

পৌষ ১৪২২ : জানুয়ারি ২০১৬

কবিতা যেমন দেখি

কবিতা পড়ে দেখা ও দেখে পড়া। কবিতার শরীর ও আত্মার সম্পর্ক। কবিতার অবয়ব, কবিতার দৃশ্যরূপ।

ক্যালিগ্রাফি : অতীন ভট্টাচার্য

(ঋণ : পঞ্চানন কর্মকার ও চার্লস উইলকিন্স)

কবিতার দেখা-পড়া

পথের ও-পারে কী আছে, বা নদীর ও-পাড়ে, তা জানতে গুগল-আর্থ দেখে নেওয়ার বদলে পথে নেমে পড়া কিংবা জলে ঝাঁপ দেওয়া বোকামিই বটে। কিন্তু উত্তর খুঁজতে চাওয়ার এহেন পদ্ধতিটি যে রোমাঞ্চকর, তা-নিয়ে সন্দেহ নেই। 'কবিতা যেমন দেখায়' শীর্ষক এই কাজটি করতে গিয়ে আমাদের অবস্থাও অনুরূপ। এমন একটি বিষয়, তা যে আদৌ 'বিষয়' হতে পারে, এটা নিজেরা বুঝতে, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অপরকে বোঝাতেই অনেকটা সময় চলে গিয়েছে। কাজটা শুরুর সময় যে আমরাও নিশ্চিত ছিলাম, ব্যাপারটা ঠিক কী, তা নয়। তবু পথে নামা, জলে ঝাঁপ দেওয়া।

জানতে-জানতে, বুঝতে-বুঝতে এগিয়েছি। এখন, সংখ্যাটি ছাপতে যাওয়ার মুখেও যে বিষয়টি ষোলো আনা ধরে ফেলেছি, তা বলতে পারি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, বিষয়টি বহুস্তরী, বহুমাত্রিক। জরুরি তো বটেই। কবিতা লেখক ও পাঠক, উভয়ের কবিতাপ্রয়াসেই এটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখার বিষয়। দুঃখজনক, সে-সচেতনতা আমাদের বাংলা কবিতায় খুব সুলভ নয়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করতে হয়েছে, ফলত একে 'সম্পূর্ণ কাজ' কোনোভাবেই বলা যাবে না। বিষয়টির একটা ধরতাই দেওয়ার চেষ্টা করা গেল, এই পর্যন্তই। সম্পাদনার ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শে ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সঙ্গে ছিলেন বরুণ চট্টোপাধ্যায় ও রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংখ্যাটির রূপায়ণে সুপরামর্শ পেয়েছি সৌম্যেন পালের থেকে। বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে। তাঁদের কৃতজ্ঞতা।

অনেক ভারী কথার মাঝে একটি হালকা কথার উল্লেখ করি। সমাপতনই! বাংলায় ছাপার হরফে একেবারে প্রথম যে পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক সজ্জাটি দেখা গিয়েছিল, সেই ১৭৭৮ সালে, হালেদ-এর বই-এর নামপত্রে — দৃষ্টিবিভ্রমে তা ভারী বিচিত্র দেখাল! কবিতা এমনও দেখায় —

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

সম্পাদক : সুস্নাত চৌধুরী

সহ-সম্পাদক : সম্বিত পাল ও জয়িতা দাশগুপ্ত
প্রকাশক : সুস্নাত চৌধুরী
যোগাযোগ : ৪৭/১ ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ, সূচক : ৭১২২৩২ ◻ চলভাষ : ৯৩৩০৯ ৪৪৪৪২
বৈদ্যুতিন বার্তা : bodhshabdo@gmail.com
অক্ষরবিন্যাস : শৈবাল ঘোষ, উত্তরপাড়া
মুদ্রণ : এস পি কমিউনিকেশনস, কল-৯
ম্যাকাও, উত্তরপাড়া
বন্ধুত্বে : বরুণ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল মুখোপাধ্যায়, রাজদীপ রায়
পিনাকপাণি ঘোষ, অরুণাভ পাত্র, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য
অতীন ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অনির্বাণ ভট্টাচার্য, প্রসুন মজুমদার ও উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব

কবিতা যেমন দেখায়

কবিতা পড়তে দেখা ও দেখে পড়া। কবিতার শরীর ও আত্মার সম্পর্ক। কবিতার অবয়ব, কবিতার দৃশ্যরূপ।

কবিতা যিনি পড়ে দেখেন, তিনি কি কবিতা, দেখে পড়েন? মানে, পড়ার আগে বা পড়ার সময় কবিতাটিকে দেখেন? হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই দেখেন। সবসময় খেয়ালে না হলেও, শারীরবৃত্তীয় কারণেই, ফলে বাধ্যত, পড়তে গেলে দেখতে হয়ই। কবিতার পাঠেও তার অন্যথা হওয়ার জো নেই। কিন্তু সেই দেখা কি আদৌ ভেবে দেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু? কবিতা যখন 'টেক্সট' হিসেবে লেখা হচ্ছে বা ছাপা হচ্ছে, তখন তার বেধে না হোক, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একটা অবয়ব তো থাকবেই। কিন্তু সেই অবয়ব কি কোনো বার্তা দেয়? যে কেজো শরীরকে আশ্রয় করে ধরা দেয় কবিতার আত্মা, সেই শরীরও কি বেজে ওঠে সময়ে-সময়ে? কবি কি সচেতনভাবেই রূপায়ণ করেন কবিতার শরীরটি? পরম মমতায় দেওয়া একেকটা স্পেস, সূক্ষ্মতর সব ছেদ-যতি, গভীর একাকী বিচ্ছিন্ন কোনো-একটা লাইন — এসব থেকে তো শুধু আত্মারই জন্ম হয় না, জন্ম নেয় কবিতার শরীরটিও। কী ভাবনা-চিন্তা চলে কবির ভেতরে, যখন সাদা পাতায় 'দেখা' দেয় একটি-একটি করে অক্ষর? আদৌ কি এসবের উপর নির্ভর করে ভোক্তা বা পাঠকের প্রতিক্রিয়া? একপাতা শূন্যতাকে আঁকড়ে কাব্যগ্রন্থের পৃষ্ঠায় কেন জেগে থাকে একা একটি কবিতা? কেন সে রান-অনের গদ্যময় ইকোনমির উলটো দিকে দাঁড়াতে চায়? পেজ-ব্রেক হলে কি কবিতা কোথাও আহত হয়? কবি আহত হন? পাঠকও কি?

যা-কিছু কবিতার মতো দেখতে, তা-ই কবিতা নয়। তারাপদ রায় বলেছিলেন, 'কবিতা এবং কবিতার মতো কবিতা — বারবার দেখেও আমার ভুল হয়ে যায়'। 'দেখা' যে শেষ কথা নয়, তা-নিয়ে আমাদেরও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম কথা বটে! কবিতার সেই দৃশ্যরূপ, তার গড়ন-সজ্জা-বিন্যাস, এমনকী তার মুদ্রণও কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে-অনুসন্ধানেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। উত্তর দিতে নয়, উত্তর খুঁজতে চেয়েছি আমরা। জানতে চেয়েছি, এ-নিয়ে বঙ্গকবিতা কী ভাবছে, কী ভাবছে কবিতাবিশ্ব? বেঁকিয়ে-চুরিয়ে লেখা দেখনদারিত্বের বিজ্ঞাপনের মতো বিচিত্র ছাঁদের কোনো অকবিতার কথা বলছি না, বলছি না মোটেই রংচঙে ইলাস্ট্রেশনের ফ্যাকাশে পাতাগুলির কথাও। একেবারে মেঠো একটি কবিতা, কিন্তু কবিতাই, তাকে কেমন দেখায়, তা-ই আমরা দেখতে চেয়েছি। সেই সূত্রে নানা কথা এসেছে ঠিকই। কিছু পুনরাবৃত্তিও রয়ে গিয়েছে। তবে, ধরতে চেয়েছি একটিই বিষয় : কবিতার শরীর ও আত্মার পারস্পরিক সম্পর্কটুকু।

— সম্পাদক

ব্লগ থেকে, বই থেকে

ব্লগ থেকে, বই থেকে

কবিতার হরফ, হরফের কবিতা

আদ্রিয়েন রাফেল

অনুবাদ : শঙ্খশুভ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সেই কিশোরী বয়স থেকেই আমার হরফের নেশা। মাইক্রোসফ্‌ট ওয়ার্ড খুলে ফন্টের ড্রপ-ডাউন মেনু ঘাঁটতে আমার কী ভালোই না লাগত — অ্যাভনি বুক, বাস্কারভিল, গাউডি, গাউডি ওল্ড স্টাইল! প্রত্যেকটি গল্প বা কবিতা লেখবার আগে আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যেত তার হরফ ঠিক করতে। ঘ্যানঘেনে সোপ অপেরা একমাত্র জেনিভা ফন্টেই লেখা সম্ভব; যেমন সুররিয়াল টাইম ট্রাভেল মানেই বুক অ্যান্টিকা।

কলেজে আমার সমস্ত লেখালিখি টাইমস নিউ রোমান-এর বারো পয়েন্টের খোঁয়াড়ে বন্দি ছিল, তা সে হোফলার টেক্সট-এ যত সুন্দরই লাগুক না কেন। এই নিয়মটায় আমার বেজায় রাগ হত, কিন্তু একজন সাচ্চা হরফপ্রেমী তার সৃজনশীলতা প্রকাশের রাস্তা ঠিকই খুঁজে বের করে নেয়। তাই হরফ নিয়ে হরেক কায়দা হয়ে উঠল আমাদের প্রকৃত সম্পাদনা এড়ানোর হাতিয়ার। গবেষণাপত্রের গতর চওড়া করতে স্পেসগুলিকে বদলে চোদ্দো পয়েন্ট করে দেওয়া; কিংবা ছেদ-যতি চিহ্নগুলিকে ছোটো করে দিয়ে একটা পাতায় ঠেসে দেওয়ার মতো আরও জায়গা বের করে আনা ইত্যাদি।

কিন্তু আইওয়া রাইটার্স ওয়ার্কশপ-এ গিয়ে আবার অনেক কিছু বদলে গেল। কবিদের মধ্যে একটা হরফের উপসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এক কবি তাঁর খুদে-খুদে বড়ো-হাতের অক্ষরগুলোকে টেক্সট বক্স-এর মধ্যে সাজিয়ে প্রতি ছত্রে অক্ষরের মাত্রাগুলিকে (শেরিফ[১]) মিলিয়ে দিলেন। অন্য আরেকজন আবার পুরোনোতেই আটকে থাকলেন, সেই বারো পয়েন্ট টাইমস নিউ রোমান; তাঁর মতে, ওটা ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করলে মনে হয়, যেন একটা জামার ওপর আরেকটা জামা পরানো হয়েছে। কিন্তু হরফ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝোঁকটা ক্রমশ বাড়ছিল। একবার একটা সেমেস্টারে তো আমাদের হরফের ব্যবহার ছোটো থেকে ক্রমে আরও ছোটো হতে লাগল — এগারো পয়েন্ট, দশ, তারপর নয়, ক্রমে সাদা পাতাটার মধ্যে আমাদের লেখাগুলো যেন মিলিয়ে যেতে বসেছিল। আর যেদিন একজন কবি এই খেলাটা ভেঙে বেরিয়ে এসে চোদ্দো পয়েন্ট ভেরদানা-তে তার পেপার জমা দিলেন, মনে হচ্ছিল অক্সফোর্ড অভিধানের মলাটে যেন একটা বিজ্ঞাপনের আখাম্বা বিলবোর্ড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০০৪ সালে কানাডার স্বনামধন্য কবি ও মুদ্রাকর রবার্ট ব্রিংহার্স্ট প্রকাশ করলেন *দি এলিমেন্টস অব টাইপোগ্রাফিক স্টাইল*, একটি ইতিহাস ও স্টাইল

গাইড যা উইলিয়াম স্ট্রাংক এবং ই বি হোয়াইট-এর বিখ্যাত ব্যাকরণ সারগ্রন্থের আদর্শে রচিত; বর্তমানে যার চতুর্থ সংস্করণ চলছে। একজন অভিজ্ঞ সুরা বিশারদের মতোই ব্রিংহার্স্ট দেখিয়েছেন হরফের কার্যকারিতা, আর কীভাবে তাকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা উচিত। 'হরফের চেহারাকে তার নিজস্ব স্বাভাবিক লব্জে বলতে দিন', তিনি লিখছেন। 'যা সুস্পষ্ট, তাকে পুনরায় ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই'। 'মার্জিনকে ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করুন'। 'ডিজাইনকে মার্জিনে মিশিয়ে দিন'। 'পাঠককে রাস্তা দেখান'।



আদ্রিয়েন রাফেল-এর ব্লগ পোস্ট

তবে ব্রিংহার্স্ট গ্রাফিক ডিজাইন ও কবিতার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা নির্দেশ করেছেন। 'কবিতা ও হরফের মধ্যেকার সম্পর্কটি প্রায়ই একটি খ্যাপাটে নেশায় পরিণত হয়', তিনি আমাকে চমৎকার পনেরো পয়েন্ট কনস্টানটিয়া-তে লিখে পাঠালেন। 'যে লেখকের (লেখায়) কোনো সারবত্তা নেই, সে-ই কেবল নিজের ব্যবহার করা হরফের চক্করে পড়ে বিভ্রান্ত হতে পারে'।

কিন্তু তাই বলে হরফকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করলেই-বা চলবে কেন? মধ্যযুগীয় লিপিকররা তাঁদের হস্তলিখিত বর্ণমালার মারপ্যাঁচে গর্ববোধ করতেন। ইলিউমিনেটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা মধ্যযুগীয় ইউরোপের আলোকিত পুথিগুলি বিস্তারিত অক্ষরবিন্যাসে সুসজ্জিত, যেসব শব্দের মধ্যে লুকোনো রয়েছে এক পৃথিবী। কবি, সমালোচক এবং *লানা টার্নার জার্নাল*-এর প্রকাশক কেলভিন বেডিয়েন্ট হরফ ব্যবহারের ব্যাপারে বেশ গোঁয়ার : তাঁর কাছে উপস্থাপনাগুলি অবশ্যই হতে হবে নান্দনিকভাবে অনুমোদিত বিন্যাসে (যেমন, কোচিন, এগারো পয়েন্ট), এবং নিজের জার্নালে বেডিয়েন্ট প্রত্যেক কবির জন্য আলাদা-আলাদা হরফ ব্যবহার করে থাকেন। প্রত্যেক কবিতার জন্যও তাঁর রয়েছে আলাদা হরফ। এই সমস্ত প্রাণবন্ত মুদ্রণসজ্জা আপাতভাবে হয়তো কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর, কিন্তু তা প্রচ্ছন্নভাবে জন্ম দেয় নিজস্ব এক স্টাইলের। বঙ্কিমতা ধীরে-ধীরে হয়ে ওঠে এক নতুন স্বাভাবিকতা।

ফন্টের ফাঁদ পাতা ভুবনে। প্রবাদ প্রতিম ফন্ট ডিজাইনার হারমান জাফ গত জুন মাসে ছিয়ানব্বই বছর বয়সে প্রয়াত হলেন। জাফ ছাড়া আধুনিক মুদ্রাক্ষরের জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন — প্যালাটিনো ছাড়া কোনো ওয়ার্ড-প্রোগ্রাম কল্পনা করুন তো! কিংবা অপটিমা ছাড়া অন্য কোনো ফন্টে ভিয়েতনাম যুদ্ধের স্মৃতিসৌধ! ২০০৭ সালে গ্যারি হাস্টউইট-এর তৈরি করা তথ্যচিত্র *হেলভেৎটিকা*-তে সর্বভূতে বিরাজমান এই সান্স শেরিফ হরফকে দেখানো হয়েছে — নিউইয়র্কের সাবওয়ে থেকে স্পেস-শাটল অরবিটর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত জায়গাতেই যার দেখা মেলে — যা হয়ে উঠেছে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সাক্ষাৎ প্রতিভূস্বরূপ। হরফ নিয়ে যদি কেবল একটামাত্র কথা আমাদের জানার থাকে, তা হবে এই যে, আমাদের চারপাশে সর্বদা কোথাও না কোথাও হেলভেৎটিকা ফন্ট আছেই।

যদিও আজকের দিনের বিচারে দেখলে, হেলভেৎটিকা-কে তেমন আহামরি কিছু বলা যাবে না। ২০১০ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিকরা প্রকাশ করেন 'ফরচুন ফেভারস দ্য বোল্ড (অ্যান্ড দি ইটালিসাইজড)' নামক একটি গবেষণা, যাতে দেখানো হয় যে, একজন পাঠক সেই লেখাগুলিকে চট করে মনে করতে পারেন, যেগুলি তিনি ছোটো এবং অস্পষ্ট ছাপার হরফে পড়েছেন। কমিক স্যান্স বা বোডোনি জাতীয় অপ্রচলিত হরফে মুদ্রিত লেখা পড়তে পাঠকের এক ধরনের মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য হয়, যার ফলে তার পাঠ প্রক্রিয়াকরণের মাত্রা আরও গভীর হয়, এবং ফলে তার স্মৃতিধারণ শক্তি বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। পাঠক যখন কোনো লেখার পাঠোদ্ধারের জন্য সেটির দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকাতে বাধ্য হন, তখন তা তাঁর মনে গেঁথে যায়।

যদিও তার মানে এই নয় যে, সবেতেই আপনাকে কমিক স্যান্স ব্যবহার করতে হবে। ২০১২-র জুলাই মাসে যখন সার্ন-এর বিজ্ঞানীরা জানালেন যে তাঁরা সম্ভবত হিগস বোসন-এর সন্ধান পেয়েছেন, স্রেফ ব্যবহৃত হরফের কারণে এই প্রাপ্তিযোগটিকে লোকজন প্রথমে পাত্তাই দেয়নি — পদার্থ বিজ্ঞানীরা তাঁদের এই প্রাপ্তির সুখবরটি প্রকাশ করেছিলেন কমিক স্যান্স হরফে, সেই অকৃত্রিম বলির পাঁঠা স্যান্স শেরিফ হরফ, যা এক কালে চটকদার মাইস্পেস পেজ-এর একচেটিয়া ছিল।

বই পড়ার সময় আমি হরফের ব্যাপারে অসম্ভব খুঁতখুঁতে। যে কারণে আমি কিন্ডল[১]-এর বদলে ঘাড়ে করে আদি ও অকৃত্রিম বই বয়ে নিয়ে বেড়াই। কিন্তু লেখার ব্যাপারটা আলাদা। লেখবার সময় আমার পছন্দ বারো পয়েন্ট টাইমস নিউ রোমান — এমন একটি ডিফল্ট হরফ আমি পছন্দ করি, যা মাথার ভিতরের চিন্তাকে হুবহু পাতায় ফুটিয়ে তুলতে আমাকে সাহায্য করে। হরফ নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি মানেই, আসলে এর আড়ালে অন্য বড়ো কোনো গলদ রয়েছে। আর এই অকারণ বাড়াবাড়ি আমার কাছে কালক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই না, কাজ না করে বসে-বসে আঙুলের নখ খাওয়া বা অকারণে চিউইং গাম চেবানোর মতো অর্থহীন।

কম্পিউটারে প্রাপ্ত হরফের সাহায্যে প্রভাব খাটানোর চেনা ছকের ব্যাপারে ব্রিংহার্স্ট আগেই সাবধান করে দিয়েছেন। 'অন্যান্য আর-পাঁচটা বিষয়ের মতোই কবিতাও একটা সাংস্কৃতিক প্রহেলিকার খপ্পরে পড়ে গেছে, যার নাম ডিজিটাল বিপ্লববাজি', তিনি আমাকে লিখেছেন —

> এর ফলে বেশ কিছু প্রাণবন্ত পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে বটে, কিন্তু এতে করে আসলে কোনো মহৎ সাহিত্য রচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে আমরা পরোক্ষে কবিদের এই শিক্ষাই দিয়ে আসছি যে পাঠ করতে বা গাইতে ভালো লাগে এমন কিছু সৃষ্টি করা তাঁদের কাজ নয়, বরং একটা পাতার মধ্যে কিছু এলোমেলো শব্দকে বিভিন্ন কায়দায় বিন্যস্ত করাই যেন তাঁদের মূল কাজ। ফলে আজকের কবিতা আগেকার নির্যাস হারিয়ে এক ভূতুড়ে চেহারা ধারণ করেছে।

তবে আমাদের লেখার ধরনের ক্ষেত্রে হরফ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বই কী। যেমন, এক কবি আমাকে একবার বলেছিলেন, 'হয়তো এটা (হরফ) একটা তৃতীয় উপাদান, যার সঠিক ব্যবহারে আমরা এমনকী কবিতাকেও অতিক্রম করে যেতে পারি'। অ্যাংলো-স্যাক্সন অনুবিদ্ধ অর্থপূর্ণ আদি অক্ষরগুলি সংকেত-বাক্যের মতো আজকালকার কবিতায় ক্রমে স্থান করে নিচ্ছে, উইংডিংস্[৩] বা ইমোজি[৪]-র আকস্মিক ব্যবহার যেন সেই আদিম হেঁয়ালির নামান্তর মাত্র। ই. ই. কামিংস এই অনুবিদ্ধ অর্থ নিয়ে খেলতে-খেলতে এক নতুন ধরনের মুদ্রাক্ষরশৈলীর জন্ম দিয়েছেন, সদ্য জন্মানো একটি ঘোড়ার নড়বড়ে পা-কে তিনি পরিণত করেছেন কাঁপা হাতের লেখা বড়ো-হাতের অক্ষরে।

লেখকদের ওয়ার্কশপে, যদিও, মুক্তধারার মতো এই হরফসজ্জা নিয়ে কেরামতির দিন শেষ। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট কলেজের মতে, গবেষণাপত্র লেখার ক্ষেত্রে বারো পয়েন্টের হরফ ব্যবহার এখন বাধ্যতামূলক, এবং বিশেষ কয়েকটি 'বুক ফন্ট' ব্যবহার করা যেতে পারে; যেমন, গ্যারামন্ড, গাউডি, প্যালাটিনো বা টাইমস নিউ রোমান। শেষমেশ যথাযথভাবে শেরিফ-সিদ্ধ হয়ে ওঠাই আমাদের ভবিতব্য।

প্রসঙ্গসূত্র (অনুবাদক-কৃত)

১. শেরিফ (Serif) : হরফের প্রান্তদেশে মাত্রার মতো দাগ-বিশেষ।

শেরিফ ফন্ট

শেরিফ সরু ও মোটা টান

Bodhshabdo

Century Oldst BT

স্যান্স শেরিফ ফন্ট

সমান সুষম বেধের টান

Bodhshabdo

Zurich Cn BT

২. কিন্ড্‌ল (Kindle) : ডিজিটাল মাধ্যমে পড়ার জন্য ব্যবহৃত এক বিশেষপ্রকার যন্ত্র। বৈ-বই (e-book) ছাড়াও এর মাধ্যমে সংবাদপত্র বা পত্রিকার বৈদ্যুতিন সংস্করণ পড়া যায় বা ডাউনলোড করা যায়।

৩. উইংডিংস্ (Wingdings) : কিছু বিশেষ ধরনের ফন্টের সিরিজ, যার দ্বারা মুদ্রণের কারুকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্নকে হরফ হিসেবেই ব্যবহার করা যায়। যেমন — ✌︎☙🗐●⌘।

৪. ইমোজি (Emoji) : কোনো আবেগ বা ভাবনা প্রকাশ করতে ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবহৃত ছোট্ট ছবি বা চিহ্ন। যেমন — ☺ 😜 ☺।

লেখিকা আদ্রিয়েন রাফেল আইওয়া রাইটার্স ওয়ার্কশপ গ্র্যাজুয়েট এবং তিনি বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা; সেখানে তিনি কাব্য সমালোচনা নিয়ে লেখালিখি করেন এবং শব্দ নিয়ে খেলাধুলো করেন। তিনি 'দ্য নিউইয়র্ক অনলাইন'-এর একজন নিয়মিত লেখিকা, এবং তাঁর কবিতা 'লানা টার্নার জার্নাল', 'দ্য বস্টন রিভিউ', 'প্রিলিউড' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান লেখাটি 'দ্য প্যারিস রিভিউ' পত্রিকার অনলাইন সংস্করণের ৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখের ব্লগ পোস্ট থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত।

হরফ-আসক্ত : কবিতার (আখর)মুখ

এডওয়ার্ড বার্ন

অনুবাদ : ঋত্বিক মল্লিক

এই সপ্তাহে প্রকাশকের জন্য আমার কবিতার বই-এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি,হরফ বিষয়ে আমার পছন্দ-অপছন্দ এই কাজেরই একটা অঙ্গ। এবং এই করতে গিয়ে আবার ভাবতে হচ্ছে, পাতায় ছাপা হলে কবিতাগুলোকে দেখাবে কেমন। তেমন চোস্ত হরফবিলাসী লোক না হলেও আমি জানি যে, যখন লেখকরা একে অন্যের সঙ্গে কাব্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, তখন মুদ্রণের বিষয়, মুদ্রণের স্বতন্ত্র স্টাইল এবং উপস্থিতির ধরন — এসব মাঝে-মাঝেই তাঁদের কথার মধ্যে আসে। এবং যাঁরা সেই অর্থে 'দৃক-কবি' (visual poets) নন, যাঁরা পৃষ্ঠার উপর শব্দগুলি কেমন করে কতটা দূরে-দূরে থাকবে এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান না, প্রথাগতভাবে বাঁ-দিকের মার্জিন মিলিয়ে লেখেন এবং চিরাচরিত লাইন-ভাঙা আর বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেন, তাঁরাও কিন্তু ছাপা পাতাটা কেমন দেখতে হবে সে-নিয়ে তাঁদের মতামত জানান।

অনেক কবিই নিজের পছন্দের হরফ বেছে নেওয়াকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমার মনে পড়ে যায়, রাতে খেতে বসে লিখনকলার স্নাতকস্তরের সহপাঠীদের সঙ্গে বিশেষ কোনো হরফের গুণাগুণ নিয়ে সব চাপান-উতোর, শেরিফের ওই একটু বেরিয়ে থাকার ছোঁয়া লেগে কোনো অক্ষরে যে কেতাদুরস্ত ভাব আর লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ে, অথবা বক্রাক্ষর লাগানো শব্দ কী লোভনীয় ঠামে হেলে থাকে পঙ্‌ক্তির উপর! আমার বন্ধুরা আর আমি বই-এর তাক থেকে বই বার করতাম এবং প্রকাশক কীভাবে বিন্যাস করেছে ছাপার হরফ, তা-নিয়ে আলোচনা করতাম।

কোনো কবিতা সংকলনের পিছনে ছাপা হরফ-বিশেষের সাতকাহন অথবা বই-এর গোড়াতেই গ্রন্থস্বত্বের পাতায় ছাপা হরফতত্ত্বের কারিগরি তরিকা পড়তে আমার পরিচিত কবিদের অধিকাংশই বেশ ভালোবাসেন। হরফবিষয়ক সামান্যতম একটা শব্দ চোখে পড়লে কবিদের আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখলেই, আমার মনে পড়ে যায় ফিল্‌ম স্টাডি-র বন্ধুবান্ধব আর কাগজে চাকরি করার সময় সহকর্মী চলচ্চিত্র সমালোচকদের ছবির শেষে পরিচয়লিপিটিও বিভোর হয়ে দেখতে থাকার কথা।

উদাহরণ হিসেবে বলি, যখন আমি আমার অফিসের বই-এর তাক থেকে এটা-ওটা কবিতার বইগুলি নিয়ে দেখছিলাম, ফিলিপ লেভিন-এর *ব্রেথ* (Knopf প্রকাশিত) বইটির নিম্ন-উদ্ধৃত অংশটি আমার চোখে পড়ে। বইটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন বইটির প্রশংসা করে আমি একটা গ্রন্থ-সমালোচনা লিখেছিলাম :

> এই বইটি ছাপা হয়েছিল 'মেরিডিয়ান' নামে একটি হরফে, ১৯৫৭ সালে বিখ্যাত ফরাসি ফাউন্ড্রি ডেবেরনি অ্যান্ড পেইগনট-এর জন্য এই ধ্রুপদী রোমান হরফটির নকশা করেছিলেন অ্যাড্রিয়ান ফ্রুটিজার। সুইজারল্যান্ডের ইনটারল্যাকেন শহরে ফ্রুটিজারের জন্ম ১৯২৮ সালে। এখানেই হরফকলা বিষয়ে পড়াশোনার সূত্রপাত, পরে জুরিখের শিল্প ও কলা মহাবিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভ। ১৯৫৩-এ তাঁর প্যারিসে আগমন এবং ডেবেরনি অ্যান্ড পেইগনট-এ নকশানবিশি বিভাগে যোগদান। মেরিডিয়ান আর তাঁর বিশ্বখ্যাত হরফ 'ইউনিভার্স' তিনি তৈরি করেন লুমিটাইপ ফোটোসেট মেশিনের জন্য।

দু-মলাটে বন্দি কোনো কবিতার কাব্যগুণ বিচারের সময়, তা ফিলিপ লেভিনের বা অন্য যে-কবিরই হোক না কেন, এইসব ব্যাপারগুলিতে যে আদৌ কিছু যায়-আসে না, তা মানতেই হবে। কেউ-কেউ তো এ-ও বলে থাকেন যে আরও আটপৌরেভাবেই লেভিনের চাঁচাছোলা কবিতাগুলো ছাপা উচিত। তবু, আমি

নিশ্চিতভাবে মানি যে, সুন্দর এবং যথাযথ হরফে ছাপা পাঠকের মনে একটা ইতিবাচকতা তৈরি করে, অথবা পাঠকের বিষয়বস্তু গ্রহণের ধারণাকে বাড়িয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে কোনো ইতালীয় কাফেতে ঢোকামাত্রই গন্ধে খিদে বেড়ে যায় কিংবা ঘুম থেকে ওঠামাত্রই কফির সুগন্ধ মন মাতিয়ে দেয়।

অবশ্য এ-কথাও মেনে নেওয়াই ভালো যে হরফের বিস্তারিত এবং খাস ইতিহাসের ব্যাপারে সবসময় পাঠকের দিক থেকে খুব-একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। 'নফ'-এরই ছাপা মার্ক স্ট্র্যান্ড-এর *ম্যান অ্যান্ড ক্যামেল*-এর শেষে হরফবিষয়ক টিপ্পনির ঐতিহাসিক বর্ণনার আবেদন আসলে আমার কাছে ছাপার হরফটার চেয়েও বেশি, হরফটা বরং বেশ মোটাদাগেরই মনে হয়। তবু, বইটি প্রকাশিত হওয়ার সময়ে আমি ইতিবাচক সমালোচনাই লিখেছিলাম। বই-এ হরফ নিয়ে যে-টীকাটি ছিল, তা হল :

> বইটি ছাপা হয়েছে 'জ্যানসন' নামের একটি হরফে, বহুকাল ধরেই ধারণা ছিল ১৬৬৮ থেকে ১৬৮৭ সালের মধ্যে লিপজিগ শহরের হরফশিল্পী আন্তন জ্যানসন এই হরফ উদ্ভাবন করেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করা গিয়েছে এগুলির স্রষ্টা হচ্ছেন হাঙ্গেরির নিকোলাস কিস (১৬৫০-১৭০২), সম্ভবত ওলন্দাজ ওস্তাদ ডার্ক ভসকেন্স-এর কাছে ইনি কাজ শিখেছিলেন। উইলিয়াম কাসলন (১৬৯২-১৭৬৬) এগুলির উপরেই ভিত্তি করে নিজের অতুলনীয় নকশাগুলি তৈরি করেন। তার আগে পর্যন্ত ইংল্যান্ডে একচেটিয়াভাবে প্রচলিত ওলন্দাজ ঘরানার মজবুত হরফের অন্যতম সেরা নমুনা এই হরফগুলি।

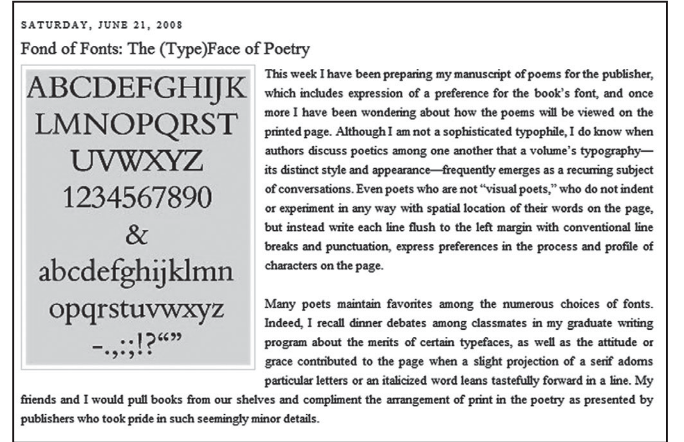
যখন প্রকাশকেরা কবির ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো মানতে লাগল, তখন হরফ নির্বাচন হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার, অনেকটা মদ, ফ্যাশন বা ঘর সাজানোর মতো। স্ট্র্যান্ড-এর পরবর্তী কবিতার বইগুলো ওলটাতে-ওলটাতে দেখলাম (*ব্লিজার্ড অফ ওয়ান, দ্য কনটিনিউয়াস লাইফ, ডার্ক হারবার*) যে, একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে, এগুলি সবই একই হরফে ছাপা এবং প্রত্যেকটি বই-এর পিছনে হরফ সম্বন্ধে একইরকম ইতিহাস লেখা আছে। সুতরাং, যদিও আমার কাছে এটা খুব-একটা আবেদন সৃষ্টি করেনি, তবু আমি এই সিদ্ধান্তই নেব যে স্ট্র্যান্ড এই হরফের একজন ভক্ত।

আবার অন্যদিকে, আমার বাড়ির লাইব্রেরিরই লেভিনের কিছু সংকলন থেকে এলোপাথাড়ি বেছে নেওয়া নমুনায় এক পট পরিবর্তন দেখা গেল — হয় কবি স্বয়ং নতুবা তাঁর সম্পাদকের মর্জিমাফিক কোনো-না-কোনো কারণে বিশেষ একটি হরফকে বেছে নেওয়ার ঝোঁক। যেমন, তাঁর *ব্রেথ*-এর ঠিক আগেই প্রকাশিত *দ্য মার্সি*-তেও সেই মেরিডিয়ান হরফেরই ব্যবহার হলেও, কালানুক্রমের বিচারে তার আগে প্রকাশিত *দ্য সিম্পল ট্রুথ* বা *হোয়াট ওয়ার্ক ইজ* বইতে আবার একটি বিকল্প ব্যবহার হয়েছে এই যুক্তিতে :

> এই বইটি মন্টিচেল্লো হরফে ছাপা। এটি আসল রোমান ১ নং ছেনি-কাটা লিনোটাইপ, বানিয়েছিলেন আর্চিবল্ড বিন্নি, আর ১৭৯৬ সালে বিন্নি অ্যান্ড রোনাল্ডসন ফিলাডেলফিয়া হরফ ঢালাই কারখানায় এটি ঢালাই করা হয়। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত পঞ্চাশ খণ্ডের বিশাল বই *পেপারস অফ টমাস জেফারসন*-এ ব্যবহৃত হরফকে সম্মান জানিয়ে এই 'মন্টিচেল্লো' নামটি দেওয়া হয়। মন্টিচেল্লো হরফটিকে বলা যেতে পারে, বামা আর বাস্কারভিল — এই দুই ধরনের হরফের মাঝামাঝি একটা স্তর, এই দু-ধরনের হরফেরই কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আছে, কিন্তু মন্টিচেল্লো-র স্বাতন্ত্র্য তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি।

গ্র্যাজুয়েট স্কুলের রাতের আড্ডা বা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমি ও আমার সহপাঠীরা হরফ নিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের তুলনা করতাম, এবং প্রকাশকের থেকে এ-বিষয়ে কোনো স্বাধীনতা পাওয়া যায় কি না — এ-প্রশ্নও উঠত। আজ যখন সেই বন্ধুদের প্রকাশ করা বইগুলি দেখি, বুঝতে পারি, যেখানে তাঁরা সুযোগ পেয়েছেন, সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। গ্রুপে বহু আলোচিত মতটিই ফিরে এসেছে যে বেমবো হরফটি কবিতার ক্ষেত্রে সেরা, আমার দুই বন্ধু তাঁদের বই-এর জন্য যেটি বেছেছিলেন, যখন সুযোগ পেয়েছিলাম, আমিও তাই করেছিলাম। যদিও আমাদের আরেক বন্ধু ব্যবহার করেছিলেন গ্যারামন্ড হরফের একটি আধুনিক সংস্করণ, সেটিও আমাদের পছন্দেরই ছিল।

বেমবো হরফটিকে এভাবে বলা যায়, '১৪৯৫ সালে কার্ডিনাল বেমবো-র *দে এতনা* পুস্তিকার জন্য ফ্রান্সেসকো গ্রিফো যে রোমান ছেনি-কাটা হরফ বানিয়েছিলেন, বেমবো হরফটি তার উপর ভিত্তি করে তৈরি'। গ্যারামন্ড হরফটির ক্ষেত্রে স্মরণীয় 'ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের এক ফরাসি হরফশিল্পী ও মুদ্রাকর'। আর আঠারো শতকের এক ইংরেজ তৈরি করেছিলেন বাস্কারভিল হরফ, এটিরও যথেষ্ট আবেদন রয়েছে আমার কাছে।



SATURDAY, JUNE 21, 2008

Fond of Fonts: The (Type)Face of Poetry

This week I have been preparing my manuscript of poems for the publisher, which includes expression of a preference for the book's font, and once more I have been wondering about how the poems will be viewed on the printed page. Although I am not a sophisticated typophile, I do know when authors discuss poetics among one another that a volume's typography—its distinct style and appearance—frequently emerges as a recurring subject of conversations. Even poets who are not "visual poets," who do not indent or experiment in any way with spatial location of their words on the page, but instead write each line flush to the left margin with conventional line breaks and punctuation, express preferences in the process and profile of characters on the page.

Many poets maintain favorites among the numerous choices of fonts. Indeed, I recall dinner debates among classmates in my graduate writing program about the merits of certain typefaces, as well as the attitude or grace contributed to the page when a slight projection of a serif adorns particular letters or an italicized word leans tastefully forward in a line. My friends and I would pull books from our shelves and compliment the arrangement of print in the poetry as presented by publishers who took pride in such seemingly minor details.

এডওয়ার্ড বার্ন-এর ব্লগ পোস্ট

নিশ্চিতভাবে, কিছু হরফ হয়তো কবিতায় ছোটো দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তি বা মাঝারি দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহারযোগ্য; আর অন্যগুলি আবার হয়তো দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে বেশি চলে। বেশ কিছু বছর ধরে আমার কবিতায় দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির ব্যবহার বেশি ঘটছে। এর ফলে হরফের ক্ষেত্রে আমার পছন্দের পরিবর্তন ঘটেছে, বেমবো থেকে গ্যারামন্ড ধরনের হরফ এখন বেশি পছন্দের। পাশাপাশি আমার গ্রানজোন হরফটিও ভালো লাগে, এই হরফটি গ্যারামন্ড থেকে ১৯২০ নাগাদ তৈরি হয়েছিল, যদিও এর নাম দেওয়া হয়েছিল ষোড়শ শতকের এক হরফনির্মাতার নামে। যখন 'নফ' প্রকাশিত অ্যামি ক্ল্যামপিট-এর *দ্য কিংফিশার* বইটি দেখলাম, প্রায় পঁচিশ বছর আগে বেরোনো এই বইটিতে ব্যবহৃত এই হরফকে আমার প্রথম ভালো লাগল। এই হরফ সম্বন্ধে বই-এ যা লেখা হয়েছিল, তা হল :

> এই বইটি গ্রানজোন হরফে লিনোটাইপে ছাপা। রবার্ট গ্রানজোন-এর অনুষঙ্গেই এর নাম। জর্জ ডবলু জোনস এই হরফের নকশা প্রস্তুত করেন ক্লদ গ্যারামন্ড (১৪৮০-১৫৬১)-এর সুদৃশ্য ফরাসি বইগুলিতে ব্যবহৃত হরফের উপর ভিত্তি করে। 'গ্যারামন্ড' নামধারী আধুনিক বিবিধ হরফের তুলনায় গ্যারামন্ড-এর আসল রূপের অনেক কাছের হরফ হল গ্রানজোন। রবার্ট গ্রানজোন হরফের ছেনি কাটার কাজে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ১৫২৩ সালে, এবং ছাপাই-এর কাজ ছাড়াও যাঁরা প্রথম হরফ উদ্ভাবক হিসেবে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

যদিও নানা কারণে আমি অনলাইন সাহিত্যপত্রিকার সমর্থক, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে যেমন *ভালপারাইসো পোয়েট্রি রিভিউ*, যেটি দশ বছরে পড়ল, কিন্তু আমার মধ্যে এখনও কবিতার বই-এর প্রতি ভালোবাসা এবং সুন্দর ছাপার প্রতি অনুরাগ বজায় আছে। হাতে বইটির স্পর্শ, হাতে করে পাতা ওলটানো এবং সাদা কাগজকে পশ্চাদপট করে ধ্রুপদী হরফগুলির নিজের বৈশিষ্ট্যে উপস্থিতি — এগুলির জন্যই এই ভালোবাসা আর অনুরাগ। সব হরফের গঠন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নকল করা যায়,

যদিও কম্পিউটার স্ক্রিনের ঔজ্জ্বল্যে বহু ক্ষেত্রেই হরফগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়।

এমনকী এখন, যখন কিন্ড্‌ল ই-বুক জনপ্রিয়তর হয়ে উঠেছে, অনলাইনে আরও বহু লেখা মিলছে, এবং আমি জানি, আমি ছাড়াও অনেকে কবিতা লিখছে, তবু এখনও কাগজে ছাপার প্রতিই আমার পক্ষপাতিত্ব বজায় রেখে চলেছি — এর সমান-সমান ছাড়, গাঢ় বা হালকা টান, ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া প্রান্তের তীক্ষ্ণ শেরিফ আর ছোটো হাতের হরফের উপর-নীচে বেরিয়ে থাকা। আমার কাছে এসব বৈশিষ্ট্য শুধু একটা হরফকে সংজ্ঞায়িত করে না যা দিয়ে কবিতা ছাপা হয়, বরং বিগত কয়েক দশক ধরে বই-এর বহুকৌণিকতাকেই তুলে ধরে যা আমার মনে কবিতার মুখ হিসেবেই থেকে যায়।

এডওয়ার্ড বার্ন একজন মার্কিন কবি ও আমেরিকার ভালপারাইসো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এ-পর্যন্ত তাঁর আটটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 'টাইডাল এয়ার' (২০০২), 'সিডেড লাইট' (২০১০), 'টিন্টেড ডিস্ট্যান্সেস' (২০১১) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান রচনাটি তাঁর ব্লগ 'One Poet's Notes'-এর ২১ জুন ২০০৮-এর পোস্ট থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত।

কেমন দেখতে হওয়ার কথা কবিতার? মুদ্রকের পন্থা ও কবির পঙ্‌ক্তি

জাঁ অ্যালিস ইয়াকবসন

অনুবাদ : অরুণাভ পাত্র

'How Should Poetry Look? The Printer's Measure and Poet's Line' শিরোনামাঙ্কিত একটি গবেষণাপত্র আমাদের বর্তমান অনুবাদের বিষয়। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জাঁ অ্যালিস ইয়াকবসন এই গবেষণাপত্রটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ হিসেবে ২০০৮ সালে জমা দেন।

১৬৮৩ সালে ইউরোপে কাঠের ব্লক ব্যবহার করার সময় থেকে শুরু। এরপর কবিতা ছাপার ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে।[১] মূল গবেষণাপত্রটিতে সেই তিনটি পর্বের কথাই তিনটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডিজিটাল জমানায় কবিতার চেহারা কীরকম দাঁড়াবে, তার একটা ইঙ্গিত কবিতা ছাপার ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যেতে পারে। এইরকম একটা জায়গাতে গিয়ে শেষ হয়েছে ইয়াকবসনের গবেষণা। তবে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতাই তাঁর আতসকাচে ধরা পড়েছে। আর প্রধানত বিভিন্ন কবিতার প্রথম পাতাটুকুকে নিয়েই হয়েছে তুলনামূলক আলোচনা। এ-জন্য তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা অবশ্য স্বীকারও করে নিয়েছেন অ্যালিস। ৩৪৮ পাতার দীর্ঘ গবেষণাপত্রটির পুরো অনুবাদ এই স্বল্প পরিসরে রাখা সম্ভব নয়। তাই বিষয়মুখ ও পত্রিকার আয়তনের কথা বিবেচনা করে গবেষণাপত্রটির নির্বাচিত কয়েকটি অংশের অনুবাদ করা হল। — অনুবাদক

গ বে ষ ণা প ত্রে র নি র্বা চি ত অং শ

বিষয়সার

মুদ্রকেরা ছাপার সময় যেসব নিয়মাবলি ব্যবহার করেন, আমি সেইসব নাড়াচাড়া করার পাশাপাশি চারটি বিখ্যাত প্রকাশনার প্রথম পাতায় তা কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা নজরে আনার চেষ্টা করেছি। এ-জন্য বেছে নিয়েছি উইলিয়ম শেক্সপিয়র-এর *Sonnets*, টমাস গ্রে-র *Stanzas Wrote in a Country Church-Yard*, ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর *Leaves of Grass* এবং টি. এস. এলিয়ট-এর *The Waste Land*। একটি কাগজে কবিতা কীভাবে ছাপা হয়, তা বুঝতে আমি গত চারশো বছরে ইংরেজি ও মার্কিন কবিতার পাতার পেজ ডিজাইন ও লেআউট নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। একই সময়ের দু-টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী উদাহরণও আমাকে রাখতে হয়েছে। তুলনা করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিত বেছে নিয়েছি। যেমন, হরফ, চিত্রগত উপাদান, ছাড়, ইনডেন্টেশন, পৃষ্ঠার আকার-আয়তন, পৃষ্ঠানিশান ইত্যাদি। বিভিন্ন ম্যানুয়াল এবং মুদ্রণের ইতিবৃত্তের নিজস্ব নিয়মেই কয়েকটা বাধ্যবাধকতাও মেনে চলতে হয়েছে।

বিভিন্ন ছাপাখানায় যে-পদ্ধতিতে কবিতা ছাপা হয় বা হয়ে এসেছে, তার রেকর্ড ঘাঁটার পাশাপাশি কবি, মুদ্রক, সম্পাদক এবং প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলেও অনেক তথ্য উঠে এসেছে। মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে যেভাবে কবিতা তার অবয়ব খুঁজে পেয়েছে, সেই পথ থেকেই ভবিষ্যতে অন্য মাধ্যমে কবিতা কী চেহারা নেবে, তার ইঙ্গিত মিলতে পারে বলেই আমার ধারণা।

গবেষণার কূটপ্রশ্ন

ডিজিটাল দুনিয়ায় কবিতাকে ঠিক কীভাবে দেখতে পাওয়া যাবে — এই প্রশ্নটা মাথাচাড়া দেওয়াতে আমার মধ্যে যে-উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, সেটিই এই গবেষণাপত্রের সূচনাসূত্র। কালি-কাগজ-ছাপাখানা না-থাকা এই রঙিন, নতুন মাধ্যমে কীভাবে জায়গা করে নেবেন কবিরা? এরকম কিছু প্রশ্ন থেকেই শুরু এই গবেষণা। আমরা ধরে নিতেই পারি আগামী দিনে কবিরা কবিতা লিখবেনই। এবং তাদের মধ্যে বেশ কিছু কবিতা দেখতে একেবারেই অন্যরকম হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ফারাকটা নতুন মাধ্যমে কীভাবে উঠে আসবে? মাধ্যমের কথা মাথায় রেখেই কি কবিরা কবিতা লিখবেন? না কি, তাঁদের কবিতা একটি সম্পূর্ণ নতুন যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে? কালি-কাগজ-ছাপাখানার সিস্টেমকে সাধারণত কবিরা একটা স্বচ্ছ মাধ্যম বলেই মনে করেন। তাহলে কি কবিতা মুদ্রণের ইতিহাস ঘাঁটলে ভবিষ্যতের একটা ধাত আন্দাজ করা সম্ভব? সেক্ষেত্রে মাপকাঠিগুলো কী হবে? আমরা ধরে নিতে পারি, সময়ের সঙ্গে কবিতা তার নিজের চেহারা পালটেছে। তা সত্যি হলে, কোন-কোন ফারাকগুলো আমরা চিহ্নিত করব? আমাদের কি বিচল হরফের জমানার শুরু থেকে কবিতা ছাপার ক্রমবিবর্তন নজরে আনতে হবে? এমন কিছু প্রশ্ন থেকেই আমার এই গবেষণার শুরু।

গবেষণারীতি

চারটি নির্বাচিত কবিতার ছাপার ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন বুঝতে এবং তার মাধ্যমে কবিতা ছাপার ট্রেন্ড খুঁজতে আমি কিছু পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছি। সেগুলো হল —

১. প্রতিটি মুদ্রিত কবিতার প্রথম পাতা থেকে কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ।

২. মুদ্রণশিল্পী ও কারিগররা চার শতাব্দী ধরে নিজ-নিজ কালপর্বের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যেসমস্ত ছাপাই-পদ্ধতিমালা ও নিয়মাবলিগুলিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেগুলির সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

৩. সময়ের সঙ্গে ছাপাখানার যন্ত্র ও পদ্ধতির পরিবর্তন নজরে এনেছি।

৪. যথার্থভাবে তুলনীয় বলা চলে, সমসাময়িক এমন কিছু প্রাসঙ্গিক কবিতা সাজিয়ে নিয়েছি মূল্যায়নের জন্য। আমি যা সব খুঁজে পেয়েছি, তা তথ্যপ্রমাণ-সহ মূলত তিনটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। একটি অধ্যায়ে কাঠের ব্লক, মাঝেরটিতে হাতে-চালানো লোহার তৈরি হ্যান্ডপ্রেস ও শেষে কিবোর্ড আসার পর কীভাবে ছাপাই-এর কাজে পরিবর্তন এসেছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছি।

কবিতা ছাপাছাপির বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করে সারবস্তু যা মিলেছে, এই গবেষণার সিদ্ধান্তে সেগুলি ধরে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে *The Waste Land* পরবর্তী সময়ে কবিতা ছাপার যে মূল বিধি বা নিয়মাবলি তৈরি হয়েছে, সেটাকেও চিহ্নিত করতে পেরেছি। মনে দাগ কেটে যাওয়া বিয়াট্রিস ওয়ার্দে[২]-র মতামতগুলিকে বিশেষভাবে মাথায় রেখেই এ-ব্যাপারটা আলোচনায় সামিল করে নিতে হয়েছে।

হালের কবিতা দেখাবে কেমন : কবিদের জন্য নয়া সমাচার

কবিতা নিয়ে কবির ভাবনা এবং তার সঙ্গে মুদ্রণযন্ত্রের যোগাযোগের বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটবংশীয় কবি উইলিয়াম এভারসন-এর সম্পাদক অ্যালবার্ট জেলপি *Dark God of Eros*-এর মুখবন্ধে লিখেছিলেন, 'মুদ্রক হিসেবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এভারসনের দাবি ছিল, যদি কোনো-কিছু তাঁকে অমরত্ব দিয়ে থাকে, সেটা অবশ্যই তাঁর কবিতা।' ইকুইনক্স ছাপাখানা উদ্বোধনের সময় এভারসন নিজেও বলেছিলেন, 'একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে সবথেকে ভালো কিছু করা বলতে আমি কবিতা লেখা বুঝি, তার পরেই থাকবে কবিতা ছাপার কাজ'। *The Waste Land* পরবর্তী সময়ে একটি বিশেষ লক্ষণ আমার চোখে পড়েছে। তা হল, কবি, কবিতা ও মুদ্রণযন্ত্রের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য, যেন একদেহ-একপ্রাণ সত্তার ক্রমোন্মেষ। কবিতাকে কেমন দেখতে হবে, তা বুঝতে হুইটম্যান কীভাবে মুদ্রণযন্ত্রকে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করেছেন, তা-ও আমরা অন্যত্র দেখেছি। পাশাপাশি, কাগজের সাদা অংশ ও কবিতায় পঙ্‌ক্তিবিন্যাস নিয়ে টাইপরাইটারের সাহায্যে এলিয়ট তাঁর কবিতায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তা-ও আমরা লক্ষ করেছি। আসলে, একজন গবেষকের কাছে প্রশ্নটা এরকম, 'কবিতাকে কেমন দেখতে হয়?' — আর, একজন কবির কাছে একই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, 'কবিতাকে কেমন দেখতে হওয়া উচিত?'

ফ্রি ভার্স-এর অক্ষরবিন্যাস কেমন হবে? শব্দ ও গ্রাফিক্স কি ভবিষ্যতের কবিতায় জায়গা করে নেবে? কবিতা কেমন দেখতে হওয়া উচিত, এ-প্রশ্ন পাঠক এবং মুদ্রণশিল্পী, দুই তরফ থেকেই ধেয়ে এলেও অধিকাংশ মুদ্রকই মেনে নেন, এ-ব্যাপারে কবির রায়ই শিরোধার্য। টাইপরাইটার আসার পরেও কবিতার খসড়ায় একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। কম্পিউটারে নতুন পেজ লেআউট এবং টাইপোগ্রাফি আসার পর কবিদের সামনে আবার একটা নতুন দরজা খুলে গিয়েছে। কবিতা কীভাবে ছাপা হবে, তা-নিয়ে কবির বক্তব্য এখন হরফসজ্জার আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একেবারে খসড়া তৈরির সময় থেকেই। তবে, কবি কী কবিতা লিখছেন, তার ওপরও বিষয়টা অনেকটা নির্ভর করছে। কবিতা ছাপার ইতিহাসে পাকাপাকি হয়ে-ওঠা মোদ্দা কথাটা বুঝলে দেখা যায়, নতুন মাধ্যমে আসার পর সাধারণত বিরাট কোনো পরিবর্তন আসে না। এক্ষেত্রেও কি তাই হবে?

প্রাসঙ্গিকতা : হতেই পারে, কবি, পাঠক এবং মুদ্রকেরা কাগজে কবিতা ছাপার স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বেরোলেন না। বিবর্ণ, ম্যাড়মেড়ে গদ্যের মতো না হয়ে কবিতা কাগজে-ছাপা বইতে চিরকালীন হয়ে থাকতেই পারে। কবি এবং মুদ্রক রামন্ডস্-এর বক্তব্য ছিল, হ্যান্ড-প্রেসে ছাপা কবিতা, তাঁকে একটা ত্রিমাত্রিক অনুভূতি এনে দেয়। এই মতের সমর্থকের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা সেই বই পছন্দ করেন, যা হাতে বানানো যায়, কেনা যায় এবং কিনে বাড়িতে রাখা যায়। শারীরিক উপস্থিতি না থাকায়, ডিজিটাল হরফ তাঁদের আনন্দ দিতে ব্যর্থ।

জেরোম ম্যাকগন[৩]-এর যুক্তি হল, ডিজিটাল হরফ আর কাগজে ছাপা বই কবিদের কাছে আলাদা মাত্রা বয়ে নিয়ে আসে। মরিসের ওপর লেখা একটি প্রবন্ধে[৪] তিনি তাঁর কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন —

> হরফ বা টেক্সটকে কবিরা নিশ্চিতভাবেই অন্য চোখে দেখেন। টেক্সটের বস্তুগত তাৎপর্য (মৌখিক, হাতে লেখা, ছাপা অথবা ইলেকট্রনিক) তাঁদের একটা রক্ত-মাংসের বাস্তবতা এনে দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানী ও গবেষকের কাছে অনুভূতি একটা চিন্তার প্রকাশ মাত্র। চিন্তনের বিষয় জানাটাই সেখানে আসল লক্ষ্য। তা কীভাবে, ও কী আকারে প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা তাঁদের কাছে গৌণ বিষয়। তাই এটার জন্য তাঁরা নতুন একটা মাধ্যমের সাহায্য নিতে বা তৈরি করতে পিছপা হবেন না।

কবিতার ভাবসত্যকে এক বস্তুময় বাস্তবে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াকেই 'হয়ে-ওঠা' (reification) বলতে চেয়েছেন ক্লিফোর্ড বার্ক। আসলে, কাগজে ছাপা কবিতা নিজেই একটা সম্পূর্ণ ও পরিণত মাধ্যম। ছাপাই-এর ইতিহাসে কবি ও মুদ্রণশিল্পীর (মুদ্রণশিল্পী-কবি এবং কবি-মুদ্রণশিল্পী, দুই ভূমিকাতেই) ঘনিষ্ঠ যুগলবন্দি সে-কথাই সমর্থন করে। কবিরা মুদ্রক হয়ে উঠছেন, এই নজির কি তাহলে ভবিষ্যতেও জারি থাকবে? সম্ভবত কবিতার রক্ত-মাংসের অনুভূতির সঙ্গে জড়িত আছে তার চেহারা। বিয়াট্রিস ওয়ার্দে ও তাঁরও আগে কিছু মুদ্রক একটি পাতায় একটি কবিতার যে-নিয়ম চালু করেছিলেন, তা-থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ভবিষ্যতেও পাঠকেরা একটি সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় কবিতা দেখার দাবি জানাবেন, ঠিক যেমনটা হয়েছিল কাগজের ক্ষেত্রে।

সম্ভবত ডিজিটাল টেক্সট কবিদের কাছে নতুন একটা সুযোগ এনে দিতে পারে। কাগজের বিদায় হয়তো কবিদের মুক্ত করবে। যে-আত্মপ্রকাশের ইচ্ছে কবিদের বিভিন্ন সময়ে দক্ষ মুদ্রকে পরিণত করত, সেই জায়গাটা নতুন ব্যবস্থায় হয়তো আর থাকবে না। কাগজের পাতায় কবিতাকে রূপ দেওয়ার জন্য বিখ্যাত হয়েই থাকবেন রামন্ডস্, ব্রিংহার্স্ট এবং বার্ক। কিন্তু ছাপাইভুবনের ভার নিয়ে কি তাঁরা রচনাক্রিয়া থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিলেন? অন্য কারো দৃশ্যত চমৎকার একখানি কবিতা ছাঁদতে গিয়ে কি তাঁরা নিজেদের নিদেন মহৎ-হলেও-হতে-পারত একটি কবিতা লেখা থেকে সরে গেলেন না? যেসব দক্ষ লেখক ছাপার নিয়মাবলি ভালো জানেন, তাঁরা তাঁদের কবিতা কেমন দেখতে হবে, তার একটা আন্দাজ নিজেরাই করে নেন। এখানেই তাকাতে হচ্ছে অতীতের দিকে। ডিজিটাল মাধ্যমের ক্ষণস্থায়ী ও সদাপরিবর্তনশীল নিয়মকানুন আসলে আমাদের বার বার নিয়ে যাবে ইতিহাসের পাতায়। সেখান থেকেই মিলবে ভবিষ্যতের রূপরেখা।

কবিতাকে সঠিকভাবে কাগজের পাতায় তুলে ধরতে চূড়ান্ত সফল হয়েছেন বাস্কারভিল এবং মরিস। কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করবেন মর্মমূলে অতি ছলনাময় এক মহত্বপিয়াসেরই মুখাপেক্ষী হতে হয় কবিতাকে। *Printing and the Mind of Man*-এ কার্টার ও মুর আলোচনা করেছেন, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাকে কীভাবে ছাপতে হয়, আর সেখানেই তাঁরা একটি অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন — 'কাগজে আসলে ভাবের একটা অংশ ছাপা হয়, যদিও কোনো পঙ্‌ক্তিই কল্পনার পঙ্‌ক্তির মতো সরলরেখা নয়, কোনো বাঁকই ভাবনার বাঁকের মতো স্বচ্ছ নয়'।

লেখা আর কাগজে তার ছবি তবু কিছুটা হলেও একসঙ্গে যায়। কবিতা কেমন দেখতে হবে, সেটা মাথায় রেখেই কবিরা তাঁদের ভাষা খুঁজে নিচ্ছেন, অথবা মুদ্রকেরা কাগজের পাতায় কবিতাকে তুলে ধরতে বিশেষ দক্ষতার নজির রাখছেন। দুই ক্ষেত্রেই কবিতা আসলে নিরন্তর হরফের সমাহার। *Print, Manuscript and the Search for Order, 1450-1830* বই-এর শুরুতেই ডেভিড ম্যাককিটট্রিক[৫] মন্তব্য করছেন, 'কবিতা কেমন দেখতে হবে এবং কবিতা কী হরফে সাজানো হবে, দু-টি বিষয়েই যত্নশীল লোকের সংখ্যা খুবই কম, যদিও বাণিজ্যিক মাধ্যমে প্রকাশিত কবিতা দেখে খুব সহজেই বোঝা যায়, টাইপোগ্রাফি, কাগজ, বাঁধাই ও ফর্ম্যাট নিয়ে কবিদের একটা সহজাত বোঝাপড়া আছে'।

প্রবহমান অক্ষরমালা : 'কীভাবে কবিতা লিখতে হয়', এই ধারার বই-এর একবিংশ শতাব্দীর বেস্টসেলার টেড কুসার[৬]-এর *The Poetry Home Repair Manual : Practical Advice for Beginning Poets*। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে লেখা এই বইতে ছাপাই-এর চিন্তাকে বার বার দূরে সরিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কুসারের দাবি, নতুন কবিদের লেখার সময় কিছু বাধ্যবাধকতা মাথায় রাখা উচিত। তাঁর সতর্কতা, ছাপাই-এর দক্ষতা যেন কোনোভাবেই সামনে না আসে। গ্রাফিক্স পাঠককে কবিতার ভাব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। হরফাচ্ছাদন পেরিয়ে পাঠককে কবি এক ভাবকাননে নিয়ে যেতে চান — '&'-এর মতো একটি চিত্রসংকেতের অনুপ্রবেশও কিন্তু সেই যাত্রায় পাঠকের পথ আগলে দাঁড়াতে পারে।

কবিতাকে গ্রাফিক আর্ট হিসেবে না দেখে শুধুমাত্র ভাষাগত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার দিকটিও চমকপ্রদ। যদিও টাইপ আদতে একটি প্রতীকী মাধ্যম। রচনাকালে অক্ষরবিন্যাসরত অধিকাংশ কবি এক পঙ্‌ক্তির শেষ বিন্দুতে গিয়েই অজ্ঞাতসারে পাতার আয়ত ঠাম, ওই চৌকোটে লিখনক্ষেত্র কোনো-না-কোনোভাবে চোখের মাথায় তুলে ফেলে এবং সেটা করে মানসচক্ষে বই ছাপা ও ছাপা বই-এর আকার-ভাবনার অবধারিত আগ্রাসনেই। কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি কবিতায় রচনা, লিখন, টাইপিং ও টাইপসেটিং একইসঙ্গে হয়ে থাকে। আজকের কম্পিউটার কিবোর্ডে টাইপরত কবিদের মধ্যে টাইপরাইটারে বসা কবি এলিয়েটের প্রত্নলীলার পুনরাভিনয় ঝলসে ওঠে — হাজারো প্রোগ্রাম দিয়ে কীভাবে টাইপসেটিং-এ মোচড় দিয়ে কবিতার দৃশ্যরূপে বেতালসিদ্ধ হওয়া যায়, কবি ভাবতে থাকেন। শুধু তাঁর কম্পিউটারে সেই নির্দিষ্ট প্রোগ্রামটি ইনস্টল করা থাকতে হবে। উদাহরণ হিসেবে 'মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ২০০৭'-কে ভাবা যেতে পারে। এখানে প্রচলিত প্রিন্টিং-এর নিয়ম 'বাই ডিফল্ট'। *ক্রিটেরিওন*[৭] যেভাবে *The Waste Land* ছেপেছে, সেভাবে ওয়ার্ড-এ ছাপতে গেলে এই কটি বিষয় উঠে আসে —

- একটি পঙ্‌ক্তি শেষ করার পর এন্টার টিপলে একটি নতুন পঙ্‌ক্তি শুরু হয়, যাঁর প্রথম অক্ষরটি বড়ো-হাতের হয়ে থাকে।
- পঙ্‌ক্তির মধ্যে ফাঁক এবং পঙ্‌ক্তি সাজানো নিয়ে নানা অপশন দিয়ে থাকে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড। পাতা ঠিক কেমন দেখতে হওয়া উচিত, এই পরামর্শও দিয়ে থাকে, যদি কী লিখতে চাওয়া হচ্ছে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।
- ওয়ার্ড একটি হরফও নির্দিষ্ট করে দেয়।
- ওয়ার্ড বিভিন্ন ড্রপ ক্যাপ বা বড়ো-হাতের হরফ তৈরি করতে পারে, যদিও সে কবিতার মানে, কবিতার শুরু বা কবিতার স্তবক, কোনোটাই বুঝতে পারে না।
- দু-টি অক্ষরের মাঝে কতটা ফাঁক হতে হবে, তা ওয়ার্ড বুঝবে, তবুও আপনাকে আলাদা করে কিনে নিতে হয় বিশেষভাবে বানানো ডিজিটাল হরফ, যা আরও সঠিক হরফবিন্যাসের নিয়ম মেনে বানানো, যা অক্ষরকে আরও সঠিকভাবে সাজাতে পারে। এই বিন্যাস-কানুন আবার ছাপার নিয়মাবলি থেকেই উঠে আসা।
- ওয়ার্ড নির্দেশ পেলে হিসেব করে 'সেন্টারড টেক্সট' করতে পারে।[৮]

নয়া মাধ্যম ও নব প্রকরণসমূহ : কালি ও কাগজের থেকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক মাধ্যম কি আরও বেশি তৃপ্তিদায়ক? ডিজিটাল লেখার নানা ফর্ম বা ধারা আছে। সঙ্গে আছে অ্যানিমেশন, সাউন্ড, লিংক, উইকিলিংক-সহ আরও যা-যা কিছু ভাবা সম্ভব। কিন্তু কোনো নিয়ম কি তৈরি হয়েছে বা হবে? লিংক-সহ কবিতার সাফল্যের মাপকাঠি কী? তা কীভাবে সবার কাছে পৌঁছোচ্ছে? পাঠকেরা কীভাবে পড়ছেন? এই প্রশ্নগুলো থেকে যাচ্ছে। কবি মুদ্রকদের নিবিড় যোগাযোগের কথা তো বলেই ফেলা হল নানারকমভাবে। টেকনিশিয়ানদের কাজের জায়গাটা বদলে গেলেও, এটা স্পষ্ট যে, নতুন মাধ্যমেও তাঁদের সঙ্গে কবিদের যথেষ্ট যোগাযোগ থাকবে। নতুন যান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেই কি কবিতার পরিবর্তনের একটা ধারার শুরু হবে? কবিতার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে 'কাগজে ছাপা', এই বিষয়টাই কি একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে? লিংক বা হাইপারটেক্সট-এর সঙ্গে হাতে হরফ সাজানো বা টাইপসেটিং-এর খুব মিল নেই। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ও কবিতা লেখার মধ্যে কোনো ফারাক কি তাহলে থাকবে? কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা লক্ষ করেছেন — অনেক কম্পিউটার প্রোগ্রামারের মতে, সফ্টওয়্যার রচনার মূলেও আছে কবিতা লেখার মতোই এক রহস্যময় সৃজনমায়া। কোনো নয়া প্রযুক্তি বা শ্রেয়তর শ্রমবিভাজন আমদানি করেই তার বিকল্প মিলে যাবে, এমন ভাবনা আদৌ সঙ্গত নয় বলেই মনে করেন তাঁরা।[৯]

কেউ-কেউ অবশ্য কবি ও তাঁর কবিতার মধ্যে যান্ত্রিক অনুপ্রবেশের কথা উসকে দিচ্ছেন। বলছেন, মেশিন নিজে থেকে সেইসব অক্ষর তৈরি করে, যা তার কাছে অর্থহীন বা বোধগম্যতার বাইরে। বিপদটা অনেকটা টাইপরাইটারে ফিক্সড পিচে টাইপ করার মতন বা লিনোটাইপ পদ্ধতিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজের অতিরিক্ত জায়গা নিয়ে নেওয়ার ঘটনার মতনই। আয়তাকার কাগজকেও অনেকে নানা যুক্তিতে অপছন্দ করার কথা বলতে শুরু করেছেন। মানুষ ও যন্ত্রের সম্পর্কের অভিমুখ ঠিক করে দেবে একমাত্র এই দশ-আঙুলে প্রাণীটিই, গল্প বলা এবং আলেখ্য সৃষ্টির উপযোগী হার্ডওয়্যারের অধিকারী হিসেবে বিজ্ঞান যে একমাত্র মানুষকেই মেনে নিয়েছে, এ-কথা স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন স্টিফেন জে গোউড[১০]।

প্রেস ও ছাপার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, যন্ত্র এমন একটা-কিছু, যা আমাদের চাহিদাকে আরও সঠিকভাবে প্রকাশ করে। আদর্শ পাতা তৈরির একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিমালা মেনে কাজ করা হাত-ছাপাই যন্ত্রের কারিগররাও লেখা আঁটিয়ে নিতে গিয়ে হাত ও চোখের ভ্রান্তিবিলাশে মাঝে-মাঝে এমনসব কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন, যেগুলি সত্যিই বড়ো চমৎকার।

নতুন যান্ত্রিক ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে কবিতা কি নিজেকে আরও যুগোপযোগী করে তুলবে? কেবল অক্ষর দিয়ে লেখা কবিতা আর গ্রাফিক উপাদান-সহ কবিতার মধ্যে একটা বিরোধাভাস তৈরি হয়ে গেছে আমার গবেষণাপত্রের অন্তিম অধ্যায়ে। উইলিয়াম মরিসের টেকনিক কবিতা ও ছবির মিলেমিশে যাওয়ার একটা নতুন সীমারেখায় আমাদের নিয়ে যায়। এই ট্রেন্ডটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার নয়। অন্যদিক থেকে দেখলে, অক্ষরে-সাজানো কবিতা হাতে-ধরা একটি যন্ত্রে টেক্সট মেসেজিং-এর মতো হয়ে যেতে পারে। যার একটা সম্ভাব্য তুলনা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত গারট্রুড স্টেইন[১১]-এর মডার্ন টাইপোগ্রাফি পদ্ধতিতে ছাপা *Tender Buttons* বইতে। কিন্তু আমাদের কি টাইপ করা অক্ষর পড়তেই হবে? একটি যন্ত্র হিসেবে কম্পিউটার কখনোই নিজেকে শুধু কিবোর্ড আর পেজ লেআউটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। কবি ও মুদ্রকেরা চাইলে কম্পিউটারকে কলমের মতোও ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক যেভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবিরা পাণ্ডুলিপি লিখতেন। কম্পিউটারে ফন্টের স্বাধীনতাও বেড়েছে সীমাহীনভাবে। একটি বিশেষ কবিতার জন্য একটি বিশেষ হরফ একজন কবি এখন নিজেই তৈরি করে নিতে পারেন। কবি ও মুদ্রকেরা যদি এমন পাতা তৈরি করেন, যা বর্গাকার বা চৌকো নয়; এমন-এমন অক্ষর বানিয়ে তোলেন, যার জন্য কোনো হরফ নির্ধারিত হয়ে নেই, তাহলে কি পাঠকেরা তা মেনে নেবেন?

নয়া থাম্ব-রুল : অধিকাংশ কবি ও মুদ্রকের কাছে বিষয়টা খুব সচেতনভাবে না থাকলেও, এটা ঘটনা যে তাঁরা এখন আয়তাকার একটা গ্রিডে কাজ করেন, যা সপ্তদশ শতাব্দীর একটি নিয়মাবলি থেকে উঠে এসেছে। এখনও আমরা কবিতার আকার তৈরি করতে গিয়ে পাতার সাদা অংশকে কাজে লাগাই, তা সে কম্পিউটার স্ক্রিন বা কাগজ, যা-ই হোক না কেন। অধিকাংশ কবিতাই এখনও লেখা হয় পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে, ব্যবহার করা হয় ছোট্ট রোমান হরফ, তা সে ইলাস্ট্রেশন বা গ্রাফিক এলিমেন্ট থাকুক আর না-ই থাকুক। কবি ও মুদ্রকের সম্পর্ক বেঁচে থাকছে আরও একটি নতুন টেকনোলজিতে। টাইপরাইটারের মতোই HTML কোডিং[১২]-এ একটি পঙ্‌ক্তি শেষে আরেকটি নতুন পঙ্‌ক্তি শুরু করতে গেলে একটি বিশেষ কম্যান্ড লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই HTML পাতার মার্জিন নিয়ে মাথা ঘামায় না। যদিও শেষপর্যন্ত পঙ্‌ক্তির বিন্যাস এখানেও কবিতা তৈরি করে। আর কবিতার পঙ্‌ক্তি ও অক্ষরও টাইপরাইটারে ছাপার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের মাথায় রাখতে হবে,

সব ধরনের ছাপাই-এর ক্ষেত্রেই সবথেকে মান্য নিয়ম হল, পূর্বের একটি নমুনার ধাঁচকে অনুসরণের পথে হাঁটা।

একবিংশ শতাব্দীর সবথেকে প্রভাবশালী কবিতা খুব সম্ভবত এখনও লেখা হয়নি। যা আসতে চলেছে, তার কি কোনো বিন্যাস-কানুন তৈরি করা সম্ভব? স্পেসিং নিয়ে আমাদের নতুন নিয়মের দরকার হতেই পারে। সুযোগ আছে বলে ইচ্ছেমতো খামখেয়ালি স্পেস বা গ্রিডের ব্যবহার কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইন্টারনেটে সাম্প্রতিক নানা কবিতার সোর্স-কোড ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, পঙ্‌ক্তি ভাঙতে ওয়েব ব্রাউজার-কে (
) নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। গ্রিড দেখানোর জন্য টেবল স্ট্রাকচার (<tr><td>) ব্যবহার করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ওয়েব ডিজাইনার রিচার্ড রাটার-এর এই লেখাটি —

> ওয়েব বা যেকোনো মাধ্যমে পদ্য সাজানোর প্রাথমিক দায়িত্ব হল এর নিজস্ব ছন্দটিকে নষ্ট না করা, যার মধ্যে পড়ছে স্পেসিং ও তার দৃশ্যগত কাঠামো (এই বিষয়টিকে এখনও কবিতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়)। এক্ষেত্রে প্রি-ফরম্যাটেড বা আগের কোনো দৃষ্টান্তের শরণাপন্ন হওয়াই সবথেকে বুদ্ধিমানের কাজ।

বোঝাই যাচ্ছে, HTML কোডিং ব্যবহার করা হলেও কবিতা কেমন দেখতে হবে, তা আসলে প্রি-ফরম্যাটেড। আগের থেকে নেওয়া। এক্ষেত্রে অন্তত ইতিহাসই কিছুটা হলেও ঠিক করে দিচ্ছে ভবিষ্যতের রূপরেখা।

প্রসঙ্গসূত্র (অনুবাদক-কৃত)

১. কাঠের ব্লকের ছাপাখানা (১৬০০-১৮০০), লোহার হ্যান্ডপ্রেস (১৮০০-১৯০০), কিবোর্ড, টাইপরাইটার, লাইনোটাইপ, মনোটাইপ (১৯০০-১৯২২)।

২. বিংশ শতাব্দীর একদম শুরুতে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে কর্মরত মার্কিন টাইপোগ্রাফি বিশেষজ্ঞ, সম্পাদক ও ক্যালিগ্রাফার। ব্রিটেনের টাইপোগ্রাফি রেনেশাঁসের অন্যতম পুরোধা।

৩. ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষণার বিষয় : মার্কিন কবিতা ও তার টেক্সট।

৪. Jerome McGann, 'The Rationale of Hypertext', *Electronic Text : Investigations in Method and Theory*, ed. K. Sutherland (Oxford : Clarendon, 1997)।

৫. কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, বিষয় : ইংরেজি পুথি ও ছাপার ইতিহাস।

৬. মার্কিন কবি, সম্পাদক ও প্রকাশক।

৭. টি. এস. এলিয়ট সম্পাদিত ব্রিটিশ পত্রিকা (১৯২২-১৯৩৮)।

৮. প্রতিটি পঙ্‌ক্তিকে পাতার মাঝ-বরাবর রাখা হলেই যেন তা কবিতার মতো দেখতে হয়ে ওঠে, এটাই প্রচলিত রীতি যা লোকসাহিত্য থেকে পাওয়া। ইন্টারনেট ও বিভিন্ন সফ্টওয়্যারেও বাঁ-দিক বা ডান দিকে সাজানো লাইনগুলিকে পাতার মাঝে নিয়ে আসার পদ্ধতি একইভাবে চালু আছে।

৯. হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত স্টিভেন ওয়েবার-এর *The Success of Open Source*।

১০. মার্কিন প্রত্নতত্ত্ববিদ ও জীববিজ্ঞানী।

১১. মার্কিন সাহিত্যিক। উনবিংশ শতাব্দীর ধারা ভেঙে আধুনিক পদ্ধতিতে লেখা শুরু করেন। মডার্নিস্ট হিসেবে পরিচিত। সেই প্রভাব পড়েছে তাঁর টাইপোগ্রাফিতেও।

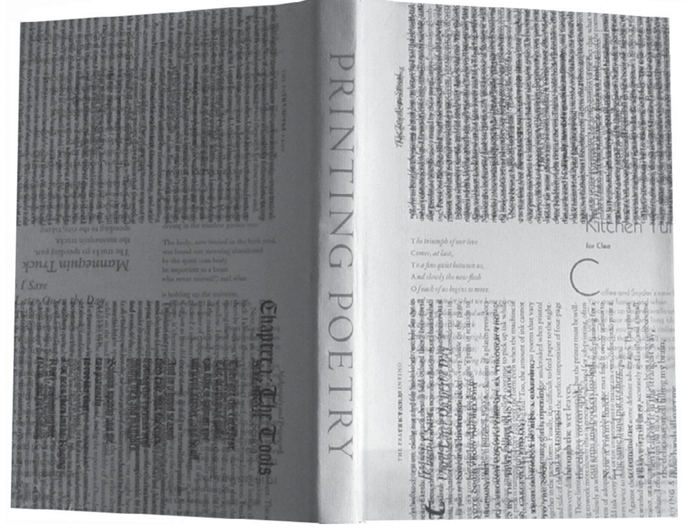
১২. HTML (HyperText Markup Language) কোডিং হল কোনো ওয়েব পেজ তৈরি করা বা সাজানোর জন্য দেওয়া নির্দেশ। কেমন হবে তার রং, কোনো ছবি থাকবে কি না, কিংবা লেখা বা অডিও-ভিসুয়াল কিছু — মোদ্দা কথা বলতে গেলে, কোনো ওয়েব পেজ-এ কী থাকবে, এবং তা কেমন দেখতে লাগবে — তা-ই নির্দিষ্ট হয় HTML কোডিং দিয়ে।

কবিতা মুদ্রণ : হরফে হয়ে-ওঠার নির্মাণতরিকা

ক্লিফোর্ড বার্ক

অনুবাদ : অতীন ভট্টাচার্য

কবি ও পাঠকের মাঝখানে দাঁড়ান মুদ্রক, সবসময়।



নিজস্ব নিভৃতিতে বিরচিত রচয়িতার নির্জন একক অনাঘ্রাত পাণ্ডুলিপির রসায়নমায়াগুণে ধাতব হরফে রূপান্তর — গ্রন্থনির্মাণের এই হয়ে-ওঠার পর্বটা আমি ভালোবাসি। হরফগুলি যেভাবে তাদের যথার্থ স্থাপত্যরীতি, তাদের যূথসজ্জার নিয়মানুগ বিরতিক্ষেত্র মেনে আয়তাকার ছাঁচে আঁটোসাটো হয়ে চূড়ান্ত রূপে উত্তীর্ণ হয় — মুদ্রণশিল্পীর দৃষ্টিদাক্ষিণ্যে হরফের নিহিত গড়ন থেকে কুঁদে-তোলা ওই রূপায়ণ — এ-ও আমার ভালোবাসার ব্যাপার।

হরফকেসের ভিতরে আমার দু-হাতের যে-অভিযাত্রায় সেরা হরফগুলোর ওজন আর লক্ষ্যভেদী ওম আমার আঙুল আবিষ্ট করে তোলে, তা-ও ভালোবাসি আমি। মাঝে-মাঝে হরফকেসের দূর কোনো প্রান্ত হাতড়াতে গিয়ে হাত বাড়ানোর ঝোঁকে ঘাই মেরে হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোও কারো-কারো প্রিয় মুদ্রা — আমিও ঠায় বসে-বসে এ-কাজ করতে পারি না।

কয়েক লাইনের জন্য এক পাতা পেরিয়ে পরের পাতায় চলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য পাতায় কয়েকটা লাইন কমিয়ে-বাড়িয়ে আদতে কোনো লাভ হয় না, সমস্যাটাকে কেবল এক পাতা থেকে অন্য পাতায় তুলে নিয়ে ফেলা হয়। কবিতার পাতা পেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপার থাকলে বরং প্রতিটি পাতাকেই সুষম ও ছিমছাম করে তোলার দায় তৈরি হয়ে যায় মুদ্রণশিল্পীর। কিন্তু তাতে আবার একেকটি কবিতার ব্যক্তিচরিত্র এমনভাবে আহত হয় যে *ট্রেজারি অব মডার্ন ভার্স* গোছের সংকলনের বাইরে তেমন দুর্বিপাক সহ্য করা মুশকিল। মিশ্রদৈর্ঘ্য কবিতাবলির ক্ষেত্রে মিতায়তন আয়তাকার গদ্যছাঁদ বা চতুর্দশপদী সংকলনের সরল গঠনতুল্য কোনো সুষমতা উদ্ভাবনেই মুদ্রণশিল্পীর মুনশিয়ানার অগ্নিপরীক্ষা।

লিভস অব গ্র্যাস-এর জন্য কয়েকশো পাউন্ড সুন্দর নতুন হরফে কিনে বহু পৃষ্ঠা গাঁথা হয়ে যাওয়ার পরেও, নেহাত দৃষ্টিনন্দন হয়নি বলে গোটাটা বাতিল করে, শূন্য থেকে কীভাবে আবার শুরু করতে হয়েছিল, তা বিশদে জানিয়েছেন এডুইন গ্রাবহর্ন।

মুদ্রক যদি উদ্ধত হন, তিনি কবিতায় অন্যায্য হস্তক্ষেপ করেন, এবং তেমন ঘটলেই রচনার চেয়ে গ্রন্থ বস্তুটিই বড়ো হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য (অনুবাদক-কৃত)

এডুইন গ্রাবহর্ন (১৮৮৯-১৯৬৮) : এই ছাপাখ্যাপা মুদ্রণমনীষী মহামন্দার সময় তাঁর ভাই রবার্টের সঙ্গে ইন্ডিয়ানাপোলিশ থেকে হাজির হন মুদ্রণের স্বর্গরাজ্য খেতাব পেয়ে-যাওয়া সানফ্রানসিসকোয়। 'জাস্বো প্রেস' নামে একটি ছোটো পুঁজি ও পরিকাঠামোর ছাপাখানা দিয়ে শুরু করলেও, উত্তরকালে নিজেদের পারিবারিক নামে 'গ্রাবহর্ন প্রেস' চালু করেন। ক্লিফোর্ড বার্ক হুইট্ম্যানের *লিভস অব গ্র্যাস*-এর যে-সংস্করণটির উল্লেখ করেছেন, সেটি গ্রাবহর্ন প্রেসের অমর কীর্তি। এখনও কেউ-কেউ ওই বইটিকে নিখুঁত মুদ্রণের সেরা দৃষ্টান্তের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। নিজের মালিকানাধীন ছাপাখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর র‍্যানডাম হাউস এবং অ্যারিয়ন প্রেস-এর কর্ণধার হিসেবে জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীর মর্যাদা পেয়েছিলেন এডুইন গ্রাবহর্ন।

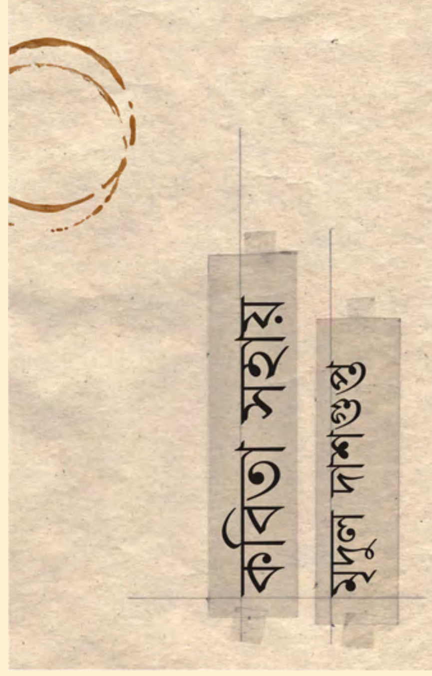
কবি ও মুদ্রণকোবিদ ক্লিফোর্ড বার্ক গত শতকের ষাট-সত্তর দশকের সানফ্রানসিসকো বে-এরিয়ার কবিতা প্রকাশনার জগৎ ও মুদ্রণরসিকজনের দুনিয়ায় 'রেনেশাঁস ম্যান' নামে পরিচিত। বিট ও উত্তরবিট আন্দোলনের কবিদের প্রায়ই ঢুঁ মারতে হত একটা ঘুপচি গ্যারেজে, সেখান থেকেই বার্ক পরিচালনা করতেন 'ক্রেনিয়াম প্রেস' নামে ঐতিহাসিক ছাপাখানাটি। ১৯৯০ সালে তরুণ মুদ্রণশিল্পী ও বাঁধাই-বিশেষজ্ঞ ভার্জিনিয়া মাড-এর সঙ্গে আলাপের পর তাঁরা দু-জনে 'ডেজার্ট রোজ' নামে একটি নতুন মুদ্রণকুটির শিল্পোদ্যোগে সামিল হন। 'হলো অরেঞ্জ' নামে একটি কবিতাপত্রিকাও সম্পাদনা করেন এই কিংবদন্তী শিল্পী। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বই হল —

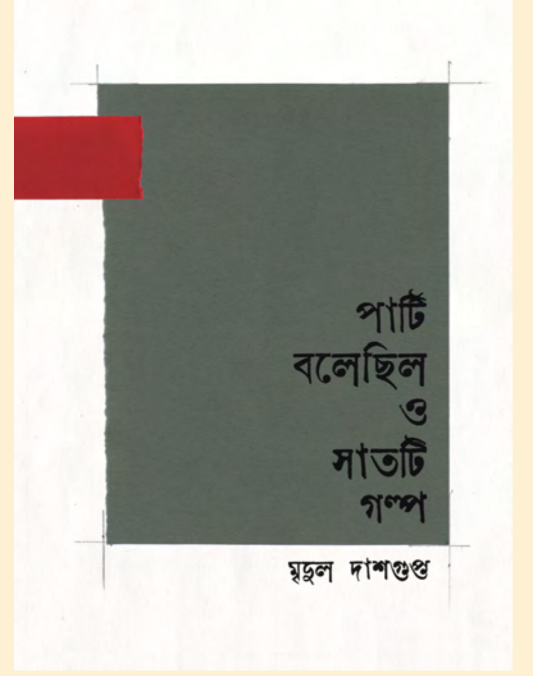
- *'Printing it : a guide to graphic techniques for the impecunious', Ballantine Books, 1972*
- *'Printing Poetry : A Workbook in Typographic Reification', Scarab Press, 1980*
- *'Type from the desktop : Designing with type and your computer', Ventana Press, 1990*

'Printing Poetry : A Workbook in Typographic Reification' বইটির আন্দাজ দিতে যৎসামান্য কিছু অংশ এখানে ভাষান্তরে উদ্ধৃত হল।

বোধশব্দ-র নতুন বইপত্র

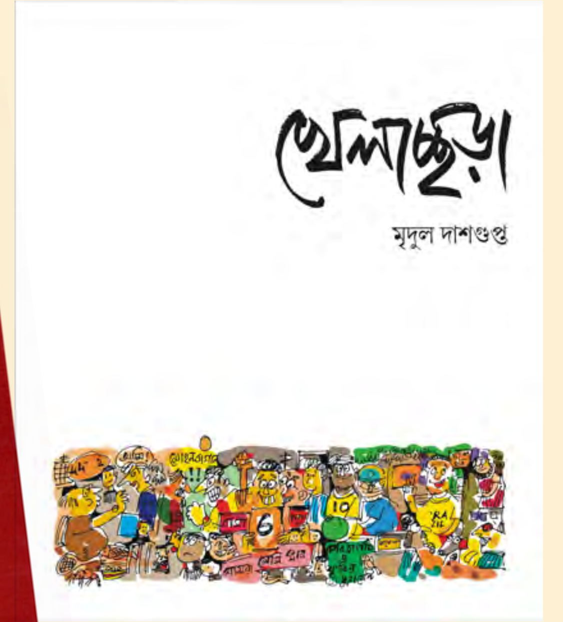












সংগ্রহ করতে নীচের লিংকগুলিতে ক্লিক করুন

https://boighar.in/product-tag/bodhshabdo/

https://www.haritbooks.com/product-brands/bodhshabdo/

ইতিকথা বইঘর • ধ্যানবিন্দু • বাতিঘর (বাংলাদেশ)

কবির কথা

কবির কথা

কবিতার দৃশ্যরূপ

শঙ্খ ঘোষ

'আধুনিক কালে কবিতা যখন ছাপার কাগজ থেকে পড়া হয়, ধ্বনিগুণই তার একমাত্র গুণ থাকে না, ভাবতে হয় তার দৃশ্যগুণও। শ্রুতিতে-দৃশ্যে একটা সংযোগ চাই শব্দগুলির মধ্যে, যেন শব্দেরও বর্ণেরও হাসিমুখ কান্নামুখ আছে, যেন বর্ণও কেউ ছুটে চলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, সিটওয়েল দেখেন এক-এক শব্দে এক-একরকম রঙ বা স্পর্শের আভাস, র‍্যাঁবো তাঁর স্বরমালায় লিখে রাখেন 'আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ, ও নীল'। যদি বর্ণেই এত রূপরঙ, তবে শব্দে আর শব্দের পরম্পরায় আরো কিছু আছে নিশ্চয়, দৃশ্যতই কবিতা একটা প্রকৃতিগঠন অর্জন ক'রে নেয়, আর কবি তাই তাকে ভেঙে ভেঙে নিত্য নূতন গড়ন বানান। কামিংসের স্বেচ্ছাচারের পিছনে বক্তব্য আর আকৃতির সাযুজ্যের দাবি বস্তুতপক্ষে অগ্রাহ্য লাগে, এই পর্যন্ত কেবল মনে হয় যে শব্দগুলি ঐ স্বেচ্ছাচারের মধ্যেও — অথবা মধ্যেই — নৃত্যপর হয়ে একরকম সজীবতা লাভ করেছে।

এই সজীবতা শব্দটি ঠিক। নিশ্চয় সজীব, কিন্তু কতদিন সজীব, কতক্ষণ? ক্ষণজীবী পতঙ্গও জীবনশীল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিও কি ক্ষণসাময়িকের ভিখারি? চিরন্তনের অভিমান কিছুই কি তার নয়? অর্থাৎ এই ব্যবহারভঙ্গি থেকেও কি আমরা আরেক অচল অভ্যাসে পৌঁছব না?...'

তিপ্পান্ন বছর আগে, ১৯৬২ সালে, *নিঃশব্দের তর্জনী* বইটির একটি গদ্যে (*শব্দের পবিত্র শিখা*) এই কথাগুলি একবার লিখেছিলাম। মুদ্রণকালের পর থেকে কবিতার দৃশ্যরূপের অবশ্যই একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু সে-ভূমিকা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক নয়, এইরকম একটা ভাবনার প্রকাশ ছিল সেখানে। সেসব দৃশ্যরূপে তৈরি হয়ে ওঠে কত-না স্তবকবন্ধের কারিকুরি, কত বাঁকাচোরা লাইনের ভঙ্গিমা। আমাদের কবিতাপড়ার অভ্যাসে এর কি কোনো প্রভাব পড়ে? কিছু যে পড়ে, সেটা তো বোঝা গিয়েছিল মুক্তবন্ধ *বলাকা*-র লাইনগুলোর ছাঁচভাঙা চেহারায়। কিংবা, মনে আছে, জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে অনেকগুলি কবিতাই কীভাবে ছাপা হয়েছিল ডানদিকে সমান মার্জিন রেখে, আমাদের প্রথাগত বাঁ-দিকের মার্জিনকে অগ্রাহ্য করে। আমাদের অনেকদিনের চলতি অভ্যাসটাকে ভেঙে দেবার ফলে — আর কিছু না হোক — চোখের-মনের একটা আরামবোধ যে হয়েছিল এক সদ্যযুবার, সে-কথা আজও মনে পড়ে।

কিন্তু ওইটুকুই। তার চেয়ে বেশি কোনো তাৎপর্য নেই এসব দৃশ্যরূপের, এইরকমই মনে হত তখন। *সঞ্চয়িতা*-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতাই এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, যার মূল ছত্ররূপটা ছিল ভিন্নরকম। বাইরের সঙ্গে ভিতরের কোনো অচ্ছেদ্য যোগ থাকলে কি এমনটা ঘটতে পারত?

তবু, কবিরা কখনো-কখনো একটু খেলাধুলো করেন লেখা নিয়ে — এইরকমই মনে হত তখন। তাই আবারও একবার লিখেছিলাম ১৯৭০ সালে :

> ক্ষুধার্ত একটি পত্রিকায় সেদিন চোখে পড়ল এক-পৃষ্ঠার কবিতা, যেখানে একটিমাত্র শব্দকে জপমালার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি হয়েছে এক নকশা। আবার যাঁরা ক্ষুধার্তের একেবারে উলটো, কবিতাকে যাঁরা করতে চান সীমাহীনরূপে স্পর্শাতীত, তাঁদেরও রচনায় মিলবে ওই একই খেলা। একটি-দুটি শব্দে, এমন-কী বর্ণে, বর্ণের নানারকম নকশায় কাগজ ভরছেন তাঁরাও। হালফ্যাশানের এক মার্কিন যুবা অনেক বিবেচনার পর তিনটি শব্দকে ভেঙে সাজালেন দু-লাইনে, হয়ে উঠল আধুনিকতম কবিতার উত্তেজনা। এতটাই তিনি জানাতে পারেন যে টাইপ-রাইটারের রিবনে যদি আবছা হয়ে আসে কালি তাহলে আরেকটা স্বতন্ত্র জন্ম হবে রচনার, কবিতার স্বরূপই যাবে পালটে। খুব নতুন নয় হয়তো, দাদাবাদের সময় থেকেই চলছে ঈষদুষ্ণ এই সব মজা-পাওয়া, আরাগঁও আমাদের A থেকে Z পর্যন্ত গোটা বর্ণমালা সাজিয়েই কবিতা নামে উপহার দিয়েছিলেন একদিন। তবে কিনা সম্প্রতি ঝোঁকটা দেখা দিল এদেশেও।...
>
> ('শব্দ থেকে পালানো', *নিঃশব্দের তর্জনী*)

স্তবকবিন্যাসের বেলায় খেলাটা যে কতদূর পৌঁছোতে পারে, অল্প বয়সে তার একটা দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়। 'গ্রীষ্মের সুর' নামে একটি চার-স্তবকের কবিতা আছে তাঁর, যে-কবিতার সবকটি স্তবক সাজানো ছিল এইভাবে :

হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে!
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল-অনিমিখ্,
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশদিক্!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায় ;
হায়!

হায়!
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ আঁখি, চারিদিকে ক্লেশ!
সংবর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর!
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর?
সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে ;—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে গোষ্পদে ও কূপে,
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে!
তৃপ্তি নাহি পায়!
হায়!

ছন্দ নিয়ে নানা কাণ্ডকারখানা করতে পছন্দই করেন সত্যেন্দ্রনাথ, তাই তাঁর ওই লীলাবিলাস দেখে অবাক হইনি। কিন্তু অবাকই হয়েছিলাম অনেকদিন পর, যখন ডিলান টমাসের মতো বিশিষ্ট কবিও প্রায় যেন ওইরকমই বরফি-ছন্দে লিখে বসেন :

The
Born sea
Praised the sun
The finding one
And upright Adam
Sang upon origin!
O the wings of the children!
The woundward flight of the ancient
Young from the canyons of oblivion!
The sky stride of the always slain
In battle! the happening
Of saints to their vision!
The world winding home!
And the whole pain
Flows open
And I
Die.

একটি মাত্র নয়, এইরকমই বেশ কয়েকটা স্তবক। আবার, এই একটি মাত্র রূপেই নয়, রূপভঙ্গিমা আছে তাঁর আরও। যেমন, এই একটি — ইচ্ছে করলে যার নাম দেওয়া যায় ডমরু-ছন্দ :

In the name of the lost who glory in
The swinish plains of carrion
Under the burial song
Of the birds of burden
Heavy with the drowned
And the green dust
And bearing
The ghost
From
The ground
Like pollen
On the black plume
And the beak of slime
I pray though I belong
Not wholly to that lamenting
Brethren for joy has moved within
The inmost marrow of my heart bone

চোখের সমস্ত অভ্যাস ভেঙে দেওয়া, কিংবা নিছক একটু মজা করা, এ ছাড়া এসব প্রয়াসের আর কীই-বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা ভেবে পাইনি সেদিন। কিন্তু এর বেশ কিছুদিন পর, দৃশ্যরূপটা যে কখনো-কখনো কতটাই জরুরি হয়ে উঠতে পারে কবিতায়, নিজেরই লেখায় তার একটা প্রমাণ মিলল একদিন।

কাগজে-কলমে কোনো কবিতা লিখে ফেলবার আগে, মনের মধ্যে তাকে কয়েকবার আউড়ে নেওয়া আমার অনেকদিনের অভ্যাস। আওড়াতে-আওড়াতে যদি একসময়ে তাকে ঠিক লাগছে বলে মনে হয়, মাত্র তখনই সেটা লিখে ফেলি। তার পরেও যে কোনো কাটাকুটি একেবারে হয় না তা নয়, তবে সেটা কমই। এইভাবেই একদিন কয়েকটা লাইন মাথায় এল, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কয়েকবার ভাবলাম সেটা, আর খানিক পরে লিখেও ফেললাম। কিন্তু লিখবার পরই মনে হল : এখনও হয়ে ওঠেনি এটা। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে আবারও ভাবছি মনে-মনে। ঠিকই তো লাগছে। আবারও লিখি। কিন্তু আবারও মনে হয় বেঠিক। মনে-মনে ভাবলে ঠিক লাগছে, কিন্তু লিখলেই বেঠিক — এমন ঘটছে কেন?

হঠাৎ তখন মনে হল : ভিতরে-ভিতরে বলবার সময়ে শব্দগুলি যে-গতিতে যে-যতিতে চলাচল করছে, সম্ভবত লেখায় তার কোনো চিহ্ন থাকছে না, তাই এত স্বস্তিহীনতা। লিখবার সময়ে বাঁ-দিকে মার্জিন দেওয়া সমান মাপের স্বাভাবিক কয়েকটা লাইন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভাববার সময়ে তাকে বলছি ছাড়া-ছাড়া ভাবে, উড়ো-উড়ো ভাবে। আবার কাগজ টেনে লিখলাম :

কিছু পতঙ্গ উড়ে এসেছিল আমার মাথার
ভিতরে সে ছিল
ঝোড়ো পতঙ্গ উড়ো পতঙ্গ
বীজাণুর চেয়ে গুঁড়ো পতঙ্গ
খুঁড়ে খুঁড়ে এই খুলি খুলেছিল ঘুণ ঘুণ ঘুণ কুরে খেয়েছিল
আমার ভিতরে যা-কিছু-বা ছিল সহসা সাহসে
ভর করে এসে
সব খুঁড়েছিল দলে দলে যত হীন পতঙ্গ গুঁড়ো পতঙ্গ
উড়ে এসেছিল আমার মাথার
ভিতরে সটান কিছু পতঙ্গ
উড়ো।

আর এইবার মনে হল, যা লিখতে চাইছিলাম সেটা পাওয়া গেল, পাওয়া গেল পতঙ্গগুলির ওড়াউড়ির একটা আভাস। কবিতাটি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু আমার নিজের লেখার অভিজ্ঞতায় নিজের কাছে স্মরণীয়। এবং শিক্ষাপ্রদ। এই শিক্ষা যে, কখনো-কখনো দৃশ্যরূপের কোনো বিশিষ্টতা বিশেষ কোনো কবিতার পক্ষে জরুরি হয়ে উঠতে পারে।

ভিন্ন আরেকবার, কালিম্পঙের এক শৈলচূড়ায় বুদ্ধমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বিস্তীর্ণ চারদিকে যেন বৃত্তাকার ঘিরে আছে দূরের শৃঙ্গগুলি, একটি কবিতার জন্ম হচ্ছিল তখন। সেবারে অবশ্য প্রথমেই লেখাটা আসছিল একটা বৌদ্ধ স্তূপের ছাঁচে। লেখা হয়ে যাবার পরে যতবারই ছাপা হয়েছে সেটা, ততবারই লাইনগুলিকে সাজিয়ে দিতে হয়েছে প্রেসে, যেন একটুও এদিক-ওদিক না হয়। ডিলান টমাসের উদ্ধৃত স্তবক দু-টিতে পাঠকেরা লক্ষ করবেন : কখনো-কখনো কীভাবে শব্দের হরফগুলির মধ্যে ফাঁক রাখতে হয়েছে, দৃশ্যরূপের স্থিরতার গরজে। কালিম্পঙে লেখা আমার সেই কবিতাটির চেহারা ছিল এইরকম :

পাহাড়ের এই শেষ চূড়া
এইখানে এসে তুমি দাঁড়িয়েছ আজ ভোরবেলা
তোমার পায়ের নীচে পদ্মসম্ভবের মূর্তি, গুম্ফার উপরে আছো তুমি
বর্ণচক্র ঘোরে চার পাশে
ঘৃতপ্রদীপের থেকে তিব্বতি মন্ত্রের ধ্বনি মেঘের মতন উঠে আসে
ধ্বনির ভিতরে তুমি অবলীন মেঘ হয়ে আছো
যতদূর দেখা যায় সমস্ত বলয় জুড়ে পাষাণের পাপড়ি মেলে দেওয়া
দিগন্তে দিগন্তে ওই কুয়াশামথিত শিখরেরা
পরিধি আকুল করে আছে
তার কেন্দ্রে জেগে আছো তুমি
আর এই শিলামুখে বহুজনমুখরতা থেকে
আবেগের উপত্যকা থেকে
মুহূর্তের ঘূর্ণি থেকে চোখ তুলে মনে হয় তুমিই-বা পদ্মসম্ভব
তোমার নিরাশা নেই তোমার বিরাগ নেই তোমার শূন্যতা শুধু আছে।

যিনি পাঠক, লাইনগুলির এই সুনির্দিষ্ট বিন্যাস হয়তো-বা তাঁর কাছে কিছুই বহন করে না। কিন্তু যিনি লিখছেন, তাঁর মনে হয়, সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলেই ছবিটা ভেঙে যাবে। তাঁর কাছে কখনো-কখনো এই ছবিটাই কবিতা।

ডিলান টমাসের কথাটাও তাই আবার নতুন করে ভাবতে হবে আমায়।

স্বয়মাগতা, সে নিজে সেজে এসেছে

মৃদুল দাশগুপ্ত

আমার এই বয়সে, এ-পর্যন্ত, আমার বাল্য ও কৈশোর-তারুণ্যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা, অর্থাৎ স্কুল-কলেজে এবং তার বাইরে যেসকল এলোমেলো পড়াশুনো, তা অতি সামান্য। আমার অভিজ্ঞতা, যেহেতু আমার কৈশোর-তারুণ্যকালে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নকশালবাড়ি ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা অবলোকন, এবং পরবর্তীকালে সাংবাদিকতা সূত্রে ভারত-বাংলাদেশে ঘোরাঘুরি, পারিবারিক ঘটনাবলি, জীবনে নানা বন্ধু-বান্ধব, মানুষজন, নারী-পুরুষ — এসবও তেমন কী আর অভিজ্ঞতা! আমার মেধা, বুদ্ধি — এসব বিষয়ে নিজে আমি কী আর বলব!

কথা হচ্ছে, আমার এই শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মেধা, বুদ্ধি — এসব অতিক্রম করে লিখনকালে যা আসে, তা-ই তো কবিতা, আমি এরকম বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, কবিতা আকাশ থেকে নামে। কবিতা স্বয়মাগতা।

আঙ্গিক নয়, কবিতা দেখতে কেমন? লেখার সময় নয়, কারণ সে আপনি আসে, বই ছাপার সময় কখনো-কখনো একথা মনে হয়েছে। বিশেষত গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে মুদ্রণ ব্যবস্থা যুগান্তকারী এগিয়ে গিয়েছে, আমি চাকরি করেছি সংবাদপত্রে, ব্যাপারটা পুরোপুরি দেখেছি।

বড়ো ভালোবাসতাম লেটারপ্রেসকে। কাঠের খোপ থেকে হরফ একটা-একটা করে তুলে ধাতব পাত পৃষ্ঠার আকারে সাজিয়ে, পাটের ফেঁসোয় বেঁধে মেশিনে তোলা হত। মেশিনে বৃত্তাকার চাকায় রং মাখানো হত। সে চাকা ঘুরে-ঘুরে হরফ-আঁটা পাতাটিতে ছাপ দিত, প্রথম দিকটায় ম্যানুয়ালি, মানে, সেলাই মেশিনের মতো পায়ে চাপ দিয়ে, হাতে হাতল ঘুরিয়ে। কোনো মেশিনে ছাপা হচ্ছে দু-পৃষ্ঠা, কোনো মেশিনে আধ ফর্মা। এপিঠ ছেপে, অন্য পিঠ। এর চেয়ে উন্নত মেশিন কোনো-কোনো প্রেসে থাকত, সেখানে মেশিন চলত বিদ্যুতে। এই ছাপা, লেটার-মেশিনে ছাপা, আমার পছন্দের ছিল। হরফগুলি বার বার ব্যবহৃত হয়ে, একটু মোটা, একটু গভীর হয়ে যেত। ছাপার যেন একটা গভীর ব্যাপার ছিল, দুর্লভ কোলে, ছবি মেট্যা, রতিকান্ত নস্কর এবং তাদের দলবল কাঠের খোপ থেকে পরম যত্নে হরফ সাজাতেন; কত মমতায়, কত আদরে, এই কম্পোজিটররা অনেকেই হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের লেখালিখির বোদ্ধা, এমনকী কেউ-কেউ কবিতা-আসক্ত। অবাক ব্যাপার, কলকাতার লেটারপ্রেসগুলিতে এই কম্পোজিটররা ছবি মেট্যা, নমিতা দাস, বিশেষত এই মহিলারা, বেশিরভাগই ছিলেন মেদিনীপুরের। এঁরা সকলেই হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের আত্মীয়স্বজন।

বঙ্গরত্ন মেশিন প্রেস, কৃষ্ণনগর — এই মুদ্রণশালাটিকে তো এসব কারণেই, আমি মনে-মনে আজকের হরেক বহুজাতিকের চেয়ে ঢের উঁচুতে রাখি! মেদিনীপুর আলো-বাতাস-সবুজের, নদিয়াও তাই, তবে তাতে ঈষৎ কৃষ্ণ-কুহক মিশে আছে, এ-কারণে আমাদের কবিতায়, তার রূপে, এসব রং মিশে গেছে বলে আমার মনে হয়। লেটারপ্রেসে অনেক সময় বহু ব্যবহারে অনেক হরফই ক্ষয়ে যেত, কিছু-কিছু হরফকে কিছুটা অস্পষ্ট লাগত, বিশেষত 'ক্ষ', 'জ্জ্ব' এসব থেবড়ে যেত। তাতে কী, ওই অস্পষ্টতা, আবছায়া পাঠক সযত্নে বুঝে নেন — এটা অনুমান করে আনন্দ পেতাম। কখনো-কখনো পাটের ফেঁসোর আঁশ শব্দগুলির পাশে চুলের মতো ছাপা হয়ে যেত। *এভাবে কাঁদে না* বইটি যখন বের হল, তার মলিন দশা দেখে তৎক্ষণাৎ মনে বিষণ্ণতা জাগল, পরক্ষণেই সে-মেঘ কেটে গিয়ে গর্বিত উত্তেজনা, আমার বই তো এইরকমই হবে, ছোটো প্রকাশন সংস্থা, ছোটো প্রেসে ছাপা... নেমে এল একটি কবিতা —

ভাঙা অক্ষর, হরফের খাঁজে
আঁশ।
অশুচিপত্রে নরকের ডাকছাপ।
বোবা ও বধির।
কালো ফুল মুখে ডানা মেলে দেওয়া
সাপ।
স্বাধীন, অসুন্দর।

আমার কবিতার বই নাম্নী কবিতাটি পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের গোড়াতেই রয়েছে।

ঝকঝকে-চকচকের ঘোর বিরোধী, বরাবর এই মনোবাসনা আমাকে ছেয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা আমাদের কৈশোর-তারুণ্যের জীবন-রাজনীতিতেই জড়িয়ে ছিল। আজও তা গায়ে এঁটে আছে। নিউজপ্রিন্টে লেটারপ্রেসে, ওই বঙ্গরত্ন মেশিন প্রেসে ছাপা *ভাইরাস* পত্রিকাটি আমাদের গর্বিত নিশান। আমার কবিতা, যা আকাশ থেকে নিজে সেজে আসে, *ভাইরাস*-এ ছাপার পর মনে হয়েছে, দিব্যি সে খুশিতে খলবল করছে। খেলছে। আবার সে-কালেরই এক রংচঙে লিটল ম্যাগাজিন *গঙ্গোত্রী*, তাতে ছাপা হয়েছিল আমার একটি দীর্ঘকবিতা, তখনকার দিনে দুধ-সাদা কাগজে ফটোটাইপে ছাপা পত্রিকা, কবিতাটিকে মনে হয়েছিল, বন্দিনি।

ডটপেনে নয়, ঝরনা কলমে লিখি আমি। হাতের লেখায় নিজের কবিতাকে যেমন লাগে (অর্থাৎ চেহারা, তার সাজ), তা যথাযথ। অমনই সেজে সে নেমে এসেছে। যেখানে কমা (,) বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?), সে নিজে দিয়েছে, প্রয়োজনে অন্তর্বাস, কাঁচুলি সে নিজে বেঁধে নিয়েছে। যেখানে স্পেস (#), সে নিজে দিয়েছে। আমি কিচ্ছুটি করিনি। হয়তো একটু আভাস পেয়েছি বা শুনেছি, টুকে গেছি। এরপর সেই পাণ্ডুলিপি দিয়েছি পত্রপত্রিকায়, লেটারপ্রেসের যুগে অতিযত্নে কাঠের খোপ থেকে তুলে-তুলে তার হরফ সাজিয়েছেন ছবি মেট্যা, দুর্লভ কোলে, নমিতা দাস। চৈত্র-বৈশাখে ফিলিপসের একশো পাওয়ারের হলুদ বাতি জ্বলছে কাঠের হরফ-বাক্সের ওপর, তাঁদের মাথার ঘাম টপ-টপ করে পড়েছে সে কবিতার ওপর, আঙুল ঘেমে গিয়ে হরফে-হরফে মিলেছে। ছাপার পর মনে হয়েছে, রূপ একটুও টসকায়নি আমার কবিতার, বন্ধুদেরও কবিতার।

এখন মনে হচ্ছে। যবে থেকে এইসব অফসেট, ডিটিপি আধুনিক অত্যাধুনিক ঝকঝকে-চকচকে মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে, বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতিতে সবরকম মাপজোক, হরফের আকার, শার্পনেস, স্পেসের মাপ... সব সুনির্দিষ্ট, আমি যে-কবিতা লিখেছিলাম, ছাপার পর তার চেহারা বদলে গেছে। এই অফসেট যখন চালু হল, কী দুশ্চিন্তা তখন আমার, ছাপার পর অনেক কবিতাকেই তো লাগছে বিধবা-বিধবা। এত বছরে কিছুটা মেনে নিয়েছি। নিরুপায়ভাবে। তবে যখন প্রথম চালু হয় অফসেট, লেটারপ্রেস ইতি-উতি তখনও কোথাও-কোথাও আছে, নয়ের দশক, *অফবিট*-এর শ্যামল ধর যখন আমার *নির্বাচিত কবিতা* প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন, তাঁকে চাপ দিয়ে রাজি করাতে আমি শর্তই করিয়ে নিয়েছিলাম, লেটারপ্রেসে ছাপাতে হবে।

সেসময় পর্যন্ত প্রকাশিত আমার কাব্যগ্রন্থগুলি, *জলপাইকাঠের এসরাজ, এভাবে কাঁদে না, গোপনে হিংসার কথা বলি* বইগুলি লেটারপ্রেসে ছাপা হয়েছিল। এর পরের বই *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* দু-বার দু-টি অফসেট প্রেস থেকে ছাপা — আমার অস্বস্তি লেগেছিল। মনে হয়েছিল, মাপজোক এত নিখুঁত, প্রতিটি হরফের মাপ এমনই সমান-সমান, সেসময় আমার যে বাড়িটি তৈরি হচ্ছে, তা তো এমন নিখুঁত নয়। আমরা মানুষজন, জীবন, জীবনযাপন, আমাদের চারপাশ, এই প্রকৃতি, পৃথিবী, তা কি আদৌ নিখুঁত? ভালো লিটল ম্যাগাজিন এখন না হওয়ার বড়ো কারণ, লেটারপ্রেস আর নেই। সবকিছুতেই এখন ঢুকে যাচ্ছে বাণিজ্য-বিনোদন।

কিন্তু কথা হচ্ছে, লেটারপ্রেস হেরে গেছে। আমিও হেরে গেছি। নেটের কবিতা পড়তেই পারি না, এমনই আমার মনের অবরোধ। তো কী করা যাবে! লিখেই আমার আনন্দ। লেখার আনন্দের চেয়ে ছাপার আনন্দ বড়ো নয়। তা দেশে, বিদেশে, যেখানেই ছাপা হোক।

কবিতার আত্মা শরীর অবয়ব

গৌতম চৌধুরী

আমার তো মনে হয়, একটি কবিতা কেমন শারীরিক গঠন লইয়া পয়দা হইবে, তাহা কবিতাটির অন্তর্বস্তু বা আত্মাই ঠিক করিয়া লয়। ইহা লইয়া কবির জারিজুরির বড়ো একটা জো নাই। তবে কবিতার শরীর আর তাহার অবয়ব ঠিক এক জিনিস নয়। অবয়ব হইল চেহারা বা সুরত। শরীরমাত্রেরই অবশ্য একটি চেহারা থাকে। কিন্তু চেহারার শরীরনিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। চেহারা কেবলই চোখের সমীপে ধরা দেয়। পাঠে প্রবেশ করিলে টের পাওয়া যায়, একই চেহারার বিভিন্ন কবিতার শরীরগঠন বিলকুল আলাদা হইতে পারে।

> হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; —
> তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
> পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
> পর দেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি
>
> — *বঙ্গভাষা*, মাইকেল মধুসূদন দত্ত

> বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা,
> গাছপালা মিশ্‌মিশে মখমলে ঢাকা।
> জট্‌বাঁধা ঝুল্‌ কালো বটগাছতলে,
> ধক্‌ধক্‌ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে,
>
> — *হুলোর গান*, সুকুমার রায়

উপরের দুইটি কবিতাংশই আয়তাকার চতুষ্কের মতন দেখিতে। 'পহেলা দর্শনধারী', এই আপ্তবাক্য আওড়াইয়া শুধুমাত্র দৃষ্টির উপর ভরসা করিলে, সুরতের এই সাযুজ্যটুকু তাহাদের শারীরতাত্ত্বিক গঠনের গুরুতর ফারাককে আড়াল করিবে মাত্র। *বঙ্গভাষা* আর *হুলোর গান*-এর লাইনগুলি উভয়তই বাংলা ছন্দপ্রকরণ মোতাবেক চোদ্দো মাত্রার বটে, কিন্তু প্রথমটি মিশ্রবৃত্তে ও দ্বিতীয়টি চার মাত্রার কলাবৃত্তে রচিত। অর্থাৎ, দৃশ্যত সদৃশ হইলেও শরীরসংস্থানে তাহারা হাড়ে-হাড়ে আলাদা। আত্মায় তো বিভিন্ন বটেই।

তবুও, কবিতার দৃশ্যগত চেহারা লইয়াও কবিরা ভাবেন বই কী। যেকালে পুথির আমল ছিল, এ-বিষয়ে কবিদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল অল্প। যুগ হইতে যুগান্তরের লিপিকরদের শ্রীহস্তের ছাঁদে ফুটিয়া উঠিত কবির বয়ান। অনেক সময় রঙে-তুলিতে চিত্রিতও হইয়া উঠিত সেইসব পুথি। লিপি আর ছবির এত আয়োজন তো দৃষ্টিনন্দনতার খাতিরেই।

ছাপাখানার যুগে হস্তলিপির শ্রীছাঁদ বিদায় লইল। চিত্রিতকরণ বিদায় লইল। বদলে, সাদা কিংবা ঈষৎ ধূসর কাগজে কালো কালির সারিবদ্ধ হরফে তৈয়ার হইল নতুন নান্দনিকতা। দৃশ্যগত সৌন্দর্যের নতুন নিরিখ হইল নির্ভুল মুদ্রণ। নতুন সম্পাদক-মুদ্রাকরের হাতে সাবেক কবিদের কাব্যগুলি পুথির লিপিকরের যদৃচ্ছ পাঠ হইতে সুবিন্যস্ত রূপ ধারণ করিল। পয়ার এবং ত্রিপদী ছাপা হইতে লাগিল আলাদা-আলাদা চেহারায়।

প্রযুক্তির এই সুবিধাজনক দিকগুলি নতুন যুগের কবিরা সাগ্রহে ব্যবহার করিলেন। ছেদ-যতির বৈচিত্র্য, স্তবকবিন্যাস, পঙ্‌ক্তিদের বিষম সংস্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে কবিতার চেহারায় আসিল নানান রকমফের। যে-কবির কাব্যশরীরে যত বৈচিত্র্য, তাঁহাদের কবিতার চেহারাতেও ততই নানান কিসিমের বিন্যাস। ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, সেই রবীন্দ্রনাথ। আঙ্গিকের দিক দিয়া এত বিচিত্র ধরনের কবিতা এখনও অবধি আরও কোনো কবি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কাজেই দৃশ্যগতভাবেও তাঁহার কবিতা বিচিত্রতম।

so that her idea of the tale was something like this :—" Fury said to a mouse, That he met in the house, 'Let us both go to law: *I* will prosecute *you*. Come, I'll take no denial; We must have a trial: For really this morning I've nothing to do.' Said the mouse to the cur, 'Such a trial, dear Sir, With no jury or judge, would be wasting our breath.' 'I'll be judge, I'll be jury,' Said cunning old Fury: 'I'll try the whole cause, and condemn you to death.'"

আজব দেশে অ্যালিস-এর অভিযাত্রা

কামিংস-এর কবিতার প্রুফ সংশোধন

গত শতকের পহেলা অর্ধে কিছু পশ্চিমী কবি ভাবাইলেন যে, কবিতা শুধু পাঠবস্তু মাত্র নয়। তাহা চোখে দেখিবারও বিষয়। হরফবিন্যাসের কারিগরিতে তাঁহারা এমনভাবে কবিতাটিকে সাজাইলেন, যাহাতে তাহার ছাপা চেহারাটি হইতে কোনো-একটি ছবি ফুটিয়া উঠে। যে-ছবিটি কবিতাটির পাঠ্যে প্রবেশ করিতে পাঠককে খানিকটা আগাম সুরাহা দেয় বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

এই ধরনের প্রকল্পে ফরাসি কবি আপলিনের (১৮৮০-১৯১৮)-এর নাম সবার আগে করিতে হয়। লাইন-শব্দ-হরফ সমূহকে ভাঙিয়া-চুরিয়া-সাজাইয়া, একটি বিশেষ কোনো অবয়বের রূপ আরোপ করিয়া, রচিত কবিতাগুলিকে তিনি নাম দিয়াছিলেন লিপিলেখ বা 'কালিগ্রাম'। মার্কিন কবি কামিংস (১৮৯৪-১৯৬২) আবার তাঁহার কিছু রচনায় শব্দের ভিতরকার হরফকে এলোমেলোভাবে ভাঙিয়া, খুশি ও দরকারমতো নানান চিহ্ন ব্যবহার করিয়া কবিতাকে সাজাইলেন।

বিগত শতকের পাঁচের দশকে আর-এক কাব্য আন্দোলন দানা বাঁধিয়াছিল, যাহা *কংক্রিট পোয়েট্রি* নামে পরিচিত। ১৯৫৬ সালে ব্রাজিলের সাও পাওলোতে এইসব কবিতার একটি প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনী! অর্থাৎ এই তরিকার কবিতা রচয়িতারাও কবিতাকে একটি দৃশ্যবস্তুর চেহারা দিতে চাহিতেন। ইঁহারা নাকি অনুপ্রেরণা পান লুইস ক্যারল-এর বিশ্ববিশ্রুত রচনা *আজব দেশে অ্যালিস-এর*

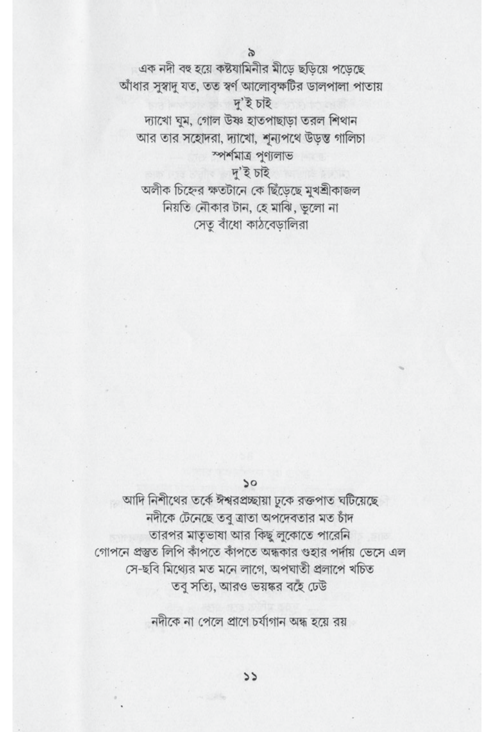
অভিযাত্রা-র একটি অংশ হইতে। সেখানে এক ইঁদুর অ্যালিসকে তাহার দীর্ঘ ও বিষণ্ণ কাহিনি বলিতেছে, সেই উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা হরফবিন্যাসের কায়দায় এমন করিয়া ছাপা হইল, যাহাতে তাহাকে দেখায় ইঁদুরের লেজের আকারে।

হুজুগে বাঙালি যে এইসব কায়দাবাজি হইতে নিজেকে দূরে রাখিবে, তাহা তো হইবার নয়! জলের স্রোত বা পাখির ডানার মতো আকৃতি দিয়া কবিতারচনার এক ধরনের চর্চা বিগত শতকের ষাট-সত্তর দশকে এই বাংলাতেও কিছুদিনের তরে দানা বাঁধিয়াছিল। তবে, তাহা কোনো লম্বামেয়াদি ধারা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পাঠক হিসাবে সেগুলি আমায় বিশেষ নাড়া দেয় নাই। তবে আমার প্রথম কবিতাবহি *কলম্বাসের জাহাজ* (১৯৭৭)-এর একটি কবিতায় এক জায়গায় সিঁড়ি ভাঙার অনুষঙ্গ আসায়, কয়েকটি লাইন ভাঙিয়া এইভাবে সাজাইয়াছিলাম —

ত্রিদিবেশ সিঁড়ি ভাঙে সেরকম বিব্রত পায়ে
                    মানোএল সুম্পসাওঁ
                              মুজতবা
                                  মনীশ ঘটক

বলিতে পারা যায়, আমার ক্ষেত্রে সে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র!

তবে স্বভাবদোষে, প্রথম দু-তিনটি পুস্তিকার পর হইতেই সময় হইতে সময়ান্তরে আমার কবিতা কেবলই বদলাইয়া যাইতে থাকে। আর শুরুতেই বলিয়াছি, কবিতার আত্মায় বদল ঘটিলে, তাহার কাব্যশরীরেও বদল ঘটে। শরীরের বদল আবার ফুটিয়া উঠে কবিতার অবয়বে। তাই, আমার প্রায় প্রতিটি কবিতাবহির কবিতাই, দৃশ্যতও আলাদা হইয়া উঠে। কিন্তু, সারল্যের সাথে বলি, তাহা কোনো পরিকল্পনার কারসাজি নয়। একধরনের নিরুপায়তা মাত্র।


৯
এক নদী বহু হয়ে কষ্টযামিনীর মীড়ে ছড়িয়ে পড়েছে
আঁধার সুস্বাদু যত, তত স্বর্ণ আলোবৃক্ষটির ডালপালা পাতায়
দু'ই চাই
দ্যাখো ঘুম, গোল উষ্ণ হাতপাছাড়া তরল শিথান
আর তার সহোদরা, দ্যাখো, শূন্যপথে উড়ন্ত গালিচা
স্পর্শমাত্র পুণ্যলাভ
দু'ই চাই
অলীক চিহ্নের ক্ষতটানে কে ছিঁড়েছে মুখশ্রীকাজল
নিয়তি নৌকার টান, হে মাঝি, ভুলো না
সেতু বাঁধো কাঠবেড়ালিরা

১০
আদি নিশীথের তর্কে ঈশ্বরপ্রচ্ছায়া ঢুকে রক্তপাত ঘটিয়েছে
নদীকে টেনেছে তবু ত্রাতা অপদেবতার মত চাঁদ
তারপর মাতৃভাষা আর কিছু লুকোতে পারেনি
গোপনে প্রস্তুত লিপি কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকার গুহার পর্দায় ভেসে এল
সে-ছবি মিথ্যের মত মনে লাগে, অপঘাতী প্রলাপে খচিত
তবু সত্যি, আরও ভয়ঙ্কর বহে ঢেউ

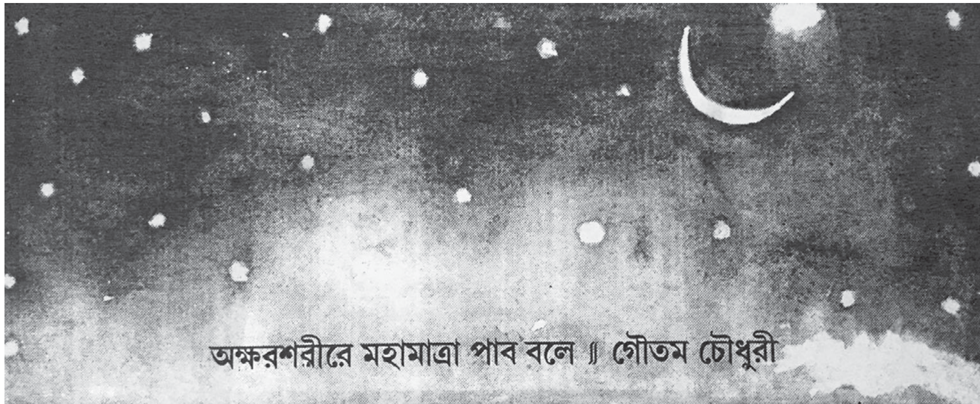
নদীকে না পেলে প্রাণে চর্যাগান অন্ধ হয়ে রয়

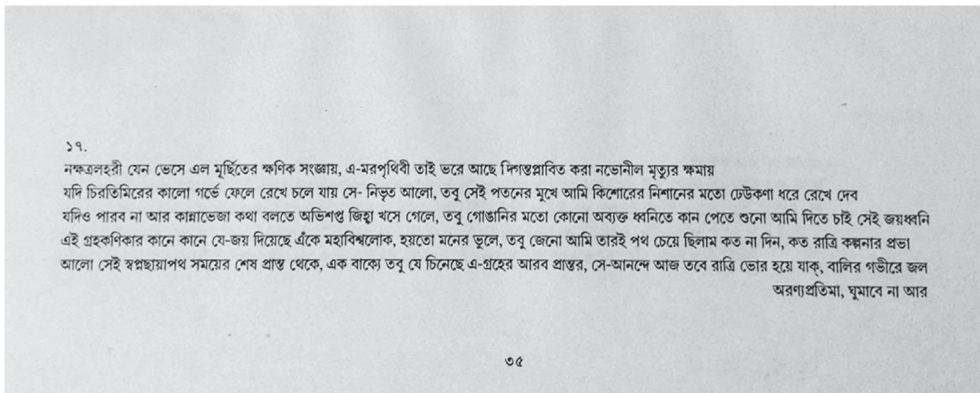
১১

নদীকথা-র একটি পৃষ্ঠা

কবুল করা ভালো, একটি বহি নির্মাণের বেলায় প্রযুক্তি বিশেষ সহায় হইয়াছিল। সেটি *নদীকথা* (১৯৯৭)। সেখানকার কবিতাগুলি ছিল অসমপার্বিক। লেটারপ্রেস ছাড়িয়া সেই প্রথম কম্পিউটারে হরফ সাজানো শুরু। যথারীতি পাতার বাম দিক হইতে কবিতার লাইনগুলি যাত্রা শুরু করিতেছে। কোনো লাইনে সাত-আটটি শব্দ, কোনো লাইনে আবার মাত্রই দু-তিনটি। মনে হইল এই অসমপার্বিকতার চেহারাটি যেন ঠিক জুতসইভাবে ফুটিতেছে না কাগজের বুকে। দেখা গেল, নয়া কৃৎকৌশলের বদৌলতে মাত্র এক বারের কোশেশে পুরা বহির কবিতাগুলি কেন্দ্রিক বিন্যাসে (central alignment) সাজানো হইয়া গেল। কবিতার অবয়বে তৈয়ার হইয়া গেল এক আলাদা দর্শনীয়তা।

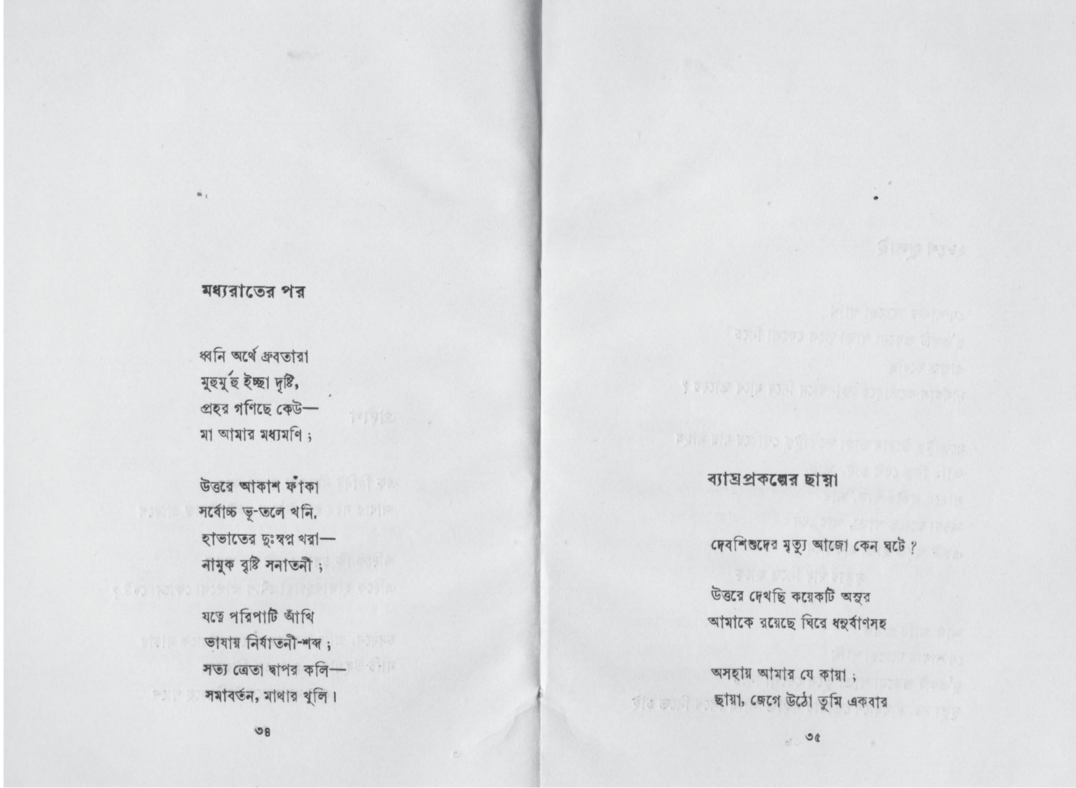
ইহার বহুদিন পর কিছু কবিতা আসিয়াছিল লম্বা-লম্বা লাইনের মহাপয়ারে। বিভিন্ন ছোটোকাগজে প্রকাশ করিবার সময় সেগুলি লইয়া বেশ মুশকিলে পড়িয়াছিলাম। ১/৮ ডিমাই কাগজের মাপ মোতাবেক ছোটো-ছোটো লাইনে ভাঙিয়া একটি অনভিপ্রেত চেহারা দিতে হইত তাহাদের। সেই কবিতাগুলি এক মলাটে বাঁধিবার সময়, বহির আকৃতিটি তাই করা গেল পুথির মতো। দৈর্ঘ্যে সরু ও আড়ে লম্বা কাগজের এ-প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিল কবিতার লাইনগুলি। অন্য চেহারার সেই বহিটির নাম *অক্ষরশরীরে মহাপাত্র পাব বলে* (২০০৬)।




১৭.
নক্ষত্রলহরী যেন ভেসে এল মূর্ছিতের ক্ষণিক সংজ্ঞায়, এ-মরপৃথিবী তাই ভরে আছে দিগন্তপ্লাবিত করা নভোনীল মৃত্যুর ক্ষমায়
যদি চিরতিমিরের কালো গর্ভে ফেলে রেখে চলে যায় সে- নিভৃত আলো, তবু সেই পতনের মুখে আমি কিশোরের নিশানের মতো ঢেউকণা ধরে রেখে দেব
যদিও পারব না আর কান্নাভেজা কথা বলতে অভিশপ্ত জিহ্বা খসে গেলে, তবু গোঙানির মতো কোনো অব্যক্ত ধ্বনিতে কান পেতে শুনো আমি দিতে চাই সেই জয়ধ্বনি
এই গ্রহকণিকার কানে কানে যে-জয় দিয়েছে এঁকে মহাবিশ্বলোক, হয়তো মনের ভুলে, তবু জেনো আমি তারই পথ চেয়ে ছিলাম কত না দিন, কত রাত্রি কল্পনার প্রভা
আলো সেই স্বপ্নছায়াপথ সময়ের শেষ প্রান্ত থেকে, এক বাক্যে তবু যে চিনেছে এ-গ্রহের আরব প্রান্তর, সে-আনন্দে আজ তবে রাত্রি ভোর হয়ে যাক্, বালির গভীরে জল
অরণ্যপ্রতিমা, ঘুমাবে না আর

৩৫

অক্ষরশরীরে মহামাত্রা পাব বলে গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও একটি পৃষ্ঠা



মধ্যরাতের পর

ধ্বনি অর্থে ধ্রুবতারা
মুহুর্মুহু ইচ্ছা দৃষ্টি,
প্রহর গণিছে কেউ—
মা আমার মধ্যমণি ;

উত্তরে আকাশ ফাঁকা
সর্বোচ্চ ভূ-তলে খনি,
হাভাতের দুঃস্বপ্ন খরা—
নামুক বৃষ্টি সনাতনী ;

যত্নে পরিপাটি আঁখি
ভাষায় নির্যাতনী-শব্দ ;
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—
সমাবর্তন, মাথার খুলি।

৩৪

ব্যাঘ্রপ্রকল্পের ছায়া

দেবশিশুদের মৃত্যু আজো কেন ঘটে ?

উত্তরে দেখছি কয়েকটি অসুর
আমাকে রয়েছে ঘিরে ধনুর্বাণসহ

অসহায় আমার যে কান্না ;
ছায়া, জেগে উঠো তুমি একবার

৩৫

অষ্টবসুর বিভা গ্রন্থের দু-টি পৃষ্ঠা

গ্রন্থনার কারণেই এই বহির মহামাত্রিক কবিতাগুলি নিছক চোখের দেখাতেও ভিনরকমের হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু, কবিতার অবয়ব কি শুধু হরফ দিয়াই গড়িয়া উঠে? শূন্যতার কি সেখানে কোনোরকম ভূমিকা নাই? এই যে কবিতাবহির প্রতি পৃষ্ঠায় কবিতা ছাড়াও বিপুল পরিমাণ ফাঁকা পরিসর পড়িয়া থাকে, তাহাও তো আমাদের দৃষ্টিকে শুশ্রূষা দেয়। সেই শুশ্রূষা কিছুটা যেন প্রতীকী। আসলে, যথার্থ কবিতা আমাদের যে-স্তব্ধতার কাছে লইয়া যাইতে চায়, এই শূন্যতা যেন তাহারই প্রতিরূপ। কিন্তু বহির ভিতর কবিতাগুলি সচরাচর অমন শূন্যের উপর ঝুলিয়া থাকেন কেন! গদ্যলিখন কাগজের পৃষ্ঠার মাথা হইতে শুরু হয় বলিয়া কবিতাকেও সেই মাথার দিব্য কে দিয়াছে! আজিকার দিনের খণ্ডকবিতা তো প্রায়ই পাতার নিম্নরেখায় পঁহুছিবার বহু আগেই খতম হইয়া যায়। সেই অবস্থায় তাহাদের দেখিলে মনে হয় নাকি, যেন শাস্তি দিয়া তাহাদের কেউ টং হইতে শূন্যের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়াছে?

এই প্রশ্নের অস্বস্তি হইতে মুক্তি পাইবার কাহিনিটি বলিয়া এই লিখন শেষ করি। তরুণ বয়সে কিছু বছর (১৯৭৪-৯১) একটি কবিতাকাগজে (*অভিমান*) লিপ্ত ছিলাম। সেই সুবাদে একাধিক কবিতাবহির প্রকাশনা-মুদ্রণের ভার আসিয়া পড়িত নানা সময়। সেইভাবেই কবিবন্ধু অশোক দত্ত-র *অষ্টবসুর বিভা* কবিতাবহিটি প্রকাশের সময় (জানুয়ারি ১৯৮৫) হঠাৎ মনে হইল, মুদ্রণের বহুদিনের প্রচলিত রীতিটি উলটাইয়া দিলে কেমন হয়। কবিতাকে শূন্যের উপর ঝুলাইয়া না-রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া রাখি বরং। এইবার তাহাদের মাথার উপর আকাশ খেলা করুক। তাহাই করিলাম। প্রতি পৃষ্ঠার মুদ্রণ-এলাকার নিম্নতম রেখাটির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল প্রত্যেক কবিতা। কবিতার উপস্থাপনায় দৃশ্যগতভাবে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়া গেল মনে হয়। অন্তত আমি কিছু শান্তি পাইলাম।

স্বপ্নের লিখন থেকে মুদ্রণের দুঃস্বপ্নযাত্রা

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতারা যে কোথা থেকে গজিয়ে ওঠে, মস্তিষ্কের কোন কোষে, মাতৃগর্ভের নাড়ি বেয়ে যৌথ অবচেতনার কোন স্তর থেকে — তা কে বলবে! কবিতা আসে ছোটো বা বড়োবেলার সামান্য কোনো স্মৃতি থেকে — কুয়োতলা, ছাদের কোণ, সন্ধে-ঘনিয়ে-আসা রামকৃষ্ণ মিশন হস্টেল-মাঠের কাশবন, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির সিঁড়ি, কোনো সুস্বপ্ন বা কুস্বপ্ন, হাওয়ায় ভেসে-আসা ছাতিমের গন্ধ, ট্রেনের মহিলাকামরা — এইসবের ঝলক থেকে। আমার লেখা এইসব সূক্ষ্ম, সামান্যদের নিয়ে। সেখানে সমুদ্র থেকে উঠে আসে ঘোড়া, দেখা দেয় জকি-মতো বামনের হাসি। সাম্প্রতিক কোনো বড়ো ঘটনা, যা মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়, মেয়েদের ধর্ষিত করে, মা খুন করে মেয়েকে, ঘটে যায় গুজরাত, নন্দীগ্রাম — তা সরাসরি আমার লেখায় আনতে পারি না, এ এক ত্রুটি বটে।

কফিহাউসের সিঁড়ি দিয়ে প্রবল গরমে নামতে-নামতে মাথায় ঘোরে একটা লাইন, 'চোদ্দোশো দুই সালের গ্রীষ্মের মতো ভয়ংকর ঋতু আর কখনও আসেনি আমাদের জীবনে'। সেখান থেকে কীভাবে যে আমি ও সাকিনা নাম্নী আর-এক আমিকে নিয়ে নারীজীবনের সমস্ত জটিলতা জড়িয়ে-মড়িয়ে এক ফর্মার একটি বই রচিত হয়ে যায়, আমি জানি না। আমি জানি না কীভাবে চণ্ডালিকার আবহ থেকে যৌনপল্লীর কাতর মেয়েটি ও তার বাবু আবার এসে শেষ হয় বৌদ্ধ আবহেই। এসব কিছুই আমি পরিকল্পনাবশে করিনি। একটি লেখা শেষ হওয়ার পরও নাছোড় হয়ে লেগে থেকে সেরকমই আরও সব লেখা লিখিয়ে নিয়েছে। তৈরি হয়ে উঠেছে এক-একটি সিরিজ।

যে-লেখা আমি খাতায়-কলমে লিখি, তা লিখে উঠতে আমার সময় লাগে না খুব। একইসঙ্গে একই আবহে ভূতগ্রস্তের মতো লেখা আসতে থাকে। একটা সময় জোর করে নিজেকে থামাতে হয় এই জেনেই যে, এর পর হয়তো মাসের পর মাস লিখতে পারব না। আমি তেমন কবি নই, যাঁরা অজস্র সংশোধন, অসংখ্য কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে লেখাটিকে তার শীর্ষস্তরে পৌঁছে দেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, উৎপলকুমার। আমার লেখা, দুর্বিনয়ে বলতে হয়, প্রায় দৈবাদেশে পাওয়া। মার্জিত কপিটি তৈরি করার সময় হয়তো এক-আধটা শব্দ বদলাই, লোভে পড়ে যাই আগে-অদেখা কোনো মিলের, এবং চাই স্পেস। কিন্তু খুব বেশি কারিকুরি তাতে থাকে না, এবং ফলত আমার লেখাগুলির মধ্যে আদৌ যদি কোনো উচ্চতায় ওঠার উপাদান থাকেও, সেখানে তারা পৌঁছোতে পারে না কখনোই, আমারই স্বভাববশে।

নিজের লেখা যখন ছাপার অক্ষরে দেখি, অসম্ভব খারাপ লাগে। এই তবে এরা! এরাই আমার সেইসব যাতনা ও অর্গাজমের সাক্ষী কবিতাসমূহ! আরও খারাপ লাগে অলস ও উদাসীন সম্পাদকদের প্রুফ দেখার ভুলে যখন লেখা ছাপা হয়, চোখ অন্ধ হয়ে আসে ভুল বানানে, এমনকী ভুল ছন্দেও। তার চেয়েও খারাপ লাগে দেড় বা দু-পাতাব্যাপী কোনো কবিতাকে রান-অন করার ফলে মুখোমুখি বাঁ-ডান পৃষ্ঠার বদলে পাতা উলটে পড়তে হলে।

এইসব লেখা, যা উঠে এসেছিল একান্ত আমারই দেখা কোনো ছবি থেকে, কী করে তাকে আমি পৌঁছে দেব কোনো পাঠকের চোখে, জানি না। যা ভেবে আমি শব্দটি বসিয়েছিলাম, যতিচিহ্নটি যে-কারণে ব্যবহার করেছিলাম, দাবি করেছিলাম স্পেস, পাঠক কী করেই বা তা বুঝবেন? আমি এক সামান্য কবি, খুব ছোটো আমার পাঠকবৃত্ত — তাঁরা হয়তো তাঁদের মতো করে একরকম অর্থ করে নেন লেখাটির, ভেবে, মুদ্রিত লেখাটি দেখে পাগলপ্রায় লাগে।

বই-এর ক্ষেত্রে আমি থিমেটিক হওয়ায় বিশ্বাসী। অদ্যাবধি *শ্রেষ্ঠ কবিতা* ছাড়া আমার সমস্ত বই কোনো না কোনো থিমনির্ভর। ফলে, যখন লিখি ওই নির্দিষ্ট থিমটির বাইরে আর কিছুই লিখতে পারি না। কোনো পত্রিকা থেকে যখন গুচ্ছকবিতার ফরমায়েস আসে, সেই দশ-বারোটি কবিতাও একটিই থিমকে ঘিরে গড়ে ওঠে। যার ফলে, আমার প্রায় সব বই-ই ক্ষীণকায়।

বই-এর ধরনে আমার পছন্দ এক, দুই বা বড়োজোর আড়াই ফর্মার পেপারব্যাক। হার্ডবাউন্ড বই আমার সাকুল্যে তিনটি — যার দু-টি বড়োঘরের প্রকাশকের তৈরি। একটি, *কাজলরেখার বাড়ি*, আমি সজ্ঞানে হার্ডবাউন্ড করিয়েছিলাম; কারণ, সাড়ে চার ফর্মার বই-এর লেখাগুলি একসঙ্গে থাকার অধিকারও ছাড়ছিল না, আবার পেপারব্যাকেও আঁটানো যাচ্ছিল না। খরচ হয়ে পড়ত প্রভূত।

আমার সাম্প্রতিক লেখাগুলিতে যতিচিহ্ন ক্রমশ কমে আসছে। দাঁড়ি আমি প্রায় টানিই না, কমা কখনো-কখনো অনিবার্য হয়ে ওঠে। খুব ব্যবহার করি হাইফেন এবং ড্যাশও।

আর দরকার হচ্ছে স্পেসের। ক্রমশই আরও বেশি স্পেস। তিন লাইনের একটি কবিতায় প্রথম দু-টি পঙ্‌ক্তির পর তৃতীয় পঙ্‌ক্তি দাবি করছে মাথার ওপর নিজস্ব এক শূন্যতা। যা তাকে অনিবার্য করে তুলবে, হয়তো আনবে একটু চোরা-মিলও। দশ-বারো লাইনের এমন লেখাও লিখেছি, যেখানে প্রতিটি পঙ্‌ক্তির পরই রয়েছে স্পেস।

এই যেসব পাগল হাওয়ার মতো স্বপ্নে-পাওয়া লেখার কথা বললাম, এর বাইরেও লিখেছি বই কী। খুব সচেতন হয়ে, মিল ও মাত্রা মেপে। একসময় কিছু সনেট লিখেছিলাম, তখন তো ব্যাকরণ মানতেই হয়েছিল। সেসব লেখাকে আজ আর আমি গুনি না, ওরকম নিখুঁত লেখার ধাত আমার নয়।

আমার নিজের পাণ্ডুলিপি ও তৈরি-হওয়া বইটির মধ্যে অনেক ফারাক। নিজের বই-এর যে-চেহারা আমি চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি হয়তো একটি বা দু-টি বই-এর ক্ষেত্রে। ফলত, নিজের মুদ্রিত লেখা আমার দু-চক্ষের বিষ। সম্পাদক ও প্রকাশকদের আমি মনে-মনে শত্রুজ্ঞান করি।

দেখা না-দেখায় মেশা

তন্ময় মৃধা

সাবেক বাঙালির গদ্য-পদ্যের প্রাথমিক এবং সম্ভবত অকলঙ্ক ধারণা তথা অনুভূতিটি অজান্তেই গড়ে দিতে পেরেছিল রবি ঠাকুরের *সহজপাঠ*-এর ওই দু-টি খণ্ড। একই বই-এর মধ্যে কবিতা আর গদ্য পাশাপাশি — এরকম আর দ্বিতীয়টি আছে বলে শুনিনি। তার আগে কী ছিল কিংবা পরে কী হয়েছে, বলতে পারব না।

১৯৮৫ সাল। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হল। মেজদির বাড়ি বেড়াতে চলে গেলাম। মেজো জামাইবাবুর আলমারি থেকে দুটো বই বার করে পড়ে ফেললাম। জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা* আর জসীমুদ্দিনের *সোজন বাদিয়ার ঘাট*। মনে আছে — ভালো লেগেছিল। *রূপসী বাংলা* — চৌকো-চৌকো গোটা-গোটা প্রমাণ মাপের কাঁঠাল পাতার মাপে লেখাগুলো — পাতায়-পাতায় সাজানো। *সহজপাঠ*-এর মতো নয়। *সঞ্চিতা*-র মতোও নয়। আর *সোজন বাদিয়ার ঘাট* যেন বাংলার ঘরবাড়ি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে বয়ে চলা অখ্যাত একটা নদীর মতো। এই পারে দাঁড়িয়ে ওই পারের লোকের সঙ্গে দিব্যি কথা বলা যায়। আমার কাছে কত দীর্ঘ, তবু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছে হয়তো নেহাত সোঁতা।

এইসব নানা অভিঘাতে, বেশ একটু বড়ো বয়সে যখন কবিতা-টবিতা নিয়ে বেশ খানিকটা চর্চা করা গেছে, তখন একদিন নানারকম বিরক্তি, অসহায়তা, প্ররোচনা আর বিভ্রান্তি এড়াতে নিজে-নিজেই আমি কবিতার একটা সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলাম। একটি পৃষ্ঠার উপর থেকে নীচে যা লম্বা করে লেখা হয়, তা-ই কবিতা। আমরা জানি, কবিতার কোনো সংজ্ঞা হয় না। কবিতার অন্তর ও বাহির নিয়ে সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত আলোচনা হয়। আমরা এ-ও জানি, ভর-ভার- অভিকর্ষের মতো কবিতার জন্য একটি সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণ বস্তুত অসম্ভব। আমার আবিষ্কৃত সংজ্ঞাটি তাই এতদিন আমি জনসমক্ষে আনতে চাইনি। সম্পাদকীয় প্রস্তাবনার সুযোগে আজ প্রকাশ্যে আনলাম।

হ্যাঁ, দুনিয়াজোড়া গড় কবিতা কিন্তু রোগা ছিপছিপে লম্বাটে গড়নের। আর সেই জন্যে গোলাপ কিংবা কবিতা দেখামাত্রই কিন্তু চিনে ফেলা যায়। যদি আমি চিনে গিয়ে লিখিত কিংবা ছাপার হরফে ওরকম চেহারার কিছু দেখি, আমার অন্তত প্রাথমিকভাবে ওটিকে কবিতা বলেই প্রতীতি হবে, হবেই। তাই বলে ব্যতিক্রম কি নেই? থাকতে বাধ্য। মানুষের মতো ব্যতিক্রমী জীব আর কে আছে! সুতরাং ব্যতিক্রম স্বাভাবিক। আর ব্যতিক্রমগুলি, আশ্চর্য ব্যাপার, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্পর্কটির মতোই পারস্পরিকতা কিংবা কালনির্ভর নয়। কথার কথা, ১৮১৮ সালে যেমন বিধ্বংসীতম ঘূর্ণিঝড় সম্ভব, সুদূর অতীতেও তেমনি আশ্চর্য রকমের চওড়া করে লেখা কবিতাও সম্ভব। দু-লাইনের কবিতার যেমন অতীত আছে, তেমনি তার ভবিষ্যৎও মুছে যায় না। আবার একেবারে কালনির্ভর ব্যতিক্রম, তা-ও তো সম্ভব। অমিতাভ প্রহরাজ — তাকে আমি ভালো করে চিনি না। সে অবশ্য আমি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কিংবা সত্যেন দত্তকেও চিনি না। যাই হোক, এই অমিতাভ প্রহরাজের *অন্যব্যাপার* কাব্যগ্রন্থটি সম্প্রতি পড়েছি এবং বলা যায়, দেখেছিও। কারণ বইটি শুধু পড়ার নয়, দেখারও। একশো সাতাশি পাতার এই বই-এর লেখাগুলি প্রচলিত কবিতাগ্রন্থের একেবারে বিপরীত ক্রমে বিন্যস্ত। আনুমানিক ৭ ইঞ্চি x ১২ ইঞ্চি বইটির যাবতীয় লেখা ওই প্রস্থের ১২ ইঞ্চি বরাবর লিখিত। প্রতিটি পাতা পুরোনো দিনের চালু নিমন্ত্রণপত্রের মতো একটা আকর্ষনহীন অলংকৃত বর্ডার দিয়ে ঘেরা। প্রতিটি পাতার উপরের বাঁদিকের কোণে 21 Page, 31 Page — এভাবে পৃষ্ঠাসংখ্যা লেখা। অতি চূড়ান্ত দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি, গড় কবিতার মতো ভদ্রস্থ পঙ্‌ক্তি, ভাগ, উপভাগ, অসংখ্য ফোটোগ্রাফ, ফাঁক, ফোকর, টানা ইংরেজি, ঐতিহাসিক নিদর্শন কিংবা লিপি-বিবর্তনের প্রতিলিপি — সব মিলিয়ে এই 'অন্যব্যাপার'। অন্তর্বস্তু কিংবা লিখনশৈলী বাদে শুধু কবিতার চেহারাটুকুর দিক থেকেই কাব্যগ্রন্থটি অন্যরকম। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার,

এত বিচিত্রের সমাবেশ সত্ত্বেও আমার মতো কূপমণ্ডূকেরও পাঠান্তে গ্রন্থটিকে কাব্যগ্রন্থ বলেই মনে হয়েছে।

মানুষের বাচ্চা কেমন দেখতে হবে, মানুষ ঠিক করতে পারে না। কবির বাচ্চা কবিতা কেমন দেখতে হবে, কবি ঠিক করে নেন। এবং আশা করি, আমার মতো সকলেই, কাব্য রচনার প্রথম দিন থেকেই এই প্রয়াসকে পূর্ণ সচেতনতার স্তরে গ্রহণ করেন না। ক্রমশ দৃঢ় হয় এই ঠামটির প্রতি কবির আবেগ, আকুতি, প্রয়াস ইত্যাদি। কোথাও চাই সমুদ্রের বিস্তার, কোথাও-বা চলমান ট্রেনের দ্রুতি। কোথাও কাছে আসা তো কোথাও দূরে চলে যাওয়া। কবিতা নিশ্চয়ই ছবির মতো দৃশ্যরূপ নির্ভর নয়। হবেও না কখনো। এবং যতদিন না সে নিউ মিডিয়া হিসাবে বাজারে অবতীর্ণ হতে পারছে, ততদিন এই সাদা পাতা-শব্দ-পঙ্‌ক্তির সীমাবদ্ধতা কিংবা বন্ধন আমাদের মেনে নিতে হবে। কেউ হয়তো খেয়ালও করবে না ওই প্রদত্ত সীমা-পরিসরটুকু দৃশ্যতই কখনো হয়ে উঠতে চাইছে দিগন্ত বিস্তৃত ধান খেত, কখনো-বা টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে একটি হতভাগ্য যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরের মতো।

ভিতর পানে চেয়ে দেখি বাহির অত নাই

রাণা রায়চৌধুরী

খুব লম্বাটে কবিতা আমার কোনোদিনই লিখতে ইচ্ছে হয়নি। লম্বাটে এবং রোগাটে দেখতে কবিতায় আমার বরাবর অনীহা।

যদিও কবিতার চেহারা বা গড়নের চেয়ে আমার কবিতার আত্মাতেই বেশি ভক্তি বা বিশ্বাস। আমি কবিতা লেখার সময় মাথায় রাখি কবিতার ভিতরটা বা অন্তরটা বা তার আত্মা যেন সর্বাঙ্গসুন্দর অথবা সর্বাঙ্গকুৎসিত হয়। কারণ কুৎসিত কবিতার আত্মাও এক ধরনের সৌন্দর্য প্রকাশ করে, তার বহতার ক্ষমতাও অনেকদূর।

অথচ মনে আছে, বহুবছর আগে আমি একটি পত্রিকায় কবিতার সুন্দর চেহারা, সুন্দর গড়ন, সুন্দর ছাপা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলাম এইরকম পাতলা কাগজ করব। যার বহুদূরব্যাপী প্রসারতা। করেওছিলাম তা, নাম ছিল *পালক*। পালকের মতো পাতলা সে-কাগজে নানান চেহারার, নানান মাপের, নানান শরীরের কবিতা ছাপা হত। তখনও চেষ্টা করতাম, কবিতাগুলো যেমনই দেখতে হোক না কেন, যেন তার প্রাণ থাকে — তার আত্মা যেন পাঠকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কথা বলে, সেইসব কবিতা যেন ভিতর থেকে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

আমি বরাবরই কবিতার প্রাণে, আত্মায় বিশ্বাসী। একটি কবিতা লেখার আগে তাই আমি ভাবি না সৃষ্টির পর সে কেমন দেখতে হবে? আমি প্রথম থেকেই মাথায় রাখি — কবিতা যেন ভিতর থেকে সুন্দর হয়, অথবা অসুন্দরের সৌন্দর্য যেন সে প্রকাশ করতে পারে।

কবিতা দেখতে দারুণ হল, একেবারে চার-ছয়, আট-দশ মাপে দারুণ স্থাপত্য হল তার — কিন্তু ভেতর ফাঁপা! ভেতরে হাওয়া নেই, বাতাস নেই, শোক-দুঃখ নেই, আনন্দের ভরাডুবি নেই, ধ্বংস নেই, উন্মাদের পাঠক্রম নেই, নেই কোনো ষড়যন্ত্রও — এমন কবিতায় আমার চিরকাল বিমুখতা। এমন নিষ্প্রাণ শিল্পে আমার ভিতরে কোনো ঢেউ ওঠে না।

আমি কতটা পারি, জানি না; কিন্তু চেষ্টা করি কবিতার সব গ্রামার ভেঙে ফেলতে। কবিতার বাড়ি মানেই যে খুব শিল্পময় নান্দনিক করতে হবে, সাজাতে হবে তাকে বাগানবাড়ির মতো, এমনটা চাইনি বা পারিওনি হয়তো।

আমি কিচ্ছু না জেনে, কোনো ব্যাকরণ না মেনে, স্রেফ ভিতরের উথালপাথাল আগুন থেকে বা ঝড় থেকে বা এলোমেলো স্রোত, স্রোতের ধাক্কা থেকে কবিতা লিখতে শুরু করি — কী হচ্ছিল জানি না, কিন্তু দিন যেতে, বেলা গড়াতে, কিছু মানুষ বললেন, 'হচ্ছে'! সেই 'হচ্ছে' নিয়েই আমি আমার কবিতা লেখা চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রথমেই যদি ঠিক করে নিই, কবিতাকে দেখতে সুন্দর করে গড়ে তুলব, তাহলে হয়তো সৃষ্টিতে কোথাও ভুল থেকে যাবে — ওভাবে তো কবিতাকে গড়ে তোলা যায় না। কবিতা একেবারেই ভিতরের ব্যাপার। রহস্যময় সে। সে অজানা। সে প্রথমে অনাত্মীয়। পরে সে আত্মীয় এবং বন্ধু হয়ে কবির কাছে ধরা দেয়। সাদা পৃষ্ঠায় যখন শুরু হতে থাকে কবিতা লেখা, তখন কি কবি জানেন কী হবে? কোথায় পৌঁছোবে তাঁর কবিতা? তিনি শুরু করেন মাত্র, গন্তব্যে কবিকে পৌঁছে দেয় কবিতাই। বলা যায়, কবি প্রথমে অন্ধ — ধীরে-ধীরে কবিতা লেখা চলতে-চলতে, কবি চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠেন। লেখার শেষে নয় তিনি আনন্দে আত্মহারা হন, অথবা লেখাটি ব্যর্থ হলে তিনি মুষড়ে পড়েন। এই সুখ-দুঃখের খেলাটি কবির একান্তই নিজের। সেখানে কবিতার প্রাণ প্রয়োগেই কবির সাধনা চলে নিরন্তর। সেখানে কবিতা কেমন দেখতে হবে, সেটা প্রায় অবান্তর প্রশ্ন!

আসলে লিখতে-লিখতে একটি লেখার বা কবিতার গড়ন বা অবয়ব তৈরি হয়। লেখার শেষে সে কেমন শেপ নেবে বা আকার নেবে, তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে হ্যাঁ, মোটামুটি একটা ধারণা থাকে — যে, লেখার শেষে কবিতাটি এইরকম দেখতে হবে, বা হতে পারে।

কিন্তু আমার যেটা আগে হয়, তা হল ভাবনা। একটা চিত্রকল্প, একটা চমকদার লাইন, একটা ফ্ল্যাশ, একটা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক — সেখান থেকেই মাথায়-মাথায় শুরু হয় আমার কবিতা লেখা। মনে-মনে খুব আনন্দ হয়। মনে হয়, পেয়ে গেছি! পাওয়ার পর হয়তো একটা মাত্র শব্দকে কেন্দ্র করে শুরু হল অজানার উদ্দেশে যাত্রা। যাচ্ছি, লেখা একটু-একটু করে হয়ে উঠছে বা হয়ে উঠছে না — কিন্তু এই অচেনাকে চেনার প্রয়াসটাই, বা গন্তব্যহীন গন্তব্যকে খোঁজার চেষ্টাটাই দারুণ আনন্দের। লিখতে-লিখতে বুঝি, কবিতা লেখা খুব সহজ অথবা কবিতা লেখা খুব কঠিন। এই যন্ত্রণাটাই আসল সেখানে। যন্ত্রণা পেতে আনন্দকে খোঁজা। কিন্তু সেখানে কবিতা লেখার পর কেমন তা দেখতে হবে বা তার চেহারা কেমন হবে, সেটা একদমই অজানা থাকে আমার কাছে।

প্রথম কয়েকটা বই আমার গদ্যেই লেখা মূলত। গদ্যে কবিতা লেখা হচ্ছে শুনে অনেকেই একটু বাঁকা চোখে তাকাতেন আমার দিকে। ছন্দে লিখি না বা ছন্দ জানি না, এমন বদনাম, ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা অবহেলা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক। ছন্দে লিখলে একটা মাপকাঠি পাওয়া যায়, একটা শরীর পাওয়া যায় কবিতার। কিন্তু গদ্য কবিতার তো কোনো বেড়া বা ফেনসিং থাকে না — সে বল্গাহীন ছুটছে। এই বেড়াহীন, ফেনসিং ছাড়া, আট-দশ আট-ছয় মাত্রার নির্দিষ্ট সীমা ছাড়া যে কবিতা, তাকে এখনও রক্ষণশীল মানুষেরা ভালো চোখে দেখেন না — অর্থাৎ, এগুলো কবিতাই নয়! এগুলো সব নিম্নমানের কবিতা — এরকম ধারণা প্রাচীনপন্থীদের।

আমার গদ্যের কবিতা নিরাকার। সে কেবল প্রাণমাত্র — তার নির্দিষ্ট ছাঁচের আকার নেই। সে এক বেঢপ কুৎসিত, এক অন্য আকারের কবিতা — কখনো চওড়া, কখনো এলোমেলো, কখনো দৃশ্যহীন এক দৃশ্যের অবতারণা তাতে। ফলে একজন কবির স্বীকৃতি পেতে, বা কবির আলোচনা পেতে, বা প্রকৃত কবির বদনাম পেতেও আমার বেশ কয়েক বছর সময় লাগল। আমি যে একজন কবি, বা আমি যে কবিতাটা মোটামুটি লিখতে পারি, তা জানতেই আমার সময় লাগল প্রায় তিরিশ বছর — কারণ আমি নির্দিষ্ট ছকে, বা ব্যাকরণ মেনে, বা সীমা মেনে প্রথম থেকেই কবিতাটা লিখিনি। আমার কবিতার চেহারা সুন্দর নয়, বা চেহারা নেই বললেই চলে, বা আমার কবিতা দেখতে চিরাচরিত নয় — ফলত, আমি আমার বন্ধুদের কাছে, সিনিয়রদের কাছে, গ্রহণযোগ্য হইনি বহুদিন — আমি আড়ালে, অবহেলায় — একাই লিখেছি, একাই তার রস আস্বাদন করে আনন্দ পেয়েছি অথবা মুষড়ে পড়েছি।

সকলেই চান কবিতাকে উত্তমকুমারের মতো দেখতে হবে। উত্তমকুমারের মতো দেখতে কবিতা মিষ্টি-মিষ্টি ডায়লগ বলবে, সে গীতিময় হবে, সে ঝাউবনে শুধুই আনন্দের কথা হয়ে, লিরিক হয়ে মৃদু-মৃদু নাচবে। উত্তমকুমারের মতো

দেখতে কবিতার গায়ের রং ফর্সা, সামান্য ভুঁড়ি থাকবে তার, টানা চোখ, নয়ন-ভোলানো হাসি — সে নিষ্ঠুর নয় কখনোই, সে কুৎসিতও নয়, সে বিনোদন মাত্র।

আমি এমন সুন্দর কবিতা — ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকেও লিখতে চাইনি — কোনোদিন। কেননা, আমার জীবন গীতিময় নয়। আমার জীবন ছয়-চার বা আট-ছয় মাত্রার বাঁধানো মার্বেল-মোড়া রাস্তাও নয় — সে এবড়ো-খেবড়ো, সে পথহারা পথিক — আমার কবিতা রেগুলার দাঁত মাজে না, স্নান করে না — ফলত, তার মুখ দিয়ে বিশ্রি গন্ধ বেরোয়, আমার কবিতাকে দেখতে খুব ভদ্রলোকের মতোও নয় — সে কোণঠাসা মানুষের মতো অসহায় দেখতে।

আমি একবার টানা গদ্যে নয়, কিন্তু কবিতার দাবি অনুযায়ী পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে এবং অবশ্যই অক্ষরবৃত্তে নয় (গদ্য ছন্দের), কয়েকটি কবিতা একটি পত্রিকায় পাঠাই, সম্পাদক চেয়েছিলেন বলেই পাঠাই — কিন্তু, কিছুদিন পর সম্পাদকমশাই বললেন, ‘কবিতাগুলি যখন গদ্যেই লেখা, তাহলে কি রান-অন কম্পোজ করব? অসুবিধে কোথায়?’ — আমি তো সম্পাদকের কথা শুনে খুব হতাশ হলাম! মনে-মনে ভাবলাম, রান-অন কম্পোজে বা টানা গদ্যেও কবিতা হয়, কিন্তু আমার কবিতাগুলি তো পরিকল্পিত পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে লেখা! এ কি বিয়ের কার্ড, যে টানা গদ্যে লিখে দেব — ‘মাননীয়া, অমুক দিন আমার কন্যার বিবাহ, আপনি আসিয়া নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করিবেন এবং পেট পুরিয়া মাংস-ভাত গিলিয়া যাইবেন’! আমি সম্পাদককে বললাম, ‘টানা গদ্যে কম্পোজ করবেন না দয়া করে — যেমন লেখা আছে, ঠিক সেরকমই ছাপা হবে’। এক্ষেত্রে আমার এই কবিতাগুলি গদ্যে লেখা হলেও একটি নির্দিষ্ট শরীর বা অবয়ব দাবি করছিল। আমি যতই বলি না কেন, কবিতার নির্দিষ্ট ছক বা শরীরী অবয়ব হয় না, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কবিতার অন্তরাত্মার সঙ্গে-সঙ্গে তার শরীরের কথাও বোধহয় কবিকে ভাবতে হয়। যেমন, আমার এই গদ্যের কবিতাগুলির ক্ষেত্রে আমাকে আগে থেকে কবিতার মাপ বা শরীর বা চেহারা নিয়ে ভাবতে হয়েছে। অথবা লিখতে-লিখতে একটা নির্দিষ্ট শরীর কবিতাগুলির গড়ে উঠেছে এবং যা আমার মনেরও অনুমোদন পেয়েছে।

তবে হ্যাঁ, কবিতাকে কেমন দেখতে হবে বা কবিতাকে গ্রন্থে কেমনভাবে সাজাতে হবে — এই নিয়ে আমার প্রাচীনপন্থীদের মতো কোনো নির্দিষ্ট গোঁড়ামি নেই। আমি তো কোনোরকম অনুষঙ্গ না মেনে কবিতাকে বই করার সময় এলোমেলো করে সাজিয়ে দিই। এলোমেলো করে সাজানোটাও এক ধরনের সাজানো বটে!

অর্থাৎ, যেমন করেই (কবিতার বইতে) কবিতাগুলিকে সাজিয়ে দাও না কেন, সেই সাজানোর পথে কবিকে হাঁটতেই হয়। তবে, অনেকেই একেবারে বিষয় মেনে বা কবিতার পারম্পর্য মেনে কবিতাকে বইতে সাজান — আমি এক্ষেত্রে উলটো করি, আবার একথাও মানছি যে উলটো সাজানোটাও একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সৃজন বা শিল্প।

আমাদের এক বন্ধু কবিতায় স্পেস, দাঁড়ি-কমা, যতিচিহ্ন... এইসব ব্যাপারে এতটাই খুঁতখুঁতে যে, সে আজও সেভাবে কবিতাটাই লিখে উঠতে পারল না। সারাজীবন সে কবিতায় যতিচিহ্ন, দাঁড়ি-কমা, সেমিকোলন, কোলন আর স্পেসের চর্চা করে গেল এবং এ-ব্যাপারে সে সঠিক এবং সিদ্ধাই-ও। কিন্তু আসল যে কবিতার রহস্য, কবিতার আলোছায়ার খেলা, কবিতার গহন দেশের যে বাজনা, কবিতার চরম যে মায়া বা ব্যাপকতা, তার থেকে আমাদের বন্ধুটি পড়ে রইলেন যোজন-যোজন দূরে। কবিতাকে সুন্দর করে সাজানোর এ-ও এক ব্যর্থ সাধনাই বলা যায়।

আমাদের এই বন্ধুটির জন্য আমার মায়া হয়, করুণা হয়। সে এক লাইন দু-লাইন করে মাপা ছন্দে কবিতা লেখে, আবার একটু ঘুরে এসে একটা দুর্দান্ত এবং নীরব স্পেস ঢেলে দেয় কবিতার অন্তরে। আবার লেখে দু-লাইন, আবার ঘুরে এসে মাপা ছন্দে একটা আন্তরিক স্পেস প্রয়োগ করে। এইভাবে তার কবিতা একটি আধুনিক যন্ত্রে পরিণত হয়। বন্ধুটি এইভাবে যন্ত্র লিখতে-লিখতে যন্ত্র-কবিতার দু-টি বই-ও করে ফেলে। কিন্তু বাংলা কবিতার সমালোচনার বাজারটি এতই মজার যে সমালোচকরা বিরাট-বিরাট চুরুট ফুঁকে ওই বই দু-টিকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেয় এবং দু-চারটে খুচরো পুরস্কার-টুরস্কারও দিয়ে দেয়। কবিতার ভিতরের স্পেসেরা, কোলন-সেমিকোলনেরা, যতিচিহ্নের দল পুরস্কৃত হয়ে নিজেরাই নীরবে হাসাহাসি করে এবং মঞ্চে উঠে মালা ও আলো গ্রহণ করে।

কবিতার ভিতরে অন্তহীন স্পেস ঢোকালে সেই কবিতাকে আড়ষ্টতায় গ্রাস করে, কীরকম নির্জীব নিষ্প্রাণ মনে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী স্পেস বা বিরতির প্রয়োগে আবার, কবিতার ব্যাপ্তি বাড়ে। কিন্তু অকারণ স্পেস ব্যবহারে, স্রেফ কবিতার শরীরটাকে সাজাতে গিয়ে কবিতাটিকেই দুর্বল এবং অসুস্থ করে তোলা হয়।

যে কবিতা শরীরসর্বস্ব নয়, কিন্তু পাঠকের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে কথা বলে চলে, সেরকম লেখাই আমার বেশি পছন্দ।

কবিতা লেখার আগে, বা সেই সময়ে কবির মনে নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। কবি জানেন না তাঁর সৃষ্টি কোন পথে শেষ হবে বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই এক অধরাকে ধরার প্রয়াস।

তবুও নানা রকমের বাংলা কবিতা লেখা চলছে, শরীর শরীরহীনতা তাতে মিলেমিশে আছে। পাঠকও তাঁর গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে কবির সঙ্গে এগোন, কবিতার সঙ্গে সখ্য করেন। তাই অন্তরাত্মার সঙ্গে-সঙ্গে কবিতা চেহারাটাও একটা মৃদু ব্যাপার হয়ে ওঠে। কবিতাকে কেমন দেখতে হবে তার ওপরেও নির্ভর করে কবিতার শেষ নির্যাসটুকু। পাঠকের মন ও চোখ নিষ্ঠুরের মতো বাজিয়ে দেখে তাকে।

চিত্ররূপময় কবিতা নিয়ে একটি দু-টি ভাবনা

যশোধরা রায়চৌধুরী

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে গিয়োম আপলিনের যখন ‘কালিগ্রাম, শান্তি ও যুদ্ধের কবিতা, ১৯১৩-১৯১৬’ নামে বইটি প্রকাশ করেন, দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠার সাদা অবতলে নানা টাইপ ফেসের সাজানোর হেরফেরে তখন সৃষ্টি হল ইতিহাস। এক-একটি পৃষ্ঠায় এক-একটি ছবির মধ্যে অক্ষর খুঁজে-খুঁজে পড়ার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল পাঠককে, ‘দৃশ্য কবিতা’ নামে, বা ‘কংক্রিট কবিতা’ নামে, তৈরি হল নতুন এক মাধ্যমও।

কালিগ্রাম ‘ফ্রি ভার্স’ কবিতার একটা বিশেষ স্তর বলেই অনেক মনে করেন। কবি নিজেও, তাঁর এক চিঠিতে (আঁদ্রে বিলি-কে লিখিত) বলেছিলেন — এমন এক সময় এই বই লিখছি যখন টাইপোগ্রাফি তার অন্তিম দিন গুনছে, আর নতুন সব মাধ্যম এসেছে সৃষ্টির, যথা সিনেমা আর ফোনোগ্রাফ।

আপলিনের সর্ব অর্থেই, ছবি আঁকলেন কবিতার। কবিতাটিই হয়ে উঠল ছবি, ছবিটিই হয়ে উঠল কবিতা। আঁকলেন / লিখলেন, ঘোড়া, সূর্য, আইফেল টাওয়ার, মানুষের মুখ ইত্যাদির ‘ছবি-তা’। অক্ষর ও শব্দ সাজালেন মানুষের চোখের মতো করে, খোলা বই-এর পৃষ্ঠার মতো করে। যে-কেউ ইন্টারনেটে গিয়ে পাবলিক ডোমেন থেকে এইসব ছবিতা দেখে নিতে পারেন।

কিন্তু রোজকার যে কবিতা আমাদের পাঠ্য, তার ভেতরে, বিশেষ করে মুক্ত কবিতা / ফ্রি ভার্সের ক্ষেত্রে, নেই কি দৃশ্যময়তার পরত?

মনে করি কিছু পাঠ অভিজ্ঞতা। দীর্ঘায়ত, পয়ারবদ্ধ যেসব কাব্য, সেগুলিতে দৃশ্যগত কোনো গল্প থাকে না। কোনোকিছুই আলাদা করে বলে না সেসব কবিতা। কিন্তু, যেসব কবিরা তাঁদের সংহত, ছোটো কবিতায় আমাদের মুগ্ধ করেছেন, তাঁদের পড়তে বসলে, কবিতা সচরাচর শ্রাব্য শিল্প নয়, দৃশ্য শিল্পই, একথা মনে না হয়ে পারে না। সত্যি বলতে কী, এসব কবিতা বসে-বসে পড়তেই বেশি ভালো লাগে। বই খুলে।

তখন মনে হয়ই, কবিদের লেখায়, প্রতিটি দাঁড়ি-কমা, শব্দ সাজানোও আসলে কতটাই না গুরুত্বের। এক-একটা লাইন কেন ভেঙে দেন কবি?

দুপায়ে রাস্তার কাদা ঘুঁটে ঘুঁটে
ধরে ধরে পার হয়ে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটা
এই মাত্র চলে গেল
আরো একটা দিন।

মাথার ওপরে টিন
শব্দ ক'রে
মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে।
সজনে গাছে ডাল ধরে দোল খায়
এখনও বৃষ্টির
বড় বড় ফোঁটা।

জলায় এবার ভালো ধান হবে —
বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে
সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা, *আরও একটা দিন*। এই বিবরণে প্রতিটি শব্দ / পঙ্‌ক্তি অংশ যেমন কেটে-কেটে যায়, সেই ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে, কবি যেন নিজের দেখাটিই আমাদের সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। একটা ছবি, একাধিক ছবি বরং বলা যায়। সাজানোর মধ্যে দিয়েই ধীরে-ধীরে এসে পড়ে আমাদের চোখের সামনে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই কাজটি বড়ো নিপুণভাবেই করতেন বলে মনে হয়। এখানে সাজানোর ভেতরে রয়েছে সচেতন সাসপেন্স তৈরির জাম্প কাট। যেন ছায়াছবির দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। একইভাবে, ছোটো থেকে আরও ছোটো কবিতায়, সমসাময়িক অনেকের লেখাতেও দেখব, একইভাবে কত সূক্ষ্ম ছবিকাজ। যেমন, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, সাজিয়ে তোলেন তাঁর লেখাকে, ওই ভাঙা লাইন, টুকরো হয়ে আসা বাক্যবন্ধ, একটু ঝুলে-থাকা একটা শব্দ, এগুলো দিয়ে।

দিন ফুরিয়ে এলে, আবার চৈত্রের কথা বলি।
আহার, মৈথুন, নিদ্রা, ভয়, যে যার নিয়মমতো
বাড়ে, সম্ভাবনা দেয় সংসারে রান্নাঘরটুকু ছাড়া
কিছু রইবে না...
দিন ফুরিয়ে এলে, আবার চৈত্রের কথা বলি।
রাত ফুরোলেও বলি, 'বসন্তকোকিল এসেছিল!'

একটি ফিকে-হয়ে-আসা গান, তারপর যতদিন প্রাণ
থাকছে তবু, ঘুলঘুলিপথে আলো দেবে

(*এবং রাজেশ্বরী দত্ত*)

এখানে 'কিছু রইবে না...'-টুকু কেমন একলা-একলা। শূন্যতার ভেতর চোবানো। একটু আলাদা করা সমস্ত কবিতার গঠন থেকে। একটু অসংলগ্ন।

২

পাবলো পিকাসোর বান্ধবী ফ্রাঁসোয়া গিলে বলেছিলেন, পিকাসো তাঁকে মাঝে-মাঝে শুধু দু-তিনটে জিনিস ধরিয়ে দিতেন, আপাত তুচ্ছ, যথা সিগারেটের র‍্যাপার, পোড়া দেশলাই কাঠি, একটা ক্লিপ। এমনই। বলতেন, এগুলো সাজিয়ে দেখাও। একটা কম্পোজিশন তৈরি হয়ে ওঠে কিনা।

যদি অল্প এলিমেন্ট বা উপাদান দিয়েই কাজ করতে না শেখেন শিল্পী, কী করেই বা পারবেন অনেক উপাদান নিয়ে কাজ করতে? পারবেন না-ই তো! তাই তো এত ভিড় শব্দের, এত অসুন্দর, এত অপ্রয়োজনীয় ছবির নানারকম লাফালাফি আমাদের চোখের ওপর। আমাদের রূপচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা পরিশ্রম করে না। যেভাবে শিল্পীর করে, চিত্রশিল্পী বা ভাস্করের।

আর, যদি মেনে নিই, কবিতা, এই শিল্পটিও ওইসব শিল্পের মতোই, খুবই সচেতন; তাহলে জরুরি হয়ে পড়ে এই বীক্ষণ, যা কখনো দর্শনও। কাজটি অবচেতন বা অর্ধ-সচেতনও হয়তো-বা, কেননা, লিখতে-লিখতেই কবির সত্তা তাঁর নিজের খেলাটি খেলতেই থাকেন এভাবে, প্রতিটি শব্দের সংকলন বা চয়নের পাশাপাশি, কীভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে এক-একটি শব্দ, সেটিও চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি শব্দ বসানোর অন্বয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই।

প্রাচীন কালে সংস্কৃত সাহিত্যে অন্বয়ের মূল্য ছিল অপরিসীম। নানা ধরনের শব্দ-খেলা গড়ে উঠত শ্লোকে বা কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে। সংস্কৃতের সুবিধে হল, অন্বয়ের হেরফেরে মানে পালটায় না। মানে, সংস্কৃতে 'আমি ভাত খাই', 'ভাত আমি খাই', 'খাই আমি ভাত', 'তুমি আমাকে বই দাও', 'দাও আমাকে বই তুমি', 'বই আমাকে তুমি দাও' — এই বাক্যগুলির সবের অর্থ এক এবং অদ্বিতীয়। তাহলে অন্বয় কেন? অন্বয়ের তারতম্য শিল্পসুষমার জন্য। ছন্দের রীতি-নীতি বা কনস্ট্রেন্ট মানবার জন্য। সুতরাং, মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা হবে না শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে, তার ওপর নির্ভর করত অন্বয়।

আধুনিক বাংলা কবিতার যেগুলি মাত্রাবৃত্তে লেখা, সেগুলির ভেতরে ছন্দের প্রয়োজনে শ্বাসাঘাত, স্পন্দ, যতির সূক্ষ্মতার দাবি থেকেই গেছে। কিন্তু মুক্ত ছন্দ বা গদ্য ছন্দের মধ্যে, আসল নির্ভরতা, অনেকটাই শ্বাসের অবধারিত যতি এবং অর্থের প্রয়োগে নাটকীয়তা আনার ওপর। তারাপদ রায়ের কবিতা, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, উৎপলকুমার বসুর কবিতায় এই কাজগুলো আমরা খুব সহজেই দেখতে পাই।

আমার নিজের কবিতায় আসি। এক বা একাধিক নির্মাণের ফর্মে আমার লেখা হয়েছে বা হয়ে থাকে। মাত্রাবৃত্ত অল্প লিখি, বেশি লিখি অক্ষরবৃত্ত, সেখানে বলবার বেগ, শ্বাসের অবধারিত কাঙ্ক্ষিত যতি, এসব কাজ করে, কোথায় ভাঙা পড়বে একটি লাইন। জীবনানন্দীয় কবিতার উত্তরসূরি হিসেবে, কবিতায় প্রায়শ গড়ে উঠেছে এই বিশেষভাবে দীর্ঘ লাইনগুলি, যেগুলো অনেক সময় আমরা মাঝখান থেকে ভেঙে ঝুলন্ত লাইন হিসেবে রাখি। ভেবে দেখলে চিত্ররূপায়ণে একটা কোথাও সাসপেন্স কাজ করেই থাকে এ-জাতীয় কাজে।

ঊর্ধ্বশ্বাস গতিতে ধাবমান, অতিনাটকীয় কবিতা করার জন্য, একাধিক কবিতায় 'রান-অন' বা গদ্য ফর্ম ব্যবহার করেছি। মুক্ত ছন্দে লেখার সময়ে পঙ্‌ক্তি ভেঙেছি অর্ধ-চেতন বোধ থেকেই। খুব সচেতনে নয়।

উলটোদিকের ভ্রম

শ্রীজাত

কেমন দেখতে হবে একজন কবিতা, সে নিয়ে যেকোনো কবিরই ভাবনা থাকে বই কী। লেখার গতিকে খুব যে চালনা করে সে ভাবনা, এমনটা হয়তো নয়, কিন্তু আড়ালে-আবডালে কবিতার চেহারা নিয়ে একটা আগ্রহ, একটা কৌতূহল থাকেই, যখন কিনা সেই কবিতা লেখা হয়ে চলেছে।

এ এক আজব রাস্তা, এই কবিতা লেখা। অজানাকে অনুসরণ করে এতগুলো বছর যে হেঁটে আসা যায়, কবিতা লেখার চেষ্টা না করলে তা জানাই হত না আমার। যখন একটা লাইন ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়, আবছা টের পাচ্ছি, এই লাইন একা নয়, সে আসছে মিছিল নিয়ে, তখনই বোধ হয় কবিতাকে দেখতে পাবার, লিখে ফেলবার একটা তাগিদ শুরু হতে থাকে ভেতরে। আসলে তো নিজে দেখব বলে, আর দশজনকে দেখাব বলেই তাকে শরীরের আকার দেওয়া। নইলে মনে তৈরি হয়ে মনেই মিলিয়ে গেলে তো ক্ষতি ছিল না বিশেষ, তাই না? আর এইখানেই এসে পড়ে সেই প্রশ্ন, কেমন দেখতে হবে আমার কবিতা?

সত্যি বলতে কী, যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে একজন কবিতাকে লিখে ফেলা, ততক্ষণ তার চেহারা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা বেশ কঠিন। কারণ ওই যে, অজানাকে অনুসরণ। একটা লাইন, তারপর আরও কিছু লাইন যখন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে আমায়, আস্তে-আস্তে খাতার পাতায় লেখা হচ্ছে কবিতার মতো

কিছু-একটা, তখনও তো আমি জানি না, এই রাস্তার শেষে ঠিক কী অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। এই ভাবনার বোঝাপড়া নিয়ে আমি কোনদিকে চলেছি, তা হয়তো আমার জানা। কিন্তু কোথায় গিয়ে শেষ দেখছি এর, সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বোঝার উপায় নেই। কবিতা তাই সব সময়ই টানটান জুয়া। যার নেশায় বার বার ফিরে যেতে হয় তারই কাছে। তাই এর মধ্যে ঝুঁকি আর রোমাঞ্চের একটা মধুর মিশেল রয়েছে বলা যেতে পারে।

আজকাল একটা ব্যাপার বেশ হয় ছেলে-মেয়েদের, হয়তো দু-জন ছদ্মনামে আছেন ফেসবুকে, চ্যাট হচ্ছে রীতিমতো, ভালো লাগা আর মতের মিলও তৈরি হচ্ছে। আর শেষমেশ তৈরি হচ্ছে একে অপরকে দেখতে পাবার অদম্য ইচ্ছে। ঠিক হচ্ছে একটা তারিখ, যে যার জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়ছেন রঁদেভ্যু-তে পৌঁছোবেন বলে। এই পৌঁছোনোর পথটুকু দু-জনের বুকের ভেতরেই একটা ধুকপুকুনি হয়। অন্যদিক থেকে দৌড়ে আসা মানুষটার নাম আমি জানি, ভাবনা জানি, পছন্দও জানি। কেবল তার চেহারা জানি না। জানি না সে তাকালে কেমন লাগে, রেগে গেলেই বা কেমন দেখায় তাকে। নিশ্চয়ই ভারী ভালো দেখতে তাকে। হতেই হবে। আর যদি না হয়? যদি ভালো লাগার মতো না-ই হয় তার মুখ চোখ হাত পা? তখন কী হবে? এতদিনকার কথোপকথন আর ভালো লাগার টান মিথ্যে হয়ে যাবে না নিশ্চয়ই! এমনটাই তো ভাবেন দু-দিক থেকে ছুটে আসা দু-জন মানুষ?

একজন কবিতালেখকও কবিতা লেখার গোটা সময়ের অনেকখানি এইরকমটা ভাবেন। যাকে তিনি লিখছেন, সেই কবিতার বক্তব্য, ছন্দ, ভাবনা, ভঙ্গি... সব তাঁর নখদর্পণে। কেবল অবয়বটুকু অজানা। শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাকে জানার কোনো উপায় নেই। থাকে না।

কবিতা যে কতরকম দেখতে হয় এবং হতে পারে, সে হিসেব কষতে যাওয়া নেহাত বোকামি হবে। এত-এত রকমের কবিতা লেখা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে, সম্ভাব্য সমস্তরকম চেহারাই বোধ হয় একাধিক বার পড়ে নিয়েছে কবিতার মুখ। কিন্তু তাতে তার রোমাঞ্চ কম হয়ে যায়নি এতটুকু, হারিয়ে যায়নি জুয়ার নির্মম ঝুঁকির পিছুটান। আজও নতুন কোনো কবিতা লিখতে বসে, শেষমেশ তার হিজাব সরিয়ে মুখটা দেখে ফেলার জোর তাগিদ চলতে থাকে মনে-মনে। চেহারা দেখবার সেই পুরস্কার পাবার লোভেই লিখে ফেলতে হয় আরও একটা কবিতা যেন।

আমি সামান্য দিন লেখালেখি করছি, বেশি রাস্তায় আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি তেমন। নিজের ভাষার খোঁজেই দিন কেটে যায় আজও, চেহারার প্রশ্ন তো তার অনেক পরে আসে। ফলে, কবিতার চেহারা নিয়ে কৌতূহল থাকলেও, ভাবনা, বক্তব্য বা ভাষার চেয়ে তাকে বেশি নম্বর দিয়ে উঠতে পারিনি এখনও।

তবে হ্যাঁ, এ-কথা এখন বুঝতে পারি, এই বছর কুড়ি-পঁচিশ ধরে কবিতা লিখে চলবার চেষ্টায় যা লিখেছি, তা একেক সময়ে একেকরকম দেখতে হয়ে উঠেছে। কখনো খুব সুগঠিত, রীতি-রেওয়াজ মানা, রেজিমেন্টেড চেহারা। আবার কখনো সমস্ত আচরণবিধি ভেঙে বেরিয়ে আসা পুরোপুরি অদেখা এক অবয়ব। *অনুভব করেছি তাই বলছি* কাব্যগ্রন্থের কবিতাদের যখন লিখছিলাম, বুঝতে পারছিলাম, কবিতার চেনা চেহারাদের সঙ্গে এদের মুখের কোনো মিল নেই। একেকটা লেখা শেষ হবার পর তাদের আকৃতি দেখে ভয়ও যে পাইনি, তা নয়। কিন্তু ভয় তো জীবন-বহির্ভূত কোনো আবেগ নয়, তাকেও তাই সম্মান জানাতে হয়। আবার সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ, *অন্ধকার লেখাগুচ্ছ*-এর কবিতারা যখন প্রায় প্রতিদিনই লেখা হচ্ছিল, আমি জানতাম, কেমন দেখতে হবে তারা। পয়ার ছন্দে লেখা চতুর্দশপদীর চেহারা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এই একইরকম থাকবে। এইভাবেই, নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, চলেওছি। নতুন-নতুন অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করবার লোভ কে-ই বা এড়াতে চায়।

তবে এখানে একটা কথা না বললে ঠিক কাজ হবে না। যখন কবিতার পাতা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থেকেছি, তখন আবার কবিতার চেহারা নিয়ে অন্যভাবে ভাবার প্রয়োজন ও সুযোগ এসেছে। কবিতা পাতায় যাবে কি যাবে না, সেই পর্বের বাছাই শেষ হয়ে গেলে আসে ইলাস্ট্রেশনের পালা। আসছে সংখ্যার নির্ধারিত কবিতাদের যখন শিল্পীবন্ধুর হাতে তুলে দিই, তখন তিনি তাদের যথাসম্ভব জায়গা করে দিয়ে পাতাটাকে সাজিয়ে তোলেন নিখুঁতভাবে। তারপর সেইসব কবিতারা যখন পাতায় ঝলমল করে ওঠে, তাদের দেখে অন্যরকম এক প্রাপ্তির আনন্দ হয়, যা নাকি নিজে কবিতা লিখে ফেলবার চেয়ে একেবারে আলাদা। এদের সকলের চেহারা তো আমার গোড়া থেকেই জানা, কিন্তু পাতায় সেজে উঠে তাদের কী যে অন্যরকম দেখায়! বাড়ির ছোটো মেয়ে হুট করে একদিন শাড়ি পরে ফেললে সকলে যেমন অবাক মুগ্ধতা পায়, এ-ও ঠিক তেমনই।

তবে আজ মনে হয়, আমরা উলটোদিকের একটা ভ্রম নিয়ে সুখে থাকি। সেই ভ্রম হল এই যে, আমরাই কবিতা লিখছি, আর কবিতা আমাদের ভাবনায় লিখিত হচ্ছে। এখন বুঝি, এর বিপরীতটিই সত্যি। অনেক-অনেক কবিতার মধ্যে দিয়ে আসলে আমাদেরই চেহারা আঁকা হচ্ছে কোথাও। আরও কিছুদিন যদি লিখতে পারি, সেই চেহারা আরও তৈরি হবে। তারপর, আমার কলম থেমে যাওয়ার পর, আমার সমস্ত কবিতা জড়ো করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকালে আমার একখানা চেহারা হয়তো পাওয়া যাবে, যা কবিতা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। তাই কবিতা কেমন দেখতে হবে, এ-প্রশ্ন আমাকে না করে, আমি কেমন দেখতে হব, এই প্রশ্ন কবিতাকে করাই শ্রেয়।

যেমন তার মন চাইবে

রাজদীপ রায়

কেমন দেখতে হবে কবিতাকে? তীক্ষ্ণ-ছিপছিপে? না ঈষৎ পৃথুলা, চওড়া কাঁধে ভর করে দাঁড়াবে একপাশে? কোন-কোন চিহ্নের সমষ্টি অলংকার হয়ে দাঁড়াবে তার শরীরে, না কি সে হবে নিরাভরণ — এসব নেহাতই দেখতে চাওয়ার বিষয়। দৃশ্যত কবিতাকে কীভাবে দেখতে ভালো লাগবে আমার? কী হবে সেই আদর্শ দৃশ্যরূপ? একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কবিতাটি লেখা এবং পড়ার ক্ষেত্রে। হয়তো বিষয়টি মুখ্য না হয়ে গৌণ হয়ে যায় পাঠপ্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু লেখা, পড়া — এই দুই প্রক্রিয়া ঘটে যাওয়ার পর যদি মূল লেখাটির সঙ্গে একটু দূরত্ব স্থাপন করে ভাবা যায় এই কথা — এভাবে লিখলাম কেন? তাহলে প্রশ্নটি উপরিতল থেকে ক্রমশ নেমে পড়ে ভেতরে। এভাবে লিখলাম, কেননা এভাবে না লিখে উপায় ছিল না — উত্তরটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমনই হয়ে থাকে। আর উত্তরের স্বপক্ষে থাকে লেখার কনটেন্ট। এবং কনটেন্ট অনুযায়ী দৃশ্যরূপ। ফলে দৃশ্যরূপটি কিছুতেই মুখ্যতার জায়গায় আসবে না। তাহলে কবিতার দৃশ্যরূপের কি কোনো মূল্যই নেই? যখন কবি একটি কবিতা লেখেন, তখন তিনি যেভাবে তার কবিতা বিন্যস্ত করেন, তার মধ্যে তো তার ব্যক্তিগত অভিলক্ষ্যটি নির্ধারিত থাকে। আমার কোথাও মনে হয়, কবিতার দৃশ্যরূপ নির্মাণে সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টি করে ঐতিহ্য। আমরা প্রত্যেকেই আগে কবিতা পড়ি, তার পরে কোনো একদিন লিখি। সে-কারণে, কবিতা কাকে বলে, তার গঠন কেমন (হয়ে থাকে), ঠিক কোন-কোন ভাষাপ্রয়োগের মাধ্যমে কবিতা হয়ে ওঠে — এই টেকনিক্যাল দিকগুলি মনে গেঁথে যায়। তারপর লিখতে গেলে অল্পবয়স থেকে যত পাঠ গেঁথে আসে মাথায়, সেসবের ঐতিহ্য প্রভাব ফেলে। আমার ক্ষেত্রে যেমন কবিতার লাইনগুলি একটু ওয়াইড হয়, ছড়িয়ে পড়ে। কবিতা কীভাবে তার বিন্যাসের আশ্রয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তার দৃষ্টান্ত সর্বপ্রথম পাই জীবনানন্দে। স্কুলে পড়া 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' আমাকে বিস্তারের ধারণা দেয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই গঠনগত বিস্তার ছিল, কিন্তু জীবনানন্দীয় মন্থরতা ছিল না। এই যে খেয়ে-খেয়ে কথা বলা, ঢোঁক গিলে কথা বলা, আমার বলার ইচ্ছে ষোলো আনা, বলতে পারছি না। ফলে এক ধরনের ব্যাকুলতা, কষ্ট এসব প্রায়শই উঠে এসেছে আমার একেবারে প্রথম দিকের লেখায়। লিখতে-লিখতে ক্রমশ বুঝেছি, কথা বলার ছন্দই আমার

ঘনিষ্ঠ ছন্দ। কখনো নিজের কথা বলতে চেয়েছি, কখনো বলেছি অন্যের কথা, অন্য কিছুর কথা, তখন নিজে সরে গেছি। প্রথমটির ক্ষেত্রে কবিতার গঠন হয়েছে ঈষৎ এলোমেলো, অগোছালো। ছন্দ নিশ্চয়ই মিশ্রবৃত্ত। তবে কোথাও-কোথাও লজ্জাবনত এক-দু-মাত্রা চুরি করেছে, বা ঘুস খাইয়েছে। এই আমি যখন নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কবিতা লিখতে চেয়েছি, তখন আবার পঙ্‌ক্তিগুলি তত ছড়িয়ে পড়েনি। আঁটোসাঁটো হয়েছে। লক্ষ করেছি, প্রথমটির ক্ষেত্রে গড় মাত্রা আঠারো, কুড়ি থেকে ছাব্বিশ-আঠাশ। যেখানে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আট-দশ কি চোদ্দো। তবে দু-মাত্রা, চার মাত্রার কোনো পঙ্‌ক্তি আমার লেখায় প্রায় দেখা যায় না। কেননা একটি বা দু-টি শব্দকে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে উত্তীর্ণ করতে গেলে যে দক্ষতা ও শক্তি প্রয়োজন, তা আমার নেই। দু-তরফের উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্বচ্ছ হবে —

দৃষ্টান্ত ১।

সমস্ত আকাশ আজ সাধক হয়েছে অনায়াসে।
বিকেলের নৌকো নিয়ে সেই দিকে, ভাসিয়ে দিয়েছি
আমার চোখের কাটা মণি। ভেতর এখন ফাঁপা
হাওয়া চলাচল করছে, প্রজাপতি দু-একটা আবেগে
দিক ভুল করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে, আগুনে-তারায়

দৃষ্টান্ত ২।

প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর, রাস্তার কাদায়
চাপ চাপ রক্ত ভেসে থাকে

হারানো শৈশব ভেবে, তাকে কুড়িয়ে নি...

দৃষ্টান্ত ৩।

যেভাবে আঁতুড় হলে শস্যকায় শরীরের ঝাঁপ
ঊষর মাটির কাছে আত্মহত্যা করে
খুলে রাখে জন্ম
খুলে দেয় বীজের ফাটল...

তুমি সেইসব শূন্য কোটরের কাছে
দাঁড়াও এখনো

যেন মাতৃত্বের কোনো উৎসর্গ নেই
পূর্ণচ্ছেদ নেই কোনো।

দৃষ্টান্ত তিনটিতে চোখ রাখলে যে বিষয়গুলি চোখে পড়ে, তা হল : প্রথাবদ্ধ অক্ষরবৃত্তে লেখার প্রবণতা, তবে যতিপাত প্রথাবদ্ধ নয়। মাত্রার চলনটা এক রেখে যতির চলনটা মুছে দেওয়া অনেকক্ষেত্রেই কবিতার আঁটো বন্ধনের মধ্যে বাতাস আনতে পারে, অবশ্যই দৃশ্যরূপের দিক থেকে এটা বোঝা যাবে না, বোঝা যাবে লেখাটি পড়লে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রথম পঙ্‌ক্তিটি অনায়াসেই চেষ্টা-চরিত্র করে পুরোপুরি আঠারো মাত্রার করা যেতে পারত, কিন্তু দু-মাত্রা শর্ট রইল। রইল তো, রইল! এর ফলে কবিতার মূল কনটেন্টে সমস্যা হয়নি, বরং দু-মাত্রার অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ছে বার বার, আর মনে হচ্ছে, এরপরে আরও কিছু ছিল, কিন্তু নেই। এমনও হতে পারত, পরের পঙ্‌ক্তি থেকে একটি 'চাপ' আমি তুলে নিলাম 'কাদায়'-এর পাশে, তাহলে ওই দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত না, পঙ্‌ক্তিটি একটু ঠেলে ডানদিকে পাঠিয়ে দিলেই আগের পঙ্‌ক্তিটির কনটিনিউয়েশন বোঝাত। টেকনিক্যালি কারেক্ট হত। হায়, কিছুই হল না! তাই প্রথম পঙ্‌ক্তি অসম্পূর্ণ রইল, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি, যার প্রথম পঙ্‌ক্তির কনটিনিউয়েশন হবার কথা ছিল, পেয়ে গেল স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তির মর্যাদা! এই যে আঙ্গিকগত বিভ্রান্তি, কখনো-কখনো কবিতার একটি ব্যাকওয়ার্ড ডোরের মতো হয়ে উঠতে পারে। পটু হাতে এই আঙ্গিক সচেতনভাবে ভাঙা হয়েছে, না কি কোনো ছন্দজ্ঞান কিংবা বাক্যগঠনবোধ না থাকার জন্য এই বিপর্যয় ঘটল, তা সচেতন পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। অবশ্য এ-নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। লেখক ভাবতেই পারেন, তিনি এমনটা ঘটিয়ে বিশাল এক কাণ্ড করেছেন। যার পাঠক আবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলে উঠতে পারেন এমন কথা : না হে, ব্যাপারটা ঠিক জমল না। শূন্য এবং তার পরবর্তী সময়ে অবশ্য ব্যক্তিমতটাই জরুরি, তাই কোনো ব্যক্তিমতই আবার জরুরি নয়। তৃতীয় দৃষ্টান্তে আমার নিজের কথা বললেও এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন রামপ্রসাদ এবং তার কবিজীবন। তিনি সাধক, কিন্তু সে-সাধনা তো আসলে কবিতার। এ-কবিতার দৃশ্যরূপের বৈচিত্র্য হচ্ছে, একটি আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তির সূত্রে পাচ্ছি ছ-মাত্রা, দশ মাত্রা, চোদ্দো মাত্রা, আট মাত্রার পঙ্‌ক্তি। ঝাঁপটি দিতে হলে খাদের ধারে যেতে হবে, তেমনি ওই পঙ্‌ক্তিটি আসলে খাদের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেমন দাঁড়িয়ে রয়েছেন রামপ্রসাদ, আর তার হাত ধরে হয়তো এই আমি।

কবিতার দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে আমার নিজের লেখায় আর একটি প্রবণতা লক্ষ করে থাকি। তা হল যতিচিহ্নের যথাসম্ভব বর্জন। লেখাকে আমি যতিচিহ্ন থেকে মুক্ত দেখতে চাই, এটা আমার একটি উপায়, পাঠকের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করবার। এতে একটি কবিতার একাধিক পাঠ তৈরি হতে পারে, পুরো লেখাটির না হলেও কখনো শুধু একটি স্তবক, শুধু একটি পঙ্‌ক্তি কিংবা শুধু একটি শব্দ ফ্লেক্সিবল বা নমনীয় যতিপাতের মাধ্যমে একাধিক সংকেতে তার ছায়াপথ বিস্তৃত করতে পারে। যেখানে যতিচিহ্ন প্রত্যাশিত, অর্থাৎ দাঁড়ি, কমা, ড্যাশ অথবা অন্য কিছু, সেখানে দু-ধরনের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে পারে। যেখানে 'কমা' চিহ্নের জন্য আমার পাঠকমন প্রস্তুত, সেখানে দেখলাম 'ড্যাশ' চিহ্ন ব্যবহার করলেন লেখক। পাঠকের ধারণাকে হন্ট করলেন তিনি, পাঠক একটু থামলেন, আবার এগিয়ে গেলেন লেখকের সূত্র ধরে। আর অন্য ক্ষেত্রে এমন হতে পারে, চিহ্নের দ্বারা লেখক তার প্রবণতা বোঝাতে চাইলেন না কিংবা পাঠকের প্রবণতাকে প্রভাবিত করতে চাইলেন না। বরং তিনি ছেড়ে দিলেন পাঠকের কাছে। যদিও যতিচিহ্ন ব্যবহার কখনোই সবসময় দৃশ্যায়নের কথা ভেবে হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যতিচিহ্ন কোনো-না-কোনো গূঢ় অভিমুখকে নির্দেশিত করে। তবুও, পাঠক যখন চিহ্নবিহীন কোনো পঙ্‌ক্তি, কোনো স্তবক বা কোনো আস্ত কবিতা দেখবেন, তখন তার মনে ভিন্নতর অনুভূতি হতে বাধ্য। চিহ্ন নেই মানে এই তো নয় যে, লেখক বলছেন, কবিতাটি যতিচিহ্নবিহীনভাবে পড়ো। পড়বার সময় তো ভাবযতি পড়বেই। সতর্ক পাঠক মাত্রেই সেই উপযুক্ত ভাবযতিটি খুঁজে নেন ওই চিহ্নহীন পঙ্‌ক্তির মধ্যে। এইভাবে চিহ্ন না থেকেও আপাত ফুরফুরে কবিতাশরীরের আত্মায় চিহ্ন থেকে যায়। কিন্তু তার শরীরে কোথাও সেই চিহ্নের দাগ লাগে না।

লেখার সঙ্গে কোথায় লিখছি, সে ব্যাপারটাও উপেক্ষণীয় নয়। সাদা পাতা! উন্মুক্ত — স্বাধীন — বেপরোয়া! যেন দিকশূন্য সমুদ্র, সেই সমুদ্রেই ভালো ফুটে ওঠে — কালো অক্ষর, নীল বা অন্য কিছু নয়, কুচকুচে কালো কালি ছাড়া আসেই না লেখা। ধবধবে সাদা পাতার সঙ্গে কালো কালির অবিরাম রতিক্রীড়াই আমার একটি মৌলিক রচনার মূল বীজমন্ত্র। এভাবেই লিখে এসেছি এতদিন। তবে সদ্য লাইন-টানা ডায়েরিতে লিখতে গিয়ে দেখছি, পাতার কারণেও কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়েছে লেখার। যে-লাইনগুলিকে জেলখানার গরাদ মনে হত, এখন সেগুলিই হয়ে গেছে জানলার। নীল অক্ষরের স্বাদ পাইনি এখনও; কী গদ্য কী কবিতা, কালো-সাদার রেট্রো যুগেই পড়ে থাকে আমার প্রমিতি। সাদা পাতা থেকে যখন প্রথম লাইন-টানা পাতায় লিখতে শুরু করলাম, সব থেকে যে পরিবর্তন হল সেটা এই — লেখার বিশেষ একটা আকার তৈরি হল। আকার মানে মাত্রা-মাপা পঙ্‌ক্তির কথা বলছি না শুধু, মাত্রা মেপে লিখেছি, লিখেছি না-মেপেও। তবে মুক্তকে লিখলেও সাদা পাতায় লেখাগুলি যেভাবে এলিয়ে পড়ত, লাইন-টানায় সে নিজের শরীরটা একটু আঁটোসাঁটো করে নিল, এমনকী গদ্যে লেখা সত্ত্বেও। কিছুতেই আর তারা লাইনের বাইরে যাবে না! যেমন একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি এসেছিল : 'তোমার এখন খিদে নেই, সমস্ত জরুল গেছে ঢেকে মেখে ঢেউ' — লেখা হয়েছিল অনায়াসে — সাদা পাতার বিস্তারে, অথচ ডায়েরির পাতায় লেখা হল —

যে যন্ত্রণা না বলতে শেখায়
তার কাছে তুমি জন্ম থেকেই নতজানু

স্বাভাবিকভাবেই পঙ্‌ক্তি দু-টি আলাদা হল। প্রথম পঙ্‌ক্তিটি চব্বিশ মাত্রার। অসম্পূর্ণ অক্ষরবৃত্ত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রথম পঙ্‌ক্তি দশ মাত্রা + দ্বিতীয় চোদ্দো,

অতএব চব্বিশ। কিন্তু ঠিক পাতার জন্য যে দ্বিতীয় লাইনটি জন্মাল, তা নয়। একটা বিরতি, থামা, একটু জল খেয়ে নিয়ে বাকি কথাটা বলা হয়ে গেল। আকারে বেশ ছোটো কবিতা লেখার প্রবণতা মাঝে-মাঝে গ্রাস করে। একবার জয় গোস্বামী আমার এমনই একটি লেখার দৃশ্যায়ন নিয়ে উল্লেখ করেছিলেন *রোববার*-এর পাতায়, শেষ *গোঁসাইবাগান* ছিল সেটি। এই সেই লেখা, যে-লেখা কম্পোজ হতে যাবার সময়, যিনি কম্পোজ করছিলেন, এই *বোধশব্দ*-রই কম্পোজিটর শৈবাল ঘোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন : সব লেখাগুলো কেন এমন হল না!

কবিতাটা নাম-সহ তুলে দিলাম, বেশি জায়গা নেবে না!

কৃষি

রোদে
চুল শুকিয়ে নিচ্ছে
মা

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কেন 'রোদে' শব্দটিকে একটু ঠেলে দিয়েছি, তার অসামান্য ব্যাখ্যা জয় দিয়েছেন, এরপর আমার আর বলার কিছু থাকে না। জয় লিখেছিলেন, 'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ কবিতাটি এইটুকুই। 'রোদে' শব্দটি দেখছি একটু ঠেলে রাখা, প্রথমে। শব্দটির দু'পাশেই ফাঁকা জায়গা। লাইনের স্বাভাবিক রেঞ্জ রাখলে দু'দিকে ফাঁকা জায়গা থাকত না। একদিকে থাকত। কিন্তু দু'দিকে ফাঁকা জায়গা রাখার ফলে দিগন্তজোড়া মাঠ খুলে গেল যেন। মাঠ রোদে ঝলমল করছে। যদিও মাঠ কথাটি কোথাও নেই কবিতায়। কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছি মাঠে ফসল তুলছে। অরুণ মিত্র যেমন তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন : 'এই আওয়াজ হয়ে যাবে এক মাঠ ধান' — সেইরকম 'এক মাঠ ধান' দেখতে পাচ্ছি আমিও। যদিও, এটাও বলে রাখি এই কবিতায় ধান কথাটিও কোথাও নেই। শুধু অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর ওপর নির্ভর করে লেখক এই দৃশ্যটি তৈরি করে দিয়েছেন। অবশ্য এই কবিতায় লেখকের আসল কাজ, যাকে বলে 'মাস্টার'স স্ট্রোক', তা রয়েছে কবিতার নামকরণে। শেষ শব্দটিও অতুলনীয়। কত অল্পে একটা কবিতা উত্তীর্ণ হয়ে যায় এ-লেখা তারই অসামান্য উদাহরণ। ভূমি তো মা। ফসলও মা। এ কথাও আমরা আগে পড়েছি। কিন্তু এমন নতুনভাবে পড়িনি।' আমার শুধু এটুকুই বলার, আপাতভাবে পঙ্‌ক্তি হিসেবে যা পাচ্ছি আমরা, আলাদাভাবে সেটি কবিতা হয়ে উঠতেই পারে না। 'রোদে চুল শুকিয়ে নিচ্ছে মা' — এটা ইমেজ, আর ইমেজ কবিতা নয়। তাহলে কীভাবে এটি আমার কাছে, বা আর কারো কাছে কবিতা হয়ে উঠল? সম্পূর্ণত কবিতাটির বিন্যাসে এবং নামকরণে। এই কবিতাটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাঠ করলে, যখন পাঠক শ্রোতা মাত্র, তখন সেভাবে কখনোই অভিঘাত তৈরি করবে না। অভিঘাত তৈরি করতে গেলে তাকে দেখতে হবে কবিতাটি। তার বিন্যাস বলে দেবে, তার শরীরে কোথাও কবিতার আত্মা আছে কি না। এর পাশাপাশি, ওই যে বললাম, লাইনটি আলাদা করে কবিতাই নয় — বললাম আমার খুব কাছের এক স্যার, তাঁর কথার সূত্র ধরে। বইটি পড়ে, মোবাইলে তিনি এই কবিতাটি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, 'আচ্ছা, *কৃষি*-কে কেন কবিতা বলব, বলো তো?' আমি তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর আমি দিইনি, দিতে চাইনি।

কবিতা ছাপার সময়েও একটা দৃশ্যায়নের ম্যাজিক তৈরি করে। আমার এমন অনেক বন্ধু আছে, যারা তার কবিতাটি ডান দিকের পাতার ওপর দিকে দেখতে ভালোবাসে। নীচের দিকে, খুব কোণের দিকে ছাপা হোক — এমনটা তারা চায় না। এটাও একটি মনস্তত্ত্ব। আমার এ-বিষয়ে ব্যক্তিগত কোনো অভিরুচি নেই, তবে যদি কবিতা ছাপার জন্য এ-পাতায় কিছুটা, পাশের পাতায় কিছুটা চলে যায়, একটু দুঃখ হয় বই কী! আরও বেশি দুঃখ হয়, যখন ছাপার কারণে একটি কবিতার বিন্যাসটাই বদলে যায়। কী কারণে বদলে গেল বিন্যাস? হয়তো মূল্যবান বিজ্ঞাপনকে জায়গা দিতে কিংবা সম্পূর্ণ বিনা কারণে! কবিতাকে কত পয়েন্ট সাইজের ফন্টে দেখব — সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে — সাধারণত দশ থেকে তেরো-চোদ্দো — এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে ফন্টের মাপ। আমার প্রথম বইটি সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন, বইটি বয়স্ক মানুষের পড়তে অসুবিধে হবে, কারণ বইটির ফন্ট-সাইজ এগারো। তবে বইটির আকৃতিও সাধারণ কবিতার বই যেমন হয়, তেমন ছিল না, এবং ফন্টগুলি স্বাভাবিকভাবেই যেন লজ্জায় একটু কুঁকড়ে গিয়েছিল। পরের বইটিতে অবশ্য লজ্জা ভেঙেছে, একটু-একটু করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, এগারো পা রেখেছে বারোয়। তবে কবিতার দৃশ্যায়নের যে দর্শন যে অভিব্যক্তি শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়, তা কোনোভাবেই কবিতার কাঠামোর জন্য একা দায়ী নয়। কবিতাকে কেমন দেখতে হবে? কেমন আবার — যেমন তার মন চাইবে। যেমন তার অস্থিমজ্জার আড়ালে অন্তর্বাহিত রক্তের ভেতর অনুভূতিগুলি নেচে উঠবে — ঠিক তেমনই দেখতে হবে তাকে।

কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা

অভিমন্যু মাহাত

কবিতা আসলে কিছুই না।

আমরা সকলেই মোরল্লেস কবিতা লিখি। আমরা একটা ছন্দবদ্ধ কাজ করি সকাল থেকে সন্ধে, সেটাও এক ধরনের কবিতা। আমরা কবিতা লিখিয়েরা যেটা করি, তাকে বর্ণ বা অক্ষরে প্রকাশ করা হয়। আমরা দু-জন মানুষের মধ্যে যে কথা বলি, সেখানেও কবিতার ছন্দ দেখা যায়। (হে পাঠক, প্লিজ, ছন্দ মানে অন্ত্যমিল বা অক্ষরবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত বুঝবেন না!) দা'ঠাকুর একটা মাত্র বর্ণ দিয়ে কবিতা লিখে গিয়েছেন... 'ঝি! কি? ঘি। দি —', নিশ্চয়ই মনে আছে। ঝি, কি, ঘি... কতকগুলো ধ্বনির সমাহার। কারো নাম ধরে ডাকা হলে, উত্তর আসে : কী? প্রশ্নকর্তা আবার বলেন : ঘি। আমি ডাকলাম : মা...। মা উত্তর দেয় : কী? আমি বললাম : জল। মা বুঝল, জল দিতে হবে। আমি বললাম : ঘি। মা উত্তর দিল : দি। মানে, দিচ্ছি।

আমাদের সমস্ত কথাই কবিতা। আমাদের সমস্ত লেখাই কবিতা। কবিতার মধ্যে যে-ছন্দ পাওয়া যায়, সেই ছন্দ জীবনে আছে। সেই ছন্দ দু-জন মানুষের কথা বলার মধ্যে আছে। ছন্দ দু-জন মানুষের সম্পর্কের মধ্যে আছে। আমাদের যে পরিবার, সেটাও একটা ছন্দ। বাবা, মা, দাদা, বোন, দিদি, ভাই... আমি, তুমি... এটাও একটা ছন্দ। আমার কথা কেউ শুনছে, আমি বলছি... এর মধ্যেও ছন্দ আছে। এমনকী সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, সে-ও একটা ছন্দ। গান হচ্ছে, সে-ও ছন্দ। আমরা যখন সাইকেল চালাই, তখনও ছন্দ থাকে। প্রত্যেকটা ছন্দবদ্ধ ভাবনাই আসলে কবিতা। কবিতার মূল বিষয় শব্দের বাঁধুনি, তার মধ্যে থাকে ছন্দ, তার মধ্যে থাকে রূপ। তাতে জীবনের সবকিছুই বর্তমান। আমরা প্রতিটি মুহূর্তেই কবিতা লিখি। কেউ সেটা লিখে প্রকাশ করে, কেউ তার জীবনধারণের প্রক্রিয়ার মধ্যে, চলার পথের মধ্য দিয়েই রেখে দেয়।

আমরা কখনো-কখনো একলা আনমনে কবিতা আওড়াই। লিখেও ফেলি। কখনো সংকোচ হয়, এটা কি আদৌ কবিতা হল? এটা তো আনমনে লেখা... এটা কি লেখা হল? কিন্তু সবসময় তো তুলনার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নন, শঙ্খ ঘোষ নন। মূল্যায়নের জন্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নন। মূল্যায়ন করতে হবে, আমি লেখাটা লিখেছি। সেই লেখা কেমন করে মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে, মূল্যায়নের জন্য লেখার আর কী-কী পরিমার্জন জরুরি, কী-কী পরিবর্ধন জরুরি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোবেলা তো আমরা দেখিনি, উনি প্রথম যে-কবিতাটা লিখেছিলেন, সেটাই রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা হয়ে উঠেছিল, তেমনটা নিশ্চয়ই নয়। নজরুলের অনেক কবিতা, লেখারও সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে সমালোচনার মধ্য দিয়েই লেখা গড়ে ওঠে। সমালোচনার মধ্য দিয়ে কবিতা পরিমার্জিত হয়। 'আকার' পায়। হতবাক হওয়ার কিছু নেই, হতোদ্যম হওয়ারও কিছু নেই। জীবনে লেখাপড়া করা, সেটাও এক ধরনের ছন্দবদ্ধ কবিতা। তা জীবনের কবিতা। সে-কবিতা লিখে ফেলা হয় না। কোথাও ছাপা হয় না। কোথাও পুরস্কারের জন্য মনোনীতও হয় না। কিন্তু জীবন তাকে একরকম পুরস্কার দেয়ই।

ছবি আঁকার মধ্যেও কবিতা আছে। যা হয়, সেখান থেকে আসে কবিতা। যা হয় না, সেখান থেকে কবিতা আসে না। বাসের মাথায় কেউ পর্বত এঁকেছেন? পর্বতের মাথায় বাস এঁকেছেন? এমনটা কি হয়েছে? না। রোদের পর মেঘ জন্মে। মেঘের পর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পর রোদ ওঠে। এই ছন্দের মধ্যে কোনো বদল হয় না। সেই ভাবনাটাই কার্যকরী করতে হবে। সেই ভাবনাটাই জরুরি।

এতক্ষণ ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম!

তবে, কবিতার অবয়ব সম্পর্কে আমার ছোট্ট বক্তব্য হল এই যে, কবিতার অবয়ব যা-ই হোক, কবিতার বক্তব্যটাই আসল। কবিতার আত্মাটাই আসল। কবিতার বাইরেটা যে-পোশাক দিয়েই, যে-অলংকার দিয়েই সাজানো হোক না কেন, যদি তার মধ্যে প্রাণ না থাকে, যদি না তার মধ্যে আত্মা থাকে, সেটাকে আমি অন্তত কবিতা বলব না। কবিতার নতুন অবয়ব বলতে কি আমরা বুঝব কুঁড়ে ঘর গ্রামের মাঝে একটা অট্টালিকা? প্রাসাদোপম বাড়ি? যে-অট্টালিকা সুন্দর গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক গ্রামের মাঝে সেই অট্টালিকা বিসদৃশ ঠেকবে না? সেটা কি অগণতান্ত্রিক নয়?

চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, কিংবা মঙ্গলকাব্য — এইসব কবিতার মধ্যে আমরা কতটা অবয়বকে গুরুত্ব দিই? না কি অবয়বকে গুরুত্বই দিই না? আমার মতে, কবিতার গুণটাই আসল। অবয়ব অর্থহীন। কবি দেবদাস আচার্য কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, একদা কবিতা-সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয় একসঙ্গে ছিল। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে, আজ কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় পৃথক হয়েছে। প্রতিটি শিল্প এখন পৃথক-পৃথক পথে পরিচালিত। কবিতার অবয়বের ইতিহাস মেলে কি? প্রশ্ন জাগে।

আমি কুড়মালি ভাষায় কবিতা চর্চার সঙ্গেও যুক্ত। সেখানে কবিতার অবয়বের ভাবনাচিন্তা এখনও আসেনি। তাহলে কি বলব কুড়মালি কবিতা পিছিয়ে রয়েছে? অবয়ব কি মূল্যায়ন করবে কবিতা এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকার? আমার তো মনে হয়, না। একেবারেই না।

কবিতাটা থেকে আমি কী পাচ্ছি, সেটাই আমি নেব। সে-কবিতাটা যদি হেঁদি-পেঁচিও হয়, তাতে কিছু যায়-আসে না। আবার কোনো কবিতা যদি অবয়বে নুরজাহান হয়, অথচ সেই কবিতা থেকে কিস্যু পেলাম না, তার কোনো মানে হয় না! নুরজাহানসম দর্শনধারী কবিতাকেও ছুঁড়ে ফেলব।

কবিতা কেমন দেখায়...

সাঁঝবাতি

সেই মেয়ে আয়নাতে মুখ দ্যাখে না। সে যদি কবিতা লেখে, কী করে জানব কেমন দেখতে তাকে? হয়তো বিজার বা অদ্ভুত ধরনের কিছু-একটা, কলম থেকে যেভাবে আছড়ে পড়ে... এমব্যারাসিং! লোকে তাকায়। তাকায়, কারণ সে লোভনীয়, নাকি সক্কলের আলোচনার বিষয়বস্তু? আগে আমিও কবিতা ব্যাপারটাকে ভালো-চোখে দেখতাম। যখন দেখলাম দু-একটা চুল পেকে উঠছে, আর আয়নাই আমায় দেখতে চাইছে না, বুঝলাম, কবিতা আসলে খুব-একটা আরামের ব্যাপার নয়। কালিদাসের তন্বী নারীর মতো না, বরং কবিতা — হঠাৎ করে মোটা হয়ে যাওয়া, রুগ্ণ, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে উলটে-পড়ে-যাওয়া একটা মেয়ে, যে বলছে — হয় ভালোবাসো, নয় চুলোয় যাও। আর ছোটো-বড়ো বোদ্ধারা তাকে আঙুল তুলে বলছে — ওর ওই ফুটো-ফুটো দাগ হয়ে যাওয়া মুখটা ভেঙে দে।

সেই ভেঙে-যাওয়া মুখ নিয়ে কবিতা সে-ই লেখে, যে রাতের বেলায় প্রেতের সাথে ঘুমোয়। নিজেও শান্তি পাবে না, কাউকে শান্তি দেবেও না। সেই কালোই লিখতে ভালোবাসি, আমার প্রিয় হৃদয়ের রঙের সাথে মিল করে... অ্যান্ড ড্যাম ইউ, ফাক ইউ। আমি জানি, আমি কানে কম শুনি, কথা বলতে পারি না, তাই লিখি। লিখতে ভালো লাগে না বলে লিখি। ভালো লাগে বলেও লিখি। নাম হতে হবে, বই-বই হই-হই করে পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে পুরোস্কার পাব না জেনেই লিখি। আমি ঘুমের ভিতরেও লিখি। বেশ করব লিখব।

দে হ ত ত্ত্ব

যতি

আমার কাছে, যতি বেশ রহস্যময়ী। যতি না বলে, বলি যদি। যতিচিহ্নের ভালোরকম ব্যাকরণ মেনে ব্যবহারের জন্যে আমার বন্ধু রেগে যান! বলেন, কেন এত যতির দরকার? প্লেন কেন লিখি না! আজকাল এইটাই ফ্যাশন।

মোহ

তোমাকে পাওয়ার কল্যাণে অনেকটা শান্ত হয়ে গেছি।
হাত থেকে তুমি যত হাত দূরে সরে গেছ,
ধূপের গন্ধ তত উগ্র লেগেছে।
পুজোর আগে গিয়ে ধুতে মাথা,
সিঁথি ঘষে ঘষে চুলের দাগ হালকা হয়ে যাচ্ছে,
রঙের ওজন বেড়ে যাচ্ছে খুব।

আবার মাঝে-মাঝে মনে হয়, চারদিকে খুব কথা হয়ে যাচ্ছে না! কখনো যতি ছাড়াই সমস্ত শব্দ জুড়ে-জুড়ে একটা হাসি তৈরি হয়। অনেকে সেখানেও যতির অভাব বোধ করেন। তবে হাসি তো শুধু অট্টহাস্য নয়, হাসি সারকাজমের / বিরক্তির / রাগের / চাকলিং / সিম্পর — এসব হাসির অনুরণন অনেক বেশি।

সিম্পর ৩

তোমাদের এভাবে দেখতে চাইনি
হাওড়া ব্রীজের নিচে,
খুব নিচে,
সারি সারি গলাকাটা মুরগীর লাশ
তেরিমেরিধাক্কাধাক্কিমদমাগীবিরক্তিপ্রকাশ...

আমি
দেবী চামুণ্ডা ছিন্নমস্তা
ঠোঁট থেকে চকচকে লাল চেটে নিয়ে

লাইন দিয়ে
কেএফসি খাই...

আর
হাসি...

তবে সেভাবে দেখতে গেলে আমার ত্রিবিন্দু (...) এবং ড্যাশ (—) ব্যবহার করতে বেশ লাগে। কবিতায় না-লেখা রহস্যগুলো, না-লেখা শব্দের বোধ খুব চিৎকার করে বলে, এই চিহ্নগুলো আবার কখনো থুতু ছেটায়। শব্দকে কেটে দেওয়ার মধ্যে কোনো হাইপ নেই। একদিন খুব রাগ করে কয়েকটা শব্দকে কেটে দিয়েছিলাম, সেটাই বোধহয় যতি বা কবিতা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল।

সততা

~~হাত~~
~~পা~~
~~মুখ~~
~~দাঁত~~
~~নখ~~

বিকলাঙ্গ বলেই
লিখতে পারছি।

যাওয়া আসার পথ এমনই
বিখ্যাত হয়ে খইয়ের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে!

সোজা রথে উল্টো হয়ে পড়ছেন
পড়ে যাচ্ছেন

জগন্নাথ!

কখনো স্মাইলি-ও যতির মতো করে এসেছে আমার লেখায়। অনেক সময় রাগ-অভিমান-নিরাশার লেখাগুলো উদাসীনভাবে যতিচিহ্ন ছাড়াই ঝরঝর করে নেমে আসে। আমি বলি, কবিতার কান্না। বলা যেতেই পারে, আমার ইচ্ছে মতো শব্দের বোধ হল যতি বা যদি...

স্পেস

আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জায়গা বা স্পেস। শব্দ যদি মনে জায়গাই না করতে পারে, তাহলে আর কবিতা কেন! তাকে ঠোঁটের মধ্যে ঘুড়ির মতো খেলিয়ে সাঁ-সাঁ করে ওড়ালে কারো হাত কাটবে কারো ঠোঁট ফাটবে, কবিতা এমনই এক রক্তারক্তি ব্যাপার। যদি আমরা ধরে নিই, কবিতা একটা বিন্দু, আর তার চারদিক ঘিরে আমরা সব্বাই বেঁচে-মরে-পলিটিক্স করে মুখের রক্ত তুলে-টুলে কিছু হওয়ার বা করার চেষ্টা করছি, তাহলে যেটা তৈরি হচ্ছে, সেটা একটা 'গোল' বৃত্ত। বিন্দুর দিকে তাকিয়ে দেখবেন, এত সবকিছু হওয়া সত্ত্বেও বিন্দু কত একা। আমার মনে হয়, স্পেসটা ওইরকমই একটা-কিছু, যাকে একা-একা ছেড়ে দেওয়া ভালো। সে যখনই কথা বলবে, ইকো হয়ে ধাক্কাটা যেমন সবার কাছে যাবে, তেমন নিজের দিকেও তিন-চার বার সমানভাবে ফিরে আসবে। খারাপ বললে, চার বার খারাপও শুনতে পাবে; আর ভালো বললে, একা হয়ে যেতে হবে। আসলে ভিড়ের মধ্যে একা হতে চাওয়াও একটা রাজনীতি।

দু-পা আকাশে রেখে ভরা চুড়িদারে রক্তদাগ যার
সমুদ্রে নিয়ে যাও ওকে
কোলে নাও বন্ধুর মত কেউ
বল — পেন
কিল হার কিল হার কিল হার

(*পেন কিলার* কবিতার অংশ)

অথবা

রারার কবিতা ৮

নিজের নাম ধরে এত দূর থেকে ডাকলাম
এত উঁচু থেকে

এরপর
যদি
কখনো
অথবা
আবার
কাছে আসি তোর
সমস্ত ইকো সমেত ফিরিয়ে নিয়ে যাব
নিজেকে।

টাইম

সময়ের সাথে আমি সম্পর্কযোগে বিশ্বাস করি। সময় না দিলে ব্যক্তিকে চেনা যায় না। হতে পারে সে তোমায় পরে বিট্রে করবে, এখন যেভাবে কবিতা আমার সাথে বিট্রে করছে, তবে তুমি তার চরিত্রও চিনে যাবে, নিজেকেও। কোনটা দুর্বলতা, কোনটা তুমি পার না পারবে না, আর দালির ঘড়ি গলে যেতে-যেতে জানিয়ে দেবে দর্দ ছাড়া চাঁচাছোলা মর্দ কবিতা লেখা যেমন যায় না, তেমন ঘাড়ের কাছে ফুরফুরে আরাম, সুখ ছাড়াও লেখা যায় না। যেহেতু শব্দেরা দয়া করে একদিন আমার কাছে এসেছিল, আমি খুব যত্নে তাদের পায়ের কাছে তারিখ দিন সময় কখনো মনের অবস্থা লিখে রেখেছি। সম্পাদককে ওইভাবেই পাঠিয়ে দিয়েছি ভুল করে। লোকে ভেবেছে পাগল অথবা মেয়েকবি। আমার ব্যক্তিগত সময়কে আমি ছাড়া কেউ আমার মতো করে ভাবেনি বা দেখতেও পাবে না। এইসব অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষ আলাদা-আলাদাভাবে স্বার্থপর। দেখলাম সময়ে-সময়ে ঠিকঠাক কনট্যাক্টে চললে পাগল একটা 'নাম' হয়ে যায়। নামের ধারে-কাছে আসার আগেই আমি দূরে সরে গেলাম। টাইম অনুযায়ী একে বলে সেক্লুসান। টাইম অনুযায়ী গুনতে-গুনতে দেখলাম — আমার মা, রবি ঠাকুর, রমিত দে, ভাস্কর চক্রবর্তী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তানিয়া এবং আরও অনেক বন্ধু বা শত্রু আমায় অনেক-অনেক কিছু শেখালেন। আজকাল জানি না কীসের ভয় করে। লেখার সময় পাশে একটা প্রিয় বই নিয়ে বসে লেখা শুরু করি। মনে হয় কেউ আমায় দেখছেন, কেউ আছেন, তাই না পারতে-পারতেও পেরে যেতে পারি।

কবি হতে পারলাম না। পারবও না। শুধু চারদিক তাকিয়ে দেখি, মেয়ে হয়েই থেকে গেছি।

একই বিষয়ে দু-বার দু-রকম। ২০০৯ —

আমি তো পিছন থেকেই ডেকেছিলাম।
আমি তো পিছন পিছন ডেকেছিলাম।

তুমি আমার চোখ দেখতে পাওনি...

আর, ২০১৪ —

ওড টু মাই মোস্ট রোম্যান্টিক লাভার

ওদিকে কুড়োবার শব্দ হল —

ফুল ঝরে পড়তে যে শব্দ
তার থেকে একটু বেশি।

শূন্যস্থানে এত বড় ড্যাশ ছিল

সে তো দেখলই না ফাঁকা থাকার আহির ভৈরব
সে তো দেখলই না
সূর্যমুখী ফুল অন্ধকারেও কতটা রোম্যান্টিক!

বন্ধ ঘর, চিৎকার ও অন্ধকার

আমার কবিতাকে ভালোবাসতে বলিনি। আমি সাহসের আগে গিয়ে লিখি, কোথায় কীভাবে লিখলে কবিতা চমকাবে, কী অনুষ্ঠানে কী পড়া উচিত না ভেবেই লিখি এবং ছোটো মুখে বড়ো করে লিখি। বড়ো মুখ করে বলার মতো আমার নিজস্ব কোনো বই নেই। নেই তো নেই, নেই থেকেই কি লেখা জন্মায় না! বন্ধু কোনো এককালে বলেছিল, কবিতা লেখার পর তাকে ফেলে রেখে দিতে হয়। তারপর চেঁচিয়ে পড়বি, যেন ভোরবেলায় আহির ভৈরবে আলতো করে গলা সাধা। তাতে নাকি কবিতা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অন্ধকার বাক্সে কবিতা ফেলতে-ফেলতে কবিতাই কখন অন্ধকার হয়ে গেল। এখন আমার আর গলা সাধা হয় না। কবিতায় গান আসত। একটু জোরেই আসত হয়তো। তার জন্যে খোলাখুলি চুরির বদনাম পেয়েছি। গান কারো একার না! এখন দেখি এত অন্ধকার বলেই সবাইকে পরিষ্কার দেখা হয়ে গেল।

মানুষ

আলো বন্ধ করো
তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।

ফেলে রাখতে-রাখতে আমার আর লিখতেই ইচ্ছে করে না। বারবার ক্যালপল ৬৫০ খাওয়ার মতো ঘন জ্বর আসে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না আমার লিভার খারাপ হয়ে যাচ্ছে, নাকি রক্ত চলাচল হচ্ছে না, নাকি আমার কবিতা আর আমিই থাকতে পারছে না। চেঁচিয়ে পড়তে গিয়ে দেখি, জানার আগেই কবে হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে। আমি বলছি না, আমার কবিতা পড়তে হবে, আমায় ভালোবাসতে হবে... আমি আমাকেই বলছি ফিসফিস করে — 'ফলো ইওর ইনার মুনলাইট, ডোন্ট হাইড দ্য ম্যাডনেস অ্যান্ড হাউল'।

এক গ্রাস ভাতে
নিজেই নিজের মাথা চিবোই
সাথে রক্তনুন

একপেট ভাতঘুমে আরো দুটো বদনাম দিও
যাতে সবকিছু ঠান্ডা করার মত
দাঁতভাঙা লিখে যেতে পারি।

(*ক্ষিদের কবিতা*-র অংশ)

বানান

সাধারণত অভিধান মেনেই লিখি। কখনো এই বন্ধু ওই বন্দুক মেনেও লিখি। তবে কিছু হিন্দি উর্দু ল্যাটিন বা অন্যভাষাগত শব্দ বা একদম নতুন নিজের তৈরি শব্দ তো এমনিই এসেছে। চমক দেওয়ার জন্যে না। গালিব থেকে গুলজার এইভাবেই... যেন ভাবতাম আমরা তিনজন ঠেকে বসেছি। আমার বন্ধুর যত প্রিয় বড়ে গুলাম আলি সাহাব বা গালিব, আমার ততটাই বেস্ট ফ্রেন্ড ভ্যান গঘ। এইভাবে এর-ওর প্রেমিককে বুঝতে গিয়ে ব্রজবুলি আসে, পদাবলি আসে, আসে রাশিয়ান সাহিত্য, গ্রিকপুরাণ, বিদেশি রূপকথা। অনেকের হয়তো কষ্ট হয় বুঝতে, কিন্তু কিছু জায়গায় কবিতা শুধু আমার নিজের... একার। সত্যি বলতে কী, পরিবেশটাও অনেকটা ম্যাটার করে। আর বড়ো হওয়াটা। কবিরা বলেন, যাপন। একইভাবে চোখে শোনা, কানে দেখাটাও। তাই কীভাবে লিখবেন কেন লিখবেন, আলমারিতে থাকতে-থাকতে একসময় হারিয়ে যায়...

ফন্ট, কালার এবং সাজানো

আমি সবসময়ই ভেবেছিলাম লিখব, এমনিই লিখব। কিছুর জন্যে না। যেভাবে খিদে আসে, প্রেম আসে, বাথরুম আসে, সেভাবেই। অত ভেবে দেখিনি, তাই ছাত্রের রেজাল্টের পিছনে, সম্রাটের ন্যাপকিনে, বাবার সিগারেটের রাংতায়, সস্তার মোবাইলে, সিসিই খাতার মধ্যে, বাথরুমে, গাড়ির কাচে, 'প্রস্রাব করিবেন না'-এর নীচে, আয়নার ওপর পাউডার দিয়ে লিখে এসেছি। বন্ধুর একদম না-কাটাকুটি করা দামি পেনে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা কবিতা-ভরা খাতা দেখে লোভ হত। ভাবতাম, কী করে? আমিও শুরু করেছিলাম, তবে শেষ করতে পারিনি; তাই-ই হয়তো কবিতা লিখছি। আগে খুব মায়া ছিল হারিয়ে-যাওয়া লেখার উপর, এখন উদাসীন। সেই সাজানো ডায়েরিতে গোঁজা আছে নোংরা শেষ না-হওয়া লেখার কাগজ, আমি এখনও ভাবি... কী করে! এখনকার ফন্টের নাম 'কালপুরুষ'। রং ধূসর বা কালো। যেভাবে ও হেনরি দেখতেন। সাজানো না, কোনো মতে কম্পিউটারে একটা ফোল্ডারে বছর হিসাবে রাখা। তা-ও সব না, এদিক-ওদিক সব... এলোমেলো। ভেবেছিলাম, প্রথম বই হলেও উপর-নীচে ডান-বাম উলটো-সোজা এভাবেই সাজাব। তেমন কিছু হাতের লেখা আমার নেই, যা দেখে লোকে বলবে — কবির মতো। তেমন কিছু পায়ের জোর নেই আমার, যা দেখে লোকে বলবে — লেখাটা দাঁড়াল। জন্মগত আমি ফ্ল্যাটফুট।

ছন্দ ও গদ্য

বলা যাক, আমি খুব বেসুরে লিখি, কানেও শুনতে পাই না। আমি লেখা শুরু করেছিলাম ছন্দ দিয়েই। মিষ্টি ছিল, মেসি ছিল, ইমম্যাচিওর, চমক থাকত। বলা ভালো, আজ সেই ইনোসেন্সি নেই। বড়ো হলে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হওয়া মেয়েদের ব্যক্তিগত অধিকার না। কবিতায় সবসময় অন্ত্যমিল খুঁজি না। যে যেভাবে আসে, কাছে ডেকে বসাই। জলটল দিই। কোথাও মিলে যায়, কোথাও একদম মেলে না, তাল কাটছে, জিভ কাটছে। আমি মনে করি, এভাবেই, খুব সাধারণভাবে হেমন্তকালের মতো আসা ভালো। সাধারণ হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। বরং কলেজের প্রফেসরদের পা ধরে-ধরে বলা — আমি ইংলিশ হন্স. হয়েও বাংলার এটা বুঝতে চাই, ওটা বুঝতে চাই, ছন্দ তাল আকার লয়... একটু শিখিয়ে দিন। বাড়িতে পড়তে যাব বলে হাপিত্যেশ করে থাকা মেয়েটাকে বলতে ইচ্ছে করে, ধুর পাগলি! কবিতাকে এভাবে পাওয়া যায় না। ওটা ভিতরে থাকতে হয়। বরং ওকে ওর মতো করে ছেড়ে দাও, ঠিক সময়ে ঘরে ফিরে আসবে।

জানি না ছোটোবেলায় তবলা ছাড়াই কেন ধ্রুপদাঙ্গ একদম ঠিক গাইতাম। তবলা বাজলেই তাল একবার কাটবে। কবিতাও ঠিক সেভাবে এসেছে, ঘুরপথ দিয়ে। সবসময় তাকে একটা বাঁধা গতে ফেলতেই হবে, এমন কথা নেই। সে আসুক না তার মতো, নিজমাত্রিক!

সাইজ ম্যাটারস

এবং লুক্স-ও। যত বড়ো হয়েছি, সবার থেকে এইসবই শুনেছি। ফর্সা কবিতা, কালো কবিতা, মুখে চমক, মুখে ব্রণ। আমি কখনো সাইজ পরিসর নিয়ে ভাবিনি। ছোটোবেলায় আবেগ বেশি ছিল, বেশি বকে ফেলতাম। এখন দেখি, কবিতা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। সামলে চলতে হয়। কলকাতা শহরেই ম্যানহোলে মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ট্রাম এখনও জীবনানন্দের মৃত্যু বেচে খায়! এখানে আবেগের দাম নেই। রহস্য রাখায় আমি বিশ্বাস করি; বিশ্বাস করি, কখনো-কখনো স্পষ্ট কথায় না বললে তবেই 'না' বলা হয়। কবিতার কাছে সৎ থাকতে চেষ্টা করি। আমার কাছে এক লাইন দু-লাইন কবিতা লেখা খুব শক্ত যেমন, তেমনই *যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল*-র মতো কাব্যোপন্যাস কীভাবে জলের মতো লেখা হয়ে গেল, ভাবতে-ভাবতে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই ভেবে যে, আমি বোধহয় কিচ্ছু পারলাম না, পারিনি। মাথা কেমন নিচু হয়ে আসে। কবিতার কাছে আমি লজ্জা নিয়ে অশিক্ষিতের মতো বসে থাকি। একে বলে বেগ। 'আ' তাকে ছেড়ে গেছে বহুদিন হল।

আবেগ ২০১১। এক লাইনার —

ভিক্টোরিয়ার পরী, সমস্ত না ছুঁতে পারার প্রতীক

আবেগ ২০১৪। দুই লাইনার —

মঞ্জিল-রাস্তার কোনো নাম হয় না
তুমি হাঁটতে জানলে তবেই রাস্তা

আবেগ ২০১৩। তিন লাইনার —

ল্যাম্প দ্য ন্যুই

ভালবাসবো...
বলে কেউ মোমআলো জ্বালেনি কখনো
আমাকে জ্বালার মত যথেষ্ট অন্ধকার কারুর ছিল না...

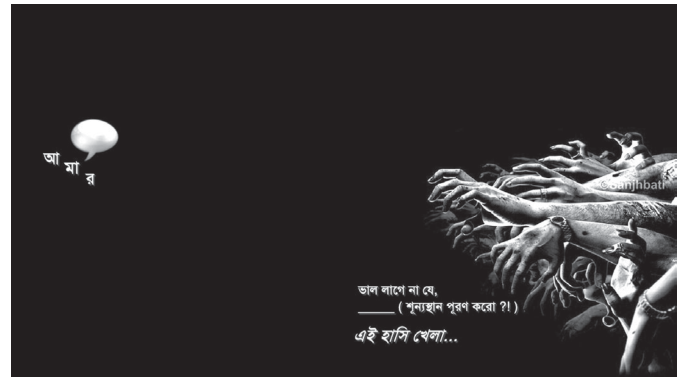
চার লাইনার —

আঙুলের ফাঁক

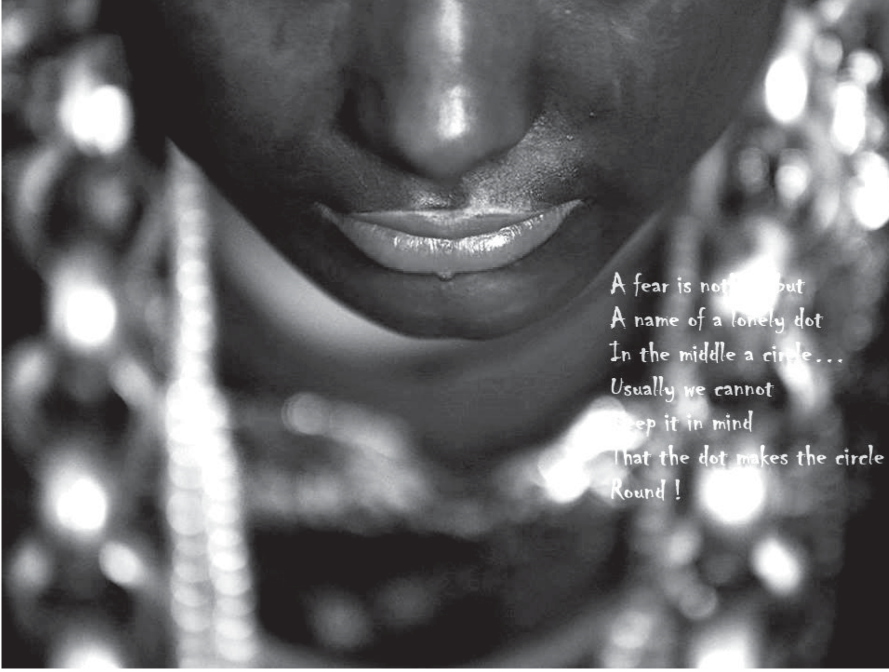
একমুঠো বালি হাতে নিয়ে
খেলতে খেলতে ছোট হয়ে এল প্রতীক্ষা

হাতের মুঠো খুলে দেখলাম
তুই কোথাও এক কণাও পড়ে নেই।

ভিসুয়াল পোয়েট্রি



অনেক সময় আমি কবিতায় গান লিখি, ছবি আঁকি। জয় গোস্বামী তো অনেকদিন আগেই এই নিয়ে লিখে গেছেন। সবসময় তার গভীর মানে থাকতে হবে, এমন আমি মনে করিনি। শুধু একটা ছবি।



গঙ্গার ধারে দু-জন বসে আছে, এমন সময় বান এল। ব্যাস, এইটুকুই লেখা হল শব্দ বা রঙের শব্দ দিয়ে! ফোটোগ্রাফি। ইচ্ছেমতো টোন দেওয়া হোক। আমি সিনেমার মতো করে ভাবি। মুভি ও সিনেমার তফাত স্বপ্নে ও রিয়ালিটিতে। তখন নিশ্চয়ই শব্দগুলো, তার রং বা রূপ পালটাবে। সাথে-সাথে মানে।

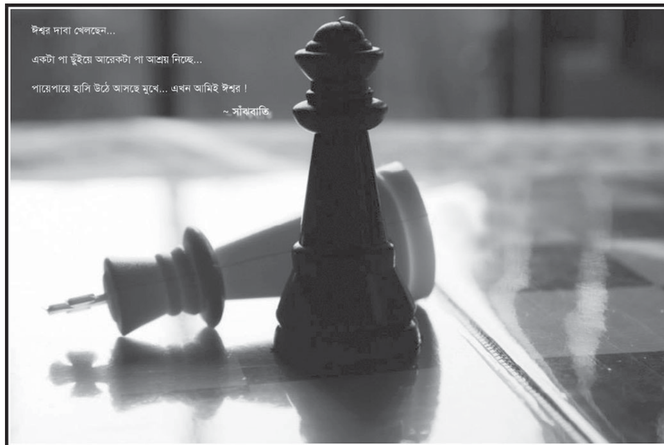
সতীচ্ছদ
ভাঙছে না

অথচ
কবি আসছেন...

ন্যাংটোপুটো
'!'

(*কল্কি* কবিতার অংশ)

ছোটো-বড়ো হয়ে আসবে তার ছায়া। কবিতা লেখা হবে স্লো মোশনে বা একসঙ্গে অনেকগুলো সাউন্ড মিশে যারা আমার হাত থেকে বেরোচ্ছে, তারা কে? ছবি আমায় কবিতা দেখাল, কবিতা আমায় ছবি।



বলা যাক, পেন্টিং-এর মতো কিছুটা। তার সবকিছু কি আমিই বোঝাতে পারি, না বুঝতে পারি!

রারার কবিতা ৪

প্রথম দেখা তুই
শেষ দেখা তুই
তফাৎ গল্পে ও কবিতায়...

আমি তোর এক্কার টুরিস্ট
এক্কার গাইড

তুই কি আমার **ভাল** মানুষ **পাহাড়**...

নামে কী আসে-যায়

নাম গুরুত্ব রাখে বই কী। আবার রাখে না। আমার কাছে ভীষণ কন্ট্রাডিক্টরি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে *এমনি বই* (শ্রীজাত) বা *নষ্ট আত্মার টেলিভিশন* (ফালগুনী রায়)। দুটো দু-রকম। আগে হলে, আমার বই-এর নাম বেশ মিনিংফুল হত। অনেকদিন আগে থেকে খুব ভেবে যত্ন করে রাখা নাম। কিন্তু সোজাকথা সোজাভাবে বলে দেওয়ায় আজকাল বেশ আরাম পাই। যেভাবে বুকস্কি, জ্যাক কেরুয়াক, শুভঙ্কর দাশ, সোমতীর্থ নন্দী, ঋতম সেন কারো তোয়াক্কা না করেই এইরকম ক্যাজুয়ালি বলে বেরিয়ে যান নিজেদের কথাগুলো। অনেকে বলেন কখনো-কখনো, শুনতে বা পড়তে মাঝে-মধ্যে অড লাগে, বা কানে বাজে। কানে বাজাটাকেই যদি বলি ইচ্ছে। ইচ্ছে থেকে কবিতা। অনিচ্ছে থেকেও। যেটা মুহূর্তে মনে এল, সেইটাই নাম হোক। বেশি ভাবতে গেলে দেখেছি মানুষ নিখুঁত হতে চেষ্টা করে। নিখুঁত জিনিস খুব একটা ভালো লাগে না আমার। আমি অনেকেরই লেখার নাম দিতে-দিতে — বাহবা পেতে-পেতে — দেখলাম, আমার জন্যে কিছু নাম আর পড়ে নেই। আজকাল তাই নাম নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে না। বা, খুব সাধারণ করে ভাবি। ঝাল লজেন্সে রুপোলি মোড়ক দিতে শিখছি ধীরে-ধীরে। আমার কবিতার নাম 'রারার কবিতা', 'ইয়ালডা', 'বিয়িং নাম্ব', 'ফসফরাস গুচ্ছ', 'লালু ফড়িং', 'ব্লো জব', আর আগে কিছু উল্লেখ করেছি। এরপর হঠাৎ করে আমার কবিতার নাম নেই, শুধু তারিখ!

কবিতা যেভাবে আমায় লেখে

পেনে যখন কবিতার শরীর আসে, ঠিক তারাশঙ্কর বা মানিকবাবুর মতো, তীব্র বুনো গন্ধ নিয়ে আসে। আসলে যখন লিখি, প্রবল ঘোরের মধ্যে লিখে যাই। হুঁশ-জ্ঞান নেই, পিন ড্রপ সাইলেন্স চাই বা ক্যাকোফোনি। তখন আমায় পিছন থেকে কেউ ডাকলে, কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে। এই সময় আমি তো আমি থাকি না, আমার মনোযোগ ভাঙলে, কে ডাকল না-ডাকল ভেবেই গালাগাল ছুড়ে মেরেছি, আদ্যোপান্ত ড্রাকুলা। কী ছটফটে হয়ে থাকি, অটো ধাক্কা মেরে গেল! কবিরা নাকি এইরকম হয়, শুনলেই গা জ্বালা করে আমার। কই, কেউ তো কখনো বলে না, কবিতাই এইরকম হয়! আমি তো নন্দনের নন্দনা হয়ে বিকশিত সেজে ঘুরিনি। অথবা উসকো-খুসকো টিপিক্যাল পাঞ্জাবি পরে বন্ধুদের সাথে রাজনীতি করে কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইনি। আমি তো নিজের মতো লিখতেই চেয়েছিলাম। ভালো লাগে না বলে ঘুম আসে। লিখতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়... একদিন আমি ঘুম থেকে উঠলাম আর দেখলাম, রাগ বা দুঃখ করার মতো আর কিচ্ছু পড়ে নেই, তখন? না, আমি আর বলব না, 'কুছ দাগ আচ্ছা হ্যায়'। অনেকবার বলে ফেলেছি। বরং সমস্ত 'না'-কে কপালের টিপ করে পরে নেব। শান্ত হতে হবে আরও। শান্ত ঝড়। কবিতা আমায় অনেক দূরে ঠেলে দিয়ে শেষ অবধি শিখিয়ে গেছে — 'কবিতার কোনো ভালো-খারাপ হয় না। সৎ-অসৎ হয়।'

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার

'সিরিজ লেখে যখন, তখন সে খানিকটা মেশিনের মতো কাজ করে। কবির মতো ততটা নয়, যতটা মেশিনের মতো।'

ক থো প ক থ ন

মণীন্দ্র গুপ্ত

ঠিক যে সাক্ষাৎকারের মতো বাছাই প্রশ্নাবলি ছিল, তা নয়। কথাবার্তার বেশিটাই উঠে এল তাঁর গদ্যের বিভিন্ন অংশের খেই ধরে, যা নানাভাবে বলতে চেয়েছে কবিতার দৃশ্যরূপের কথা। গদ্যাংশগুলি হুবহু বজায় রাখায় কিছু প্রশ্ন দৃশ্যতও রইল দীর্ঘ। পৃথকভাবে সংযোজিত হল তাঁর গদ্যের আরও কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ। *বোধশব্দ*-র পক্ষ থেকে কবি মণীন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে কথা বললেন **সুস্নাত চৌধুরী**।

আপনার কবিজীবন এবং *পরমা* সম্পাদনা ও প্রকাশনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলুন, একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতার দৃশ্যগত প্রেক্ষিতের বিবেচনায় একজন প্রকাশকের কী ভূমিকা থাকা উচিত?

আমার মনে হয়, প্রথম নজর দেওয়া উচিত, পড়তে কী করে সুবিধে হয়। যেন ছাপার ভুল না থাকে, যেন ভাঙা টাইপ না থাকে, যেন কালির বিতরণে সমতা থাকে — আগে তো ভাঙা টাইপ বা ছাপা জ্যাবড়ানো-বিবর্ণ হত। এমনকী, যদি লাইন ভাঙা হয়, অনেক বার আমি চিন্তা করেছি, বড়ো লাইনের ক্ষেত্রে যদি চওড়ায় না ধরে, খানিকটা এক্সট্রা আছে, তাহলে সেটা কোথায় বসবে? ঠিক কোনখানে? বসিয়ে-বসিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করতাম, কোথায় দিলে পরে এটা কন্টিনিউয়েশন বলে বোঝাচ্ছে, পড়তে সুবিধে হচ্ছে, এবং কোনো জার্ক আসছে না। এগুলো লক্ষ করতে হবে। এগুলো নির্ভর করে এক্সপেরিয়েন্সের উপরে। সত্যিই এসব ভাবলে, ভাবার আছে।

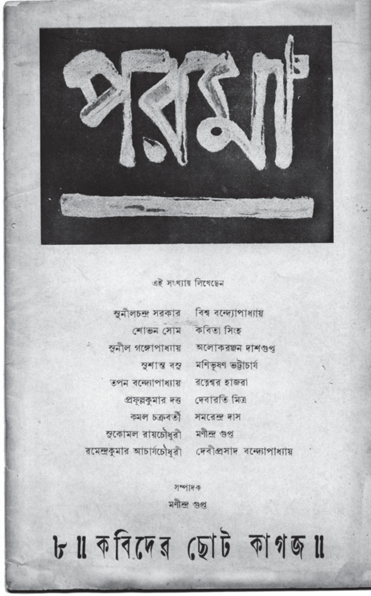
আর দরকার হল, লেখার পাশে ফাঁকা জায়গা। আমি হিসেব করে দেখেছি, এক পৃষ্ঠায় যদি একটি কবিতা আসে এবং চারদিকে একটা ফ্রেমের মতো সাদা জায়গা থাকে, তাহলে একটা দৃশ্যরূপ তৈরি হয়। সেটি কিন্তু কবিতাটার পক্ষে স্বাস্থ্যকর এবং সুবিধেজনক। আবার কবিতা এত ছোটো-ছোটো হয়ে গিয়েছে যে এক পৃষ্ঠায় একটিই কবিতা অনেকসময় ভালো লাগে না, মনে হয় যেন বেশি শৌখিনতা হয়ে গেল! মানে, চার লাইন কি ছ-লাইন কি দশ লাইন — এটা খুব আনইকনমিকাল মনে হয় এবং মনে হয় যে বেশি সাজানো হল আর কি। ওরকম না করাই ভালো। তখন কী করব আমরা? সেটা যাঁর বই, তাঁর উপরেই নির্ভর করে, তিনি কী ডিসিশন নেবেন। আরেকটা জিনিস হয়, আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করি, হয়তো বড়ো কবিতা, দু-পৃষ্ঠায় গেছে, তখন আমি ভাবি আর কি, কবিতাটা বাঁ-দিকের পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হয়ে ডানদিকের পৃষ্ঠায় এসে গড়িয়ে যাবে। এই দুটো পৃষ্ঠার মধ্যেই কবিতাটা শেষ। তাহলে আমাকে আর পাতা ওলটাতে হচ্ছে না। ভাবতে হচ্ছে না যে এর পরে কী আছে, বা আদৌ কিছু আছে কি না। এক বারেই পুরো চেহারাটা দেখা গেল। মানে, খেয়াল রাখতে হবে, কোনোরকম আনএক্সপেক্টেড কিছু যেন না ঘটে।

আর, আগে দেখতাম, হাতের কাজের উপর বেশি নির্ভর করত প্রেস। এই যে কবিতার শিরোনাম, এখন তো হেডিং সাধারণত একই টাইপে পয়েন্ট বাড়িয়ে, কিংবা লম্বায় বাড়িয়ে, বা পাশে বাড়িয়ে আলাদা করা হয়। কখনো বোল্ড করা হয়। সেটা যার যেমন ইচ্ছে, যার চোখে যেমন ভালো লাগে। আগে কিন্তু তা ছিল না। আগে আর্টিস্টরা লেটারিং করে দিতেন, ব্লক করে ছাপা হত। তার ফলে, ওই হাতের কাজ এবং টাইপ সেটিং কিন্তু এক পৃষ্ঠায় আসত। এখানে চরিত্রের মেলামেশা দরকার। যদি না মেলে, তাহলে কিন্তু খারাপ লাগবে দেখতে। মিললে খুব সুন্দর, সুদৃশ্য।

একইভাবে, পত্রিকায় কবিতা ছাপার ক্ষেত্রে দৃশ্যগত ভাবনার দিক থেকে একজন সম্পাদকের কী দায়িত্ব বলে আপনি মনে করেন? বা, এই প্রেক্ষিতে বই ও পত্রিকার নির্মাণের মধ্যে পার্থক্য কী?

দ্যাখো, বইটাকে আমরা বিক্রি করি, কিন্তু কমোডিটি হিসেবে ধরি না। কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ডিফারেন্স আছে। পত্রিকাকেও আমরা ভালোবাসি, কিন্তু যতই ভালোবাসি না কেন, তাকে কিন্তু আমরা কমোডিটি হিসেবে ধরি। কত কপি পত্রিকা বিক্রি হল তোমার — বলি না? কিন্তু বই-এর ক্ষেত্রে আমরা সেভাবে বলি না। পত্রিকার পিছনে যেহেতু একাধিক লোক থাকে, তাই উৎসাহটা অনেক বেশি থাকে। অনেকের শেয়ার রয়েছে আর কি! মানে, বাড়িতে খাওয়া আর চড়ুইভাতিতে খাওয়া, এর মধ্যে যে-তফাত, সেই তফাতই রয়েছে নিজের বই আর পত্রিকাতে!

পত্রিকাতে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা আমি আমার নিজস্ব কথা বলছি, পত্রিকাতে কবিতা থাকে, প্রবন্ধ থাকে। তার মানে, গদ্য থাকে, পদ্য থাকে। পদ্যের কথা তো আগে বললাম, সেটা বই-এর ক্ষেত্রে যেভাবে করতে হবে, এখানেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু গদ্য-পদ্য মিলিয়ে একটা অ্যাসর্টেড চেহারা আসে। সেখানে কী করব? বাইরের বইগুলো দেখলে কিন্তু অনেককিছু মাথায় আসে আমাদের। যেমন প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা ফন্ট বদলে দিতে পারি। গদ্যের একরকম ফন্ট, কবিতার আরেকরকম ফন্ট। বদলে দিয়ে একটা দৃষ্টিগত তফাত



মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকা

আনতে পারি, ভালো দেখায়। পয়েন্টও বদলে দিতে পারি। পয়েন্ট বদলে বক্স করে যদি মাঝখানে ছাপি, ছবির এফেক্ট আসে। এগুলো কিন্তু করা যায়। আমি দেখেছি, ফর্টিস-ফিফটিসে ইংল্যান্ড থেকে একটা পত্রিকা বেরোত *ব্রডশিট* বলে, বামপন্থার কাগজ, তাতে মাঝে-মাঝে ছোটো পয়েন্ট বড়ো পয়েন্ট করে কম্পোজ করা হত। অসাধারণ দেখতে! এই জিনিসগুলো দেখলে পরে মাথায় অনেকরকম ধারণা কাজ করে।

এই যেমন, আমার *লাল স্কুলবাড়ি* — সেখানে কবিতাগুলো শুরু হয়েছে নীচে রেঞ্জ রেখে। সাধারণত কী হত, ওপরে রেঞ্জ রেখে আরম্ভ হত, কিন্তু এটা নীচে রেঞ্জ রেখে আরম্ভ হয়েছে এবং যদি ওপারে নিয়ে গেছি তো মাথার উপরের গ্যাপটা বাড়িয়ে দিয়েছি, যাতে ব্যালান্স থাকে। শিরোনামটা রেখেছি একই জায়গায়। এই কায়দাটা নিয়েছিলাম ফরাসি বই থেকে। অরুণ মিত্রের কাছে অনেক ফরাসি বই আসত, আমাকে একটা দিয়ে বললেন — দ্যাখো, কী সুন্দর করেছে! আমি বললাম — বাঃ! দিন তো, আমি কাজে লাগাব। ওইখান থেকে আমি এই ধারণাটা পেয়েছিলাম। এইরকমভাবে নানান দিক থেকে দেখতে হবে। সুবিধেটা প্রথম মনে রাখতে হবে, যাতে পড়ার কোনো অসুবিধে না হয়, সুখপাঠ্য হয় যেন।

***পরবাসী, কুড়ানী ও দারুমা সান*-এ আপনি লিখছেন — 'ফারসী, চীনে, রোমক লিপিগুলির এক একটির এক এক গতিপথ — ফারসী লেখা চলে আড়াআড়ি ডান থেকে বাঁয়ে। বই পিছনের পৃষ্ঠায় শুরু হয়ে শেষ হয় সামনের পৃষ্ঠায়। চীনে লেখায় শব্দ বা হরফগুলি নামে বৃষ্টিধারার মতো উপর থেকে নিচে, কিন্তু পরের পর শব্দ সাজানো হয় পৃষ্ঠার ডান কিনারা থেকে ক্রমশ বাঁয়ের দিকে। তুলিতে লেখা এই লিপি যেহেতু গাছের মগডাল থেকে লতার মতো নিচের দিকে নামে, অতএব চীনে নিসর্গ চিত্রের ছন্দের সঙ্গে অনেকখানি পাঠ্য বস্তুও ছবির সঙ্গে খুব খাপ খেয়ে যায়।'**

তাহলে কি কনটেন্টের সঙ্গে হরফের সাযুজ্য থাকা বাঞ্ছনীয়?

বাংলার ক্ষেত্রে হয়তো অন্যরকম হবে, কিন্তু হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তো অনেকরকম করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বা ঠাকুরবাড়ির অনেকে লেখার যেখানে কাটাকুটি হয়েছে, কাটাকুটিকে কাটাকুটির মতো না রেখে সেখানে ছবি করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথও করতেন। ভালো লাগত। ধরো, রবীন্দ্রনাথের *পূরবী*-র ওই *শেষ বসন্ত* কবিতাটা — বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে...। এই যে কবিতাটা, এখানে কাটাকুটি করেছেন। কাটাকুটিতে মনে হচ্ছে, যেন সত্যিই একটা বাঁশবন, এবং মেয়েটা নেই। সূর্যাস্তটা আছে। এখন এই যে জিনিসগুলো, এগুলো মনের অসম্ভব চেতনার শক্তি। কিংবা, দেখে বুঝতে পারা, যেটা আমি চাইছিলাম, সেটা এসেছে। এটা কিন্তু এনজয় করার। তো, এইদিক থেকে ব্যাপারটা ভাবা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা এক্সিবিশন হয়েছিল, ছবির মতো টাঙিয়ে। আমি দেখেছিলাম। অসাধারণ! এমনকী তোমার ভেতরটা পর্যন্ত মেলোড হয়ে যাবে।

পত্রিকা প্রসঙ্গে যেটা বলছিলেন, কবিতা আর গদ্য কি তাহলে আলাদা হরফে ছাপার কথা ভাবা উচিত?

এই প্রয়াস বাংলায় সেভাবে হয়নি। আমি দেখিনি। কিন্তু হলে ভালো হত। ডি কে গুপ্ত একটা পত্রিকা করতেন, *সারস্বত*। এই পত্রিকাটি দেখলে বুঝতে পারবে, ছাপা দিয়ে কী করা যায়! না দেখলে, বোঝানো সম্ভব নয়। এর ভেতরে কিন্তু পয়েন্ট বদলানো হয়েছে।

এই যে প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে পয়েন্ট কমিয়ে দিই, এইটা কিন্তু চালু ব্যাপার হিসেবেই করছি, নিজেরা মন থেকে করছি না। যে, আমি এইটা করব, এইটা এইরকম হবে, এত পয়েন্ট দেব — সেইভাবে হচ্ছে না। খুব কনশাসলি করছি না।

***জনমানুষ ও বনমানুষ*-এ আপনি লিখছেন — 'পত্রিকা থাকলে অনেক মুরুব্বী এবং ভক্ত জোটে, এদের একটি কথাও শোনা উচিত নয়। ছাপাখানার কম্পোজিটার এবং মেশিনম্যানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে ফল খুব ভালো হয়।' শুনেছি আজকাল, বা আগেও হয়তো ছিল, অনেক সম্পাদক / প্রকাশক নাকি হাতে-কলমে আর কাজ করেন না। শুধু লেখা বেছে, ম্যাটার দিয়ে দেন। ছাপা, প্রুফ দেখা, বাঁধাই — এসব দেখভালের জন্য আলাদা লোক রয়েছে। এই প্রবণতা সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য?**

কাগজে ভূমিষ্ঠ বা ছেপে প্রকাশিত হবার পর কবিতার তো একটি শব্দও বাড়ে না বা কমে না — অর্থাৎ কোনো রকম দৈহিক পরিবর্তন ঘটে না। তাহলে এই স্থির নিশ্চলতার মধ্যে বৃদ্ধি কী করে সম্ভব? কিন্তু জেনে রাখুন, বৃদ্ধি ঘটে। কারণ, ভূমিষ্ঠ হবার পরই যদি কবিতা নিবিড় স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হত, তবে সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যু ঘটত। পাঠক শুধু কাগজে বা গ্রন্থে তার মুদ্রিত দেহটির মমি বা ফসিল দেখতে পেতেন, কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করতে বা তার দ্বারা সংক্রমিত হতে পারতেন না। কথাটা অন্যভাবেও বলা যায় : আমরা পাঠকরা জানি, কবিতা আমাদের মধ্যে কিছু-একটা সঞ্চারিত করে, ফলে আমাদের সংবিৎকে সে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও, পরিবর্তিত করে বা পরিবর্তনের দরজায় পৌঁছে দেয়। নিজেকে অপরের মধ্যে চালনা করার এই প্রতিভা, এই সংক্রাম-ক্ষমতা কবিতার প্রাণময়তারই অনিবার্য প্রমাণ। জড় বা মৃতের পক্ষে অন্য প্রাণের চেতনাকে স্পর্শ করাই অসম্ভব, পরিবর্তিত করা তো দূরের কথা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, অক্ষর সমবায়ে গঠিত কবিতার দেহটি অপরিবর্তিত ও জড় থেকেও, যখন পাঠক-চেতনার সংস্পর্শে আসে তখন সেই আপাত-জড়ের বলয় ভেঙে যেন চেতনা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। কার চেতনা? — নিশ্চয়ই সেই রচয়িতা কবির চেতনা, যা এতক্ষণ সংহত হয়েছিল ঐ জড় অক্ষরগুলোর মধ্যে। আর, তার বিচ্ছুরণের আকাশ কোথায়? — সে আকাশ পাঠকের চেতনায়। কবির সংহত চেতনা ঐ আকাশে ক্রমান্বয়ে ব্যাপ্তি পেতে থাকে। সুতরাং বলা যায়, কবিতার বৃদ্ধি, বাইরে কোথাও ঘটে না, ঘটে একমাত্র পাঠকের চেতনায়। আর, আমার ধারণা, একমাত্র এই বৃদ্ধির পরিমাণের নিকষেই মহৎ, ভালো ও দুর্বল কবিতার যাচাই হওয়া সম্ভব। কবিতার স্থায়িত্বের পরিমাণও নির্ভর করছে, পাঠকচেতনায় তার এই সংক্রাম ও সম্প্রসারণ ক্ষমতার উপর।

'বৃদ্ধি', 'কবিতার জীবন ও দুষ্প্রবেশ্যতা', *চাঁদের ওপিঠে*

আমার তো মনে হয়, যে সম্পাদক হবে, বা যার উপরে নির্ভর করছে বই বা পত্রিকাটা কীরকমভাবে বার করবে, তার নিজের রাইট ছাড়া উচিত নয়। এটা তো আমার একটা প্রিভিলেজ! আমি একটা পত্রিকা সাজাচ্ছি, পত্রিকাটা আমার প্রোডাকশন, আমি কেন ছাড়ব! আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব, আমার মতো করে, আমি যা ভালো বুঝছি, সেইভাবে করতে।

তাহলে কি লেখা নিয়ে বা কনটেন্ট নিয়ে যে আগ্রহ রয়েছে, প্রোডাকশন নিয়ে সেটা নেই? বা, সেটাকে তত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে না?

এই ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি। এইটাই কারণ। তাই প্রোডাকশন নিয়ে সেই আগ্রহটা নেই। একজন সম্পাদক, সে লেখা সম্বন্ধে, তার মান সম্বন্ধেও এক্সপার্ট হবে, আবার কীভাবে তাকে সাজাতে হবে, সেই সম্বন্ধেও তার জ্ঞান থাকতে হবে। সেরকম লোক কম আছে, কিন্তু আছে। আরে, একটু-একটু করে নিজেকে তো ট্রেইন-আপও করা যায়।

'সুমুদ্রিত' বলতে আমরা কী বুঝি? নির্ভুল। মানে, সহজে বোঝা যায়, চোখের কষ্ট লাগে না, এইরকম। কিন্তু এর যে একটা এসথেটিক দিক আছে, সেইটে কি বুঝি? না, সেইদিকে আমাদের ঝোঁক আছে? এই সৌন্দর্যচেতনাটা ধরতে হবে।

***পরবাসী, কুড়ানী ও দারুমা সান*-এ আপনি বলছেন — 'এমন কি আধুনিক সুগঠিত টাইপ ফেসের নিখুঁত ছাপা যে দৃশ্যের নকশা তৈরি করে তাও একটি লেখাকে নীরবে রূপ দিতে থাকে। এই যুগে, আবৃত্তিকারের গলায়, শব্দে শোনা গল্প কবিতা নয়, ছাপা পৃষ্ঠাগুলি তার ঐ কম্পোজ করা স্থির নীরব পটে যতখানি দেয়, লেখকের হয়ে তার চেয়ে বেশি অন্য কোনো মাধ্যম দিতে পারত না। ছাপাখানা, একসঙ্গে অনেক বই প্রস্তুত করতে পারে বলে নয়, লেখার সবচেয়ে আধুনিক, ভাবাবেগহীন দৃশ্যচিত্র তৈরি করে বলে আমি তার একান্ত অনুগত।'**

এই প্রসঙ্গেই জানতে চাই, লেটারপ্রেস থেকে এই যে সাম্প্রতিক ডিটিপি-অফসেট-ডিজিটাল — এই পরিবর্তনের কী প্রভাব বাংলা পত্র-পত্রিকা বা বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে পড়ছে বলে মনে হয়?

ঠিকই বলেছিলাম। লেটারপ্রেস খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত মাঝে-মাঝে। মানে, ভাঙা টাইপ কিংবা মেশিনে চাপাতে যাওয়ার ঠিক আগে টাইপের বাঁধুনিটা হড়কে গেল! সমস্ত টাইপ ঝুরঝুর করে পড়ে গেল! এই যে সমস্যাগুলো, এগুলো আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কতখানি রিস্ক নিয়ে যে কাজ করা হত! এখন নিঃসন্দেহে অনেক সুবিধে হয়েছে, অনেক সুদৃশ্য হয়েছে। ভাবা যায় না, একটা টাইপ ভাঙা নয়! এটা আমরা আশা করতে পারিনি। তার পরে, যে লেখক, সে যদি কম্পিউটার চালাতে জানে, সে নিজেই করে নিতে পারে সবটা। আমি পারি না, শিখিনি, কিন্তু অনেকে তো পারে দেখছি।

তবে, একটা ব্যাপার আছে, আগেকার কম্পোজিটররা বানান ভালো জানত। আর এখন নিয়মাধীন বানান উঠেই গেল প্রায়।

এই যে বলছেন, অনেকে নিজেরাই করে নিচ্ছেন, ডিটিপি-ডিজিটালের এই অতিব্যবহার ও সহজলভ্যতায় আখেরে নান্দনিকতা কি মার খাচ্ছে?

এটা আমি সেভাবে বলতে পারব না। কিন্তু ভুল লোকের হাতে গিয়ে পড়লে হবে না। এর মধ্যে তো বই তৈরির ব্যাপার রয়েছে, যে এটা করবে, তাকে সেটা শিখতে হবে। আদারওয়াইজ হবে না। সে তখনই কাজটা করবে, যখন সে কাজটা পারে।

তবে, মাঝে-মাঝে এইসব ছাপা-টাপা নিয়ে প্রদর্শনী হওয়া উচিত, যেমন ছবির প্রদর্শনী হয়, সেইরকম। তাহলে অনেকটা বোঝা যাবে। এগুলো হওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির কথা বললেন। *পিলসুজ* পত্রিকার সাক্ষাৎকারে (১৯৮৯) খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলেছিলেন আপনি — 'ক্যাশ মেমোর সাদা পিঠে, বই কিংবা চায়ের বাদামি ঠোঙায় খসড়া করা কবিতা আমার সহজে উতরোয়। এক বন্ধু তার ব্যবসা উঠে যাবার পর ডেলিভারি চালানের একখানা আস্ত বই উপহার দিয়েছিল। ডিমাই অক্টেভো, পাতাগুলো পর পর হলদে, গোলাপি আর সাদা। লাল স্কুলবাড়ি-র প্রায় সব কবিতাই ওই ডেলিভারি চালানে লেখা।'

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এই ফিক্সেসনগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

রাফ কাগজে আমার লিখতে সুবিধে হয়। কারণ ওটার কোনো দায়িত্ব থাকে না। একটা কাগজ নষ্ট করছি, এই দায়িত্বটা থাকে না। আর মনেও খুব ফ্রি থাকি — ও যাবে তো যাবে! সুতরাং, মনটা ফ্রি থাকলে লেখা উতরোয় সহজে।

প্রত্যেক জীবিত বস্তুরই শরীর একটি আশ্চর্য সংগঠন। কবিতার জীবনের প্রসঙ্গে তার শারীরিক বিশেষত্বের এবং শরীর-অতিরিক্ত ব্যক্তিত্বের কথা না বললে এই বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা দরকার, কবিতা মোটেই কিন্তু সুন্দরের সংগ্রহ নয়, তিল তিল করে জমানো তিলোত্তমা নয় কবিতা। বরং প্রত্যেকটি জীবিতের মতো প্রত্যেকটি কবিতারও আলাদা এবং নিজস্ব একটি সুগঠিত, নিটোল জৈব অবয়ব আছে। তুলনা দিয়ে বলা যায় : সে অবয়ব হয়তো উজ্জ্বল নারীশরীরের মতো বা দৃঢ়পেশী পুরুষশরীরের মতো বা কুসুমপ্লাবিত লতার মতো বা স্তব্ধ অন্তঃপ্রাণ মহাদ্রুমের মতো। প্রকৃতির জৈবজীবনের মহাপট থেকে প্রত্যেকটি কবিতার জন্য আলাদা উপমা চয়ন করা যায়। জৈব অবয়বের নিয়মানুযায়ী উৎকৃষ্ট কবিতার প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি কণিকা এক অবিভাজ্য অমোঘ সংগঠনের লগ্নতায় আবদ্ধ। — তার প্রতি বাক্য, প্রতিটি মৃদুতম শব্দ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়, অকাট্য, অচ্যুত।

এইদিক থেকে আমার মনে হয়, কোনো কবিতার নিটোল সম্পূর্ণতাকে সর্বস্ব দিয়ে স্পর্শ না করে তার কোনো বিশেষ অংশ তুলে বিচার করা বা বিচ্ছিন্ন পংক্তি নিয়ে সুখী ও দুঃখী হওয়া খুব ভুল। ধরতে হবে তার সেই উদ্ভাসিত সত্তাকে, যা সম্পূর্ণ দেহময় বিস্তৃত ছড়িয়ে থেকে খেলছে।

'কবিতার দেহ ও ব্যক্তিত্ব', 'কবিতার জীবন ও দুষ্প্রবেশ্যতা', *চাঁদের ওপিঠে*

কবিতার আঙ্গিক নিয়ে আমি কোনোদিনই ব্যস্ত হই নি, কিন্তু সচেতন থেকেছি সর্বদা, হয়তো একটু অতিরিক্ত সচেতন। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলি : বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবারই মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার ঢুকিয়ে দেয়। কবিতার বৈধী রূপ-রীতি, আঙ্গিক-প্রকরণের সংস্কারও তার মধ্যে পড়ে। অনেকদিন নিজের মতো করে চিন্তাভাবনা করার ফলে ধীরে ধীরে আমার

আসলে, এ হল আমার কার্পণ্য! আমার স্বভাবটা একটু কৃপণ। এছাড়া আমি তো আর কোনো কারণ খুঁজে পাই না। অনেকে তো সাজগোজ করে কবিতা লিখতে বসতেন, সামনে গোলাপফুল গোঁজা। এখন অবশ্য অন্য সাজগোজ থাকে! আমার ওসব কিছু দরকার পড়ে না।

এই প্রসঙ্গে বলি, একটা জিনিস করলে কিন্তু মন্দ হয় না। মনে করো, তুমি একজন কবির কবিতা ছাপলে, পাঁচ-ছ-টা কবিতা, সঙ্গে তার পাণ্ডুলিপির একটা কাটাকুটি করা পৃষ্ঠা পাশে ছেপে দিলে। একটা ছবির এফেক্ট-ও আসবে, তার স্বভাবটাও বোঝা যাবে।

***লাল স্কুলবাড়ি*-র তিনটি পর্বের শুরুতে আপনার নিজেরই আঁকা তিনটি ছবি রয়েছে। সঙ্গে কবিতার অংশ বিশেষ। ছবিগুলি আঁকার বা ব্যবহারের সেই প্রক্রিয়াটি কেমন ছিল?**

প্রথম প্রেফারেন্স দিয়েছি ছবিটাকে। ছবিটাকে আমি সিলেক্ট করেছি যে, এইরকম ছবি এই ক্যাপশন দিয়ে যাবে। তিনটে ছবি। অনেক চিন্তা করেছিলাম এই বইটার ক্ষেত্রে। ঠিক করেছিলাম তিনটে ছবি দেব, ছবিটাকে পরিষ্কার করার জন্য নীচে তিনটে লেখা। এইভাবেই...।



অলংকরণ : *লাল স্কুলবাড়ি*

***পিলসুজ* পত্রিকার ওই সাক্ষাৎকারেই আপনার মন্তব্য ছিল — 'শুধু ছন্দ কেন, একজন কবির যাবতীয় অলংকার, আঙ্গিক, প্রকরণ এবং চাতুরী, সবই জানা কর্তব্য। একজন কবি ভোরবেলা উঠে কি স্থির করে নেন : আজ আমি যে কবিতাটি লিখব তা গদ্যে হবে না পদ্যে — সনেট না ভিলানেল — স্রগ্ধরা না মালিনী?**

প্রত্যেকটি কবিতা তার নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে আসে। আধারের সঙ্গে আধেয় ওতপ্রোত, অচ্ছেদ্য। কবিতা গান্ধারীর পুত্রদের মতো একটিমাত্র পিণ্ড থেকে জন্মায় না, কুন্তীর ছেলেদের মতো তাদের এক-এক জনের এক-এক রূপ, এক-এক গুণ, এক-এক চরিত্র। ধর্ম, আকাশ, বাতাস, ভেষজ, নিরাময় — সবাই এসে জীবনের গভীর উৎসব সম্পূর্ণ করেন। পাঠক দ্রৌপদীর মন নিয়ে দেখলে ঠিকই বুঝতে পারবেন।'

কেউ যখন সিরিজ লেখেন, তখন তো একটা ফ্লো-এ লিখতে থাকেন হয়তো। সেক্ষেত্রে কি এই ভাবনা কিছুটা হলেও কবির ভেতরে কাজ করে না?

সিরিজ লেখে যখন, তখন সে খানিকটা মেশিনের মতো কাজ করে। কবির মতো ততটা নয়, যতটা মেশিনের মতো। ঠিক আছে?

***পরবাসী, কুড়ানী ও দারুমা সান*-এ এক জায়গায় আপনি লিখছেন — 'ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য — এরা হচ্ছে শিল্প, বস্তুগত, অবয়বময়। কবিতা নিরবয়ব — তাকে কিছুতেই শিল্প বলা যাবে না। তেমন তেমন গল্পও শিল্প নয়। কবিতা আর গল্প যদি শিল্প না হয় তবে তারা কী? বস্তুর ভর আছে, শক্তির ভর নেই — এইভাবে দেখা যাক প্রভেদটাকে। ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের তো ভর আছে, আর কবিতা, গল্পের ভর নেই — তারা শক্তি। ...বস্তুর বিশ্লেষণ বা বিচার করা খানিকটা সহজ। কিন্তু শক্তির বিচার করবে কে? তাই কবিতা বিচার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এইখানে ভালো কবির অসুবিধা এবং খারাপ কবির সুবিধা।'**

সেই সংস্কার মুছে গেছে। শিখাসূত্র ত্যাগ করার পরই বোঝা যায়, কী অভিমানের বাঁধনে এতদিন নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলাম।

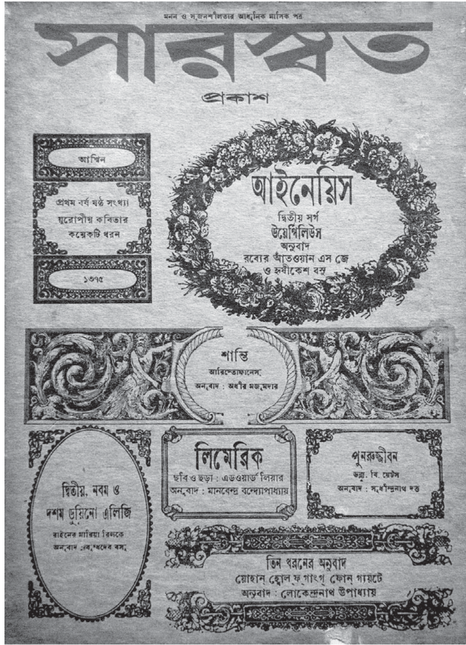
কবিতার আত্মা ও দেহ, আধেয় ও আধার অবিচ্ছেদ্য। — একটিতে পরিবর্তন ঘটালে সেই কর্মফল অন্যটিও ভোগ করবে। সুতরাং ভ্রূণাবস্থায় বাড়তে থাকার কালেই কবিতা তার নির্দিষ্ট দেহ পরিগ্রহ করে নেয়। ভূমিষ্ঠ হবার সময় তার রূপের দ্বিধা অবান্তর। তবু একই কবিতা কেউ পদ্যে ও গদ্যে দুইবার দুই পাঠে লিখেছেন এমনও দেখেছি। আমি তা পারি না। জোর করে লাইন কমিয়ে বা বাড়িয়ে চোদ্দতে এনে চতুর্দশপদী করা যায় — কিন্তু তাতে সে কি বেশি সুন্দরী হবে? যার জন্যে এত ছাঁটকাট ফ্রক ফ্রিল, হয়তো দেখা হয় নি, আসলে সে ছিল পুরুষ বাচ্চা।
অলৌকিকের হাত থেকে যে শব্দটি হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম, মিলের খাতিরে তার বদলে আর একটি শব্দ খুঁজে নেওয়া কঠিন না। কিন্তু কেন? মিল কি এতই জরুরি? অন্যদিকে, কোনো কবিতা যদি বিশেষ ছন্দ, মিল, মাত্রা নিয়ে 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী' হতে চায় তবে তাকেই বা আটকাব কোন্ প্রাণে! কন্যা হত্যা ভ্রূণাবস্থায়ও পাপ।

যেসব কবিতা গদ্যে আসে তাদের আঙ্গিক-প্রকরণ নিয়ে আমার সচেতনতা ও সাবধানতা কোনোক্রমেই কম নয়। গদ্যের ধারণশক্তি বেশি বলেই আমি যেমন আরো সূক্ষ্মতা, আরো ব্যঞ্জনা, শেষ অতলতা দাবি করি তেমনি লক্ষ্যে রাখি দাবি মেটাতে গিয়ে গদ্য যেন তার নিরাভরণ পৌরুষ না খোয়ায়।

অতএব আমাকে বুঝে নিতে হয় প্রত্যেকটি একক শব্দ, তার তন্মাত্র। অনুভব করতে চেষ্টা করি, শব্দ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কাছে যে আবেদন জানায় সেই ধ্বনি, বর্ণ, স্পর্শের অতীত আকৃতিকে। চেতনা থেকে জাগে চক্ষুষ্মান শব্দ, অচেতনা থেকে ওঠে অন্ধ শব্দ। যত দিন যায় শব্দের মাহাত্ম্য তত টের পাই। স্টুডিয়োতে দিনে, ল্যাবরেটরিতে রাত্রে,

এ-লেখা প্রথম প্রকাশের পর কুড়ি বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। আজ এই ২০১৫-১৬ সালে এসে কীভাবে দেখছেন? 'ভালো কবির অসুবিধা এবং খারাপ কবির সুবিধা' কী জায়গায় রয়েছে?

যা বলেছিলাম, এখনও তাই আছে। কিছু পালটায়নি।



মনন ও সৃজনশীলতার আধুনিক মাসিক পত্র

সারস্বত

প্রকাশ

আশ্বিন

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

য়ুরোপীয় কবিতার কয়েকটি ধরন

১৩৭৫

আইনেয়িস

দ্বিতীয় সর্গ

উয়েগিলিউস

অনুবাদ

রব্যের আঁতওয়ান এস জে ও হৃষীকেশ বসু

শান্তি

আরিস্তোফানেস

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

দ্বিতীয়, নবম ও দশম ডুয়িনো এলিজি

রাইনের মারিয়া রিলকে

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

লিমেরিক

ছবি ও ছড়া : এডওয়ার্ড লিয়ার

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনরুজ্জীবন

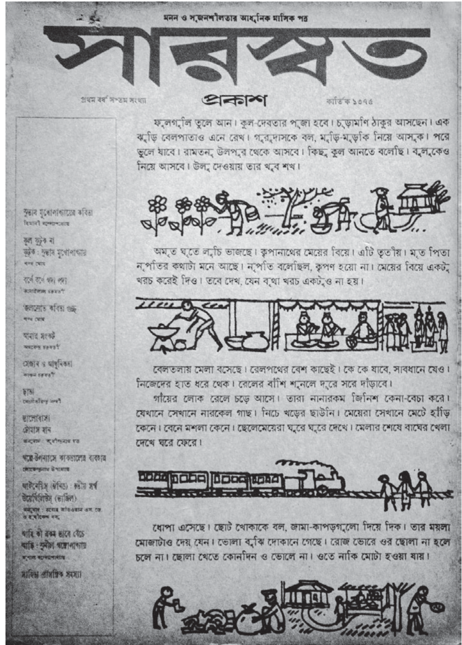
ডব্লু. বি. য়েটস

অনুবাদ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তিন ধরনের অনুবাদ

য়োহান্ ভোল্ফ্‌গাং ফোন্ গ্যয়টে

অনুবাদ : লোকেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়



মনন ও সৃজনশীলতার আধুনিক মাসিক পত্র

সারস্বত

প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা

প্রকাশ

কার্তিক ১৩৭৫

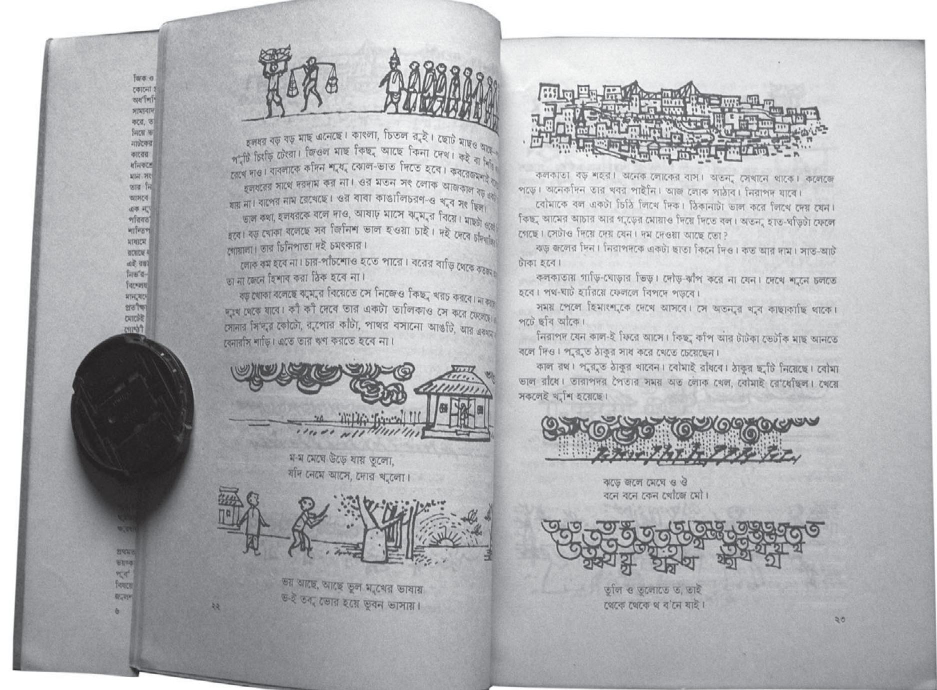
ফুলগুলি তুলে আন। কুল-দেবতার পুজো হবে। চূড়ামণি ঠাকুর আসছেন। এক ঝুড়ি বেলপাতাও এনে রেখ। গুরুদাসকে বল, মুড়ি-মুড়কি নিয়ে আসুক। পরে ভুলে যাবে। রামতনু উলপুর থেকে আসবে। কিছু কুল আনতে বলেছি। বুলুকেও নিয়ে আসবে। উলু দেওয়ায় তার খুব শখ।

অমৃত ঘুতে লুচি ভাজছে। কৃপানাথের মেয়ের বিয়ে। এটি তৃতীয়। মৃত পিতা নৃপতির কথাটা মনে আছে। নৃপতি বলেছিল, কৃপণ হয়ো না। মেয়ের বিয়ে একটু খরচ করেই দিও। তবে দেখ, যেন বৃথা খরচ একটুও না হয়।

বেলতলায় মেলা বসেছে। রেলপথের বেশ কাছেই। কে কে যাবে, সাবধানে যেও। নিজেদের হাত ধরে থেক। রেলের বাঁশি শুনলে দূরে সরে দাঁড়াবে।

গাঁয়ের লোক রেলে চড়ে আসে। তারা নানারকম জিনিশ কেনা-বেচা করে। যেখানে সেখানে নারকেল গাছ। নিচে খড়ের ছাউনি। মেয়েরা সেখানে মেটে হাঁড়ি কেনে। বেনে মশলা কেনে। ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে দেখে। মেলার শেষে বাঘের খেলা দেখে ঘরে ফেরে।

ধোপা এসেছে। ছোট খোকাকে বল, জামা-কাপড়গুলো দিয়ে দিক। তার ময়লা মোজাটাও দেয় যেন। ভোলা বুঝি দোকানে গেছে। রোজ ভোরে ওর ছোলা না হলে চলে না। ছোলা খেতে কোনদিন ও ভোলে না। ওতে নাকি মোটা হওয়া যায়।



হলধর বড় বড় মাছ এনেছে। কাৎলা, চিতল রুই। ছোট মাছও আছে— পুঁটি চিংড়ি টেংরা। জিওল মাছ কিছু আছে কিনা দেখ। কই বা শিঙি রেখে দাও। বাবলাকে কদিন শুধু ঝোল-ভাত দিতে হবে। কবরেজমশাই

হলধরের সাথে দরদাম কর না। ওর মতন সৎ লোক আজকাল বড় একটা যায় না। বাপের নাম রেখেছে। ওর বাবা কাঙালিচরণ-ও খুব সৎ ছিল।

ভাল কথা, হলধরকে বলে দাও, আষাঢ় মাসে ঋদ্ধুর বিয়ে। মাছটা ওকেই দিতে হবে। বড় খোকা বলেছে সব জিনিশ ভাল হওয়া চাই। দই দেবে চাঁদখালির গোয়ালা। তার চিনিপাতা দই চমৎকার।

লোক কম হবে না। চার-পাঁচশোও হতে পারে। বরের বাড়ি থেকে কতজন আসবে তা না জেনে হিশাব করা ঠিক হবে না।

বড় খোকা বলেছে ঋদ্ধুর বিয়েতে সে নিজেও কিছু খরচ করবে। না করলে দুঃখ থেকে যাবে। কী কী দেবে তার একটা তালিকাও সে করে ফেলেছে। সোনার সিঁদুর কৌটো, রুপোর কাঁটা, পাথর বসানো আঙটি, আর একখানা বেনারসি শাড়ি। এতে তার ঋণ করতে হবে না।

ম-ম মেঘে উড়ে যায় তুলো,
যদি নেমে আসে, দোর খুলো।

ভয় আছে, আছে ভুল মুখের ভাষায়
ভ-ই তবু ভোর হয়ে ভুবন ভাসায়।

২২

কলকাতা বড় শহর। অনেক লোকের বাস। অতনু সেখানে থাকে। কলেজে পড়ে। অনেকদিন তার খবর পাইনি। আজ লোক পাঠাব। নিরাপদ যাবে।

বৌমাকে বল একটা চিঠি লিখে দিক। ঠিকানাটা ভাল করে লিখে দেয় যেন। কিছু আমের আচার আর গুড়ের মোয়াও দিয়ে দিতে বল। অতনু হাত-ঘড়িটা ফেলে গেছে। সেটাও দিয়ে দেয় যেন। দম দেওয়া আছে তো?

ঝড় জলের দিন। নিরাপদকে একটা ছাতা কিনে দিও। কত আর দাম। সাত-আট টাকা হবে।

কলকাতায় গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়। দৌড়-ঝাঁপ করে না যেন। দেখে শুনে চলতে হবে। পথ-ঘাট হারিয়ে ফেললে বিপদে পড়বে।

সময় পেলে হিমাংশুকে দেখে আসবে। সে অতনুর খুব কাছাকাছি থাকে। পটে ছবি আঁকে।

নিরাপদ যেন কাল-ই ফিরে আসে। কিছু কপি আর টাটকা ভেটকি মাছ আনতে বলে দিও। পুরুত ঠাকুর সাধ করে খেতে চেয়েছেন।

কাল রথ। পুরুত ঠাকুর খাবেন। বৌমাই রাঁধবে। ঠাকুর ছুটি নিয়েছে। বৌমা ভাল রাঁধে। তারাপদর পৈতার সময় অত লোক খেল, বৌমাই রেঁধেছিল। খেয়ে সকলেই খুশি হয়েছে।

ঝড়ে জলে মেঘে ও ঔ
বনে বনে কেন খোঁজে মৌ।

তুলি ও তুলোতে ত, তাই
থেকে থেকে থ ব'নে যাই।

২৩

সারস্বত পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা

***চাঁদের ওপিঠে*-তে একজায়গায় বলছেন — '...তাহলে এই প্রস্তাবিত কবিতার শরীর কেমন হওয়া উচিত? গদ্য পদ্যের বিরোধ ভঞ্জন ইত্যাদি কথা তো অনেক হয়েছে। তবু এখনও আমরা সেই রবীন্দ্রনাথেই আছি। আসলে কবিতার কথা ভাবলেই আমরা যেন ক্লীবাবস্থা পাই — মন উদাস হয়ে যায়, কলম এলিয়ে পড়ে, ভাষা বেপথু। জীবনে যা ভাবি, যে কথা বলি, কবিতায় গেলেই যেন তাকে উলটেপালটে দিতে হবে। অথবা এ যেন এক**

পরীক্ষা করি বাক্য — তার গড়ন, অন্বয়, ঘনতা, লঘুতা — পংক্তির দৈর্ঘ্য, ছেদ, সংস্থান।

তার পরেও মনে হয়, পদ্যের পরে গদ্যও বোধহয় যথেষ্ট না। আর কি কোনো ভাষা আছে? সংলাপ, ডায়েরি, চিঠি, বক্তৃতা, জাবেদা খাতা, গোপন ভাষা, গুহ্য ভাষা, মাছের ভাষা, পাখির ভাষা, স্বরলিপি, মর্স কোড — সমস্ত খনি থেকে আহরণ করে করে হয়তো এমন কোনো ভাষা পাওয়া যাবে যা একেবারে অন্য কবিতার জন্ম সম্ভব করবে। আমার অসম্ভব ইচ্ছে করে, মহারাজ হর্ষবর্ধনের মতো পাঁচ বছর পর পর রাজকোষে যা-কিছু জমেছিল সব বিলিয়ে দিয়ে আবার কৌপীন থেকে নতুন করে শুরু করি।

'আমার আঙ্গিক ভাবনা', 'উত্তর দ্বাদশ', *চাঁদের ওপিঠে*

তা হলে এ যুগের, এই মানুষদের কবিতা কেমন হবে? কেমন হওয়া উচিত? কবিতা, যার একদিক অনির্দেশ্য অনির্বচনীয়কে স্পর্শ করে আছে, সে কেমন হবে, কেমন হওয়া তার উচিত, এমন কোনো ফরমান জারি করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবু প্রারম্ভিকভাবে এইটুকু বলা যায়, কম্পিউটার, গাইগার কাউন্টার, পারমাণবিক বোমা, মঙ্গল চাঁদ শুকতারায় যাবার হাউই ও জাহাজ যে সূক্ষ্ম, নিপুণ, সংবেদনশীল, নির্ভুল, প্রলয়বীর্য, অনন্তভেদী, অমোঘলক্ষ্য ধ্যানের ফল, আমাদের কবিতাকেও যেতে হবে সেই পথে। এ কথার অর্থ কিন্তু এই নয় যে আমি কবিতার মধ্যে কিছু সফিস্টিকেটেড যন্ত্রপাতির লোহালক্কড় বা নাড়িভুঁড়ি বা কিছু বৈজ্ঞানিক সমীকরণ ভরে দিয়ে তাকে এক মহাপণ্ডিত রোবট বানাতে চাইছি। আমি চেয়েছি তার আত্মা হোক অনন্তসম্ভব আর সেই অনুযায়ী তার দেহ হোক নিখুঁতগঠন।

'হিতোপদেশ', *চাঁদের ওপিঠে*

যদি কেউ মনে করেন, কবিতাও ঐরকমই দেহনির্ভর শিল্প তাহলে তিনি ভুল করবেন। ছন্দ, শব্দ, মাত্রা, ধ্বনি, ছত্রের বিন্যাস — বহিরঙ্গে এই সবই আছে সত্যি,

প্রেতাবিষ্ট অবস্থা — আমরা নিজেরা কথা বলি না; চালু, বিবর্ণ, মৃত কবিতার প্রেত আমাদের গলা অধিকার করে নেয়, আমাদের গলায় সে-ই কথা বলে। আর, পরে আমরা রটাই — আমরা নির্মাণ করি না, আমাদের ভর হয়। একটু উপরের স্তরে, যাঁরা সত্য কথা ছাড়া বলেন না, এমন কি সেই তীব্র সৎপুরুষরাও কবিতার সামনে কেমন যেন 'হত ইতি গজ'-এর বিলোল যুধিষ্ঠির হয়ে যান। এর চেয়ে পুরো মিথ্যুক হওয়া ভালো ছিল।'

কবি ও কবিতার ক্ষেত্রে এমনটা কেন হয় বলে মনে করেন?

বলে তো, কবিরা বলে না? আমার ভুল হতে পারে, এটা হচ্ছে যে, একটা কথা আমি বলব, সেই কথাটা আমার ভেতর থেকে আসবে। আমি বিশ্বাস করব। তা না, কবি হলে পরে কীরকম বলা উচিত ছিল, সেই কথা ভেবে যদি বলি, তাহলে সেটা আমার কথা হল না। এবং এটা খুবই এলোমেলো ব্যাপার হয়ে যায়। তারপর, কবিতার ভাষা যেন আলাদা! কেন? আমাদের মুখের ভাষা কি যথেষ্ট নয়? অথবা, কবিতার ভাষা যদি অন্যরকম হয়ও, সেইটা মুখের ভাষার সঙ্গে মিশে যাক।

ওই একই লেখায় বলছেন — 'কবিতাকে আমরা, অভ্যাসবশত, বহুদিন ধরে ভেবে আসছি স্ত্রীলিঙ্গ। সেভাবেই আমরা তাকে সাজাইগোজাই। কেন, তাকে কি পুংলিঙ্গ ভাবা যায় না? শুধু দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনেই হয়তো তার শরীর ও আত্মা, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত পথে, পালটে যেতে পারে।'

এই জায়গাটা যদি একটু সবিস্তারে বলেন।

কবিতাকে আমরা সাধারণত মেয়ে ভাবি। মেয়ে ভাবি এই জন্যে যে, সে নরম, সে সব সহ্য করতে পারে না, সে সুন্দর, তার ভাষা স্বতন্ত্র হয়। কবিতার আবার চেহারার বর্ণনা আছে, তার কোমর সরু হবে, নিতম্ব মোটা হবে। এর কী মানে আছে! মনে করো, স্ট্রাইক নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, সেইটা কি এই কবিতার চেহারাতে মানাবে? প্রত্যেকটা লেখার যে-ভাব, সেই লেখা কিন্তু সেই ভাবকে ধারণ করার উপযুক্ত হওয়া চাই।

আপনার *টুনুনান্টাং* লেখাটি শেষ হচ্ছে এইভাবে — '...আদিম স্তরে রয়ে গেছে এমন নরগোষ্ঠীর কিছু গান উপস্থিত করছি, যদি তাতে শব্দদৈন্য এবং অর্থহীন ধ্বনির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কিছু বোঝা যায় :

হা মা লা হা মা লা হা মা লা হা মা লা
ও লা লা লা লা লা লা লা লা লা

টেরা ডেল ফুয়েগোর অধিবাসী ইয়ামানা ইন্ডিয়ানদের এই গান কাউকে দেখে স্বাগত, বিস্ময় ও আনন্দ জানাবার গান, ছোট ছোট লাফের সঙ্গে গাওয়া হয়। ইয়ামানাদের গান এই রকমই — সত্যিকারের শব্দ একটাও নেই, সবই অর্থহীন ধ্বনি। কিন্তু তাদের ভাবাবেগটা তো বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে।

তান্ তান্দিনানান্ তান্দিনানে
তানান্ তান্দিনা তান্দিনানে

শ্রীলংকার ভেদ্দা আদিবাসীরা তাদের অর্থসঙ্গত গানের শুরুতে এবং শেষে এই অর্থহীন ধ্বনিগুলি ঐ অনুক্রম রক্ষা করে গায়। আমাদের সংগীতে তেলেনা অথবা দক্ষিণী নাচের বোল হয়তো এই একই জিনিস, উচ্চস্তরের শিল্পীদের গায়নে যা ক্রমশ সূক্ষ্ম এবং দুর্ধর্ষ শিল্পিতা পেয়েছে।

ধ্বনিসাদৃশ্যে আরো অনেক তুলনা মনে আসে। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর একটি :

টুনুনান্টাং টুনুনান্টাং লোহিত যাচ্ছে বয়ে...
টুনুনান্টাং টুনুনান্টাং সময় যাচ্ছে ক্ষয়ে।

ব্রহ্মপুত্রের জল বয়ে যাওয়া বা ধমনীতে রক্তের শব্দ কিংবা আয়ু ক্ষয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই অতীব অর্থপূর্ণ। কিন্তু শেষে ঐ কঠিন সত্য আর মনে থাকে না, শুধু বাজতে থাকে অর্থহীন টুনুনান্টাং ধ্বনি — যে ধ্বনি জলকলরবের আর সময়ের ঘণ্টার। অতএব অবোধ্য ধ্বনিও সবসময় নিরর্থক নয়, আদিমদের ধ্বনি তো নয়ই।'

এখানে 'ধ্বনি'-র কথা বলছেন। দৃশ্যও কি নয়? 'অর্থহীন' শব্দও কি চোখের উপর ভাসতে থাকে না?

যার যেমন ক্যাপাসিটি, সে তেমনি এনজয় করে। এলিয়টের লেখায় রয়েছে না — ডা ডা ডা। সংস্কৃত। এমন বাজ চমকাচ্ছে যে মানুষ একরকম শব্দ করছে, অসুররা আরেকরকম করছে, আর দেবতারাও আরেকরকম করছে। এটা শব্দের ব্যাপার হল। কিন্তু যে-ভাষায় কবিতাটা লেখা, সেখানে তো এইটা, মানে, সংস্কৃত যায় না। আবার ধরো, আমির খান। ওঁরা সরগম করেন তো, সরগমে প্রথমে ছবিটা আনার চেষ্টা করেন — গলাতে কাজ করলে, সেইটে একটা ছবি আনে কি না। তো, আমির খান বলছেন যে, 'রে' লাগাতেই কৈলাশের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। যখনই 'রে' লাগাচ্ছেন, কৈলাশের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। তখন বুঝতে পারছেন যে, 'রে'-টা ঠিক আছে। এটাও তো শব্দ থেকে দৃশ্যে আসছে। এগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িত। খুব সূক্ষ্মভাবে জড়ানো রয়েছে। আমাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণাগুলো যত সূক্ষ্ম হবে, তত আমরা এদের হদিশ পাব।

কিন্তু ওদের পেরিয়েও যিনি আছেন তিনিই আসল। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার প্রাণহীন কামুক বিচারকদের কাছে নিখুঁত মাপজোকই সব, যার সঙ্গে মেয়েটির নারী-অস্তিত্বের তুচ্ছতা বা মহিমার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। কবিতায় চিরদিনই আলংকারিকদের আরাধ্য সেই বহিরঙ্গ শিল্পের চেয়ে ভিতরের প্রাণমর্মরের মূল্য বেশি। এটিই কবিতার শিল্প-পেরোনো শিল্প বা শিল্পের অন্তরে শিল্প।

বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ কোনো শিল্পই কাজের কাজ কিছু করে না, শুধু চেতনাকে আনন্দিত করে। তাছাড়া, ছবি যেমন শুরুতেই চোখের সুখ আনে, গান যেমন শুরুতেই কানের সুখ আনে, কবিতা শুরুতে তেমন কিছুই আনে না। কবিতা, তাকে আমরা এখন যেভাবে জানি, শুধু বই খুলে মনে মনে পড়ার। প্রত্যক্ষভাবে নয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় পড়তে পড়তে জেগে ওঠে — অপ্রত্যক্ষভাবে কাজ শুরু করে — চেতনায় সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সংহত হয়ে এসে দেশকালকেও জড়িয়ে নিয়ে কাজ করে। একটুকরো তুচ্ছ কাগজে নলখাগড়ার কলমে আঁকা এমন দূরবিসারী শিল্প আর কে আছে!

'শিল্প পেরোনো শিল্প', *জনমানুষ ও বনমানুষ*

ছাপার পৃষ্ঠা এখনকার লেখকদের উপরেও প্রভাব ফেলেছে তাদের অজানিতে। কবিরা, বিশেষ করে, ছাপা পাতার ভিসুয়াল ইফেক্টের কথা না মনে রেখে পারেন না, অনেক সময় মুদ্রণ শিল্পের সহায়তায় বাড়তি ইফেক্ট তৈরি করার চেষ্টা করেন। মুদ্রণযন্ত্র একটি মেশিন, কিন্তু অভ্যাসবশত মেশিনের মধ্য দিয়েই আমরা এখন চেতনার অনেক জটিলতা প্রকাশ করি।

কোনো লিপির ক্রমবিকাশে তার রূপান্তর বিভিন্ন পর্যায়ে কিভাবে হয়েছে তা পণ্ডিতেরা জানেন। আমি চমৎকৃত হই লিপির রৈখিক গুণ ও শেষ চরিত্র দেখে, বিশেষ করে চীনা, জাপানী, আরবী ও ফারসী দেখে। মনে হয় লিপির চরিত্রের উপরেও সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করে সাহিত্যের চরিত্র। অথবা ভাইসি ভার্সা।

'টুনুনান্টাং', *পরবাসী, কুড়ানী ও দারুমা সান*

‘এতদিন পরে আমার মনে হয়, কবিতার ইলাস্ট্রেশন আদৌ হয় না। কবিতাটাকে কবিতার মতো, ছবিটাকে ছবির মতো দেখাই ভালো।’

ক থো প ক থ ন

কৃষ্ণেন্দু চাকী

আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল ‘কবিতা যেমন দেখায়’ বিষয়টিতেই। তবে তার আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে এল আরও নানা কথা। *বোধশব্দ*-র পক্ষ থেকে শিল্পী কৃষ্ণেন্দু চাকীর সঙ্গে কথা বললেন **বরুণ চট্টোপাধ্যায়**।

কবিতার ইলাস্ট্রেশন আমাদের এই সংখ্যার বিষয় নয়। কিন্তু ইলাস্ট্রেশন করতে গিয়ে একজন শিল্পী কীভাবে কবিতাটাকে দেখেন, বা কী ভাবেন, সেটা জানা জরুরি। শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাইব, কবিতার ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে একজন শিল্পীর ভাবনা কীভাবে কাজ করে?

আমার যেটা মনে হয়, এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। এবং একজন শিল্পী কতটা কবিতা বোঝেন, তার উপরে ডিপেন্ড করে। যেমন, সিগনেট প্রেস-এর প্রথম যুগে সত্যজিৎ রায়ের করা কবিতার বই-এর সেইসব অপূর্ব মলাটগুলো — *পারাপার*, *সংবর্ত*, *অর্কেস্ট্রা*, *নীল নির্জন*, *রূপসী বাংলা*, *বনলতা সেন*। এগুলোর পর আমার প্রথমেই মনে আসছে পূর্ণেন্দু পত্রীর কথা। উনি যেহেতু নিজে কবি ছিলেন, তাই উনি যখন কবিতা নিয়ে ডিল করতেন, কবিতা নিয়ে কাজ করতেন, তখন কিন্তু সরাসরিই একজন কবির দৃষ্টিকোণগুলো মিশে যেত। মানে, সেটা শুধু একজন শিল্পীর ইলাস্ট্রেশন নয়, একজন কবির করা ইলাস্ট্রেশনও। *দেশ*-এ যখন বলা যায়, বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হল কবিতার ইলাস্ট্রেশন, পরপর দুটো সংখ্যায় দুটো কবিতার ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন পূর্ণেন্দুদা — শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *ভয় আমার পিছু নিয়েছে* এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়*। এই দুটোকে আমি মনে করি আধুনিক বাংলা কবিতায় ইলাস্ট্রেশনের খুব ভালো দুটো নিদর্শন। পূর্ণেন্দুদা ছাড়া পৃথ্বীশদা, মানে, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ও কবিতার সঙ্গে অসম্ভব ভালো কিছু কাজ করেছিলেন। খুব ইমাজিনেটিভ।

আরেকটা দিক হচ্ছে, এটা জোর করে হয় না, সকলের মধ্যে কবিতা থাকে না। অনেক শিল্পীই আছেন, হয়তো অন্য কাজ খুব ভালো করেন, কিন্তু কবিতার ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আড়ষ্ট হয়ে যান। তার কারণ হচ্ছে, কবিতার যে-ভাষা, কবিতার যে-সংকেত, এটা সবাই না-ও ফিল করতে পারেন। কবিতা অনুভব করার ব্যাপার, এটা ঠিক ওইভাবে জোর করে হয় না। তো, এরকম আমরা দেখেছি, অনেক মেজর গ্রাফিক ডিজাইনার, কিন্তু কবিতার জন্য খুব ভালো কাজ করতে পারেননি। তার মানে কখনোই এই নয় যে, তাঁরা কম শক্তিশালী শিল্পী। কিন্তু সত্যিই কবিতা ভেতরে না থাকলে হয় না। সেটা করা যায় না। কবিতার ছবি আঁকার জন্য এমন এক ধরনের মেজাজ দরকার, এমন একটা মন দরকার, যেটা কাব্যিক। মানে, সরাসরি বলতে গেলে তা-ই বোঝায়। সেইটা না হলে কিন্তু কবিতার ছবি হয় না।

আর, কবিতার সেই অর্থে ইলাস্ট্রেশন হয় বলেই আমি মনে করি না। এটাও একটা পয়েন্ট যে, কেন ইলাস্ট্রেশন হবে? সবকিছুর ইলাস্ট্রেশন তো হয়ও না। আমরা যেটা বলতে পারি, সমমনস্ক আরেকটা শিল্পকর্ম ওটাকে সাপোর্ট করছে। এইটা হতে পারে। ধরো, কোনো-একটা পেন্টিং, কেউ হয়তো সেটা কোনোকিছুর কথা না ভেবে, নিজের মতো করেই করেছে, অথচ সেটা কোনো-একটা কবিতার সঙ্গে খুব সুন্দর ফিট করে গেল। এরকম কোনো যোগাযোগ হয়তো কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়ও। কিন্তু সরাসরি আক্ষরিক অর্থে কবিতার কোনো ইলাস্ট্রেশন হয় বলেই আমি মনে করি না। কেননা এটা তো ন্যারেটিভ নয়। এমনকী যে-জিনিসটা একদম সরাসরি ন্যারেটিভ, সেটার ক্ষেত্রেও তো ইলাস্ট্রেশন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এমন কিছু যদি ইলাস্ট্রেশন না দিতে পারে, যেটা সাহিত্য দিতে পারছে না, তা নইলে কিন্তু সেটা করার কোনো দরকার নেই। নাহলে তুমি আরেকটা শিল্পমাধ্যমের কাছে যাবে কেন, একজন লোক তো লিখেইছে! ছবির যে-মজাটা, সেটা যখন এমন একটা-কিছুর স্বাদ দিতে পারে, যেটা লেখার মধ্যে নেই বা লেখাতে আনা সম্ভব না, অর্থাৎ একটা আলাদা মাত্রা যোগ হচ্ছে, কেবল তখনই সেটার কথা ভাবা যেতে পারে। কবিতাটা ন্যারেট করা, বা কবিতাটা আরেক বার বলা আর্টিস্টের কাজ নয়। যেমন, কমলকুমার মজুমদার প্রচলিত ছড়ার জন্য ছবি এঁকেছিলেন, *আইকম বাইকম*, *পানকৌড়ি* বইতে — কী ইউনিক কাজ! লৌকিক ছড়ার আশ্চর্য আজগুবি ও রহস্যময় জগৎটা অপূর্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল তাঁর ছবিতে। যার আবেদন একেবারেই নিজস্ব। কোনো অবস্থাতেই ওই কাজগুলোকে ছড়ার ন্যারেশন বলে মেনে নেওয়া যায় না।

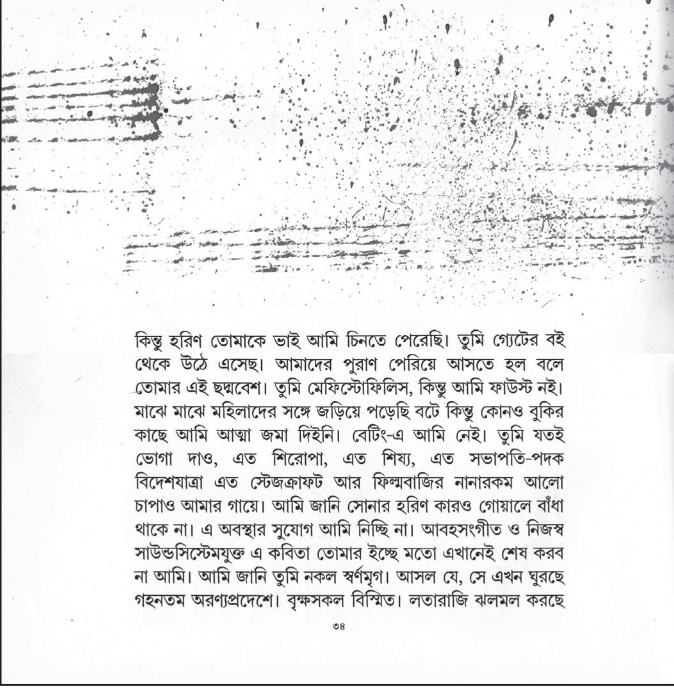
কিন্তু আপনারা যখন পেশাদারভাবে কোথাও কাজ করেছেন বা চাকরি করেছেন — যেমন, *দেশ*-এ তো কবিতা ইলাস্ট্রেট করার একটা ব্যাপার ছিল।

আমরা যখন কাজ করেছি, আমাদের কেউ কিছু বলেনি। আমাদের স্বাধীনতা ছিল। আমি জানি না, এখন, এই মুহূর্তে ঠিক কীরকম। কিন্তু আমাদের সেই অর্থে কেউ কোনো নির্দেশ দেয়নি। কিন্তু একটা কথা আমার সবসময় মনে হয়েছে, যদি আমি জিনিসটাকে খুব ভালোবেসে দেখি, তাহলে সেটা খুব ফ্রি একটা জায়গা চায়। সেটা সবসময় তো আর কাগজে সম্ভব নয়। কাগজেরও তো কতগুলো নিজস্ব বাধ্যবাধকতা আছে। আবার অনেকদিন আগে যেমন একটা বই করেছিলাম একদম নিজের মতো করে। *হরিণের জন্য একক*। ওটা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমরা করেছিলাম — আমি এবং জয় (গোস্বামী)। তো, ওখানে কখনো টাইপটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে, কখনো বড়ো হয়ে যাচ্ছে — আমরা নিজেরাই আলোচনা করে সেসব ঠিক করেছিলাম — যেগুলো ফিসফিস করে কথা, কবিতায় আছে, সেগুলো ছোটো টাইপে যাবে — যেগুলো বেশি লাউড, সেগুলো বড়ো হরফে যাবে।

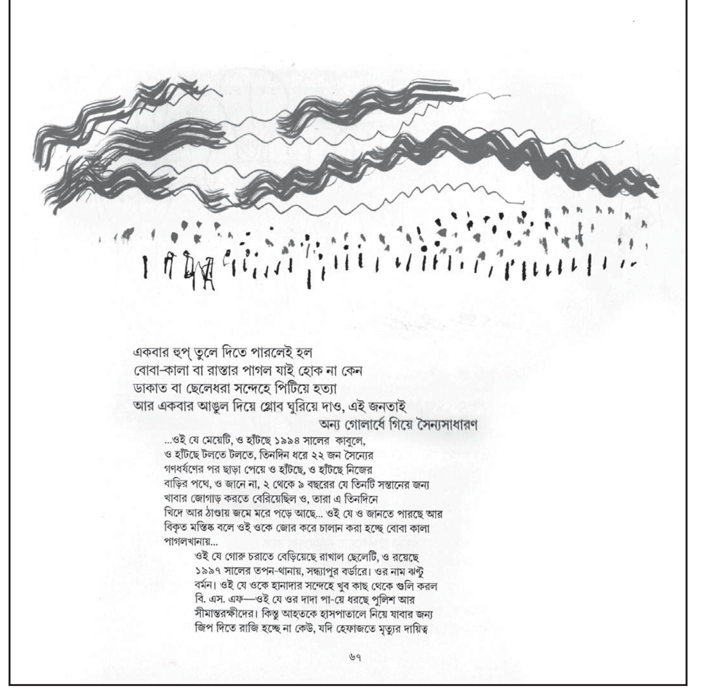
কবিতার স্বভাব অনুযায়ী...

হ্যাঁ, কবিতার স্বভাব অনুযায়ী। সেই মুড অনুযায়ী কিন্তু আমি কাজ করছি। সমস্ত জিনিসটার মধ্যে, লক্ষ করবে, একটা উন্মাদনা আছে এবং একটা ফ্রি বা স্বচ্ছন্দ ব্যাপার আছে। এটা থাকলে পরেই আমার মনে হয় ভালো। কাউকে যদি অনেক রকমের নির্দেশ দেওয়া হয়, পরামর্শ দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো সেই জায়গাটা অ্যাচিভ না-ও করতে পারে, ফলে তার কাজটা হয়তো ততটা ভালো হবে না।

যিনি কবি, তিনি এখানে অংশগ্রহণ করছেন — বা, আপনিও কোথাও কবিতাটায় অংশগ্রহণ করছেন — অর্থাৎ একটা মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে। কিন্তু যেখানে কবি আপনার সামনে নেই, বা অচেনা মানুষ, সেটা তো আরেক রকমের কাজ।


কিন্তু হরিণ তোমাকে ভাই আমি চিনতে পেরেছি। তুমি গ্যেটের বই থেকে উঠে এসেছ। আমাদের পুরাণ পেরিয়ে আসতে হল বলে তোমার এই ছদ্মবেশ। তুমি মেফিস্টোফিলিস, কিন্তু আমি ফাউস্ট নই। মাঝে মাঝে মহিলাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি বটে কিন্তু কোনও বুকির কাছে আমি আত্মা জমা দিইনি। বেটিং-এ আমি নেই। তুমি যতই ভোগা দাও, এত শিরোপা, এত শিষ্য, এত সভাপতি-পদক বিদেশযাত্রা এত স্টেজক্রাফট আর ফিল্মবাজির নানারকম আলো চাপাও আমার গায়ে। আমি জানি সোনার হরিণ কারও গোয়ালে বাঁধা থাকে না। এ অবস্থার সুযোগ আমি নিচ্ছি না। আবহসংগীত ও নিজস্ব সাউন্ডসিস্টেমযুক্ত এ কবিতা তোমার ইচ্ছে মতো এখানেই শেষ করব না আমি। আমি জানি তুমি নকল স্বর্ণমৃগ। আসল যে, সে এখন ঘুরছে গহনতম অরণ্যপ্রদেশে। বৃক্ষসকল বিস্মিত। লতারাজি ঝলমল করছে

৩৪


একবার হুপ্ তুলে দিতে পারলেই হল
বোবা-কালা বা রাস্তার পাগল যাই হোক না কেন
ডাকাত বা ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা
আর একবার আঙুল দিয়ে গ্লোব ঘুরিয়ে দাও, এই জনতাই
অন্য গোলার্ধে গিয়ে সৈন্যসাধারণ

...ওই যে মেয়েটি, ও হাঁটছে ১৯৯৪ সালের কাবুলে,
ও হাঁটছে টলতে টলতে, তিনদিন ধরে ২২ জন সৈন্যের
গণধর্ষণের পর ছাড়া পেয়ে ও হাঁটছে, ও হাঁটছে নিজের
বাড়ির পথে, ও জানে না, ২ থেকে ৯ বছরের যে তিনটি সন্তানের জন্য
খাবার জোগাড় করতে বেরিয়েছিল ও, তারা এ তিনদিনে
খিদে আর ঠাণ্ডায় জমে মরে পড়ে আছে... ওই যে ও জানতে পারছে আর
বিকৃত মস্তিষ্ক বলে ওই ওকে জোর করে চালান করা হচ্ছে বোবা কালা
পাগলখানায়...

ওই যে গোরু চরাতে বেড়িয়েছে রাখাল ছেলেটি, ও রয়েছে
১৯৯৭ সালের তপন-থানায়, সন্ধ্যাপুর বর্ডারে। ওর নাম ঝণ্টু
বর্মন। ওই যে ওকে হানাদার সন্দেহে খুব কাছ থেকে গুলি করল
বি. এস. এফ—ওই যে ওর দাদা পা-য়ে ধরছে পুলিশ আর
সীমান্তরক্ষীদের। কিন্তু আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য
জিপ দিতে রাজি হচ্ছে না কেউ, যদি হেফাজতে মৃত্যুর দায়িত্ব

৬৭

হরিণের জন্য একক গ্রন্থের দু-টি পৃষ্ঠা

এবং আরও একটা বিষয়, যখন কাগজের পাতায় কবিতা সাজানো হচ্ছে, ধরা যাক, দু-পাতা মিলিয়ে নানাজনের লেখা মোট সাতটা কবিতা যাবে। এবার, তাদের কেউ একটু ছোটো, কেউ একটু লম্বা, কেউ একটু চওড়া — শিল্পী তখন কীভাবে নির্বাচন করবেন?

আমি যেটা সবসময় করে এসেছি, আমি যেকোনো একটা কবিতাকে বেছে নিয়েছি। এটা আমার মনেই হয়নি কখনো যে চারটেকেই করতে হবে, বা সাতটাকেই করতে হবে। দুটো কবিতার ছবি কখনো একসঙ্গে হতে পারে না। আলাদাভাবে কোনো ক্ষেত্র না পেলে কখনো দুটো জিনিসকে একইসঙ্গে দেখানো যায় না। তার কারণ, দুটোর অ্যাপ্রোচ আলাদা, দুটোর টেম্পারামেন্ট আলাদা। তুমি দ্যাখো না, সাতটা লেখা যেমন বলছ, সাতরকম হাতের লেখা যদি একটা পাতায় রাখো — কেউ গোল-গোল করে লেখে, কেউ হয়তো খুব ফাস্ট লেখে, আবার কেউ ভেবে-ভেবে আস্তে-আস্তে লেখে, কারো লেখা হয়তো খুব জড়ানো — মানে, সাতটা লেখা সাতরকম। একটা লোকের হাতের লেখায় কিন্তু তার টেম্পারামেন্টের ছাপ থাকে। কবিতাও ঠিক তাই। আমি কখনো দুটো কবিতা মিশিয়ে ইলাস্ট্রেট করার চেষ্টা করিনি। যেগুলো করা গেল না, গেল না! যেটার ছবি ভালো হয় বলে মনে হয়েছে, সেটাই বেছে নিয়েছি। তবে, আবারও বলছি, এতদিন পরে আমার মনে হয়, কবিতার ইলাস্ট্রেশন আদৌ হয় না। কবিতাটাকে কবিতার মতো, ছবিটাকে ছবির মতো দেখাই ভালো।

তার মানে, আপনার তো কোথাও একটা মানসিক অবরোধ ছিল...

হ্যাঁ, এখনও আমি তা-ই বিশ্বাস করি যে লিটারেলি কবিতার ইলাস্ট্রেশন হয় না। কিন্তু আমি যেটা করি, সেটা এইভাবে বলতে পারো যে, একটা জিনিস ভালো লাগলে তুমি সেটাকে অবলম্বন করে বা সেই মেজাজটা রেখে তোমার মতো করে আরেকটা জিনিস করতে পারো। তাতে কোনো বাধা নেই। আমি কখনো মনে করিনি যে *হরিণের জন্য একক* আমি ইলাস্ট্রেট করছি। ও ওর মতো করেছে, আমি আমার মতো করেছি। পুরোটা একটা কোথাও আমি গ্রাফিকালি অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছি। ওই যে অক্ষরগুলোকেও সাজিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে, এখানেও একজন ডিজাইনারের বা আর্টিস্টের ভূমিকা থাকবে। যেমন, পিকাসো অনেকসময় করেছেন; পিকাসোর বন্ধু ছিলেন আপলিনের, তাঁর বইতে। মাতিস করেছেন, জাঁ কক্‌তো তো করেইছেন। উনি নিজেও যেহেতু কবি — ইনফ্যাক্ট, আমি একটা বই দেখেছিলাম, কার্তিয়া ব্রেঁসো-র ফোটোগ্রাফের একটা কালেকশন, সেটার মলাট কিন্তু ফোটোগ্রাফ দিয়ে নয়, মাতিসের একটা ড্রয়িং দিয়ে! এটা ভীষণ ভালো লেগেছিল আমার! তার কারণ কী, এখানে একটা শিল্পমাধ্যম আরেকটা শিল্পমাধ্যমকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। মানে, অ্যাপ্রোচটা এই। সেইরকমই কবিতার ক্ষেত্রেও হতে পারে না কি? আমি এইভাবেই দেখি।

আবার, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আমি বলব, কবিতার সঙ্গে ছবি না দিয়েও ভালো লাগে। শুধু কবিতাগুলোই পরপর যাচ্ছে, আমার কাছে এইটা খুব ভালো; পাঠক ছবির কথা নিজে ভাববে। কিন্তু ম্যাগাজিনে সবসময় তো ওইরকম হয় না, তখন স্ট্রেট ওরকম একটু বোবা লাগে। কোনো-একটা ছবি তখন দারুণ ভূমিকা পালন করে। জাস্ট একটা পেন্টিং হয়তো। যে এঁকেছে, সে কবিতাটা পড়েনি। যে লিখেছে, সে-ও ছবিটা দেখেনি। কিন্তু কোনো একজন সম্পাদক, বা শিল্পী, বা কবি নিজেও সেই ভূমিকাটা পালন করতে পারেন — ছবিটা নির্বাচন করলেন, যে এটা এর সঙ্গে খুব ভালো যায়। কবিতার সঙ্গে ছবি আরও বেশি সংকেতময় হতে পারে। ভালো লাগে।

***মিরর*-এ তারকোভস্কি তাঁর বাবার কবিতা ব্যবহার করছেন। সেই জায়গায় তিনি ক্যামেরা একেবারে নড়াচ্ছেন না। প্রথমত, এটা তাঁর বাবার প্রতি শ্রদ্ধা। পরে *স্কালপটিং ইন টাইম*-এ লিখছেন — একটা কবিতা পড়া হচ্ছে, তখনও ক্যামেরা নড়ছে মানে, আমি দুটো মাধ্যমকে হিউমিলিয়েট করছি।**

একজ্যাক্টলি। আমি এটাই বলতে চাইছি, কিন্তু অন্যভাবে। ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যদি কবিতার মেজাজটা বজায় রেখে সম্পূর্ণ নতুন একটা কাজ করা যায়, একমাত্র তবেই সেটা সার্থক হতে পারে। কোনো মাধ্যমই হিউমিলিয়েটেড হয় না।

বরং এটা কি একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধের যে, ধরা যাক, তাঁকে একটা কবিতার বই ইলাস্ট্রেট করতে দেওয়া হল। তিনি বললেন যে, আমি

আঁকব কি আঁকব না, সেটা আমার বিষয় — আমি ইলাস্ট্রেট করব। তখন তাঁর মাথার মধ্যে যত ছবি রয়েছে, যা তিনি দেখেছেন আজ পর্যন্ত, তিনি সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন।

একজ্যাক্টলি। তিনি সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন, ছবি না এঁকেও তিনি সম্পূর্ণ বইটা ইলাস্ট্রেট করতে পারেন শুধু অক্ষর দিয়ে, সংখ্যা দিয়ে, এমনকী শুধুমাত্র স্পেস ব্যবহার করেও। অ্যাপ্রোচটা কী হবে, সেটা তো শিল্পীর উপরে। এবং আমরা দেখেছি বহু ক্ষেত্রে, একটা গতানুগতিক চিন্তা থেকে মানুষ যেভাবে করে এসেছে, আগে দু-হাজার কাজ এভাবেই হয়েছে, কাজেই এটাই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা — এই টেম্পারামেন্ট যার মধ্যে থাকবে, সে কিন্তু কবিতার জন্য খুব ভালো ছবি করতে পারবে না। তাকে সবসময় আরেকটা ক্ষেত্রকে ভাবতে হবে... আরও কী-কী হতে পারে বা আর কী-কী হওয়া সম্ভব... এখান থেকে কী-কী বাদ দেওয়া যেতে পারে... বা, নতুন কী ঢোকানো যেতে পারে... সমস্তটাই ভাবনার প্রসেসের মধ্যে থাকতে হবে। অনেক ইনোভেটিভ হতে হবে।

একটা কবিতার বই, যেখানে একেক পাতায় একেকটি কবিতা ছাপা রয়েছে, কিন্তু কোনো ইলাস্ট্রেশন নেই। ধরা যাক, বই-এর গোটা স্থাপত্যটি কবির সচেতন সিদ্ধান্ত। কবিই বইটি সাজিয়েছেন। এখন এই বইটি যদি আপনার হাতে আসে, তাহলে সেটি দেখে থেকে কি ওই মানুষটির খানিকটা আঁচ পাওয়া সম্ভব?

আমার মনে হয়, কিছুটা যায়। কোনো কবিতার উপরে স্পেস, কোনো কবিতার তলায় স্পেস, কোনো কবিতা বাঁ-দিকে, কোনো কবিতা সেন্টারে — স্ট্রাকচারের এই জায়গা থেকে একটা মানুষকে, তার চরিত্রকে কিছুটা চেনা যায়। তবে সেটা খুব সূক্ষ্ম এবং ডাইরেক্টলি বলে দেওয়ার মতো নয়, তবে মেজাজটা বোঝা যায়। খুব অনুভূতিশীল লোকেরাই পারে।

আর এই যে অক্ষর, সাজানো, ছবি... সবটাই না, কিছুটা সময় দাবি করে। কিন্তু আজকের এই আধুনিক সময়টা এত ফাস্ট! আগে কী হত, ধরো, একটা ছেলে ভোরবেলা যাচ্ছে কোথাও, আঠেরো-কুড়ি বছর বয়স, কোনো-একটা কাজেই যাচ্ছে, আগে সে ট্রামের জানলার ধারে বসে গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে দেখতে-দেখতে যেত... হয়তো তখনও কিছুটা কুয়াশা আছে, চারটে লোক মর্নিং-ওয়াক করে ফিরছে, এই পুরো অ্যাটমোস্ফিয়ার, এই পুরো পরিবেশটা কিন্তু সে রিড করতে-করতে যাচ্ছে। আমরা করেছি, এটা আমাদের এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, কানে একটা ইয়ার ফোন লাগিয়ে, মোবাইলটা খুটখুট করতে-করতেই যাচ্ছে। পাশ দিয়ে কিন্তু সকালটা বেরিয়ে যাচ্ছে। সেটা ও খেয়ালও করছে না।

যে-বিষয়টা নিয়ে তোমরা কাজ করছ, এটা খুব সেন্সেটিভ একটা বিষয়। যেটা নিয়ে একটা মানুষ অনেকক্ষণ বসে ভাবতে পারে। কিন্তু তাকে তো ভাবতে হবে। তার যদি সময় না থাকে, তাহলে সে কিস্যুই ধরতে পারবে না বিষয়টা। ফলত, সবার সঙ্গে তুমি চট করে এ-নিয়ে কমিউনিকেট করতেও পারবে না।

এই প্রেক্ষিতেই জানতে চাই একজনের সম্পর্কে। মণীন্দ্র গুপ্ত। যিনি শুধু কবি নন, কবিতার মুদ্রণের জায়গাতেও যাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে বলে মনে হয়।

মণীন্দ্রবাবুর কথা যখন উঠলই, তখন বলি। আমি দেখেছি, মণীন্দ্রবাবু নিজে যখন ছবি এঁকেছেন কবিতার জন্য, ওঁর কিছু বই-এর প্রচ্ছদ ও কাজ উনি নিজেই করেছেন, সেগুলো খুবই সুন্দর হয়েছে। *পরমা* যখন উনি করতেন, সেটা যে কী যত্ন করে করা হত, সেটা এখনও দেখলে বোঝা যায়! মূল কাগজটা কেউ যদি হাতে নিয়ে দেখে তো বুঝতে পারবে, ওটা মণীন্দ্রবাবুর প্রাণ ছিল। মানে, ওটা যে কতটা নিখুঁতভাবে করা যায়, কতটা সুন্দরভাবে করা যায়, সেটা মণীন্দ্রবাবু দেখিয়েছিলেন। আর ওঁর যে স্পেস সেন্স, রিফাইন্ড টেস্ট, তার প্রমাণ কিন্তু আমরা ওই কাগজগুলোর মধ্যেও পাই। এই বিষয়টা ওঁর মনে সরাসরি ক্রিয়া করেছে। অনেকের অবচেতনে করে, কিন্তু ওঁর ক্ষেত্রে এটা কনশাসলি কাজ করেছে। মণীন্দ্রবাবু ভালো চেনেন নিজেকে। ছবি আঁকার একটা ভূমিকা রয়েছে বলেই ওঁর সেটা আরও তাড়াতাড়ি আসে, এটা আমার ধারণা।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে মুদ্রণ-প্রযুক্তির উন্নতিকে তো কাজে লাগাতেই হবে। কিন্তু ফেলে-আসা লেটারপ্রেস থেকে আজকের ডিটিপি-ডিজিটাল জমানা — এই পরিবর্তনটার ফলে কি ক্ষতি কিছু হয়েছে?

একটা কথা বলা জরুরি, লেটারপ্রেসে যেহেতু পুরো ব্যাপারটা ম্যানুয়ালি হচ্ছে, সেখানে একটা মানুষের মন কাজ করছে। এই একটা আ-কার বসাচ্ছে, একটা ই-কার বসাচ্ছে, একটা দন্ত্য-স বসাচ্ছে... তারপর দন্ত্য-স-র খোপটা শেষ হয়ে গেল, আবার নতুন দন্ত্য-স নিয়ে এসে কাজ করতে হচ্ছে... এই প্রবলেমগুলো হয়তো এখন নেই। কিন্তু সবকিছু ম্যানুয়ালি করলে, একটা মানুষের হাতের ছোঁয়া যদি থাকে, আমার ধারণা কোথাও তার একটা আলাদা রূপ তৈরি হয়। যেটা অযান্ত্রিক। সেইটা খুব ইন্টারেস্টিং।

ডিটিপি-র মুশকিল হচ্ছে, এই টেকনোলজি খারাপ কেউ বলছে না, সবকিছুই ভালো, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কী, আমাদের এখানে টেকনোলজিটা হঠাৎ করে ঢুকে গেছে। ইউরোপে আস্তে-আস্তে এসেছে, ওদের শিক্ষা আর জীবনযাপনের মানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু এখানে দুম করে একদিন পুরোনো প্রিন্টিং মেশিনপত্রগুলো লোহা-লক্কড়ের মতো, মানে স্ক্র্যাপে সব বিক্কিরি করে দিয়ে একটা কম্পিউটার নিয়ে বসে গেল! এই যে হঠাৎ করে জিনিসটা ঢুকল, তার ফলে কী হচ্ছে, এই টেকনোলজিটা যথার্থভাবে ব্যবহার করার মতো শিক্ষা, সেই এসথেটিক সেন্সটা কিন্তু পরের প্রজন্মের মধ্যে ঢুকল না। তারা ওই অপারেশনটা জানে, জিনিসটা করে দিতে পারবে, কিন্তু এসথেটিক্সটা নেই। মনে করো, লিডিং দেওয়ার ক্ষেত্রে আগে লেটারপ্রেসে কী হত, একটা বেসিক গ্রিড মেনে, দুটো লাইনের মাঝে হয় তোমাকে একটা লেড দিতে হবে, বা দুটো। এর মাঝামাঝি দিতে পারবে না। বা, একটাও না রাখলে চলবে না। মানে, বেসিক একটা রুল কিন্তু আগে থেকে করা আছে। মিনিমাম যে-গ্যাপটা, তার একটা সায়েন্টিফিক জায়গা রয়েছে, এইটুকু না দিলে পড়া যাবে না। কিন্তু ডিটিপি-র ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, যেহেতু সম্ভব, তাই, তুমি ইচ্ছেমতো লিডিং কমিয়ে দিচ্ছ। চাইলে তুমি একটা পাতার মধ্যে, কেউ পড়তে পারুক-না-পারুক, গোটা একটা উপন্যাস ধরিয়ে দিতে পার! মেকানিকালি পার। বা, একটা ছবি স্পেসের মধ্যে ফিট করছে না, সেটাকে স্ট্রেচ করে ঢুকিয়ে দিচ্ছ — সেটা ডিসটর্টেড হয়ে গেল। যে করছে, সে ব্যাপারটা বুঝতেও পারল না, কারণ তার সেই চোখই তৈরি হয়নি। আবার পুরো ব্যাপারটা খুব সুন্দর করেও সাজানো যায়। ঠিক যতটা মার্জিন, যতটা দরকার, চোখে যেটা আরাম, কত পয়েন্ট যাবে বারো না সাড়ে বারো, তাই নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক হচ্ছে — এই সূক্ষ্মতা বা সেন্স যার আছে, তার হাতে আধুনিক প্রযুক্তি ভালো। কিন্তু যার প্রোপোরশন সেন্স নেই, ছবির ক্ষেত্রেও নেই, অক্ষরের ক্ষেত্রেও নেই, তাকে দিয়ে তুমি কী করাবে! যেহেতু যন্ত্রের নিজস্ব কোনো রুচি বা সৌন্দর্যবোধ নেই, সে-জন্য যাঁরা যন্ত্রটা ব্যবহার করছেন, তাঁদের তো ওগুলো একান্তভাবেই থাকা দরকার।

আরেকটা বিপদ কি হচ্ছে না, এই কাণ্ডটা যেখানে করা হল, সেটা দেখে হয়তো পাঠকেরও কোনো পীড়াবোধ হচ্ছে না। তাহলে তো বুঝতে হবে, চোখটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছিই। একটা ভুল জিনিস দিনের পর দিন দেখতে-দেখতে লোক ঠিক ভেবে সেটাকেই অনুসরণ করতে শুরু করে এবং ক্রমশ সেটাই একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়ায়। এটাই সব থেকে দুঃখের।

প্রবন্ধ

পড়ার আগে দেখা, না কি দেখার আগে পড়া

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

কেমন দেখতে তাকে? সে কি পড়ন্ত বিকেলের আভা মেখে বসে থাকে রেবা নদীর তীরে? না কি ভরদুপুরে কেঁদুলি গ্রামের কুটিরে একা পড়ে থাকা স্মরগরল সে? অথবা তার চেহারা মধ্যরাতে আচমকা বদল হয়ে যাওয়া ফুটপাতের মতো? তার চশমার ফ্রেম কালো না সোনালি, মনে করার আগেই সে উধাও হয়ে যায় ঘরে, দূরে, দিগন্তরেখায়? কার মতো সে? কার মতো? ভাবতে-ভাবতে বেলা ঢলে, পড়ন্ত বিকেলের আভা মেখে সে বসে থাকে একা। তার মুখে তখন না-পাওয়ার রং লেগে আছে, তার দু-গালে অনবধানের ধূসরিমা, তার চোখে হাজার বছরের নির্ঘুম। রাত আসে। কালো, বিমর্ষ রাত। তখন সেই মুখচ্ছবিও আর দেখা যায় না। কেমন দেখতে তাকে, ভুলে যায় পৃথিবীর লোক। পাঠকের অন্তরাত্মায় তার স্বাদ লেগে থাকে। কিন্তু কেমন ছিল সে, থালা-ভরা পঞ্চব্যঞ্জন, না কি মাটির সানকিতে আমানি-পান্তা, ভুলে যায় সবাই। তবুও সে থাকে।

কবিতার কোন রূপটাকে নিয়ে কথা বলব? তার মুখ? না কি তার শরীর? কবিতার কাব্যগুণকে যদি তার মুখ ধরি, তাহলে তার শিরোনাম, পঙ্‌ক্তিবিন্যাস, অনুচ্ছেদকল্প, ছেদ আর যতিচিহ্ন-সহ তার আপতিক রূপটিকে তার শরীর হিসেবে ধরাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেখানেও একটা সমস্যা থেকে যায়। কবিতার কোন অবস্থার এহেন রূপটিকে ধরব 'কবিতা যেমন দেখায়' এই সমস্যায়নের নিগড়ে? তার মুদ্রিত রূপ, না কি পাণ্ডুলিপি অবস্থার চেহারা? পাণ্ডুলিপিও দুই প্রকার। খসড়া মূল পাণ্ডুলিপি আর ছাপতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ম্যানুস্ক্রিপ্ট। কোনটা তার দেখন-সুরত? ধন্ধ লাগে।

কবিতার চেহারাগত বৈচিত্র্য নিয়ে কথা উঠলে ধন্ধ বাড়ে বই কমে না। একদিক থেকে দেখলে *এলাহাবাদ প্রশস্তি*-ও কবিতা, *রাজতরঙ্গিনী*-ও কবিতা। পাথরের গায়ে খোদাই করা কবিতার চেহারা মোটেই ভূর্জপত্রে লিখিতের মতো হবে না। আবার, সেখানে লিপি-বৈচিত্র্যেরও ব্যাপার থাকবে। ব্রাহ্মী লিপিতে লিখলে কবিতার যেমন চেহারা দাঁড়াবে, বাংলায় লিখলে তেমন হবে না। বাংলাতেই যদি শ্রীচৈতন্যের কালের লিপি আর ভারতচন্দ্রের সময়কার লিপিকা পাশাপাশি রাখা যায়, তাদের চেহারাও দু-দিকে হাঁটবে। এভাবেই কাল ও দেশ, লিখন-মাধ্যম ও মুদ্রণ-মাধ্যম ইত্যাদির ভেদে বদলে যাবে 'কবিতা যেমন দেখায়'-এর সমস্যায়ন। একটা-কোনো স্থির বিন্দুতে ধরে রাখাই যাবে না একে।

২

কবিতা নিয়ে সেইসময়ে রাত্রিযাপন-নিশিপালনের কাল। ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে জনৈক সুহৃদ কয়েকটি কাগজ মেলে ধরলেন এক নিরালা দুপুরে। সেগুলো ছিল কংক্রিট পোয়েট্রি-র কিছু জনপ্রিয় উদাহরণের ফোটোকপি। কম-বেশি কুড়ি-বাইশ বছর আগে বাংলা কবিতার হাল-হকিকতই সেভাবে জানি না, সুতরাং কংক্রিট পোয়েট্রি যে তপন সিংহের ভাষায় একটা জবরদস্ত শকুমেন্টারি ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতি বিচিত্র সেইসব লিখনপ্রয়াসের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি। এর কয়েক বছর পরে হাতে আসে উত্তম দাশের *হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন* বইটি। সেখানে পুষ্কর দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যদের কবিতাপ্রয়াস সম্পর্কে অবহিত হই। বাংলা কাব্যজগতেও যে একই প্রয়াস কিছু মানুষ নিয়েছিলেন, তা জেনে বিস্মিত হই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কেন কংক্রিট পোয়েট্রি প্রয়োজন পড়েছিল অথবা তার পূর্বাপরই বা কী, তা জানার চেষ্টা করা হয়ে ওঠেনি। কারণ, কীভাবে যেন মাথার মধ্যে ক্লিক করেছিল, এসবে কবিতার মূলধারার কিছু যায় বা আসে না।

তাহলে কবিতার একটা মূলধারা রয়েছে, তার আবার এক বা একাধিক 'কীরকম দেখায়' রয়েছে। কার্যত, এই 'কীরকম দেখায়' পার্টটিকে নিয়ে ক-জন কবি মাথা ঘামান, সেটা ভাবার অবকাশও কেউ নিয়েছে কি? নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, কবিতা পড়ার সময়ে কেউই তার চেহারা নিয়ে সবিশেষ মাথা ঘামান না। আবার একেবারেই যে ঘামান না, তেমনটাও নয়। ছিপছিপে কবিতার ছন্দে ভাষায়...— সুমনের গানের এই পঙ্‌ক্তিকে মনে করা যাক। সুমন এখানে একটা বিশেষ ধাঁচার কবিতার কথাই বলেছিলেন। আবার অনেক দিন আগে খবরের কাগজে পড়া শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কমেন্ট মনে পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে। শক্তি লিখেছিলেন, তিনি বহু চেষ্টা করেও সুভাষের মতো মেদহীন ছিপছিপে চেহারার কবিতা লিখতে পারেন না। এই দুটো কমেন্টই কবিতার একটা বিশেষ চেহারার কথা বলে। এখানে কবিতার কনটেন্ট একেবারেই উল্লিখিত নয়। চেহারাটাই বিবেচ্য। মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, ছিপছিপে কবিতা লেখা একটা মহত্তর কাজ। এমনি কবিতা লেখার চাইতে সেটা বোধ হয় ঢের বেশি শক্ত কাজ!

কংক্রিট পোয়েট্রি থেকে ছিপছিপে কবিতা — চেহারা-সর্বস্ব কাব্যের কথা নিয়ে কি ভেবেছি কখনো কবিতা লেখার আগে? সুভাষ মুখোপাধ্যায় পড়ে বিস্ময় জাগত তাঁর ছবি তৈরির ক্ষমতা দেখে। কিন্তু সেই ছবি তো কবিতার অন্তর্লীন একটা সামগ্রী। তার সঙ্গে কবিতার ছিপছিপে বহিরঙ্গের কি কোনো যোগ আদৌ রয়েছে? সুভাষের মার্কসবাদ চর্চার সঙ্গে ছিপছিপে কবিতার? কে জানে! একটা ধাক্কা আসে শক্তির *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* পড়তে গিয়েও। পাতার পর পাতা একই মাপের কবিতা সেই বই-এর অন্তর্চেহারায় এমন একটা ঘোর ছিটিয়ে রেখেছিল, তা থেকে মুক্তি মেলা সহজ নয়। প্রথম পাঠে চতুর্দশপদীর মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই ধরা পড়ে না। তবে এটা বোঝা গিয়েছিল, এ-বস্তু কবিতার চাইতেও এককাঠি সরেস। কিছুদিন পরে হাতে আসে বিক্রম শেঠের *গোল্ডেন গেট*। সেটা আবার চতুর্দশপদীতে লেখা উপন্যাস। পাতার পর পাতা জুড়ে সনেটের পর সনেট। পাঠকের পক্ষে খুব সুবিধের নয় ব্যাপারটা। তবে দেখনশোভার দিক থেকে বলিহারি বলতেই হবে। ওই বই-এর কথা বাদ দিলেও অস্বীকার করা যাবে না, মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতা অথবা শেক্সপিয়রের সনেট সমগ্র একেবারেই ভিন্ন চেহারা নিয়ে পাঠকচক্ষে প্রতিফলিত হয়। একটু হঠে গিয়ে যদি সনেটের বিষয়টাকে দেখা যায়, তবে একটা খটকা লাগেই। কোন অভিপ্রায়ে পেত্রার্ক এই টান-বাঁধনের মধ্যে গিয়েছিলেন? শেক্সপিয়রেরই বা কোন দায় ছিল এসব লেখার? আপাত চেহারার বাইরে কি সনেট কিছু অন্য কথা বলে? মনে রাখা প্রয়োজন, ইতালীয় রেনেশাঁসের অন্যতম বক্তব্য পারফেক্ট অর্ডার-কে লিখনের ক্রিয়ায় ধরার চেষ্টাই সনেট কি না, তা-নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে বহুকাল ধরেই।

এসোটেরিক ইতিহাস নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁরা বলতে পারবেন, সেই জলের গেহরাই ঠিক কতটা।

একই ব্যাপার বলা যেতে পারে *ফিরে এসো, চাকা*-জাতীয় বই-এর ক্ষেত্রে। এই বই পড়তে বসে বার বার কবির অভিপ্রায় নিয়ে ধন্ধ দেখা দেয়। কবিতার অন্তর্বয়ানকে অ্যাড্রেস না-করেও, শুধুমাত্র সেই বই-এর পাতা উলটে চেহারা দেখলেও এই ধন্ধ একইরকম থেকে যায়।

সনেটের বই নিয়ে ভিসুয়ালের সমস্যা অথবা সুবিধা যা-ই থাক, অন্য কবিতার বইতে সেসব ব্যাপার একেবারেই আলাদা। তবে বই-এর কথায় যাওয়ার আগে একটা কথা বলা দরকার। গ্রন্থিত হওয়ার আগে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার দৃশ্যরূপ সবসময়েই গ্রন্থিত রূপটির চাইতে আলাদা। আবার গ্রন্থেরও চরিত্রভেদ রয়েছে। বিচ্ছিন্ন কাব্যগ্রন্থের অন্তঃস্থ কবিতার বিন্যাস সাধারণত যেমন হয়, সংকলন বা অ্যান্থোলজির কবিতার চেহারা তার চাইতে একেবারেই ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। একক কাব্যগ্রন্থে একটি পৃষ্ঠায় একটি কবিতার যে চল রয়েছে, সংকলনে তার ব্যত্যয় ঘটে। রান-অন অবস্থায় কবিতা পড়া আর পৃষ্ঠা উলটে কবিতা পড়ার মধ্যে যে আশমান-জমিন ফারাক, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্নেরা মর্মে-মর্মে জানেন। কিটস-কে কাব্যগ্রন্থে পড়া, কিটসের কাব্যসমগ্র পড়া আর গোল্ডেন ট্রেজারি-তে কিটস পড়ার মধ্যে কী পার্থক্য, তা পাঠকমাত্রেই বোঝেন।

কবিতার হ্রস্ব-দীর্ঘের ব্যাপারটাও এক্ষেত্রে ভাবা দরকার। *দেশ* পত্রিকায় যখন জয় গোস্বামীর *শ্রাবণ* কবিতাটি ছাপা হয়, তখন দু-লাইনের সেই লেখাটিকে নিয়ে বিস্তর নেতিবাচক কথাবার্তা হয়েছিল বাংলাবাজারে। কিন্তু এ-কথাটা সকলেই ভুলে গিয়েছিলেন যে, জয় তার অনেক আগেই আর-একটি দুই পঙ্‌ক্তির কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। 'বাৎসরিক' নামের সেই কবিতাটি *ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা?* কাব্যগ্রন্থের অন্যতম অমোঘ কবিতা হিসেবে ততদিন বিবেচিত। *শ্রাবণ* নিয়ে যখন নেতিবাচকতার চাষ চলছিল, তখন বার বার দু-লাইনের কবিতা বলে তাকে উল্লেখ করা হত। কিন্তু একবারও *বাৎসরিক*-এর উদাহরণ সেখানে উঠত না। তাহলে প্রশ্নটা নিশ্চয়ই সেই ছোটো কবিতার দৃশ্যত ক্ষুদ্রত্বের সঙ্গে নিহিত ছিল না! বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে ছোটো আকারের কবিতা কোনো সমস্যাই নয়। তা হলে রবীন্দ্রনাথের *কণিকা* ভাইরাল শেপ নিত না। এখানে আবার কেউ বলে উঠতেই পারেন, *কণিকা*-র কাব্যগুণ নিয়ে কে, কবে মাথা ঘামিয়েছে!

সমস্যাটা স্ট্রাকচারাল। হিন্দি বা উর্দুতে দু-লাইনের কবিতাটাই দস্তুর। জাপানে তিন লাইন লিখলে বাহবা পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলায় সেটাই সময় বিশেষে নঞর্থক সমালোচনার মুখে পড়ে। একটু লঘু চালেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, সনেটের প্রাথমিক রূপ সনেত্তো কাউদাত্তো বা আঠারো লাইনের কবিতাকে যখন চোদ্দোয় নিয়ে আসা হয়েছিল, তখনও কি একইপ্রকার সমালোচনা ঘটেছিল?

দীর্ঘ কবিতার ক্ষেত্রে দৃশ্যরূপ একেবারেই ভিন্নতর। এখানে একটা ব্যাপার রয়েছে। আকারে দীর্ঘ কবিতাকে আলাদা করে 'দীর্ঘ কবিতা' হিসেবে শনাক্ত করার আস্য একেবারেই হাল আমলের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ পাতার পর পাতা কবিতা লিখেছেন, কিন্তু সেইসব কাব্য-আয়াসকে 'দীর্ঘ' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা কখনো করেননি। ১৯৮০-র দশকের আগে এই টার্ম সম্ভবত বাংলাবাজারে ছিল না। *প্রতিক্ষণ* অথবা *দেশ*, কে প্রথম এই অভিধা চালু করেছিল, তা নিয়ে গবেষণার অবকাশ রয়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, দীর্ঘ কবিতা যখন থেকে ট্যাগ-সমৃদ্ধ হয়ে বাজারে এল, তখন তার প্যাকেজিং হল একেবারেই অন্যরকম। *প্রতিক্ষণ*-ই সে-অর্থে কবিতার পাতায় ইলাস্ট্রেশন চালু করে। পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য বিষয়গুলির চাইতে কবিতাকে আলাদা করতে এবং তাকে পৃথক গুরুত্ব দিতেই পূর্ণেন্দু পত্রী এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এর ফলে কবিতার দৃশ্যরূপে, একেবারেই যাকে বলে যুগান্ত ঘটে যায়।

৩

ইলাস্ট্রেটেড কবিতা আর ছবিছক্কাহীন কবিতার মধ্যে চেহারাগত পার্থক্য নিয়ে বলার আগে বলে নিতে চাই, এই মুসাবিদা কখনোই কবিতার চিত্রায়ণের যাথার্থ বিচারের ক্লিশে বিতর্কে প্রবেশ করবে না। বরং মনে রাখার মতো কিছু কবিতা-চিত্রণকে মনে করার চেষ্টা করি এই অবসরে।

মনে আছে, *দেশ* পত্রিকায় জয় গোস্বামীর *বর্ষাবন্দনা* দীর্ঘ কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয়, সেই ছিপছিপে কবিতার অনুষঙ্গ ছিল কৃষ্ণেন্দু চাকীর অলঙ্করণ। পরে কবিতাটি গ্রন্থভুক্ত হলে, অবশ্যম্ভাবীভাবে চিত্রণ বর্জিত হয়। কিন্তু কেন জানি না, সেই প্রথম দেখা কবিতা আর তার আশপাশে ছড়িয়ে থাকা বৃষ্টি-ছবি চোখে সেঁটে বসেছিল। সেখান থেকে মুক্ত হওয়া গেল না আজও। একইরকম ঘটেছে *যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল*-র ক্ষেত্রে। তবে বইতে ছবি থেকে যাওয়ায় সেই হারাই-হারাই ভাবটা ঘটেনি।

প্রতিক্ষণ-এ কবিতার অনুষঙ্গে বেশিরভাই সময়েই ব্যবহৃত হয়েছে ফোটোগ্রাফ। পরে *প্রতিক্ষণ* তার পকেট বই সিরিজে *সমুদ্রের কবিতা* বা *কবিতার কলকাতা* বের করে, তখনও সেখানে ছিন্ন ফোটোগ্রাফকেই ব্যবহার করা হয়। সেখানে কবিতার চেহারা একেবারেই অন্যরকম। *দেশ* আর *প্রতিক্ষণ*-এর কবিতার পাতা কখনোই একই চেহারার ছিল না। এটা একটা স্বাস্থ্যকর সহাবস্থান, সেটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। পরে এই ব্যাপারটা কেমন একটা কৌলিক হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রথম আলো' নামে এক কবিতা পত্রিকা ১৯৯০ দশকে বেরোতে শুরু করে। সেটার চেহারা ছিল *দেশ*-এর কবিতার পাতা বিচ্ছিন্ন করে নিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনই। এই একই চেহারায় বেশ কয়েকটা কবিতার কাগজ বাজারে আসে। কেমন যেন মনে হতে থাকে, *দেশ* বা *প্রতিক্ষণ*-এর দেখিয়ে দেওয়া চেহারাটাই কবিতার একমাত্র প্রণিধানযোগ্য চেহারা। এর বাইরে গেলেই তুমি খেলা থেকে বাদ।

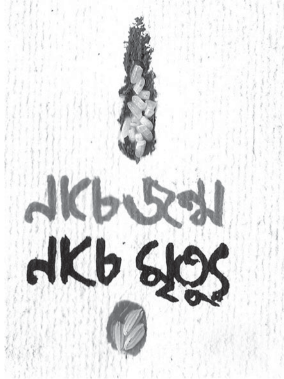
এই ধ্রুবপদ বেঁধে দেওয়ার মধ্যে কাব্যরাজনীতি নিশ্চয়ই ছিল। লিটল ম্যাগাজিনের 'বিগ' হয়ে ওঠার অ্যাম্বিশনটা দেখা দিয়েছিল 'মিমিক্রি'-র ঢং-এ। তবে, এই মিমিক্রি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ছোটো পত্রিকার কবিতা আবার তার নিরলঙ্কৃত জায়গাতেই ফিরে যায়।

কবিতার চিত্রণের ব্যাপারে আরও দু-একটা কথা না-বলে পারছি না। এই মুহূর্তে হাতে রয়েছে এডগার অ্যালান পো-র 'দ্য র‍্যাভেন অ্যান্ড আদার পোয়েমস' নামের একটি বই। এখানে কবিতাগুলি চিত্রিত করেছেন জেফ হিল নামের এক চিত্রকর। পো-র কবিতার রহস্যময়তাকে মান্যতা দিয়ে বাই-কালার ছবিগুলি যে-ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছে, তাকে স্যালুট করতেই হয়। বাংলা কবিতার প্রকাশনাতেও এই চিত্রণের ব্যাপারটা এসেছে। বহুকাল ধরেই এক্সপেরিমেন্টও হয়েছে তা নিয়ে। ১৯৯০-এর গোড়ায় সুমিতাভ ঘোষাল 'পদ্য গদ্য সংবাদ' নামে কবিতার একটা কাগজ করতেন। সেখানে এক পাতা কবিতা আর এক পাতা ছবি (কালি-কলমের কাজ) থাকত। গোড়ায় পত্রিকাটি ছিল ক্যালিগ্রাফি থেকে ফোটোকপি করে তৈরি। পরে পিটিএস করা হয়। সেখানে কবিতার চেহারাটাই ছিল আলাদা। মনে আছে, জয়দেব বসুর 'তোমাকে মানাতো এককুচি নাকছাবি / শরৎসকালে গিটারবাদিনী রাই...' কবিতাটি প্রথম পড়ি। সেইরকম কাজ আর পরে হয়নি। কারণ, টেকনোলজিই বদলে যায় পরে। এত কসরত করে পত্রিকা ছাপানোর আর দরকারই পড়েনি।

না-ছাপা কবিতা, কাটাকুটিতে ভরা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টাও নতুন কিছু নয়। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ফ্যাকসিমিলি 'নিজ হাতে নিজস্ব ভাষায়' নামের একটা সংকলনই রয়েছে এ-নিয়ে। সেখান থেকে ছাপা কবিতার আকৃতিতে ট্রান্সফার করে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করা যায়। কল্পনা করা যায়, কী দাঁড়াতে পারে হাজার নিকস অ্যান্ড কাটস-এ ভরপুর লিখনের মুদ্রণের পরবর্তী সুরত। তবে ফ্যাকসিমিলি সংকলনের আস্য বাংলায় তেমন-একটা নেই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছু কাজ হয়। তার কারণ এক, তাঁর পাণ্ডুলিপির রিচ দৃশ্যরূপ, আর দুই, তিনি রবীন্দ্রনাথ। মাঝে-মাঝে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর কবিতার কাটাকুটিকে অতটা গুরুত্ব না-দিতেন, তাহলে কী হত? জীবনানন্দের অপ্রকাশিত কবিতা নিয়েও ফ্যাকসিমিলি সংকলন হয়েছে। তবে তা অতটা

জমেনি। কারণ, ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনানন্দের পক্ষে নিজের লেখা কবিতা নিয়ে অত রসালাপের সময় বা মানসিকতা ছিল না।

সম্প্রতি আর একটা উদাহরণ হাতে এল। কৌশিক বাজারি নামের এক তরুণ কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ *নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু*-র প্রথম রূপায়ণটি করেছিলেন হস্তলিপির মাধ্যমেই। এই বছর সেটি মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর সেই হাতে লেখা বই-এর ই-রূপটি নীচের এই লিংকে ক্লিক করলেই দেখা যাবে — http://khatakobitar.blogspot.in/2012/09/blog-post_15.html।



।। সে বহুদিন পূর্বের কথা, সম্ভবত পূর্বজন্ম ... ।।

১. তখন আকাশ বাতাস ছাই ও ধুলার মধ্যে কাব্য রচনার প্রচলন ছিল। ঘাস ও পালকের কলম তখনো [redacted] অনাবিষ্কৃত। গম্ভীর স্থির পুষ্করিণী ও তার জলের উপর লেখা কাহিনির কথা তখন বহুল প্রচলিত এক দু:খরীতি। যুদ্ধ, মৃত্যু, আগুন ও রক্তের কাব্যও জানা ছিল আমাদের। তখন বৃন্তহীন কাঁচুলিতে বুক বেঁধে কিশোরীর দল নেমে আসত পাহাড়ের [redacted] পথে, তাদের চিকন দুধসাদা নগ্ন রাঙাপদ পাথর উপরে ফুটে উঠলেই একমাত্র আমরা স্বর্গ ভুলতাম; তখন সেই প্রাচীন কিশোর শরীর গু-গু রোমাঞ্চিত, আজন্মের ক্ষুধাবোধ, সান্ধ্যচিহ্নগুলো ও মাতাল অন্ধকার ফুটে তারা দেখা দিত কখনো কখনো, তখন শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা মনে হ'ত আমাদের, সেই সব মুহূর্তগুলি কলঙ্কলতাহীন আলো ... তারপর, পুনরায় অন্ধকার, বিচ্ছিন্ন ক্লান্ত একরোখা অন্ধকার ...

[redacted] অন্ধকারের ওপর আঙুল চালিয়ে দু:খ লিখছে একদল প্রাচীন কিশোর ... ।

১৮

পরে মুদ্রিত বইটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই ধরা যাবে কোথায় বদলেছে দৃশ্যরূপ।

শেষমেশ

আসলে তা দেখার, পরে তা পড়ার — কবিতাকে কি এভাবে দেখা সম্ভব? তা হলে কী হবে হাজার-হাজার আবৃত্তিকারের? কী হবে অডিও বুক নামক সাম্প্রতিকতম মাধ্যমটির? জানা নেই। তবে, এটুকু বলা যায়ই, কবিতার শ্রাব্যরূপটির সঙ্গেও কবিতার আর-এক দৃশ্যরূপের সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে পাঠক (আসলে শ্রোতা) একরাট। রবিঠাকুরের গলায় *বীরপুরুষ* শোনার পর, জিম রিভস-এর গলায় এডগার অ্যালান পো-র *অ্যানাবেল লি* শোনার পরে, যে-ছবির দল চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা পাণ্ডুলিপি-মুদ্রণ-চিত্রঋদ্ধি — এ-সবকিছুরই অতীত। কবিতা কেমন দেখায় — এই প্রশ্ন সেখানে তার তৃতীয় ডানাটি মেলে। সে এক অন্য উড়ান, তার কথা এখানে নয়।

দৃশ্যশব্দ, শব্দদৃশ্য এবং কবিতার অব্যক্ততা

অর্ক চট্টোপাধ্যায়

শব্দ কতটুকু শব্দ আর কতটুকু দৃশ্য? হায়ারোগ্লিফকে অক্ষর বলব না দৃশ্য? পড়তে না পারলে কি আমরা শব্দদের দৃশ্য ভেবে নিই? অপাঠ্যতা কি ভাষালিপির দৃশ্য হয়ে ওঠবার আকর? সিগমুন্ড ফ্রয়েড *The Interpretation of Dreams* (১৮৯৯) গ্রন্থে যখন স্বপ্ন তথা অবচেতনের অবয়বকে 'rebus' (ছবির ধাঁধা বা ধাঁধার ছবি) -এর আকারে দেখেন, তখন টেক্সট হিসেবে স্বপ্নের পাঠযোগ্যতার প্রশ্নে শব্দ আর দৃশ্যের দ্বান্দ্বিকতা বেরিয়ে আসে —

> For instance, I have before me a picture - puzzle (rebus) - a house, upon whose roof there is a boat; then a single letter; then a running figure, whose head has been omitted, and so on. As a critic I might be tempted to judge this composition and its elements to be nonsensical. A boat is out of place on the roof of a house, and a headless man cannot run; the man, too, is larger than the house, and if the whole thing is meant to represent a landscape the single letters have no right in it, since they do not occur in nature. A correct judgment of the picture-puzzle is possible only if I make no such objections to the whole and its parts, and if, on the contrary, I take the trouble to replace each image by a syllable or word which it may represent by virtue of some allusion or relation. The words thus put together are no longer meaningless, but might constitute the most beautiful and pregnant aphorism. Now a dream is such a picture-puzzle, and our predecessors in the art of dream interpretation have made the mistake of judging the rebus as an artistic composition. As such, of course, it appears nonsensical and worthless.

ফ্রয়েডকে স্বপ্নের পাঠবস্তুতে পৌঁছোতে দৃশ্যের দরবার পেরোতে হয়। তাঁর মতে 'Image'-কে 'syllable' বা 'word' দিয়ে ভাবলে তবেই স্বপ্নচিত্রের অর্থ প্রকট হয়, নাহলে তাকে অর্থহীন বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এর মানে নিশ্চয়ই এমন নয় যে দৃশ্য মাত্রেই অর্থহীন। বরং দৃশ্যের অর্থ অনুধাবন করতে হলে তাকে ভাষাচিহ্ন হিসেবে দেখা দরকার, এমনটাই বলতে চাইছেন ফ্রয়েড। লিখনের ইতিহাসে শব্দ আর দৃশ্য একে অপরের দোসর হয়ে দেখা দেয়। উদাহরণ হিসেবে ক্যালিগ্রাফির কথা ভাবা যেতে পারে। চিনা ভাষায় অক্ষরেরা যেভাবে চিহ্নায়ক (signifier) হিসেবে চিহ্নায়িতদের (signified) দৃশ্যের পরিসরে এনে বিস্মিত করে, তার কথাও মনে করা যায়। চৈনিক চিত্রকর শি-তাও-এর ছবিগুলিতে রেখাঙ্কন যেভাবে লিখনের ভূত উগরে দেয়, সেখানে শব্দ আর দৃশ্যের এই সহবাস লক্ষণীয়।

অপাঠ্য হয়ে উঠলে শব্দেরা দৃশ্যের শবদেহ হয়ে যায়। অজানা ভাষার বই-এর পাতা উলটোলে আমাদের সেরকমই মনে হয়। কিন্তু অপাঠ্য না হলেও শব্দের শরীরে দৃশ্যের রেখাপাত থাকে। আমরা প্রথম যখন কোনো শব্দ দেখি, সবার আগে কিন্তু দেখি, তারপর পড়ি এবং তখন অর্থ অনুধাবন বা উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রথম সাক্ষাৎ ক্ষণিকের, যেখানে শব্দের শরীর কেবলই দৃশ্য হয়ে প্রতিভাত হয়। আলাপ যখন জানা ভাষার সঙ্গে, তখন এই ক্ষণিকের দৃশ্য-সাক্ষাৎ সাধারণত আমাদের অজ্ঞানেই হয়ে থাকে। দৃশ্য হিসেবে শব্দের সঙ্গে প্রাথমিক মোলাকাত অবচেতন। এই মোলাকাত সদা-বিস্মৃত হয়ে থাকে কিন্তু বিস্মৃতি আমাদের ভোলে না, বরং ফিরে-ফিরে আসে। এই কারণে ভাষার গঠনতন্ত্রকে ফ্রয়েডের ফরাসী উত্তরসূরি জাঁক লাকা তিনটি পরিসরে বিভক্ত করেন। ভাষার একটি স্তর 'symbolic', যেখানে চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতের সঙ্গে কোনো এক সম্পর্কহীনতায় সম্পর্কিত হয় (আমরা এই (অ)সম্পর্কের জটিলতায় যাব না, তবে কোনো ভাষাতেই শব্দশরীরের সঙ্গে শব্দ যাকে নির্দেশ করে, সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ এমনকী পরোক্ষ সম্পর্কও থাকে না; তাই গাছকে পাথর বললেও ভাষার সাপেক্ষে অত্যুক্তি হয় না।), দ্বিতীয় স্তর 'imaginary', যেখানে শব্দেরা দৃশ্যের উদ্রেক করে অর্থ উৎপন্ন করে থাকে, আর তৃতীয় স্তর হল 'real', অর্থাৎ শব্দেরা যা না-বলে লুকিয়ে রাখে। অবচেতনের বাস্তবতাস্বরূপ এই রিয়াল কিন্তু রিয়ালিটি নয়, বরং

রিয়ালিটি থেকে আমরা যাকে বহিষ্কার করে থাকি, সেইসব শব্দকল্পদ্রুম রিয়াল হয়ে ভাষার আগে-পরে ওপর-নীচে অব্যক্ততা রেখে যায় : 'what is rejected in the symbolic returns in the real'। লাকার এই ত্রিস্তরীয় বিভাজনে ভাষার ইমেজ আর রিয়ালের মধ্যে কীরকম সম্পর্কের কথা আমরা ভাবতে পারি? শব্দশরীর যেখানে সিম্বলিকালি অর্থ উৎপাদন করে না, বরং গণিত-চিহ্নের (লাকা যাকে সিগনিফায়ারের 'letter' হয়ে ওঠা বলেন) এককত্ব অর্জন করে X হয়ে যায়, সেই X সেখানে X ছাড়া আর কিছু নয়। X মানে শুধুই X, আর কিছু নয়। অর্থের এই বিনির্মাণ-বিন্দুতে শব্দ ইমেজের মাধ্যমে রিয়ালের কাছে যেতে চায়। দৃশ্যের সঙ্গে অব্যক্ততার সম্পর্কের জায়গাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ছবিরা কি কথা বলে? কী কথা কয় তারা? তারা কি তারাদের মতো নীরব নয়? তারা কি বলতে না-পারা কথাই বলে? কবিতা যদি বলতে না-পারা কথার কথকতা হয়, তাহলে ভাষার শব্দশরীর ও তার অবয়ব সেখানে ওতপ্রোত হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ 'লেখন' শীর্ষক দু-তিন লাইনের দ্বিভাষিক 'হাইকু'-র বাংলা ভূমিকায় ১৯২৬ সালে লিখেছিলেন —

> এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে কেন দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয় — সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা চীন লণ্ঠনের মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে। তাই জর্ম্মানিতে হাতের অক্ষর ছাপবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখনগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল। অন্যমনস্কতায় কাটাকুটি ভুলচুক ঘটেছে। সে সব ত্রুটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়েরই আভাস রয়ে গেল।।

এই অসামান্য ভূমিকাটি শব্দশরীরের দৃশ্যময়তাকে মুদ্রিত অক্ষরের বাইরে নিয়ে গিয়ে স্বাক্ষরের আঙ্গিকে ভাবতে শেখায়। এর থেকে বোঝা যায় যে কবি শুধু কবিতার শব্দগুলির অর্থান্তর নিয়ে ভাবিত নন, তিনি শব্দের আবয়বিক দিকের কথাও ভাবেন। রবীন্দ্রনাথের থেকে ভালো কে বুঝবেন কবিতার এই ব্যক্তিক এবং স্বাক্ষরিক দৃশ্যরূপ? *স্ফুলিঙ্গ, আফ্রিকা* কিংবা *পূরবী*-র নানা কবিতায় যেভাবে ওঁর আঁকিবুকিরা কবিতার টেক্সটকে আক্ষরিকভাবেই ধারণ করে থাকে, তাকে ফ্যাকসিমিলি ছাড়া অন্য কোনোভাবে ছাপার অক্ষরে আনা যায় কি? শব্দেরা এখানে দৃশ্য হয় না ঠিকই, কিন্তু তাদের ঘিরে কখনো গাছ, কখনো ছাইদান আবার কখনো-বা প্রদীপের স্কেচে রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যের ডালেই শব্দদের বসান। উইলিয়াম ব্লেক বা গুন্টার গ্রাসের মতো চিত্রকর কবিরা ক্যানভাসেই কবিতা লেখেন কিংবা পাতাকেই ক্যানভাস বানিয়ে নেন; যেখানে টেক্সট আর ইমেজ সংলাপ চালায় একই সারফেসের ওপর। এইসব প্লেটে শব্দ আর দৃশ্যের অবয়ব নীরবে লতিয়ে ওঠে। *লেখন*-এর তিয়াত্তর নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন —

ফুলগুলি যেন কথা
পাতাগুলি যেন চারি দিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা

টেক্সটের সরবতাকে এভাবে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে দৃশ্যাবয়বের অরব রূপান্তর।

কবিতার শব্দশরীরের সাথে দৃশ্যাবয়বের সম্পর্ক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সূত্রে আমরা দেখলাম যে এই সম্পর্ক কবিতার সঙ্গে কবির লালন-পালন রমন-গমনের সম্পর্কও বটে। হস্তলিপির আঁকন-বাকনে কবিতার দৃশ্য আর শব্দশরীরকে মিলিয়ে দিয়ে কবি যেন তার কবিতার ভেতর বাসা বাঁধতে চান। কিন্তু কবিতা কি তাকে ভালো বাসা দেয়? ফরাসী কবি স্টেফান মালার্মে তাঁর বিখ্যাত ছেদ-যতিহীন কবিতা *Un Coup De Dés* বা *A Dice Throw*-এ ক্যাপিটাল আর স্মল লেটারের ফারাককে ব্যবহার করে শব্দদের দৃশ্যাকার দিতে চান। কবিতাটির মুদ্রণ নিয়ে বিশেষভাবে সচেতন মালার্মে। কুড়ি পাতা জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া এই কবিতায় শব্দেরা নানা দৃশ্যের বিন্যাস তো তৈরি করেই, তা ছাড়াও কয়েকটি বাক্য গোটা কবিতা জুড়ে ক্যাপিটাল লেটারিং-এ ছড়িয়ে দেন তিনি। একটি বাক্য শুরু হয় প্রথম পাতার শিরোনাম থেকেই : 'A DICE THROW', এরপর একটি ফাঁকা পাতার পর তৃতীয় পাতায়, যেখানে সমস্ত অক্ষর ক্যাপিটাল, সেখানে অন্যান্য টেক্সটের থেকে বড়ো সাইজে দেখা দেয় 'AT ANY TIME', এরপর নবম পাতায় আবার ওই বড়ো ফন্ট সাইজে 'NEVER WILL ABOLISH', এরপর সতেরো নম্বর পাতায় আবির্ভূত হয় 'CHANCE', এবং বাক্যটি শেষ হয় : 'A DICE THROW AT ANY TIME NEVER WILL ABOLISH CHANCE'। এই বাক্যটি ছাড়াও কুড়ি পাতা জুড়ে ভাগে-ভাগে এর থেকে ছোটো ফন্ট সাইজে অথচ ক্যাপিটাল লেটারিং-এ লিখিত হয় আরও কয়েকটি বাক্য তথা শব্দ-পরম্পরা, যাদের মূল কবিতার ভেতর অন্য-অন্যান্য কবিতা বললেও ভুল হবে না। এই বাক্যগুলি কখনো আলাদা পাতায়, কখনো একই পাতায় কিছু স্মল লেটার-শব্দের পর লিখিত হয়েছে; দু-টি দাঁড়ি দিয়ে সেই বিভাজন চিহ্নিত করলাম —

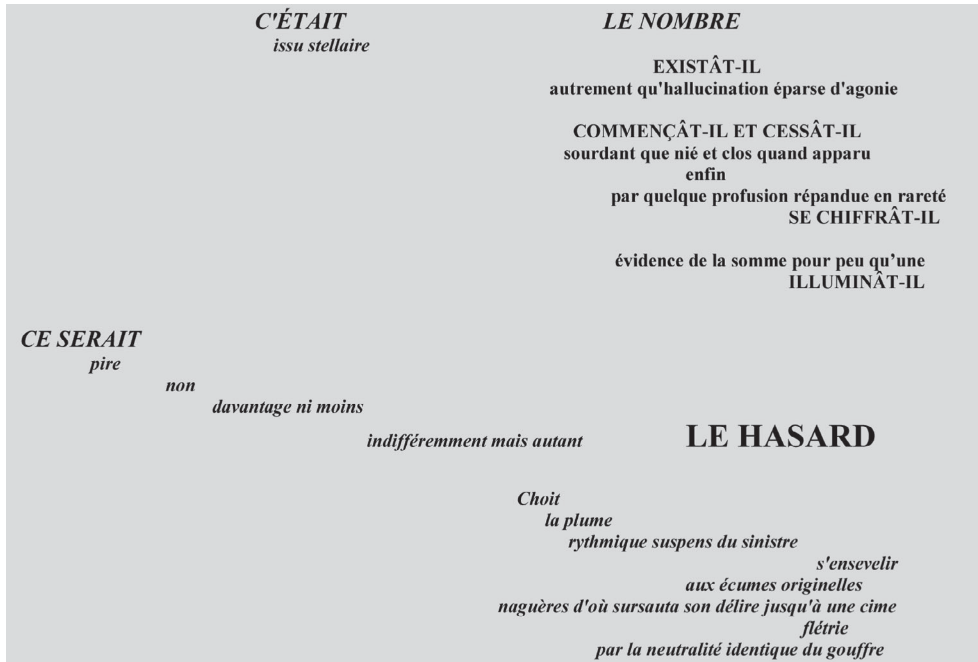
১.
WHETHER || THE MASTER || AS IF || AS IF || MIGHT HAVE EXISTED || MIGHT HAVE BEGUN AND ENDED || MIGHT HAVE BEEN RECKONED || MIGHT HAVE ENLIGHTENED || NOTHING WILL HAVE TAKEN PLACE || OTHER THAN THE PLACE || EXCEPT || PERHAPS || A CONSTELLATION

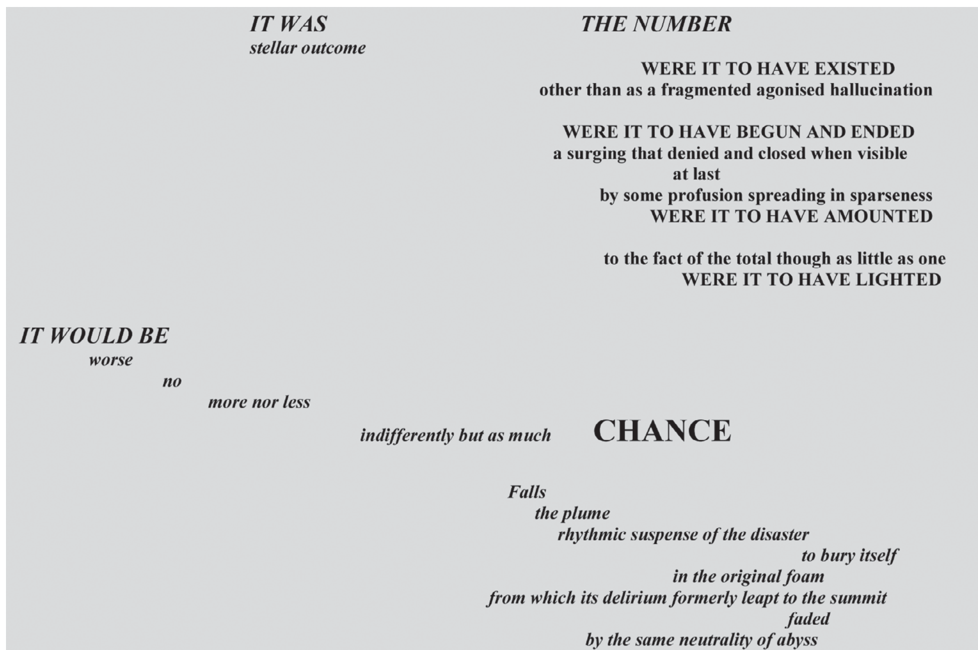
২.
IF || IT WAS || IT WOULD BE || THE NUMBER

এই কবিতায় কবি আমাদের পাঠ করতে শিখিয়েছেন। কীভাবে দৃশ্যের অবয়বে শব্দদের পাঠ করা যায়, তা-ই হয়তো এই কবিতার উপজীব্য। ফন্ট সাইজ, ক্যাপিটাল-স্মল লেটারিং এবং বোল্ড প্রিন্টের ব্যবহারে বাক্যের রৈখিক পাঠের সীমানা ভেঙে দিয়ে আমাদের খানিকটা অন্যভাবে পড়তে শিখিয়েছেন মালার্মে। পরপর এলেও কিছু-কিছু শব্দ একই ইউনিট তৈরি করেনি। যেমন তৃতীয় পাতায় 'AT ANY TIME'-এর পর ক্যাপিটাল লেটারেই রয়েছে : 'EVEN WHEN CAST IN || EVERLASTING CIRCUMSTANCES || FROM THE DEPTH OF A SHIPWRECK', কিন্তু ফন্ট সাইজের পার্থক্যের কারণে ওই বাক্যগুলিকে 'AT ANY TIME'-এর পর রেখে পড়া যাবে না। এছাড়া স্মল লেটারে লেখা শব্দগুলি গোটা কবিতা জুড়ে ক্যাপিটালে লেখা শব্দের পরপর এলেও, তাদের পরপর পড়ার পথ বন্ধ করেছেন কবি। এই কবিতার গাণিতিক ফর্মুলা হল, স্মল লেটারে লেখা শেষ বাক্য : 'Every Thought emits a Dice Throw', এবং গোটা কবিতার বিস্রস্ত বিন্যাসে ছক্কার দানের রূপকটিই পারফর্মড হয়েছে। কাব্যচিন্তনের ভাষ্যরূপে শব্দেরা ছক্কার চালের মতোই পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে গেছে। আর ছক্কার দানের চিহ্ন-একক হল স্পট। স্পটকে আমরা কী বলব? শব্দ, দৃশ্য, নাকি লাকানিয়ান লেটারের মতো গাণিতিক সংখ্যা? গণিত ও কবিতার সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাশীল মালার্মে কবিতার কনটেন্টে যে সম্ভাব্য সংখ্যার কথা বলেছেন (IF || IT WAS || IT WOULD BE || THE NUMBER), তাকে তিনি শব্দদের আবয়বিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন। দৃশ্যের এই লিখন ইমাজিনারি আর রিয়ালকে পরস্পরের কাছে নিয়ে এসেছে। শব্দের দৃশ্যজ সক্রিয়তায় ভাষার অব্যক্ততা যেখানে সিগনিফায়ার থেকে লেটারের দিকে ধাবিত হয় এবং শব্দ থেকে সংখ্যার জন্ম হয়, সেই রিয়ালের গতিমুখকে চিহ্নিত করেন মালার্মে। কবিতায় অন্যত্র স্মল লেটারে এই 'রিয়াল' সংখ্যাটিকে বলা হয়েছে 'the one and only number that cannot'। এই সংখ্যা যাকে উৎপন্ন করতে কবিতা বা কবিতায় বর্ণিত জাহাজডুবির কাহিনি ব্যর্থ হয়েছে, সেই একক ইউনিক নাম্বার যেন কাব্যভাষার গাণিতিক অব্যক্ততা। এই অব্যক্ততার কারণেই কোনো চিন্তার এক্কা-দোক্কা-ছক্কা চাল 'চান্স' নামক ধ্রুবকটিকে ভাঙতে পারে না : 'A DICE THROW AT ANY TIME NEVER WILL ABOLISH CHANCE', অথচ প্রতিটি কাব্যচিন্তন নতুন-নতুন চাল চেলে যায়। সব চাল তাও কখনোই চালা হয় না। প্রতি চালে কোন সংখ্যা মিলবে, কিংবা কোন সংখ্যার পর কখন কোন সংখ্যা আসবে, এমন কোনো স্থিরীকৃত রৈখিক পরম্পরায় কবিতা বা গণিত কেউই আমাদের পৌঁছোতে দেয় না।

তাই একে অপরের উলটোদিকে ক্যাপিটাল ও স্মল লেটারে এই বাক্য দু-টি লেখা হয়। প্রথমটা এক জায়গায়, একসাথে। আর দ্বিতীয়টা গোটা কবিতা জুড়ে, ভাগে-ভাগে —

১. Every Thought emits a Dice Throw
২. A DICE THROW AT ANY TIME NEVER WILL ABOLISH CHANCE


C'ÉTAIT
issu stellaire
LE NOMBRE
EXISTÂT-IL
autrement qu'hallucination éparse d'agonie
COMMENÇÂT-IL ET CESSÂT-IL
sourdant que nié et clos quand apparu
enfin
par quelque profusion répandue en rareté
SE CHIFFRÂT-IL
évidence de la somme pour peu qu'une
ILLUMINÂT-IL
CE SERAIT
pire
non
davantage ni moins
indifféremment mais autant
LE HASARD
Choit
la plume
rythmique suspens du sinistre
s'ensevelir
aux écumes originelles
naguères d'où sursauta son délire jusqu'à une cime
flétrie
par la neutralité identique du gouffre


IT WAS
stellar outcome
THE NUMBER
WERE IT TO HAVE EXISTED
other than as a fragmented agonised hallucination
WERE IT TO HAVE BEGUN AND ENDED
a surging that denied and closed when visible
at last
by some profusion spreading in sparseness
WERE IT TO HAVE AMOUNTED
to the fact of the total though as little as one
WERE IT TO HAVE LIGHTED
IT WOULD BE
worse
no
more nor less
indifferently but as much
CHANCE
Falls
the plume
rhythmic suspense of the disaster
to bury itself
in the original foam
from which its delirium formerly leapt to the summit
faded
by the same neutrality of abyss

মালার্মে-র *Un Coup De Dés*-এর একটি অংশ ও তার ইংরেজি অনুবাদ

কবিতা জুড়ে ঘটনা বলতে কেবলই ঘটে তার স্থানিকতা (‘NOTHING WILL HAVE TAKEN PLACE OTHER THAN THE PLACE’)। এই অসীম স্থানিকতায় লিখন হয়ে যা রয়ে যায়, তা হল হয়তো একটি নক্ষত্র (‘PERHAPS A CONSTELLATION’)। এই ‘হয়তো’-এ কবিতার আকস্মিকতা লেগে থাকে। আর নক্ষত্র মাত্রেই আকাশের শরীরে আঁকন বা লিখন। শব্দ আর দৃশ্য এবার মিলে যায় আকাশের ক্যানভাসে। তবে নক্ষত্রের দৃশ্য-লিখন অর্থ উৎপাদন করে না। এ হল সেই একক অনুপস্থিত সংখ্যা — অভিব্যক্তির আদলে অব্যক্ততা। আর এই গাণিতিক এককত্ব, X যেখানে শুধুই X, অন্য কিছু নয়, সেখানেই কেবল অসীমের গায়ে রেখাপাত করা যায়। মালার্মের কবিতা ‘a limit on the infinite’-এর নামে এই অজ্ঞেয়তাকে মার্ক করে যায়। লক্ষণীয় হল, একমাত্র ফন্ট সাইজ ও ক্যাপিটাল-স্মল লেটারিং-এর দৃশ্যপথ বা দৃশ্যপটেই ভাষার মধ্যে নিয়ে আসা গেল ভাষাহীনকে। এই ভাষাহীন অতিলৌকিক নয়, বরং ভাষার মেটি-রিয়াল গাণিতিকতা যা সিগনিফায়ারের ইমাজিনারি অর্থ উৎপাদনকে রিয়ালের পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে ঘিরে রাখে।

সমসাময়িক বাংলা কবি অনুপম মুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিককালে যেসব পুনরাধুনিক কবিতা লিখেছেন, সেখানে তাঁর স্ব-উচ্চারিত পুনরাধুনিক অভিধার সঙ্গে কবিতার মুদ্রিত দৃশ্যশরীরের এক ধরনের সম্পর্ক চোখে পড়ে শব্দের কাটাকুটিতে। এইসব কবিতায় বারবার বিভিন্ন শব্দ স্ট্রাইকথ্রু করে কবি যেন

কবিতার পাণ্ডুলিপিতে শব্দচয়নের দৃশ্যজ কাটাকুটিকে মুদ্রিত কবিতার শরীরে আমদানি করতে চান। *ঐহিক* ওয়েবজিনে প্রকাশিত *লস্ট ইন ট্রানস্লেশন : একটি পুরাধুনিক কবিতা* শেষ হয় এই দু-টি লাইন দিয়ে —

ভাষারাষ্ট্র। কবরকে ~~কেউ~~
~~অনুবাদের~~ প্রদেশ বলছে না
।

অনুপম প্রথম কবি নন, যিনি কাটাশব্দের মাধ্যমে কবিতার মগজিয়া প্রক্রিয়াকে মুদ্রণের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন, কিন্তু বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হল অঙ্কন ও লিখনের মধ্যিখানে এই আনুভূমিক রেখার (অন)বস্থান যার সাথে আধুনিকতার প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটা জড়িয়ে রয়েছে প্রিন্ট-মডার্নিটির সূত্রে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে আপাত-বর্জিত ‘কেউ’ ও ‘অনুবাদের’ শব্দ দু-টির যোগ-বিয়োগের ওপর অর্থের জটিলায়ন নির্ভর করে রয়েছে। প্রিন্ট কালচার আধুনিকতার কাছে যা, আজকের ইন্টারনেট বা আন্তর্জাল উত্তরাধুনিকতার কাছে অনেকটা তা-ই। এখন আমরা অনলাইন রিডিং এবং অনস্ক্রিন রাইটিং-এর যে নতুন সময়ে বাস করছি, সেখানে কবিতা তথা ভাষার দৃশ্যশরীরের তাৎপর্য আরও বেড়ে গিয়েছে। প্রযুক্তির যুক্তিতে কথা আজকাল বলার থেকে বেশি লেখা হয়, সে মেসেজ হোক, চ্যাট হোক আর ফেসবুকের দেওয়াল কিংবা টুইটার-হাতল, যা-ই হোক না কেন। এইসব দেওয়াল-লিখিত কথায় স্মাইলি, স্টিকার জাতীয় বস্তুবিশেষে, দৃশ্যের আঙ্গিকে বলতে না-পারার থেকেও বেশি বলতে না-চাওয়া কথা ভেসে ওঠে। ইন্টারনেটের নয়া-জমানায় ‘নিউ মিডিয়া রাইটিং’ বলে যে নব্য শব্দশিল্পের জন্ম হয়েছে, সেখানে শব্দের দৃশ্য হিসেবে দেখাটাই স্বাভাবিক। ব্রায়ান কিম স্তেফান্স-এর ২০১৪-র ‘ডিজিটাল পোয়েম’ *সুইসাইড ইন অ্যান এয়ারপ্লেন*-এর উল্লেখ করে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করব। এশিয়ান-আমেরিকান কবি এই অনলাইন কবিতায় অ্যানিমেশনের মাধ্যমে এক আক্ষরিক শব্দবিস্ফোরণ দেখিয়েছেন, যেখানে আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন মিলিটারি অপারেশনের প্রতীক হিসেবে শব্দের ভাঙা-গড়া দেখানো হয়েছে —



সুইসাইড ইন অ্যান এয়ারপ্লেন শব্দাক্রমণ

শব্দের এই দৃশ্যজ ভাঙা-গড়ার টেক্সট এসেছে *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস*-এর যুদ্ধবর্ণনা থেকে। এখানে কনটেন্টকে যেভাবে ফর্ম শাসন করেছে, তাতে দৃশ্য উৎপাদনের দায় পড়েছে শব্দের রক্ত-মাংসের শরীরের ওপর। শব্দের বিয়োজনেই এখানে দৃশ্যের প্রস্তুতি এবং দৃশ্যের মাধ্যমে ভাষার উচ্চারণ অনুচ্চারণীয়ের দিকে যাত্রা করেছে। কাব্যবিষয়ের অন্তরস্থিত চিত্রকল্পে ভাষা, অ-ভাষার মাধ্যমে দৃশ্যের দিকে ঝোঁকে অর্থ উৎপাদনের জন্য। সেখানে আমরা একটা লাইন পড়ে মনস্পটে তার দৃশ্যায়ন করে থাকি। এখানে ভাষা লাকানিয়ান ইমাজিনারিতেই ঘোরাফেরা করে। প্রযুক্তির উন্নতি ও মাধ্যম পরিবর্তনের সাথে-সাথে আমরা প্রিন্ট-আধুনিকতা পেরিয়ে যে অধুনান্তিক আন্তর্জালে প্রবেশ করেছি, সেখানে ভাষা তার শারীরিক উপস্থিতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এক মেটি-রিয়ালিটি গড়েছে। দৃশ্যের আত্ম-নির্মাণে অব্যক্ত রিয়ালকে চিহ্নায়িত করার ক্ষেত্রে ভাষার দিগন্ত ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। ভাষার এই দৃশ্যজ অব্যক্ততাই কবিতার মান-চিত্র।

বাংলা কবিতা : নয়নপথের নানা বাঁকে

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGAL LANGUAGE. 39

মর্য্যদা থাকিতে কেনো নাজাহো উচিয়া ।
আপন সদৃশ স্থানে উচি বৈস গিয়া ॥

এত সুনি সোমদত্ত কোপেতে জনিন ।
অগ্নির উপৰে জেন ঘৃত ঢালি দিন ॥

সোমদত্ত বনে সেনী নাকৰিস গর্ব্ব ।
তোমার মহিমা জত আমি জানি সর্ব্ব ॥

কোন দোষে দোষী আমি কহত সত্তর ।
এত কটু ভাসা মোৰে কহিস বর্ব্বর ॥

তোমা হইতে নিচ কেবা আছয়ে মানুষে ।
মোর অগোচর নহে জানিয়ে বিশেষে ॥

এতেক সুনিয়া সেনী অতি ক্রোধ মন ।
কোপে ডাক দিয়া বলে সুন সর্ব্ব জন ॥

এত অহঙ্কাৰ হইল আৰে দলাঙ্গার ।
পরনিন্দা ছিদ্র নাহি চাহো আপনার ॥

ইহার উচিত ফল দিব আমি তোৰে ।
এত বনি কোপে সেনী উচিন সত্তরে ॥

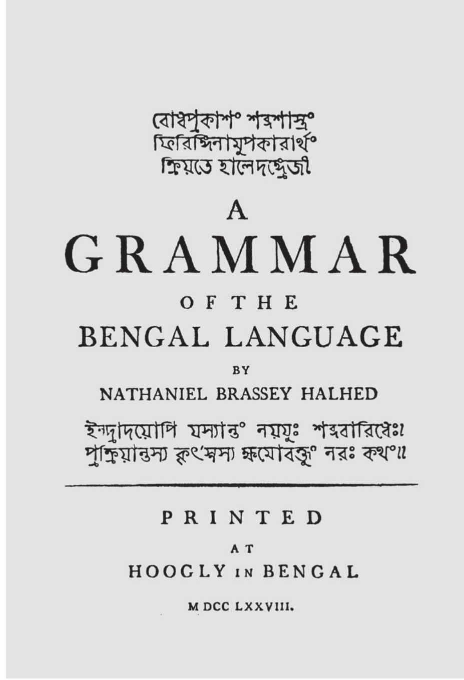
সেনী

এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ (১৭৭৮)-এর মুদ্রিত পৃষ্ঠার অংশ

পুথির সংসারে সবই থাকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে — দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী সমস্তই সার সার অনুভূমিকভাবে, সেরকম থাকাটাই দস্তুর, সুদীর্ঘকালের সেটাই প্রথা। নজরকাড়া কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। থাকে তখনই, লিপি সুন্দর হলে, পত্রগুলি চিত্রিত হলে। কেবল কথকঠাকুর জানেন কোন পদ কীভাবে পড়বেন, কীভাবে পড়লে তাদের সুরগত পার্থক্য ফুটে উঠবে, ধরা দেবে শ্রোতার কানে। অবশ্য পদগুলির মাঝে মাঝে চিহ্ন যোজনা (ঃ, ঃঃ, ঃ, ০।০, ০।, ০।।) করা থাকলে, লিপিকার যদি করে থাকেন আদৌ, খানিকটা সহজগম্য হয় তবে চোখের দেখায় পদের মধ্যবর্তী বিভাজন। কিন্তু সবক্ষেত্রে সেরকম থাকে না। তখন কথকঠাকুরকেই পাঠের অভ্যাসে তা করে নিতে হয়, মনে মনে। সাত নকলে আসল যে খাস্তা হয়ে ওঠে কখন, কে তার হদিশ পায়! পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। আসরে সম্মিলিত শ্রোতা তার কী জানে! ওসবে তার মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু কালচক্রের ঘূর্ণনক্রমে একদিন নিরক্ষর, কালোকোলো সেই শ্রোতার উপভোগের সামগ্রী, কথকঠাকুরের পুথির আধারে থাকা দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদীরও বরাত ফেরে। সাগরপারের ধলোরা এখানকার ভাষা শিখতে চায়, দেশি লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাদের মন পড়তে চায়, না হলে শাসন করবে কী করে! কোম্পানির শাসন বলে কথা — তার পত্তনেই না চারদিকে সাজো-সাজো রব! দেশের রাজা এখন ওই ধলোরাই, যেদিকে হেলাবে — সেদিকেই হেলতে হবে। কোম্পানির ধুরন্ধর প্রতিনিধি বাংলার লাটবাহাদুর হেস্টিংস চান জাহাজ বোঝাই করে দলে দলে যেসব সাদামানুষ আসছে এখানে, তারা এখানকার লোকজনের ভাষা শিখে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কোম্পানির শাসনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলুক। শাসক যখন তারাই, শাসিতের ভাষা সম্পর্কে তো সঠিক ধারণা চাই তাদের, না হলে

বোঝাপড়া হবে কী করে দু-পক্ষে। আর তাই ওঁরই ইচ্ছাক্রমে, সেই লক্ষ্যপূরণে বই লেখার বরাত পান নাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড (১৭৫১-১৮১৮)। ফলস্বরূপ প্রকাশ পায় তাঁর 'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী' : *এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ* (১৭৭৮)।


বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
M DCC LXXVIII.

সেখানেই, হস্তলেখের পরিবর্তে, চার্লস উইলকিন্স আর পঞ্চানন কর্মকারের বাহাদুরিতে প্রস্তুত বিচল ধাতব হরফে মুদ্রিত হয় বাংলা ভাষার উদাহরণস্বরূপ বেশ কিছু কবিতাংশ। মহাভারতের দ্রোণপর্ব থেকে অংশবিশেষ ছাড়াও সেযুগে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, চৈতন্যকথার বিক্ষিপ্ত পদগুলির পাশাপাশি সাধারণের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অঙ্গ দুর্গাপুজো, সত্যনারায়ণ পুজো সংক্রান্ত, কিংবা রাধাকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপ্রকাশক কোনো উদ্ধৃতি, কৃষ্ণপ্রেমের গীত, কিংবা খেউড় গানের জনপ্রিয়তাসূচক পদের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়; আবার কামলিপ্সু বাসনাকুল অভিব্যক্তির পদও দুর্লভ নয় সেখানে। বাংলা মূলের সঙ্গে ইংরাজি প্রতিবর্ণীকরণ ও ভাষান্তর-সহ, শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীরাই যেহেতু সেই গ্রন্থের উদ্দিষ্ট পাঠক।

বোধগম্য বাংলা গদ্য প্রকরণের অভাবে বাংলা ভাষার পক্ষেও তাই কবিতা প্রকরণই হয়েছিল তার এক এবং অদ্বিতীয় মুখ। হালেদ সাহেবের উপায়ান্তর ছিল না সেযুগে প্রচলিত কবিতার দ্বারস্থ না হয়ে। ওই সময়কার বঙ্গদেশের অবস্থাকে তাঁর মনে হয়েছিল থুকিডিডিসের (আনু. ৪৫৫-৪০০ খ্রি. পূ.) পূর্ববর্তী গ্রিস দেশের মতো — একমাত্র কবিতা প্রকরণই যেখানে সুবিজ্ঞাত, পাঠ্যবস্তু স্বরূপ গদ্যের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অজানা। লেখকও তাই আত্মপ্রকাশের মাধ্যম স্বরূপ নির্বাচন করে নেন যেকালে কবিতা প্রকরণ, নেই তাঁর কাছে প্রকাশক্ষম কোনো গদ্যভাষা, সেরকম কোনো রীতিও অজ্ঞাত।

সেই কবিতা প্রকরণেরই জাতক পদগুলি, সেযুগে যখন প্রথম মুদ্রিত হয় — পুথির সেই ভূমিশয়ান মুদ্রা ছেড়ে, পরিবর্তে সটান — উল্লম্বভাবে, আশপাশে ফাঁকা জমি রেখে — হাত-পা খেলিয়ে, পঙ্ক্তিগুলিতে যেমন — পঙ্ক্তির ধারক শব্দগুলির ক্ষেত্রেও অন্তর্বর্তী ফাঁক সমান রেখে, শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুকূল বাতায়ন খুলে দু-দণ্ড জিরোবার অবকাশ দিয়ে, তাঁর বইয়ের পৃষ্ঠায় — সেদিন সেই নিরীহ উদ্ধৃতিগুলির সূত্রেই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিগ্রাহ্য আবেদন, কিংবা, দর্শনীয় রূপের নতুন উন্মেষও আরব্ধ হয়। আসরে সম্মিলিত শ্রোতার কাছে নয়, ব্যক্তিপাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়ে তার নিজস্ব অনুভূতির আলোয় বিবেচনার দিন তখনও দূরবর্তী। কিন্তু সেই অনাগতের জন্যই পথনির্দেশ রয়ে যায় সাবেক যুগের কবিতাংশকে প্রথম ছাপার হরফে সামিল করার সময়, সতেরোশো আটাত্তরে।

হুগলি, শ্রীরামপুর, কলকাতা মিলিয়ে এর পর ছাপাখানার বিস্তারে মিশনারিদের পাশাপাশি দেশীয় লোকজনের প্রত্যক্ষ সহযোগে যা-কিছু প্রকাশ পেতে থাকে — বাংলা গদ্যের বিকাশে সেসবের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিস্তারে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে গুণগত পার্থক্য অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, 'গেয় এবং শ্রব্য' থেকে 'লেখ্য এবং পাঠ্য' — সেকথা আমরা এক্ষেত্রে আবারও স্মরণ করতে পারি। গেয় থেকে অগেয় কবিতার দিকে যাত্রার পথটি স্বভাবতই মসৃণ ছিল না, তেমনই কালসাপেক্ষও ছিল। অগেয় কবিতার ভিত্তি প্রস্তুতিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩১-৫৮) পত্রের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অবশ্যস্মরণীয়, সেখানে প্রকাশিত সব কবিতা পাঠকের দৃষ্টির কাছেই প্রাথমিক আবেদনে পাঠ্য ছিল। বিলিতি কবিতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ রঙ্গলাল এবং মাইকেলের ভূমিকা — কবিতার বিষয়, রচনাশৈলী এবং রুচির পরিবর্তনে — স্মরণ করার সময় তাই ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকাও মনে রাখা জরুরি। সুরাশ্রয়ী শ্রব্যকবিতা থেকে গেয়সুরবর্জিত পাঠ্যকবিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবার মতো পরিস্থিতি ক্রমশ প্রকট হতে থাকে এঁদেরই স্বতন্ত্র কর্মধারায়।

পঠনভঙ্গির ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সূচনা হয়, হয়তো পরোক্ষ প্রভাব ছিল সেটা পাশ্চাত্য পঠনভঙ্গিরই, ছাপাখানার ক্রমবিস্তারে কিতাব যখন পাঠকের হাতে সরাসরি পৌঁছোল এবং নিজের ঘরে থেকেই সম্ভব হল কবিতার রসাস্বাদন। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বাক্‌ধর্মী কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতায় সেই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যখন পয়ার অতিক্রান্ত দীর্ঘ চালের পঙ্ক্তি রচনা (স্মরণীয়, রঙ্গলালের *পদ্মিনী উপাখ্যান*), কিংবা, প্রবহমান পয়ারে অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন করে, পূর্ণযতি বা পঙ্ক্তিযতির সাবেক প্রয়োগও লঙ্ঘন করে (মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর) সেই অভিনব রীতিতে পাঠককে সামিল করার প্রয়াস দেখা গেল, কবিতার পাঠকের পক্ষে তখন কি আর সাবেক সুরে সুর মেলানো সম্ভব? প্রাথমিক অস্বস্তির কারণ হলেও সেসব, হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টাও ছিল, তাই কালক্রমে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে সমস্তই — সে অমিত্রাক্ষরই হোক, কিংবা সনেট, কি এপিস্‌ল্, বা পাশ্চাত্য রীতির স্তবকবন্ধে ওড-জাতীয় রচনা। উপরন্তু ছন্দের বন্ধন থেকে কবিতার ভাবমুক্তির মতো গুরুতর বিষয়ও এইসব প্রয়াসের অন্তঃসলিলা হয়ে ছিল, সেকথাও মনে রাখা দরকার। অন্যদিকে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের বিভিন্ন ছন্দরূপ সম্পর্কে কৌতূহল থেকে বাংলায় স্বাভাবিক উচ্চারণে তাদের রূপান্তরের আগ্রহ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিনবত্বেরও কমতি ছিল না কিছু (স্মরণীয় এক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপককাব্য *স্বপ্নপ্রয়াণ*)।

পাশাপাশি, নতুন সময়ের কবি তাঁর রচনায় 'নূতন ছন্দ' প্রবর্তনের ভাবনায় পাঠককে তাঁর পদবন্ধে 'ছন্দের গঠন' বুঝে 'পাঠ করিবার সুবিধা' প্রদানে যখন প্রয়াসী হন, দেখা যায়, স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ অভিপ্রায়ে তার নির্দেশও জ্ঞাপন করেছেন 'ছন্দবিশেষে দীর্ঘ উচ্চারণের স্থান নির্ণয় জন্য মাত্রার উপরিভাগে গুরুতাজ্ঞাপক (—) চিহ্ন' যোজনা করে। গ্রন্থের ভূমিকায় যেমন সে-প্রসঙ্গে আপনকথা বলেন, তেমনই অভ্যন্তরে পাদটীকাতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ দিয়ে রাখেন। কোনো কবিতার বইয়ে সাধারণভাবে যা দেখা যায় না, ছন্দের আলোচনা গ্রন্থেই আমরা সেরকম দেখতে অভ্যস্ত, রুদ্ধদল (ক্লোজড সিলেবল) বোঝাতে '—' চিহ্ন এবং মুক্তদল (ওপেন সিলেবল) বোঝাতে '◡' চিহ্ন। কিন্তু হেমচন্দ্রের *দশমহাবিদ্যা*-য় (১২৮৯ ব. / ১৮৮২ খ্রি.) সংস্কৃত কোনো ছন্দের লঘুগুরু উচ্চারণের ধাঁচে সেরকম প্রয়োগ কিছুটা লক্ষ করা যায়। যদিও সংস্কৃতের

কোনো ছন্দরূপ তিনি বাংলায় আনেননি এবং সেকথা জানানও — 'কোনও সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে' এবং 'আপাততঃ দুই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ।' কিন্তু ছন্দ-সচেতন কবির ওই রচনা পূর্বাপর পড়তে গেলে পাঠককে যে অনেক সময়ই কৃত্রিম উচ্চারণের আশ্রয়ে এগোতে হয় এবং সে অভিজ্ঞতা যে সর্বত্র খুব সুখকর নয়, তা হয়তো এখন অনেকেই জানেন। কিন্তু সেযুগে 'নূতন ছন্দ' প্রবর্তনের ভাবনায় উদ্‌বেল কবির কাছে এসবের তাৎপর্য ছিল — এখন হয়তো এর অনেক কিছুই হাস্যকর মনে হতে পারে পাঠকের। যেমন, প্রতি অধ্যায়ে পদবন্ধের চালে কিছু কিছু তফাতের দরুন অদ্ভুত সব নামকরণও করেন ছন্দের : 'ললিত পয়ার', 'ললিত ত্রিপদী'. 'লতিকাপদী', 'দ্রুতললিত পয়ার', 'লঘুললিত ত্রিপদী' প্রভৃতি। যাই হোক, তাঁর সেই প্রয়াসের স্বল্প উদাহরণ রইল এখানে, যার নামকরণ করেছিলেন 'দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী' —

শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ,
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
"রে সতি রে সতি", কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।

কবিতার বইয়ে এই ধরনের চিহ্ন-যোজনা, যা আমরা চাক্ষুষ করছি, বইটির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় যখন তা আরও ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান হয়ে থাকে, সেটি যে খুব দৃষ্টিনন্দন নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কবিতার বইয়ে সেই ব্যতিক্রমকেই দর্শনীয় বিষয় স্বরূপ গ্রহণ করতে হয় — সেভাবেই একে আমরা গ্রহণ করছি।

এছাড়া, আরও একটি ব্যাপার *দশমহাবিদ্যা*-য় লক্ষণীয়। বিভিন্ন মহাবিদ্যার মূর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে হরফের তারতম্য — সাধারণ এবং স্থূল হরফের পারস্পরিক উপস্থিতি, যা আমরা আরও পরবর্তীকালের কবিদের রচনায় লক্ষ করেছি, তার নমুনাও সামান্য কিছু মজুত আছে, পরে দেখা যাবে। কিন্তু তার বহুকাল আগে হেমচন্দ্রের ওই বইতেই দেখা যায় কবিতার অভ্যন্তরে সাবেক স্মল পাইকা এবং তার চেয়ে বড়ো স্থূল হরফের ব্যবহার — তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মহালক্ষ্মীর বিবরণ ছাড়াও দু-এক ক্ষেত্রে আরও। এখানে কয়েকটির অংশবিশেষ দেওয়া গেল।

১। তারামূর্তি প্রসঙ্গে —

জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে॥

২। ষোড়শী প্রসঙ্গে —

প্রেমসঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে
ঐখানে রাজিছে ষোড়শী-রূপিণী॥

৩। ভুবনেশ্বরী প্রসঙ্গে —

সদা সুহাস্যযুতা ঐখানে বিরাজিতা
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে॥

৪। ভৈরবী প্রসঙ্গে —

রত্ন কিরীটময় চন্দ্র উদয় হয়
ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী-রূপিণী॥

এগুলি ছাড়াও অন্যত্র আরও —

লিখি বুকে মোক্ষ নাম পূরা, জীব, মনস্কাম,
'নিখিল নিস্তার পাবে' শিব কৈলা আপনি।

* * *

পাই যেন পুনরায় পূজিতে সে রাঙা পায়
জগৎ মধুর করি **তারা** নাম শুনা রে॥

* * *

মিলাইল দশ রূপ, উমারূপ ধরিল।
হরগৌরীরূপে সতী হিমালয়ে উদিল॥
হাসিল কৈলাসপুরী **উমা** হেরি নয়নে।
কেশরী বৃষভ ছুটি লুটাইল চরণে॥

৩৮ হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

শ্রম-কান্ত প্রাণিক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে।
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥

৮-৯। বগলা ও ছিন্নমস্তা

জীব নিস্তারে সতী ঐ হের চিন্তাবতী
দারিদ্র্যদলনীরূপ বগলার শরীরে।
হের আর ঊর্দ্ধদেশে মদনোন্মত্তার বেশে
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে॥
বিকট উৎকট ফূর্ত্তি বিপরীতরতিমূর্ত্তি
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।
আপনার ঘৃণাকর নগ্নবেশ ঘোরতর
বিশ্বময় দেখাইছে নিজ রক্ত শুষিয়া॥

১০। মহালক্ষ্মী

নেহার তারপরি, শোভে কমলার পুরী,
রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবনে।
কিবা বেশ সুমোহন, লীলারসে নিমগন,
পরমাপ্রকৃতি সতী সর্ব্ব শেষ ভুবনে॥

দশমহাবিদ্যা-র একটি পৃষ্ঠা

সেকালের জনপ্রিয় কবির রচনার পাশে এবার তাহলে দেখা যেতে পারে একালের অন্যতম জনপ্রিয় কবির রচনাতেও হরফের তারতম্য কীরকম দর্শনীয় হয়ে আছে। প্রয়াত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি* (১৩৭২ ব.) গ্রন্থের অন্তর্গত *আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ* কবিতায় সাধারণ এবং স্থূল হরফের পারস্পরিক উপস্থিতি —

পরিত্রাণ, তুমি শ্বেত, একটুও ধূসর নও, জোনাকির পিছনে বিদ্যুৎ,
যেমন তোমার চিরকাল
জোনাকির চিরকাল; স্বর্গ থেকে পতনের পর
তোমার অসুখ হলে ভয় পাই, বহু রাত্রি জাগরণ — প্রাচীন মাটিতে
তুমি শেষ উত্তরাধিকার। একাদশী পার হলে — তোমার নিশ্চিত
পথ্য হবে।

আমার **সঙ্গম** নয় কুয়াশায় সমুদ্র ও নদী;
ঐ শব্দ চতুষ্পদ, দ্বিধা, কিছুটা উপরে, সার্থকতা যদি উদাসীন;
বিপুল তীর্থের পুণ্য — নয়? সর্বগ্রাস
যেমন জীবন আর জীবনী লেখক।

প্লেনের ভিতরে **কান্না** এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়িয়ে আনি
একই বুকের মধ্যে॥

এখন তত পরিচিত নাম না হলেও, একদা যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন সত্য গুহ তাঁর *একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল* (অধুনা) গ্রন্থটির জন্য, এঁর একটি রচনাতেও স্থূল হরফের ব্যবহার লক্ষণীয় — *নিষেধ এখানে নিষেধ* কবিতার অংশবিশেষ —

ভয় ধরলেই আমি গান হাঁকিয়ে দৌড়তে থাকি; কি গাইছি সেটা বড় নয়
সুরটা ঠিক সমুদ্রে ঝড় ধরার আওয়াজ
আমার মনে হোলো, এক্ষুনি একটা চীৎকার দেয়া উচিত
যুবকেরা আসুন যুবতীরা আসুন
আপনাকে হত্যার জন্যে টোপ দেয়া হচ্ছে আপনাকেই
আমার জীবনের জন্যে ওঁৎ পেতে রয়েছে আততায়ী
গান্ধি হত্যার পরেও স্বাধীনতার উৎসব থামেনি এবং হিরোসিমার পরেও
যা বুঝেছিলাম তা নয়, বাগানটাগান নয়,
এখানে রক্তমাংসের, যাকে বলে, প্রত্যেকেই মানুষ
প্রত্যেকেরই এমন তাপ যে পৃথিবী ফুটছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি
আমার চোখ ভরে সূর্য উঠছে
আমার মতো দেখতে লোকটা, ঐ দেখুন,
লাল ট্রাফিক সিগনালের দিকে আঙুল তুলে চীৎকার করছে
নিষেধ এখানে নিষেধ

(গল্প কবিতা : সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ১৯৬৮)

স্থূল হরফ ছাড়াও সাধারণ স্মল পাইকা এবং পাইকার আয়তনগত তারতম্যে দর্শনীয় অমিয় চক্রবর্তীর *পারাপার* (১৩৬১ ব.) গ্রন্থের সুপরিচিত কবিতা *সাবেকি* এবং *সত্যাগ্রহ (১৩৫২)*। মূল গ্রন্থে *সাবেকি*-তে 'রাম নাম সত্ হ্যায়' ধুয়োটি সাধারণ পাইকায় এবং বাকি অংশ স্মল পাইকায়। যেমন, *সত্যাগ্রহ (১৩৫২)*-তেও দেখা যায়, 'ঐ কালো পন্থী কেউ টিঁকবে না, না না' (গানের কলি) পাইকায়, কিংবা, 'ঝড়ে রোদে বেলা গেল' এবং 'আবার নতুন দিন এলো' কথা দুটি উপর-নীচে স্পেস দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে রাখা হয়েছে পাইকা হরফে, কিংবা, কোরাসের কথায় — 'গড়ি প্রাচীর' / ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির / প্রাণখড়্গ / গান ধর্ গো / ''ঐ কালো পন্থী কেউ টিঁকবে না, না, না!'' অন্তিমে এসে পুরোটাই পাইকায়, কিন্তু শুরুতে গানের কলিটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ (গড়ি প্রাচীর... গান ধর্ গো) ওই কবিতারই অন্যান্য অংশের মতো স্মল পাইকায়। অথচ ওই কবিতা দুটি যখন অমিয় চক্রবর্তীর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (দে'জ, চতুর্থ সং, ১৯৯৮) সংকলনের অন্তর্গত হয়, তখন মূল গ্রন্থে পাইকা হরফে মুদ্রিত অংশগুলির সমস্তই স্মল পাইকা বোল্ড বা স্থূল হরফে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এর দরুন উভয় ক্ষেত্রে দৃশ্যগত পার্থক্যও তৈরি হয়। কিন্তু তা উপলব্ধির বিষয় এবং এর ভেতর যে বিকৃতি ঘটে গেছে তা যদি কারোর অনুভবগম্য না হয় তাহলে আমাদেরই-বা কী করার থাকে। কাকে দুষব আমরা? এ একরকম ব্যাধি, বাংলা প্রকাশনা জগতের আরও পাঁচটা ব্যাধির মতোই। প্রসঙ্গত, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা*-য় পাঠক *সাবেকি* কবিতাটি লক্ষ করবেন, সেখানে ওই ধুয়ো যথারীতি সাধারণ পাইকা হরফেই আছে। আবার, ইদানীংকালের কম্পিউটার টাইপ সেটিঙে মুদ্রিত মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত *আবহমান বাংলা কবিতা : তৃতীয় পর্ব*-য় (২০০৬) সংকলিত ওই কবিতাই দেখুন, সেখানেও হরফের ছোটো-বড়ো তারতম্যেই পাবেন, স্থূলাক্ষরে নয়। যাই হোক, *সাবেকি*-র অংশবিশেষ উভয়রূপেই এখানে দেওয়া গেল, পাঠক বিচার করুন এবার।

সাবেকি

গেল
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।
রাম নাম সত্ হ্যায়
গৌর বসাকের পড়ে রইল ভরন্ত ক্ষেত খামার।
রাম নাম সত্ হ্যায়॥
দুচার পিপে জমিয়ে নস্য হঠাৎ ভোরে হলো অদৃশ্য—
ধরণটা তার ক্ষ্যাপারই—
হরেকৃষ্ণ ব্যাপারি।
রাম নাম সত্ হ্যায়
ছাই মেখে চোখ শূন্যে থুয়ে, পেরেকের খাট তাতে শুয়ে
পলাতক সেই বিধুর স্বামী
আরো অপার্থিবের গামী।
রাম নাম সত্ হ্যায়

পারাপার প্রথম সংস্করণে *সাবেকি*

সাবেকি

গেল
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।
রাম নাম সত্ হ্যায়
গৌর বসাকের পড়ে রইল ভরন্ত ক্ষেত-খামার
রাম নাম সত্ হ্যায়
দু-চার পিপে জমিয়ে নস্য হঠাৎ ভোরে হলো অদৃশ্য—
ধরনটা তার ক্ষ্যাপারই—
হরেকৃষ্ণ ব্যাপারি।
রাম নাম সত্ হ্যায়
ছাই মেখে চোখ শূন্যে থুয়ে পেরেকের খাট তাতে শুয়ে
পলাতক সেই বিধুর স্বামী
আরো অপার্থিবের গামী।
রাম নাম সত্ হ্যায়

অমিয় চক্রবর্তীর *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-য় *সাবেকি*

সত্যাগ্রহ (১৩৫২) থেকেও অংশবিশেষ অনুরূপভাবে রইল —

সত্যাগ্রহ

(১৩৫২)

গড়ি প্রাচীর।
ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির
প্রাণখড়্গ।
গান ধর্ গো
"ঐ কালো পন্থী কেউ টি ঁকবে না, না, না।"

সত্যাগ্রহ

(১৩৫২)

গড়ি প্রাচীর।
ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির
প্রাণখড়্গ।
গান ধর্ গো
"ঐ কালো পন্থী কেউ টি ঁকবে না, না না।"

পারাপার প্রথম সংস্করণে ও *অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা*-য় *সত্যাগ্রহ (১৩৫২)*-র প্রথম অংশ

আবার নতুন দিন এলো

শাদা বুদ্ধির তাই আলোগুলো জ্বালিয়ে
দীপ-নেভানোর যুগে না পালিয়ে
এইটুকু বলা যাক স্পষ্টই—
বানরদেবতা, হবে নষ্টই
যদি নরত্ব বজায় রাখি।—যাই হোক
পাপের বিরুদ্ধে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হেনে হত্যা-শোক
মাথা নিচু করব না কোটি লোক।
ঝড়ে রোদে বেলা গেল
(কোরাস্)
গড়ি প্রাচীর
ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির
প্রাণখড়্গ।
গান ধর্ গো
"ঐ কালো পন্থী কেউ টি ঁকবে না, না, না॥"

আবার নতুন দিন এলো

শাদা বুদ্ধির তাই আলোগুলো জ্বালিয়ে
দীপ-নেভানোর যুগে না পালিয়ে
এইটুকু বলা যাক স্পষ্টই—
বানরদেবতা, হবে নষ্টই
যদি নরত্ব বজার রাখি।—যাই হোক
পাপের বিরুদ্ধে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হেনে হত্যা-শোক
মাথা নিচু করব না কোটি লোক।

ঝড়ে রোদে বেলা গেল
(কোরাস)
গড়ি প্রাচীর
ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির
প্রাণখড়্গ
গান ধর্ গো
"ঐ কালোপন্থী কেউ টি ঁকবে না, না, না।"

পারাপার প্রথম সংস্করণে ও *অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা*-য় *সত্যাগ্রহ (১৩৫২)*-র শেষাংশ

অমিয় চক্রবর্তীর ওই কবিতা দুটিতে ছোটো-বড়ো হরফের ব্যবহার লক্ষ করে তার প্রত্যক্ষ প্রভাবেই হোক বা না-হোক, কৃতবিদ্য কবি রাজলক্ষ্মী দেবীর দ্বিতীয় গ্রন্থ *ভাব ভাব কদমের ফুল* (১৯৬৬)-এর অন্তর্গত *জন্মদিন* শীর্ষক রচনাতেও অনুরূপ উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে আছে। তেরজা রিমার মিলকাঠামোয় তিনটি স্তবকের পর একটি যুগ্মক, মোট এগারো পঙ্ক্তি, কবিতাটির সম্পূর্ণই এখানে দেওয়া গেল।

আজকে আমার জন্মদিন। তুমি নেই কোনোখানে।
শিরীষের ফুল যেন তোমার হাসির উপহার।
— দেখেছি আশ্চর্য স্বপ্ন গতরাত্রে, খুঁজি তার মানে।

দেখেছি, সমুদ্রে চলে বিশাল আমার 'লাইনার',
দু'ধারে ইচ্ছার মতো ভাঙে ঢেউ। এবং পিয়ানো :
টুনটুনি ঝুলনা ঝোলে। ঝড়ে ভেঙে যায় সিংহদ্বার।

যদি যাই বহুদূর সমুদ্রযাত্রায়, — তুমি জানো,
অরণ্য, পর্বত, নদী, অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা
আংশিক মেটাবে ক্ষতি। কেন না, যা গিয়েছে হারানো

তা' আমার স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি ও মৌলিক নীলিমা।
তা' আমার দিগন্ত। তোমার দু'চোখে তার সীমা।

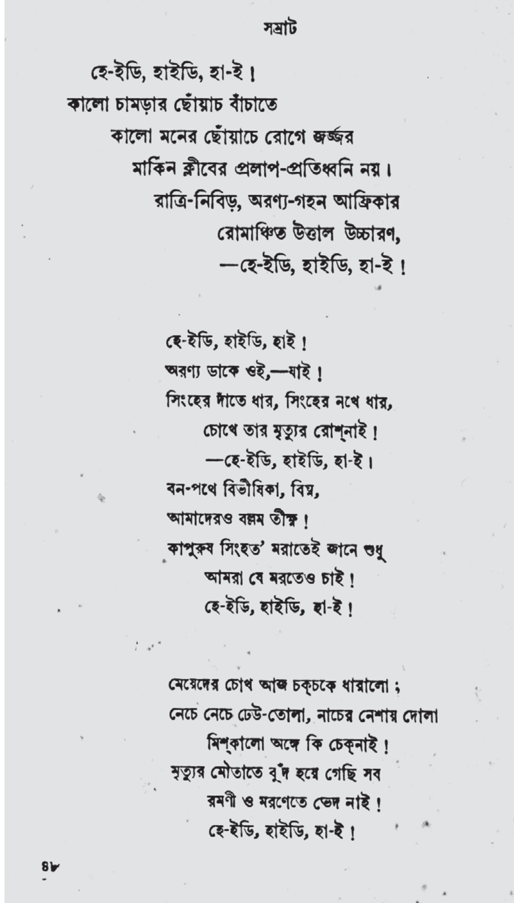
কবিতাটি আমরা তাঁর *নির্বাচিত কবিতা* (মহাদিগন্ত, ২০০০) থেকে উদ্ধৃত করলাম। মূল গ্রন্থ (কৃত্তিবাস প্রকাশনী) দুর্লভ হওয়ায় 'ঝড়ে ভেঙে যায় সিংহদ্বার' বাক্যটি সাধারণ পাইকা, না স্মল পাইকা বোল্ড বা স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত ছিল তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কম্পিউটার টাইপ সেটিঙে স্থূলাক্ষরে নয়, সামান্য বড়ো আয়তনে মুদ্রিত।

আবার, স্মল পাইকা এবং তার চেয়ে আয়তনে ছোটো বর্জাইস ব্যবহারের উদাহরণও রয়েছে একই কবিতায়। যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্রর *সম্রাট* (১৯৪০) গ্রন্থের অন্তর্গত *নীলকণ্ঠ* শীর্ষক রচনা। স্মল পাইকায় কবির আপনকথা, আর 'রাত্রি নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার / রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ' যাদের — 'হে-ইডি হাইডি হা-ই! / অরণ্য ডাকে ওই — যাই! / সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার, / চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই!...' শিকারজীবী সেই বন্য মানুষের 'কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস'কে প্রকাশ করা হয় বর্জাইসের মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ আর সেটি বোঝার উপায় নেই — না তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (দে'জ, প্রথম পরিবর্তিত সং ১৯৮৪, ষষ্ঠ সং ২০০১) দৃষ্টে, না সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর *কবিতাসমগ্র*-য় (সিগনেট প্রেস, ২০১৫)। ওই কবিতার সর্বাংশই একইরকম হরফে মুদ্রিত — প্রাক্তন সেই তফাতটাই মুছে গেছে দীর্ঘকাল আগে থেকে! দে'জ-এরও আগে ভারবি প্রকাশনার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থমালার অন্তর্গত হওয়ার সময়ও ওই তফাত ছিল না বলেই অশ্রুকুমার সিকদার মন্তব্য করেন — 'ভারবি-প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় এই হরফগত তারতম্য বজায় না রাখায়, মনে হয়, কবির অভিপ্রায়কে মূল্য না দিয়ে কবিতাটির ক্ষতি করা হয়েছে। বাংলা হরফে যদি ইটালিকস্ চালানো যেত তাহলে এইসব ক্ষেত্রে হরফের ছোট-বড় তারতম্যের পরিবর্তে ইটালিকস্ ব্যবহার করা যেত — বিদেশী কবিতার বইতে যেমন আকচার হয়।' (মুদ্রণ ও বাংলা কবিতার জন্মান্তর / দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন; সম্পা. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ, ১৯৮১)

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের তো লোকান্তর ঘটেনি তখনও — ভারবি সংস্করণে তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশের সময়, তাহলে 'কবির অভিপ্রায়কে মূল্য না দিয়ে কবিতাটির ক্ষতি করা'র কথা যে বলেছেন অশ্রুবাবু, তা হয় কী করে? তবে কি এক্ষেত্রে তিনি একেবারে কিছুই জানতে পারেননি? নাকি 'স্থান সংকুলানের জন্যে বা অন্য কোনো অজুহাতে কবির অভিপ্রেত বিন্যাস ভেঙে অন্যভাবে কবিতা মুদ্রিত করা'র মতো অনুচিত কর্মকেও পাকেচক্রে মেনে নিতে হয়েছিল? তাহলে তো একপ্রকার অনুমোদনই হয় সেক্ষেত্রে। আবার, দে'জ সংস্করণে যখন প্রকাশ পায় (১৯৮৪), তখনও তো সেই ত্রুটি সংশোধনের উপায় ছিল, সেক্ষেত্রেও হয়নি কেন? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তো দে'জ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন — 'চোখ বাধ সাধায় প্রেমেন্দ্র মিত্রর পক্ষে এ-বই আগাগোড়া দেখে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেধে সে-ভার আমিই কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। ফলে, ভুলত্রুটির দায়ও আমার।' (নতুন সংস্করণ প্রসঙ্গে) তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। আমরা আদার ব্যাপারী হয়ে আর হা-পিত্যেশ করি কেন!

যাই হোক, এক্ষেত্রে *সম্রাট*-এর প্রথম সংস্করণ (১৯৪০) এবং তার পরবর্তী 'নূতন সংস্করণ' (১৩৬২ ব.) উভয়ই আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হলে যা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, পাঠকের কাছে তা উপস্থিত করা গেল। খতিয়ে দেখে বিচার তিনিই করুন।

কিন্তু বিভ্রাট কেবল ওইসব ক্ষেত্রেই নয়, আরও আছে। যদিও তা হরফের তারতম্যঘটিত নয়, অন্য ধরনের; আর তা কবিতার অঙ্গহানিরই আরেক দিক।


সম্রাট

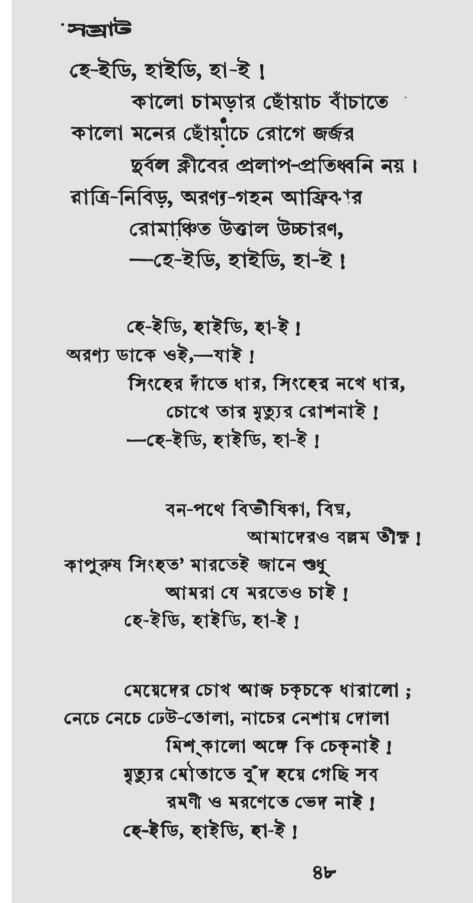
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জ্জর
মার্কিন ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি, হাই!
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই!
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার,
চোখে তার মৃত্যুর রোশ্‌নাই!
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই।
বন-পথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ!
কাপুরুষ সিংহত' মরাতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

মেয়েদের চোখ আজ চক্‌চকে ধারালো;
নেচে নেচে ঢেউ-তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেক্‌নাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

৪৮

সম্রাট প্রথম সংস্করণে (১৯৪০) *নীলকণ্ঠ*


সম্রাট

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর
দুর্বল ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই!
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার,
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই!
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

বন-পথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ!
কাপুরুষ সিংহত' মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

মেয়েদের চোখ আজ চকচকে ধারালো;
নেচে নেচে ঢেউ-তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেক্‌নাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

৪৮

সম্রাট দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫৫) *নীলকণ্ঠ*

যেমন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *পদাতিক* (১৯৪০) গ্রন্থের *অতঃপর* শীর্ষক রচনার ক্ষেত্রে। ঢাকাবাসী জনৈক বঙ্গচন্দ্র পালের (কবিপ্রদত্ত নাম) জবানিতে কোনো সম্পাদককে লেখা চিঠির আকারে রচনাটি দৃশ্যত টানা গদ্য — মাপা মাত্রায় পঙ্‌ক্তিবিন্যাস এমনই, কিন্তু সেখানেও অন্ত্যমিলের ছোঁয়া রয়ে গেছে। আঙ্গিকগত দিক থেকে অবশ্যলক্ষণীয় ওই রচনা। কিন্তু মূলগ্রন্থ, কিংবা তাঁর *কবিতাসংগ্রহ*-য় (প্রথম খণ্ড, দে'জ, ১৯৯২) দেখা না থাকলে, কেবল *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-য় (দে'জ) চাক্ষুষ করলে ওটির অঙ্গহানি সম্পর্কে পাঠক কিছুই বুঝতে পারবেন না। অক্ষরবিন্যাসে খেয়ালই করা হয়নি ওর ভেতর পঙ্‌ক্তিসজ্জায় অন্ত্যমিলগুলির দিকে। ফলে, পাঠক ওটিকে নির্ভেজাল গদ্যকবিতা স্বরূপই জানবেন। আর সে-জানা যে সঠিক নয়, তাই-বা তিনি বুঝবেন কী করে! *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের (১৯৮২) পরবর্তীগুলিতে তা সংশোধিত হয়ে থাকলে উত্তম, কিন্তু তা না হলে সংশোধন জরুরি। এ কিন্তু তাঁর *চিরকুট* (১৩৫৭ ব.) গ্রন্থের সেই *উনত্রিশে জুলাই* (স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!..) কবিতার দৃশ্যরূপ এবং নাম বদল (ময়দানে চলো; শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৮২) নয়, যা কবির অনুমোদন ছাড়া সম্ভব ছিল না। যাই হোক, এখানে তাঁর *কবিতাসংগ্রহ : ১* এবং *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র উক্ত সংস্করণ থেকে *অতঃপর-এর* অংশ বিশেষ দেওয়া গেল, লক্ষ করুন —

অতঃপর

সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, ইতস্তত ভূসম্পত্তি আছে নিম্নস্বাক্ষরকারীর। এ-দুর্দৈবে জমিদারী রক্ষা দায়। বংশপরম্পরাগত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভুবনে ঈশ্বর চালান, চলি।

পেয়াদারা বশংবদ : প্রবঞ্চক আদায়ের প্রত্যেক ফিকির তাদের কণ্ঠস্থ আজো। অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয়নি গত দুই তিন সনে। আদালতে ফল অল্প।

যৎসামান্য আয় আজো বন্ধকীতে। ভিক্ষাপাত্র নির্ঘাৎ নতুবা। বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশবিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অগ্রিম — পৈতৃক বলাও চলে।

বিপদ একাকী নয়কো! — সচ্চরিত্র, কিন্তু ক'টি বুদ্ধিহীন যুবা নিরক্ষর চাষাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ করে। দুশ্চিন্তায় আমাদের হাত-পা সব হিম। (সাম্যবাদী দল এরা?)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-য় *অতঃপর-এর* অংশবিশেষ

অতঃপর

সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, ইতস্তত ভূসম্পত্তি আছে নিম্নস্বাক্ষরকারীর।
এ-দুর্দৈবে জমিদারি রক্ষা দায়। বংশপরম্পরাগত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভুবনে
ঈশ্বর চালান, চলি।

পেয়াদারা বশংবদ : প্রবঞ্চক আদায়ের প্রত্যেক ফিকির
তাদের কণ্ঠস্থ আজো। অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয়নি গত দুই তিন সনে।
আদালতে ফল অল্প।

যৎসামান্য আয় আজো বন্ধকীতে। ভিক্ষাপাত্র নির্ঘাৎ নতুবা।
বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশবিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অগ্রিম—
পৈতৃক বলাও চলে।

বিপদ একাকী নয়কো! — সচ্চরিত্র, কিন্তু ক'টি বুদ্ধিহীন যুবা
নিরক্ষর চাষাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ করে। দুশ্চিন্তায় আমাদের হাত-পা সব হিম।
(সাম্যবাদী দল এরা?)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *কবিতাসংগ্রহ : ১-এ অতঃপর*

নীলকণ্ঠ-য় যেমন শিকারজীবী বন্য মানুষের আরণ্য উল্লাস 'হে-ইডি, হাইডি, হা-ই' বর্জাইস হরফে সাকার হয়েছিল, তেমনই আবার সভ্য সাঁওতালি সমাজের বাদ্যধ্বনি, 'দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং' নগরপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে — অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের *নিষিদ্ধ কোজাগরী*-র (১৩৭৩ ব.) অন্যতম স্মরণীয় রচনায় (নগরপ্রশ্ন ও সাঁওতালি প্রত্যুত্তর) —

''ইচ্ছা মিটে যাওয়ার পরেও ঘৃণিত শয়তান
কেন অমন ইচ্ছা বানায়, উত্তাল মশারি
ছিঁড়ে কেন পালিয়ে যায় সকল নক্তনারী?''
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং।।

''একাদশী চাঁদের চোখে কৃপাদৃষ্টি ঝরে,
কোনো-কোনো গৃহীর মুখে ঈশ্বর ঝরান
কী-অপরূপ আভা, তবু কে রয় নিজের ঘরে?''
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং।।

''রুক্ষ দুপুর সে-ও কি তোদের সুন্দর কাকিমা
এক-একজনের স্বপ্ন নাকি ধানকেয়ারির সীমা?
মৃত্যু বুঝি তোদের কাছে নিশীথিনীর নাম?''
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং।।

এই কবির অন্য রচনাতেও হরফের তারতম্য লক্ষ করা যায়। যেমন, *দুই বন্ধু*-র (১৯৮৪) ভেতর —

শব্দের গ্রন্থনাকেই আমরা তুলে দিয়েছি স্রগ্ধরা,
তার নিদর্শন সেই আমাদের ষট্‌পদীর ছড়া :

হায়দারাবাদ থেকে এনেছে বিদ্রির কাজ
আমার গভীর বন্ধু এক

এনেছে হায়দ্রাবাদ থেকেও বিদ্রির কাজ
গভীর আমার বন্ধু

হায়দ্রাবাদ থেকে এই বিদ্রি যে এনেছে তার কাজে
গভীরতা মিশে আছে, সে তবুও আমার বন্ধু না

লক্ষণীয়, 'হায়দারাবাদ', এবং 'হায়দ্রাবাদ'-এর উচ্চারণগত তফাতে মাত্রামূল্যের পার্থক্য এবং বাক্যের অন্বয়গত বৈভিন্ন্য। বিশ্লিষ্ট 'হায়দারাবাদ' যথাবিধি ছয় মাত্রা, কিন্তু হায়দ্রাবাদ প্রথমে সংকোচনে পাঁচ, পরে বিশ্লেষে ছয় — বাক্যের ভেতর অন্য শব্দের পরে একবার বা মধ্যবর্তী থেকে এবং আরেকবার বাক্যের শুরুতে থেকে অবস্থান বদলের দরুন। আবার ওই দীর্ঘায়ত কবিতারই অন্যত্র স্পেস এবং ইটালিক্সের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়, যেমন —

নিজের লেখা 'দেবীগর্জনে'র সেই ভূমিকা ছিল
বিজনদারই — শেষে   সাজঘরের প্রান্তে   শরীর থেকে
নটের ডাকসাজ   খুলে ফেলার মুহূর্তে   নিজেকে দেখে
চোখের জল তাঁর   দেখে ফেলেছি চাপা   কৌতূহলে
মনন ও হৃদয়   তখনো অবিভক্ত   আকাশতলে

যাই হোক, হরফগত তারতম্য যে কবিতার দৃশ্যরূপের ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এইসব উদাহরণে আমরা সেইটিই দেখার চেষ্টা করলাম। হতে পারে আমাদের ভাষায় মালার্মের সেই বিখ্যাত রচনা *Un Coup De Dés Jamais N'Abolira Le Hasard* (1897; A throw of the dice never will abolish chance)-এর তুল্য হরফের তারতম্য এবং ফাঁক বা শূন্যতার ব্যবহারে কোনো দর্শনীয় রচনা নেই। কিন্তু যৎসামান্য যা আছে, সেসবের দিকে লক্ষ রেখেও হয়তো বুঝে নিতে পারি কবিতার শরীরে তার ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ভূমিকাটুকু।

বাংলা অক্ষরের ছাঁদ অনেকটা নির্দিষ্ট না হলে হেমচন্দ্রের পক্ষেও হয়তো সম্ভব ছিল না হরফের ওই তারতম্য দিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ। ততদিনে শতবর্ষ পার বাংলা মুদ্রণের। বহু জল বয়ে গেছে হুগলি নদী দিয়েও। কবিতা — সে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদীই হোক, কিংবা প্রবহমান মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষর, কিংবা ছোটো-বড়ো পদবিন্যাস ভাঙা ভাঙা ছত্রের সজ্জায়, দেখতেও হয়েছে অন্যরকম। কমা, ড্যাস, সেমিকোলন — সবই যোজনা হয়েছে, পূর্ণচ্ছেদ তো আছেই — পুথির যুগ থেকে, একটি নয় শুধু, একটির পাশে আরেকটিও। উপরন্তু এসেছে ফাঁক — যা 'স্পেস' বলতে অভ্যস্ত আমরা, তার ব্যবহারে কবিতায় বিশিষ্ট দৃশ্যরূপও। সে কেবল যুগ্মক, কিংবা একাধিক পঙ্ক্তি সহযোগে প্রস্তুত স্তবকের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করার জন্য নয়, ছত্রের পর্ববিভাগ স্বরূপও — শব্দের মধ্যবর্তী হয়ে। পাঠককে কবিতার পাঠে সাহায্য করতে, ছন্দের চালটাকে ধরিয়ে দেবার জন্যেও। অর্থাৎ এর পেছনে সচেতন একটা প্রয়াস সক্রিয় ছিল। এক্ষেত্রে একটু পেছনে তাকালে দেখা যায়, বাংলা মুদ্রণের সূচনা যাঁদের মারফত হয়েছিল, এ-কর্মটি তাঁরাও করে গিয়েছিলেন যথাবিধি। হালেদ সাহেব যখন 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' তাঁর বইখানি প্রণয়ন করেন, তখনই, সেই সতেরোশো আটাত্তরে। দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদীর বিভাজন প্রদর্শনের সময়। তাঁর প্রদর্শিত একটি চৌপদীর উদাহরণ ছিল এমনই —

আ গো মর‍্যা যাই   লইয়া বালাই   কুলে দিয়া ছাই
ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া   উহারে লইয়া   যাই পলাইয়া
সাগর পারে॥

পরিষ্কার তিনটি অর্ধযতির প্রতিনিধিত্ব করছে ফাঁকগুলি এবং চার ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। অপূর্ণ শেষ পদটিকে আলাদাও করা হয়েছে। প্রথম তিন পদে এই উদাহরণে মিল আছে, কিন্তু তৃতীয় পদটি চৌপদীর ক্ষেত্রে মিলহীনও হয় কখনো। সেটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবিকর্ম। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এখানে। পুথির ক্ষেত্রে যেমন পদগুলি সবই অনুভূমিকভাবে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে কিছুটা সেরকমভাবে রয়েছে। যদিও পদগুলির মাঝখানে ফাঁক আছে এবং শেষ পদটিও স্বতন্ত্র করেই দেখানো হয়েছে। দৃশ্যত অবশ্যই আলাদা। এই উদাহরণকে অবলম্বন করেই এখন আমরা যদি এর বিন্যাসে বা সজ্জায় বদল ঘটাই, তাহলে যা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে —

আ গো মর‍্যা যাই
লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই
ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া
উহারে লইয়া
যাই পলাইয়া
সাগরপারে॥

আবার এই নতুন সজ্জাতেও যদি কোনো পরিবর্তন আনতে চাই, তাও সম্ভব —

আ গো মর‍্যা যাই
লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই
ভজি ইহারে।

যোগিনী হইয়া
উহারে লইয়া
যাই পলাইয়া
সাগরপারে॥

এতেও আবার কিছুটা বদল আনা যেতে পারে। কিন্তু আমরা আর এক্ষেত্রে সজ্জাবিলাসী হতে চাই না। যে-দুটি নমুনা দেওয়া গেল, প্রকৃতপক্ষে সেটাই করেছিলেন কবিতার দৃশ্যরূপে বদল এনে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের কবিরা। স্পেস ব্যবহারে যার দরুন বৈচিত্র্য এসেছিল মুদ্রিত কবিতায়। আর তা সম্ভব হয়েছিল ছন্দ-পঙ্ক্তি রচনা সূত্রেই — নতুন ছন্দকে প্রয়োগ করতে গিয়ে। এর অজস্র উদাহরণ আছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় — তাঁর অনুসরণে এবং অনুকরণেও বহুজনের।

সেকালে বিশিষ্ট ছন্দ-পঙ্ক্তি রচনার কারণে পাঠককে জানাতেও হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে তাঁর *বিরহানন্দ* (মানসী) কবিতার শীর্ষটীকায় — 'এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক।'

ছিলাম নিশিদিন   আশাহীন   প্রবাসী
বিরহতপোবনে   আনমনে   উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে   দিশে দিশে   খেলিত,
অটবী বায়ুবশে   উঠিত সে   উছাসি।
কখনো ফুল দুটো   আঁখিপুট   মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে   পড়িত রে   নিশাসি।

এমনকী *মানসী*-র (১২৯৭ ব.) ভূমিকায় যুক্তবর্ণের মাত্রামূল্য সম্পর্কেও মন্তব্য করেন, যখন তিনি নিশ্চিত হয়েছেন তাঁর প্রাপ্য দু-মাত্রা সম্পর্কে (কলাবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে)। কারণ সেকালে অধিকাংশ রচনাই মিশ্রকলাবৃত্তে হওয়ার দরুন ওই ছন্দের ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের যে মাত্রামূল্য তার থেকে স্বতন্ত্র করার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি কলাবৃত্তে রচনার অনভ্যাসে। (যার দরুন অনেক সময় মাত্রারক্ষার প্রয়োজনে কোনো শব্দকে কোমল করেও লেখা হত। যেমন, শব্দ > শবদ, প্রকাশ > পরকাশ ইত্যাদি) যদিও কলাবৃত্তের আদল অনুপস্থিত ছিল না বিভিন্ন কবির রচনায় (স্মরণীয়, মধুসূদনের *ব্রজাঙ্গনা*-য় 'কুসুম : ১' — 'কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি — / ভরিয়া ডালা'); কিন্তু বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় সমস্যা ছিল ওই যুক্তবর্ণের মাত্রামূল্য নির্ধারণে (সেটা মধুসূদনের ওই রচনাতেও আছে, দ্র. কুসুম : ৩,৪,৫; ব্যতিক্রম 'বসন্তে : ১'-এ 'পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল', 'চঞ্চল' বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে)। যার দরুন ছন্দ-সুষমা নষ্ট হত — উভয় ছন্দের চালে যে-পার্থক্য তা সুস্পষ্ট না হওয়ায়। এই সমস্যা রবীন্দ্রনাথ এড়াতেন তাঁর প্রথম দিককার রচনায় যথাসম্ভব যুক্তাক্ষরবর্জিত শব্দের ব্যবহারে এবং তাঁর অতুলনীয় শ্রুতির গুণে। কিন্তু সবার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত, উদ্ধৃত ওই রচনায় রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জার ছাপ সুস্পষ্ট হলেও, এর উৎসে কিন্তু তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ ভূমিকা ছিল — *স্বপ্নপ্রয়াণ*-এর সূত্রে —

হেথায় ঝরঝর ঝরঝর ঝরণা ঝরে।
পাদপ মরমর মরমর শবদ করে॥
কি জানি কোথা হতে বায়ুপথে আসিছে গীত।
বীণার ঝঙ্কার হয় আর আচমবিত॥

(নন্দপুর প্রয়াণ)

স্পেসের ব্যবহারে আমাদের সুপরিচিত, রবীন্দ্রনাথের আরও একটি রচনা — *কড়ি ও কোমল*-এর 'তুমি' —

তুমি   কোন্ কাননের ফুল,
তুমি   কোন্ গগনের তারা!
তোমায়   কোথায় দেখেছি
যেন   কোন্ স্বপনের পারা!
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি।
শুধু   মনের মধ্যে জেগে আছে
ওই নয়নের তারা।

পাঠক, লক্ষ করুন, অতিপর্বের অবস্থান এবং ওই সূত্রে ছত্রগুলিকে কীভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে ফাঁক রেখে। আবার অন্যত্র — তাঁর *নদী* থেকে —

আমি　　বসে বসে তাই ভাবি,
নদী　　কোথা হতে এল নাবি।
কোথায়　　পাহাড় সে কোন্‌খানে,
তাহার　　নাম কি কেহই জানে।

কিংবা *পূরবী*-র 'দুর্দিন' শীর্ষক কবিতায় —

ওই আকাশ-'পরে আঁধার মেলে কী খেলা আজ খেলতে এলে
　　তোমার মনে কী আছে তা জানব না।
আমি　　তবুও হার মানব না,　　হার মানব না।
　　তোমার　সিংহ-ভীষণ রবে,
　　তোমার　সংহার-উৎসবে,
　　তোমার　দুর্যোগ-দুর্দিনে —
তোমার　তড়িৎশিখায় বজ্রলিখায় তোমায় লব চিনে —
কোনো　শঙ্কা মনে আনব না গো আনব না।
যদি　　সঙ্গে চলি রঙ্গভরে　　কিংবা পড়ি মাটির 'পরে
　　তবুও হার মানব না হার মানব না।

রবীন্দ্র-কবিতায় অতিপর্বের উপস্থিতি এবং শব্দ-মধ্যবর্তী ফাঁক যে কতরকমভাবে ছড়িয়ে আছে, তা অনুধাবন করতে গেলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই, কবিতার দৃশ্যরূপে সেসবের বৈচিত্র্য দর্শনে।

প্রসঙ্গত, এইসব কবিতাই যখন বইয়ের পৃষ্ঠায় পূর্ণরূপে বিরাজ করে, তখন যে প্রতিক্রিয়া হয় আমাদের পাঠক হিসেবে, সে তো বাস্তবিকই খণ্ডদৃশ্য দর্শনে হয় না। ধরুন, আপনি ওই *বিরহানন্দ* কবিতাটি যখন বইতে সামগ্রিকভাবে চাক্ষুষ করছেন, সেখানে শব্দ-মধ্যবর্তী ওইসব স্পেসের মাধ্যমে নদীর ধারার মতো যে বঙ্কিম প্রবাহ প্রত্যক্ষ করবেন, সে তো উদ্ধৃত ওই কয়েক ছত্রে পাওয়া যাবে না। কিংবা, *নদী* কবিতাটিই যখন বইতে পূর্ণরূপে দেখছেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই নদীর ধারাবাহিকতা পাঠক হিসেবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দেখে আপনার যে-প্রতিক্রিয়া হবে, সে তো আপনি ওই সামান্য চার ছত্রে পাবেন না। তবু আলোচনা সূত্রেই দেওয়া গেল, ভবিষ্যতে কোনো অবসরে ওটির পূর্ণরূপ দেখবার স্পৃহা হলে দেখে নেবেন।

এবার দেখুন, স্পেসকে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যে-রচনা আপনি একটু আগেই অন্য সজ্জায় দেখেছেন, তারই বদল হচ্ছে কীভাবে। যখন আমরা *কড়ি ও কোমল*-এর ওই *তুমি* কবিতাটি *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-র (প্রথম খণ্ড, ১৯৮০; প.ব. সরকার প্রকাশিত) পৃষ্ঠায় নয়, *গীতবিতান*-এ চাক্ষুষ করি —

তুমি　কোন্ কাননের ফুল,　তুমি　কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি　যেন　কোন্ স্বপনের পারা॥
কবে তুমি গেয়েছিল,　আঁখির পানে চেয়েছিলে
　　ভুলে গিয়েছি।
শুধু　মনের মধ্যে জেগে আছে　ওই নয়নের তারা।

দৃশ্যরূপ তো সম্পূর্ণই বদলে যাচ্ছে। অধিকন্তু চিহ্নের ক্ষেত্রেও বদল লক্ষ করা যাচ্ছে। 'তারা' এবং 'পারা'-র পরে যে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ছিল, তা হয়ে যাচ্ছে এক দাঁড়ি আর দুই দাঁড়ি।

আমাদের খুবই পরিচিত, বাল্য থেকেই, রবীন্দ্রনাথের আরও একটি রচনা — 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' — গান হিসেবেই জানি মূলত; অল্প বয়স থেকে *সঞ্চয়িতা*-য়, কিংবা, *গীতবিতান* প্রথম খণ্ডে 'পূজা' পর্যায়ে দেখে এসেছি। দু-ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও সেটা তলিয়ে ভাবার মতো মন তৈরি হয়নি। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হলে যখন রচনাবলীতে চাক্ষুষ করার সুযোগ এসেছে, দেখি, সম্পূর্ণ আলাদা ছবি। সেই রূপভেদ কেবল ওইটিতেই নয়, রবীন্দ্র-রচনায় আরও বহু ক্ষত্রে আছে। কবিতা এবং গানের কথা স্বরূপ যখনই স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে, বদলে গেছে তখনই। এর বাইরেও আরও বদল ঘটে থাকবে, সেসব এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, আর এ ব্যাপারে আমরা বিশেষজ্ঞও নই। যা হোক, আমাদের প্রয়োজন ভিন্ন, অতএব দেখে নেওয়া যাক। *সঞ্চয়িতা*-য় (সং ১৯৬৩) 'পরশমণি' শীর্ষকে স্তবক বিভক্ত হয়ে যেভাবে — তার প্রথম স্তবক —

আগুনের　পরশ-মণি　ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন　পুণ্য করো　দহন-দানে।
আমার এই　দেহখানি　তুলে ধরো,
তোমার ওই　দেবলয়ের　প্রদীপ করো —
নিশিদিন　আলোক-শিখা　জ্বলুক গানে।
আগুনের　পরশ-মণি　ছোঁয়াও প্রাণে॥

এই রচনাই *গীতবিতান*-এ 'পূজা' পর্যায়ে (২১২ সংখ্যক) যখন সংকলিত, শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁক রয়েছে ঠিকই, যদিও প্রথম পদগুলির পর ফাঁক একটু বেশি, কিন্তু এই দ্বিপদীবন্ধের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুই দাঁড়ি যুক্ত হয়েছে — সেটা ধ্রুবপদ স্বরূপ ওখানে সর্বত্রই আছে যেমন, তা ছাড়া পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতেও অনুরূপ। কিন্তু প্রথম পঙ্‌ক্তিকে আর পঞ্চমের পরে ষষ্ঠ স্বরূপ ফিরিয়ে আনা হয়নি সংগত কারণে — যেহেতু ওই ধ্রুবপদে আবার ফিরে আসতে হবে গীত হওয়ার সময়। সেখানে দশটি পঙ্‌ক্তি, যথারীতি ফাঁক দিয়ে পর পর। পঞ্চমের পর দুই দাঁড়ি প্রথম স্তবকের সমাপ্তিসূচক হয়ে আছে, যেমন দশম পঙ্‌ক্তির পরেও।

এবার ওইটিই যখন *গীতালি*-র অন্তর্গত ১৮ সংখ্যক রচনা স্বরূপ রচনাবলীতে চাক্ষুষ করি, রূপের বদল কীরকম, লক্ষ করুন — ওই প্রথম স্তবকই —

আগুনের
　　পরশমণি
　　　　ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
　　পুণ্য করো
　　　　দহন-দানে।
আমার এই
　　দেহখানি
　　　　তুলে ধরো,
তোমার ওই
　　দেবালয়ের
　　　　প্রদীপ করো,
নিশিদিন
　　আলোক-শিখা
　　　　জ্বলুক গানে।
আগুনের
　　পরশমণি
　　　　ছোঁয়াও প্রাণে।

ধুয়ো এখানে রয়েছে *সঞ্চয়িতা*-র মতো, সেটাই স্বাভাবিক, কারণ মূলে এটি কবিতা, দ্বিপদীবন্ধে। উপরন্তু স্তবকসূচক যে-ফাঁক, সেটিও রয়েছে, যা *গীতবিতান*-এ ছিল না, দুই দাঁড়ি দিয়ে তা বোঝানো হয়েছিল। চিহ্নেও এক্ষেত্রে সামান্য তফাত আছে — প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'ছোঁয়াও প্রাণে'-র পর যা কমা (,) চিহ্ন ছিল *সঞ্চয়িতা*-য়, এখানে তা পূর্ণচ্ছেদ। আবার চতুর্থে 'প্রদীপ করো'-র পর যে ড্যাস (—) চিহ্ন ছিল, এখানে তা কমা (,) চিহ্ন। প্রথম পঙ্‌ক্তির পুনরাবর্তনে, স্তবকের সমাপ্তিসূচক দুই দাঁড়ি যা ছিল, এখানে তা এক দাঁড়ি। যাই হোক, প্রত্যেক পদকে স্বতন্ত্র সারিতে রেখে এই যে সিঁড়ির মতো দৃশ্যরূপ পাঠকের কাছে দেওয়া হয়েছিল তাকেই যখন আবার সংকলন গ্রন্থে উপস্থিত করা হয়, স্থান সংকুলানের প্রশ্নে তার দৃশ্যরূপ কীভাবে বদলে গেছে, ফাঁক বা স্পেসের ব্যবহার দুটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পন্থায় হওয়ার দরুন, সেটি অনুধাবনের জন্যই এখানে আমাদের তুলনাত্মক আলোচনায় আসতে হল।

প্রসঙ্গত, দলবৃত্তের বিশিষ্ট এই চালে রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু রচনা আছে (যাদের অন্যতম, ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি) এবং তাঁর অনুজ কবিদেরও। কিন্তু একে রবীন্দ্রনাথ যতটা ভাবগম্ভীর করে প্রকাশ করেছেন, অন্যক্ষেত্রে তা দুর্লভ — ছোটোদের ছড়াতেই তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। স্মরণীয়, নজরুলের *লিচুচোর*, সুকুমার রায়ের *নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার*। কালক্রমে অনেকেই লিখেছেন — তা লক্ষও করা যায় একালের স্বনামধন্য কবি শঙ্খ ঘোষের এবং আরও অনেকের রচনায়। শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিজীবনের প্রথম দিকে এবং পরিণত বয়সেও যখন লেখেন এই ছন্দে, উভয়ক্ষেত্রে দৃশ্যগত তফাত কিছুটা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই ভাবগত পার্থ্যক্যও। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে মিল যেখানে — সেটি হল শব্দের মাঝখানে ফাঁক বা স্পেস ব্যবহারে। আমাদের এই আলোচনায় সেটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় দুটি রচনারই অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

১। বহো রে   আলোর মালা   অবশা   রাত্রি ঘিরে
মেঘের ওহ   আকাশ ছিঁড়ে   ঝরে রে   বেদন-সুরা
কবিতা   কল্পলতা   আকুলা   চঞ্চলতা
বাঁধে রে   যন্ত্রণা তার   বাঁধে সে   তমস্বিনী।

— *দিনগুলি রাতগুলি*

২। মনে হয়   অনেকদিনই
সে কিছু   বলছিল না
ভেবেছে   অভাব তো নেই
দড়িরও না   কলসিরও না
যদি জল   সামনে থাকে
অতলে   বাঁধবে তাকে
সাত না   হাজার পাকে
জলে কি   মন ছিল না?
ভেবে সে   অনেকদিনই
কিছু আর   বলছিল না

— 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়', *ধুম লেগেছে হৃৎকমলে*

দ্বিতীয় রচনার শীর্ষটীকায় প্রসঙ্গসূত্র ধরিয়ে জানানো হয়েছে, 'তারপর আট মাসের মেয়েটিকে ভাসিয়ে দিয়ে যুবতী বধূটিও...'। সুতরাং এই রচনা যে বাস্তব কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবির প্রতিক্রিয়া তা বুঝতে পারা যায়। এটিতে সুরারোপও করা হয়, অনেকে শুনে থাকবেন হয়তো, লোপামুদ্রা মিত্রর কণ্ঠে। লক্ষণীয়, প্রথম রচনায় শব্দের মাঝখানে ফাঁক বাড়িয়ে ৭+৭ চোদ্দ দলমাত্রায় এক একটি ছত্রকে পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং তার দরুন বারোটি সারিতে বিভক্ত ওই রচনার স্বতন্ত্র দৃশ্যরূপও তৈরি হয়। রচনাটি সুপরিচিত, অনেকেই দেখে থাকবেন তাঁর গ্রন্থে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সাত দলমাত্রার প্রতি পর্বকে এক-এক ছত্র করে সাজানো হয়েছে। তা ছাড়াও প্রথম স্তবকের চতুর্থ সারিতে প্রথম পদেই পাঠকের পড়ার ঝোঁককে কিঞ্চিৎ সামলে দিয়েছেন, যাতে সে কোনোক্রমেই ওই ছন্দের চালে মশগুল হয়ে মূল বিষয় থেকে সরে না যায় — ৩+৪ দলমাত্রায় পড়া শুরু করে 'দড়িরও না, কলসিরও না' — ৪+৪ দলমাত্রায় যখন পাঠক উপস্থিত হচ্ছেন, স্বাভাবিক কারণেই তাকে থামতে হচ্ছে, আর সেটাই কবির অভিপ্রায়, তাঁর পরিণত বুদ্ধিরই প্রকাশ সেখানে, যা তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ।

এই কবিরই আরও একটি রচনার দিকে আমাদের আলোচনাক্রমে নজর দেব। ছয় মাত্রার কলাবৃত্তে লেখা — কিন্তু এর সজ্জা এমনই, প্রাথমিকভাবে সেইটিই পাঠকের চোখে পড়বে, আর পড়তে গেলে তখনই ধরা যাবে এর ছন্দের ঝোঁকটাকে। ছোটো ছোটো পর্ব, ভাগ করা হয়েছে ফাঁক দিয়ে — দৃশ্যরূপের দিক থেকেও নজর কাড়ে। তাঁর *মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়* (১৯৭৪) গ্রন্থের *পতঙ্গ* শীর্ষক কবিতা — দেখা যাক —

কিছু পতঙ্গ উড়ে এসেছিল আমার মাথার
ভিতরে সে ছিল
ঝোড়ো পতঙ্গ উড়ো পতঙ্গ
বীজাণুর চেয়ে   গুঁড়ো পতঙ্গ
খুঁড়ে খুঁড়ে এই খুলি খুলেছিল ঘুণ ঘুণ ঘুণ কুরে খেয়েছিল
আমার ভিতরে যা-কিছু-বা ছিল সহসা সাহসে
ভর করে এসে
সব খুঁড়েছিল দলে দলে যত হীন পতঙ্গ গুঁড়ো পতঙ্গ
উড়ে এসেছিল আমার মাথার
ভিতরে সটান কিছু পতঙ্গ
উড়ো।

বইয়ের সাদা পৃষ্ঠায় যখন এটি দেখা যায় কালো অক্ষরে, পাঠকের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, ঝোড়ো, উড়ো, গুঁড়ো, হীন পতঙ্গই যেন সেখানে বিস্তীর্ণ এবং এই রচনায় এমন এক গতি আছে যা পাঠককে প্রথম থেকে শেষ অবধি একনিশ্বাসে পড়িয়ে নেয়, থামতে হয় যখন অবশেষে, মনে হয়, যেন শেষ হয়নি, কিছু বাকি আছে। লক্ষ করুন, একটি পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া সমস্ত রচনায় কোনো বিরামচিহ্ন নেই এবং শেষ শব্দ 'উড়ো' অপূর্ণ পদ, যা সমগ্র রচনার কোথাও নেই। এমনকী যুক্তাক্ষরও একমাত্র 'পতঙ্গ' শব্দেই, আর কোথাও নেই। ফলে ওই শব্দের ধ্বনি — শব্দটির আবর্তনে বারংবার যা সৃষ্টি হয়, বাজতে থাকে। তাহলে কেবল দৃষ্টি নয়, শ্রুতিও যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে।

এবার আমরা অন্য কবির রচনায় তাকাব। প্রয়াত নরেশ গুহর *দুরন্ত দুপুর*-এর (১৯৫২) *রুমির ইচ্ছা* —

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল   হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের   ক্লাশ।

তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব   রোজ,
পায় না আমার কেউ   খোঁজ।
তবে আমি উড়ে-উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক   ভোজ।

হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল   লাল
ভ'রে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে,
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।

কবিতাটি আমাদের অপরিচিত কিছু নয়, হয়তো আমাদের ভালোলাগা থেকেই কিছুটা স্মরণে আসে। কোনো জটিল রচনা নয়। কিন্তু আমাদের মনে থেকে যায় ঠিক সে-কারণে নয়। বরং এর রচনাশৈলীর গুণে। আর ওই যে হাঁস, ক্লাশ, রোজ, খোঁজ, ভোজ, লাল এমন সব ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে থেমে গিয়ে পরের পঙ্‌ক্তিটা খুঁজে ফিরি হাঁপ ছেড়ে, ওইটা ভুলি কী করে! ওইখানেই যে এর আশ্চর্য চাবিটা লুকোনো। আর দেখতেও তো একটু অদ্ভুত। কোনো অতিপর্ব নয়, যা পঙ্‌ক্তির আগে থাকে। চার-চার করে এগিয়ে শেষে দুই-এর দেয়ালে ধাক্কা, ফিরতিতে আবার সেই চার-চার। 'মৌমাছি'-টাই যা একটু ভেঙে বলতে হয়। বাকি সব ঠিকঠাক। অবশ্য তৃতীয় স্তবকের 'হোক আমার'-কে জুড়ে না দিলে একটু অসুবিধে আছে, জুড়লেই — হোকামার, ল্যাঠা চুকে যায়। এমন রচনার জুড়ি ক-টা আছে? মেলা ভার।

এতক্ষণ আমরা যৎসামান্য উদাহরণে স্পেসের ব্যবহার যা লক্ষ করেছি, সেসব থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কবিতার দিকে এবার নজর ফেরাব। রচনা অমিয় চক্রবর্তীর, তাঁর *পারাপার* (১৩৬১ ব.) গ্রন্থের *সনেট* শীর্ষক কবিতা। নামত 'সনেট' হলেও, তার গাঢ় বন্ধন কিছুই নেই। মিলের ধরন কিছুটা শেক্সপিয়রীয় সনেটের আদলে; কিন্তু এর যা সজ্জা তাকে 'সনেটকল্প'ও বলা যায় কি না সে নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। যাই হোক, আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে প্রাসঙ্গিক।

হে যম, অন্ধকার যাত্রীর শোনো কথা :
মৃত্যু হলো।
অস্পষ্ট ওপারে আমরা চলে
যাচ্ছিলাম, মেদিনীপুরের লোক,
জলে —
ঝড়ে যে-রাত্রে মেদিনীপারের শূন্যতা
ডেকে নিল।
ভয়ংকর তেষ্টা, ছেলে কেঁদে
কোথায় হারালো... আজো কাঁদে;
এলো বান,
ওরে বাড়ি আয়।
একি ঢেউ, না কামান?
এদিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা,
বেঁধে
মারে, "কংগ্রেসি কোথায়?" সঙ্গে, যম,
দেশী
সৈন্য হাসে
— নয়, এরা মৃত্যুদূত নয়,
যে-মৃত্যু তোমার কালো ঝড়ে —
ধরাময়
কোথা থেকে পাপ আনে এরা?
শোনো,
বেশি
মনে নেই...
যম,
ঘরনী কোথায়?
ঘরে
যেতে হলে পথ বলো খুঁজব কি করে॥

এতটা ফেলে-ছড়িয়ে না হলেও, স্পেসকে ব্যবহার করে স্বতন্ত্র নকশা ফুটিয়ে তোলার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় দৃষ্টিপাত দাবি করে আমাদের।

তেমনই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রচনার দিকেও। তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত পাঠক মাত্রেই তা জানেন। ছন্দবদ্ধ পঙ্ক্তিকে ভেঙে স্পেসকে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে, তেমনই আবার টুকরো ছোটো কথাকেও নির্দিষ্ট বিন্যাসক্রমে ওই স্পেসেই রেখে আশ্চর্য দৃশ্যরূপ নির্মাণও বিরল নয়। কত বিচিত্রভাবে সেসব ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায়! যৎসামান্য উদাহরণ রইল এখানে। প্রথমে তাঁর সেই বিখ্যাত রচনা 'তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ' (লাল টুকটুকে দিন / ফুল ফুটুক) থেকে এবং পরে আরেকটি সেই স্মরণীয় রচনা *যাচ্ছি*-র (জল সইতে) অংশবিশেষ।

১। দিনে দূরে ঠেলে দিনান্তে নিলে কাছে।
ঠা-ঠা রোদ্দুরে পাই নি কোথাও ছায়া,
নীল সমুদ্র পুড়ে গেছে সেই আঁচে
চোখ মুছি —
তুমি স্বপ্ন!
না, তুমি মায়া?

আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি —
গলুক
বুকের
অশ্রুজমাট শিলা।
দাও তুমি ভালবাসাকে জন্মভূমি
ঘৃণার ধনুকে
আমি টেনে বাঁধি
ছিলা।

২। ও ফুলের সাজি
ও নদী, ও মাঝি
বনের জোনাকি
ও নীড়, ও পাখি
যাচ্ছি

ও ছুঁচ
ও সুতো
ও ছিটের জামা
ফিতে-বাঁধা জুতো
যাচ্ছি

ও ছবি
ও পান
মমতা
ও টান
যাচ্ছি

ও চোখের চাওয়া
ও ছাদ, ও সিঁড়ি
ও মাটির দাওয়া
ও কাঠের পিঁড়ি
যাচ্ছি

ও স্মৃতি, ও আশা
ও ঝিঁঝি, ও ঝাউ
ধোঁয়া ও কুয়াশা
বউনি ও ফাউ
যাচ্ছি

এই দ্বিতীয় রচনা ক্রমে যখন সমাপ্তির দিকে এগোয়, আরও কৃশ হয়ে এক-এক শব্দে যে-দৃশ্যরূপ তৈরি হয়, এর ভাববস্তুর সাযুজ্যে, তা নিশ্চয় অজানা নয় এর সঙ্গে পরিচিত পাঠকের। আর সেই সমাপ্তির আগে যে 'যাচ্ছি' নয়, বরং 'ও মায়া / আসছি' কথাটা রয়েছে, সেও হয়তো মনে থাকবে তাঁদের কিংবা সেই অন্তিমে 'ও মিউ...'।

একসময় অনেকের মুখেমুখেও ফিরত, ছোটো পরিসরে বন্ধুমহলের আলোচনায়, এখনও হয়তো কারোর স্মরণে থাকতে পারে — সোজাসাপটা কথা, দ্বিবিধ অর্থময় কোনো রচনা নয় এবং স্বল্পায়ত বলেই কিনা কে জানে, বা লিরিক-ধর্মগুণেও হতে পারে, রণজিৎ দাশের 'মায়াভবনের পথে...'। *আমাদের লাজুক কবিতা* (১৯৭৭) সংকলনের *দেখা হয়ে যায়*, যতিচিহ্নহীন এই কবিতায় স্পেসের ব্যবহার লক্ষণীয় —

মায়াভবনের পথে দেখা হয়ে যায়
সকালে সন্ধ্যায়
আমূল গৃহিণী হয়ে যে আমার মর্মে বিঁধে আছে
ভীষণ অপরিচিতা সেই দীর্ঘাঙ্গীর সাথে
বার বার
মায়াভবনের পথে দেখা হয়ে যায়
সকালে সন্ধ্যায়

একালের আরেক কবির রচনা, রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে উদ্ধৃতিগুলি শীর্ষটীকা স্বরূপ রেখে বারোটি অংশে বিভক্ত করেছেন *আলো* শীর্ষকে, গ্রন্থ *পাতার পোশাক* (১৯৯৭), কবি জয় গোস্বামী। স্পেস এবং কবিতার আকার লক্ষ করুন, রবীন্দ্র-স্মরণে ওই আকার তাৎপর্যবাহী, যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। *প্রান্তিক*-এর ৯ সংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় পঙ্ক্তি এখানে শীর্ষটীকা, ওই বিবরণের অনুরূপ রবীন্দ্রনাথের একটি ছবিও আছে — দেখে থাকলে, এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারেন সেটি। *আলো* শীর্ষকের পঞ্চম অংশ —

দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি...

পাড়ে দাঁড়িয়েছি, আর, ও চলেছে ভেসে
সময়ের অন্ধকার কেশে
জড়িয়েছে মস্ত মাথা,
অন্ধ চোখ,
কাছি
গাছে রাখা ছিল, জলে সড়সড় সড়সড়
নেমেছে
চলেছে
গাছ
উপড়ে নিয়ে, পাশ্ববর্তী গ্রাম উপড়ে নিয়ে, টিলাখণ্ড,
প্রাণী, পশু, পাহাড়ের চূড়া
সব উপড়ে নিয়ে ওই কাছি ভেসে যায় ওই মাথা
ওই কেশের লহরী।

এই সময়ের আরেক জন। প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে স্পেসের ব্যবহার কতটা ওতপ্রোত, সেইটিই লক্ষণীয় এখানে। তিনটি 'কমা' চিহ্ন ছাড়া আর কোনো যতিচিহ্ন নেই। কবি সুতপা সেনগুপ্ত, *ধুতুরা* (১৯৮৯) গ্রন্থিকার অন্তর্গত অন্তিম অংশ (৭) —

সিনেমা ভেঙেছে, তুমি শহরের অলিগলি ছেড়ে
এসেছ মধ্য রাস্তায়
অনেক দূরের পথ যেতে হবে, রাত করে বাড়ি ফেরা
শুরু হলো আবার তোমার
তুমি কি বিষণ্ণ হবে ট্রামরাস্তা ধরে হেঁটে যেতে
হাতে ধরা থাকবে অন্ধকার বাতি
শব্দের পেছনে পেছনে বুনো কুকুরের মতো লালা ঝরবে গোটা আত্মা দিয়ে
তোমার পায়ের ছাপ লিখে দেবে শহরের প্রতিটি বাড়ির দরজায়
তবু কেউ দরজা খুলে দেবে না তোমাকে
তুমি আঘাটায় যাবে, সেখানে বেশ্যা ভেবে লোক ঘিরবে মৌমাছির মতো
কোনো সুরসিক লোক ধাক্কা দিয়ে বলে যাবে এক্সট্রিমলি সরি ম্যাডাম
তুমি আঘাটায় যাবে, সিনেমা ভেঙেছে, তুমি আর কোথা যাবে
অনেক দূরের পথ যেতে হবে রাত করে বাড়ি ফেরা
শুরু হলো
আবার
তোমার

কেবল শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁক নয়, বা যে-উদাহরণগুলি এখানে দেওয়া হয়েছে সেসবে স্পেসের ব্যবহার যে-ধরনের, তার বাইরেও আরও আছে। যেমন, পঙ্‌ক্তির অন্তবর্তী ফাঁক বাড়িয়ে পঙ্‌ক্তিগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে দর্শনীয় করে তোলার চেষ্টা, কিংবা, প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চম এরকম মৌলিক সংখ্যার পঙ্‌ক্তিগুলি বাঁ-দিকে রেখে, দ্বিতীয়-চতুর্থ-ষষ্ঠ প্রভৃতি যৌগিক সংখ্যার পঙ্‌ক্তিগুলি ডান দিকে সরিয়েও ফাঁক সৃষ্টি করা হয়। দীর্ঘকাল ধরে সেরকম হয়ে আসছে — সেই উনিশ শতক থেকে আজ অবধি বিভিন্ন কবির রচনায় তা আদৌ দুর্লভ নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে আমরা জীবনানন্দ দাশের *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪) গ্রন্থের *ঘাস* কবিতাটি দেখে নিতে পারি —

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস — তেমনি সুঘ্রাণ —
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি — চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ থেকে নেমে।

সুদীর্ঘ গদ্যপঙ্‌ক্তিকে সজ্জার এই দৃষ্টান্ত ছাড়াও আমরা দেখেছি হ্রস্ব পদ্যপঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রেও এরকম — বহু কবির রচনায়, সেকাল থেকে একালেও সেটি অব্যাহত। স্বতন্ত্র স্তবক করে যেমন অন্তবর্তী ফাঁক রেখে সেখানে, তেমনই আবার দৃশ্যত স্তবক না করে পূর্ণযতি ব্যবহারে, কিংবা, অনেক সময় যতিচিহ্ন না দিয়েও। নতুন করে এসব বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এরকম ছাড়াও স্পেসকে অন্যভাবে ব্যবহারের দৃষ্টান্তও রয়েছে পঙ্‌ক্তিসজ্জায় এবং তার দরুন স্বতন্ত্র আকার সৃষ্টি হয় কীভাবে, লক্ষ করুন। জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) গ্রন্থের *বোধ* কবিতার শেষাংশ —

এই বোধ — শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ — অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ — গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা — পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
— সেই সব।

এই যে আমরা স্বতন্ত্র আকার প্রাপ্তির কথা বললাম, তার বিচিত্র দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেমন — বিশেষত তাঁর গানের কথার সংকলন গ্রন্থ *গীতবিতান*-এ এবং কবিতার ক্ষেত্রেও — তেমনই আবার আধুনিকদের রচনাতেও। যেমন, অমিয় চক্রবর্তীর *অভিজ্ঞান বসন্ত* গ্রন্থের *অভিজ্ঞান* শীর্ষক কবিতায় — সাপের ফণার মতো উদ্যত যেন, দৃশ্যরূপ এমনই —

শ্যামলরক্তিম ঘণ্টাধ্বনি
শুনেছো কি?
চিহ্ন
নিরন্ত —
বসন্ত —
প্রতীকী
হে ধরণী?
দিকে-দিকে
উদ্ভিন্ন
বাজে অঙ্কুরে
অন্তিকে
বাজে দূরে
কঠোর অভিজ্ঞানে
বীজমন্ত্রের কল্যাণে
মৃতুধ্যানে
প্রাণের ব্যথায়
অসহ ব্যথায়
চিত্তনূপুর শোনা যায়।

আবার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় দেখুন, ছোটো ছোটো টুকরো কথাগুলিকে কীভাবে বিন্যাস করা হয়েছে — স্বতন্ত্র দৃশ্যরূপ — *ফিরে ফিরে* শীর্ষক রচনায় (যত দূরেই যাই) —

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিল : আসবেন
দেখব, আসবেন
আচ্ছা, আসবেন দেখব।

বলেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে অমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিলাম : মা আমার,
খেলনা আনব —
মা আমার,
আজ ঠিক আনব।

বলেছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

আবার স্তবকসজ্জায় প্রচলনের বাইরে গিয়ে অন্যতর দৃশ্যরূপও ফুটিয়ে তোলার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের *কুহু ও কেকা* (১৯১১) গ্রন্থের *গ্রীষ্মের সুর* কবিতায় — শব্দ দিয়ে বরফি আকৃতির স্তবক। এরকম চারটি স্তবক পরপর সাদা পৃষ্ঠায় যখন মুদ্রিত থাকে, স্বভাবতই তার দৃশ্যরূপ পাঠককে ওই কবিতার দিকে আকৃষ্ট করে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের রচনাতেও লভ্য, তাঁর *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* (১৯৬৫) গ্রন্থের *আছে আছে সে আছে এখানে* শীর্ষক কবিতায় — সেখান থেকে অংশবিশেষ দেওয়া গেল।

জানালায়
বৃষ্টি ঝরে যায়
অসম সাহসী বসে থাকে
অতিদূরে করতালি দিয়ে একা ডাকে
মারাত্মক ছিটকোকিল, টেলিফোনে ক্রূর
বেজে ওঠে স্খলিত ঘুঙুর
বৃষ্টি ঝরে যায়
জানালায়

কে হে তুমি
চকিত মৌসুমী —
দেয়ালে বুরুশ করে ফেরো
অনুরূপ দুঃসাহস ছিল আমাদেরও
ভিতর-দেয়ালে দেবো রঙ পরিপাটি
সত্য রবে প্রদীপ্ত ও খাঁটি
চকিত মৌসুমী
কে হে তুমি

সমস্বরে
বাজে বন্ধঘরে
অর্গান-জড়ানো এলোমেলো
অন্ধকারে বেড়ালের থাবা করে বেলো
সমুদ্র গর্জনে গান খুঁড়ে চলে মাটি
ভূপতিত নিষ্প্রাণ করোটি
বাজে বন্ধঘরে
সমস্বরে

এও কিন্তু স্তবক, সাজানো হয়েছে বরফি সদৃশ ক'রে। আবার ওঁরই ওই গ্রন্থের অন্য কবিতায় — *কে আর তেমন ভালোবাসে?* — স্তবকের দৃশ্যরূপ পিরামিড সদৃশ — সম্পূর্ণই এখানে দেওয়া হল।

কে আর
হৃদয় বেঁধে রাখে
হৃদয় নয়তো দূর-ঘুড়ি
ওড়ে শূন্যে পশমের ফাঁকে
কে আর হৃদয় বেঁধে রাখে?

কে আর
তোমাকে বলে ভার
পরিজন-শূন্য রাজধানী
এখানে কে শিখেছে সাঁতার
কে আর তোমাকে বলে ভার?

কে আর
কুড়াবে বেলাতটে
তুমি ছাড়া ঝিনুক সকল
মুক্তা পড়ে আছে অকপটে
কে আর কুড়াবে বেলা-তটে?

কে আর
তেমন ভালোবাসে
হাত ধরে, চোখে কথা কয়
এখানে — চাকার দাগ ঘাসে
কে আর তেমন ভালোবাসে?

পঙ্‌ক্তি সংখ্যার বিচারে ধুয়োসমেত এটি চতুষ্ক (Quatrain)। কিন্তু স্তবকসূচক শব্দ 'কে আর', বিছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানের দরুন — কবিপ্রদত্ত অঙ্গসজ্জায় প্রতি স্তবকের চূড়ায় থাকছে যেহেতু — চতুষ্কের রূপ আর প্রাথমিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না। কিন্তু ধুয়োয় বা অন্তিম চরণে ও-ই আবার যথাযথ হয়ে আছে বাকি শব্দ ক-টির সঙ্গে। অতিপর্ব না হওয়া সত্ত্বেও যখন প্রতি স্তবকের প্রারম্ভে নিঃসঙ্গ করে রাখা হয়েছে 'কে আর' এবং অন্তিমে একত্রে রেখেছেন, সংগত কারণেই তার তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য। প্রথম 'কে আর' উচ্চারণের পর যেন সামান্য থেমে তার পরের অংশকে অনুসরণ করতে বলছে — চোখে দেখা না গেলেও একটা ফাঁক যেন রয়ে গেছে, কিন্তু দ্বিতীয় 'কে আর' অর্থাৎ ধুয়ো বা চতুর্থ চরণের সূচক শব্দ স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে স্তবকটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিচ্ছে। সুতরাং আবৃত্তির ক্ষেত্রে উচ্চারণের সময় ভাবগত দিকটি লক্ষ করে দু-রকমভাবে এর প্রকাশ সম্ভব করে তোলার সংকেতও যেন রয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন এই, যদি ওই ধুয়ো না থাকত এই রচনায় এবং প্রতি স্তবকসূচক শব্দ 'কে আর'ও ওভাবে স্বতন্ত্র না থাকত, কী হত তাহলে? রচনাটির কোন ক্ষতি হত? আমরা যদি এভাবে দেখতে চাই — ত্রিপদিকার (Tercet) ধরনে, কীরকম হয়?

কে আর হৃদয় বেঁধে রাখে
হৃদয় নয়তো দূর-ঘুড়ি
ওড়ে শূন্যে পশমের ফাঁকে

কে আর তোমাকে বলে ভার
পরিজন-শূন্য রাজধানী
এখানে কে শিখেছে সাঁতার... ইত্যাদি

প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি সমিল, কিন্তু দ্বিতীয় মিলছুট, অর্থাৎ নিঃসঙ্গ পঙ্‌ক্তি প্রতি ক্ষেত্রেই। এও তো এক ধরনের স্তবক। খামতি কোথায় এখানে? রূপে স্বতন্ত্র শুধু নয়, ধুয়োর অর্থাৎ ওই চতুর্থ পঙ্‌ক্তির অনুপস্থিতির জন্য কি কোথাও অপূর্ণাঙ্গ

মনে হচ্ছে? মজা এই, ধুয়োর মাধ্যমে স্তবকগুলির সূত্রে যে-ছন্দমণ্ডল তৈরি হয়ে পাঠককে দ্রবময়ী কবিতার স্বরূপ চিনতে সাহায্য করে, ওই ধুয়ো বাদ দিলে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ধ্বনিগত তাৎপর্য এখানেও। কবির অভিপ্রেত ছিল যে-গঠন, সেখানে তাঁর নির্জন স্বাক্ষরও রয়ে গেছে এভাবেই। এমনকী হাইফেনের ব্যবহারেও। দ্বিতীয় স্তবকে 'পরিজন-শূন্য' ছাড়াও তৃতীয় স্তবকে 'বেলাতটে'-কে প্রথমে যুগ্ম, কিন্তু পরে, ধুয়োয় এসে অযুগ্ম করে কেবল মাঝে একটু হাইফেন ছুঁইয়ে রেখে বিশেষ একটু ঝোঁক। সংক্ষিপ্ত, সরল অথচ মর্মে বিশদ এই রচনা তার গীতিধর্মেই শুধু নয়, অপ্রগল্‌ভ মেজাজেও পাঠককে আবিষ্ট করে।

ওঁরই সমসাময়িক আরেক কবি, সুনীল বসুর একাধিক রচনাতেও বিভিন্ন নকশা দ্রষ্টব্য হয়ে আছে। তাঁর *তিমির তরংগ* (১৯৫৫) গ্রন্থে সেসব রয়েছে। গ্রন্থনামের কবিতাটি ছাড়াও *জল, সোনালি সুখ* এবং *মোনালিসা-কে* শীর্ষক রচনায়। উদাহরণ স্বরূপ *তিমির তরংগ*-র অংশবিশেষ দেওয়া গেল —

রূপসী রমণী, কাম ব্যর্থ; — ধূপ-ধুনচির সেই প্রাচীন গন্ধ
অম্লান রাখো, — ব্যর্থ কোরো না হৃদয়
আয়ুর মুক্তির নীল-সিঁড়ি
সোনালি সন্ধ্যার
প্রদীপের
রং
জং
পড়া ভাঙা
প্রাসাদে জ্বালুক
শালুক শিখার লাল তেজ
কান্নার আশ্চর্য নদী খোঁজে ঈশ্বরের —
প্রেম, — সবুজ কাননে। হরিণীর চোখে। ধুনোয়। আলোয়।

উলটো এবং সোজা দুটি ত্রিভুজ ওপর-নীচে পরস্পর সংলগ্ন। এই নকশা দেখে আমাদের পরিচিত কোনো বস্তুর সাদৃশ্য পাচ্ছেন, পাঠক? নজর দিন, পেয়ে যাবেন। এবার অন্য একটি রচনা — *জল* — এখানে আর ওপর-নীচে নয় ত্রিভুজ — আয়নায় প্রতিবিম্বের মতো হয়ে আছে পরস্পর — বাঁ-দিকেরটি মাত্রাহীন 'ব' অক্ষর যেন, ডানদিকেরটি তারই প্রতিবিম্ব — মাঝখানে চওড়া ফাঁক, জুড়ে দিলে বরফি আকৃতি — এরও অংশবিশেষ উদ্ধৃত থাক।

জল	ছল
জল ওঠে	জল পড়ে
সাগরের সিঁড়ি	পাথরের পিঁড়ি
পরি নাচে পাতালের	মদ ঝরে মাতালের
তারপর নীল-	দিন, নেয় চিল
যাযাবর	দিন যায়
হায়	হায়
তটে	তটে
মানুষের	ভিড় হয়
ডুবো চাঁদ নেচে	ওঠে নীল রাতে
ঝাঁক ঝাঁক তারা ফোটে	আকাশের জানালায়
জাহাজের আলো	কাঁপে, সাগরের
অজগর	নড়ে চড়ে
মিহি	ঝড়ে

.দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এরকম। দেখলে মনে হয়, কাগজ ভাঁজ করে কেটে একটা নকশা তৈরির পর উল্লম্বভাবে তাকে দু-ভাগ করা হয়েছে। এই কবিরই অন্য একটি রচনায় আবার হরফ দিয়ে অন্য নকশা — মোচাকৃতি — শঙ্খের আভাস — কিংবা, কাজললতা যেন — *সোনালি সুখ* —

ঘরে
চমকে
ঝরছে হাওয়া
দমকা হাওয়ার ঢেউ
থমথম মেঘ ছিঁড়ে জোছনার
নীল ফুল চারদিকে। চামচিকে ওড়ে :
অন্ধকারে ঘোরে পাখা; — কুয়াশা মেঠোপথ —
শালবন গেছে চলে; জোনাকির থোকা থোকা ফুল
সে কান্নার নীল জলে ভাসছে; স্বর্ণিল তন্দ্রায়, স্বপ্নের ঝরনায়
তিন বাঘ তোলে হাই; সোনা বালু চিক চিক মর্মর পাতা ঝরা আর
ভরা ভরা রাত নীল; জলপাই গাছ আর আমলকী ডাল কটি নীল
নিঝ্‌ঝুম তন্দ্রার ধ্যান; গান আজ কত লিখি কত অরণ্য কাহিনী গান
চন্দ্রের ভাস্বতী জেল্লা, কেল্লা সুপ্ত, গুপ্ত সবুজ পাহাড়, ভাঙা ভাঙা
যত পশু হাড় জোছনায় করে স্নান; তিন বাঘ বন হাঁটে, জল
চাটে — নীল মাঠে বাসি ফুল ঝরে ম্লান। হীরা জ্বলা কচি রাত,
যার আজ প্রাণ চায় শুধু ঝরাক সময় নীল, —
মুঠো মুঠো সুখ, কুমকুম ফুল, প্রবাল —
জল! দ্যুতি ঝরা পান রাঙা মুখ —
মহুয়া বন, মন আজ বহুদূর,
আঙুর জোনাকি জ্বলুক,
ছায়া ছায়া শাড়ি,
ঘুম; সোনালি
সুখ!

এসব যখন প্রকাশিত হয় — উনিশশো পঞ্চান্ন — বাংলা কবিতার জগতে তখন হরফ দিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি প্রসঙ্গে কোনো প্রস্তাব এনে বিশেষ কোনো পত্রিকাকে ঘিরে তরুণ কবিদের স্বতন্ত্র কোনো সমাবেশ হয়নি, যা আরও পরে উনিশশো পঁয়ষট্টিতে 'শ্রুতি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল, এটা মনে রাখা জরুরি এক্ষেত্রে। যদিও বহির্ভারতে এসব নিয়ে নানা রকমের আলোড়ন চলছিলই দীর্ঘকাল ধরে। এমনকী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যে-দুটি রচনা এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উপস্থিত করা হয়েছে, তাও সংকলিত হয়েছিল উনিশশো পঁয়ষট্টিতে, *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো*-র রচনাকাল ১৩৭০-৭২ ব., অর্থাৎ উনিশশো তেষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি, সেরকমই জানানো হয়েছিল। সুতরাং এদিক থেকেও দেখা যাচ্ছে, সুনীল বসুর প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে অনেক আগের, *তিমির তরংগ*-র প্রকাশ তাঁর উনিশ বছর বয়সে (জ. ১৯৩৬)। আলোচনাক্রমে এখানে যে-কটি প্রাসঙ্গিক হয়েছে, তাদের বাইরেও এমন কিছু রচনা বর্তমান যেগুলি স্পেসের ব্যবহার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য হওয়ার দাবি রাখে, যেমন *বাহানা* শীর্ষক কবিতাটি, কিংবা *মাঘ রজনীর অবিরল জোছনায়* (কখনো দস্যু কখনো প্রেমিক, ১৯৭১)।

যে-কটি উদাহরণ এ পর্যন্ত সন্নিবেশ করেছি আমরা মুদ্রিত কবিতায় হরফ বিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি প্রসঙ্গে, তাদের চেয়ে ভিন্ন গোত্রের দুটি রচনা এবার দেখে নেব। প্রথমটি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কিন্তু অগ্রন্থিত যেসব রচনা সংকলিত হয়েছে তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-য় (১৯৮৫), সেগুলির একটি *কিশোরী* — লক্ষ করুন, পঙ্‌ক্তিবিন্যাস এখানে এমনই, যার সূত্রে ইংরাজি বর্ণমালার অন্তিম বর্ণ Z-এর একটা আভাস পাওয়া যায় —

গভীর সমুদ্র হবে, এখনি শরীরে তার রূপরেখা
তরঙ্গ আভাস
রহস্য-জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে...
বেলাভূমি বুকের ওপরে দুটি গাংচিলের ছায়া
ধীরে ধীরে বৃত্ত এঁকে বসে...
নীলজলে নৌকো ভাসানো খেলা শুরু হবে বলে
তৃণভূমি থেকে
উৎসবের আলোকিত ভোর জেগে ওঠে...

এক্ষেত্রে যা আভাস, অন্যক্ষেত্রে সেটাই প্রকট হয়ে আছে, দেখামাত্র যা চিনতে পারা যায়। গৌরীশঙ্কর দে-র *স্খলিত স্বপ্নের নীড়* (১৯৯৪) গ্রন্থের *মেটামরফসিস* শীর্ষক রচনা —

ছায়া যে-পথের শেষে পড়ে আছে মনে হয় সে-ছায়াপথের
ফের
পথিকের
চিরবিরহের
মায়া। কৃষ্ণগহ্বরের
নগ্ন-গভীর আকর্ষণের
টানে অপসৃয়মাণ হৃদয়ের
সমাপন থেকে বের-হওয়া তিমিরের
ভাষা-অভিসার। স্তম্ভিত অসংখ্য নক্ষত্রের
ঢেউয়ে, সচল নিভৃতবিজ্ঞান, অন্তিম প্রভাতের
প্রাণ। যেখানে সমাপ্তি এবং শুরুর ডেল্টা-মুহূর্তের
স্পর্শে জেগে ওঠে আলো, জাগে বিসৃষ্টি রূপান্তরের।

একপদী মিলে Z আকৃতির এই রচনায় উৎস থেকে ক্রমপ্রসারণে আলোকপতনের মতো হয়ে আছে উপর থেকে নীচে তির্যক গতি শব্দগুলির বিন্যাস। ষাট ডিগ্রি কোণের মতো একটি ত্রিভুজ — তার উপর এবং নীচে দুটি সরলরেখা। কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে Z আকৃতির এই নকশা সামঞ্জস্যহীন নয়, যা অনেক সময় ঘটে থাকে এই ধরনের রচনায়। দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি ক-টিকে ভেঙে এই দৃশ্যরূপ রচনার ক্ষেত্রে আদ্যন্ত সচেতন মানসেরই পরিচয় পাওয়া যায় এখানে।

এসব না হয় কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কথা ভেবে সচেতন নির্মিতি। এক্ষেত্রে বড়ো একটা ইতিহাসও আছে পাশ্চাত্যে। সুদীর্ঘকাল ধরে এর চর্চাও হয়েছে নানারকমভাবে। বিভিন্ন লেখকের মস্ত মস্ত বইও আছে তাঁদের গবেষণার ফসল স্বরূপ এই বিষয়ে। ব্যাপারটা যে কালকের কথা বা কাল কা যোগীদের কম্ম নয়, বরং তার বিপরীতই, সে সম্পর্কে তাঁদের নিষ্ঠাবান কর্মের দৃষ্টান্তেই বোধগম্য হয়। যার দরুন মালার্মের *Un Coup De Dés...* (1897)-এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী চর্চার সাক্ষ্যে একটা বিভাজনই হয়ে গেছে 'প্যাটার্ন পোয়েট্রি'র ইতিহাসে। তাছাড়া 'ভিসুয়াল পোয়েট্রি', 'কংক্রিট পোয়েট্রি' ইত্যাকার নামে নানারকম ক্রিয়াকর্ম এবং তাত্ত্বিক প্রস্তাবে খুবই ভজকট ব্যাপার সেসব। আমরা আদার ব্যাপারী হয়ে যতটুকু যা বুঝি, বা বুঝতে অপারগ সেসব বিষয়ে, সে নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু এটুকু অন্তত বলতে পারি, শিল্পকলার বড়ো রকমের একটা ইতিহাস না থাকলে ওসব হত না সেখানে। ছিল বলেই গিয়োম আপলিনের-এর *Calligrammes* (1917)-এর জন্ম হয়েছিল। তাঁর উনিশশো তেরো থেকে ষোলোর মধ্যবর্তী রচনাসমূহের সংকলন ওই কাব্যগ্রন্থের সব রচনাই কিন্তু হরফ দিয়ে চিত্র নির্মাণ নয় (হস্তলেখেও আছে)। প্রচলিত সাধারণ রূপেরও বেশ কিছু রচনা আছে। প্রথম মহাযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগদানের সূত্রেও কিছু রচনায় তার প্রতিফলন ঘটেছে, যার দরুন ওই গ্রন্থের কবিতাগুলি যুদ্ধ ও শান্তির কবিতা স্বরূপ আখ্যাত। যাই হোক, আমাদের এখানে গত শতকের ষাট-সত্তরের দশকে প্রসূত 'দৃষ্টিগ্রাহ্য' কবিতার যেসব নমুনা রয়েছে, বিক্ষিপ্তভাবে সেসবের কিছু দর্শন করে আমাদের খুব একটা আশাপ্রদ কিছু মনে হয়নি। ব্যতিক্রমেও যদি সারবস্তু কিছু না থাকে কেই-বা আর আকৃষ্ট হয়! 'দরকচা' বলে বাংলায় যে শব্দটি আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটাই প্রযোজ্য।

হরফের বিশিষ্ট বিন্যাসে কবিতায় এই ধরনের আকারগত সাদৃশ্য ছাড়াও গ্রন্থ অলংকরণের ক্ষেত্রেও তা দর্শনীয় হয়ে আছে। হ্যাঁ, এই বাংলায়, ছাপাখানার ক্রমবিস্তারে বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ সূত্রে। সেই উনিশ শতকেই, হরফ দিয়ে তাক-লাগানো বিভিন্ন নকশা সৃষ্টির পরিকল্পনাও উদয় হয়েছিল ছাপাখানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কারও মাথায়, যা সেই গ্রন্থকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে পাঠকের কাছে। কিন্তু যেমন-তেমনভাবে নয়। পদবন্ধন করে। সেই পদবন্ধকেই এমনভাবে সাজিয়ে তুলতে হবে হরফের মাধ্যমে, যার থেকে প্রথম দর্শনেই মনে পড়ে যায় সুপরিচিত কোনো আকার। অর্থাৎ হরফের মাধ্যমে একটা ছবি, যা নির্বস্তুক ধারণা নয়, বাস্তব জীবনে যার প্রচলন আছে, এমনই। আমাদের অনুসন্ধানে সেরকম দু-একটি প্রাপ্তির সূত্রে দেখতে পাই, এই জাতীয় প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রাচীন পারসিক বা ফারসি কোনো গ্রন্থের বঙ্গীকরণে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন, ইসলামি জগতের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী চিত্রিত পুথির ধারাটিকে স্মরণ করেই সম্ভবত, হরফ দিয়ে তাঁদের বইগুলিতে যতটা সম্ভব, নানারকম নকশা ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এ বিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ, সুতরাং নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় নেই কবে থেকে এ জিনিস আরব্ধ হয়েছিল, বা কে সূচনা করেন। আমরা সেরকম বইয়ের আখ্যাপত্র দেখে বাস্তবিক অবাক হয়েছি। একটি *জামালনামা* (১৮৫৯), মুন্সি আজিমুদ্দিন-কৃত, অপরটি *দরবেসনামা* (১৮৬৫), মুন্সি আবদল আজিজ-কৃত তরজমায়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশনার ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হয়েছিল পয়ার পদবন্ধে এবং তা মুদ্রণে হরফবিন্যাস করা হয়েছিল *জামালনামা*-র ক্ষেত্রে ঘটাকার পাত্র বা দানসদৃশ এবং *দরবেসনামা*-র ক্ষেত্রে মিনারের গম্বুজ বা চূড়ার আকারে। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন পাঠক। প্রথমোক্ত গ্রন্থ ছাপা হয় চিৎপুর রোডের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রেসে, সিরাজুদ্দিন জমাদারের তত্ত্বাবধানে। আর দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থের মুদ্রণেও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তিনি, সেটি ছাপা হয় শিয়ালদহের কাদরিয়া প্রেসে। এই ধরনের পদবন্ধনে — দুটি ক্ষেত্রেই যা দ্রষ্টব্য হয়ে আছে — অভ্যস্ত না থাকলে সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সম্ভবত কাদের বক্স, যাঁর নাম দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থের ক্ষেত্রে সূচনায় 'কাদেরবক্স জ্যাতকার'-রূপে প্রদত্ত হয়েছে, তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর মতো আরও কেউ কেউ থাকাও আশ্চর্যের কিছু নয়, যাঁরা প্রয়োজন অনুসারে এরকম লিখে দিতেন। প্রথম গ্রন্থের ক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিতীয়টির মতো সে-পুরুষের (থার্ড পারসন) বয়ান নয়, আমি-পুরুষের (ফার্স্ট পারসন) বচন স্বরূপ প্রকাশ

জামালনামা।



এই কেতাবের নাম জামাল নামা হইল।
মুন্সী আজিমদ্দীন নাম রচনা করিল॥
পারসির
কেতাব ছিল
মজমুন ইহার।
ছলিছ বাঙ্গালায়
আমি করিলাম প্রচার॥
রসিক লোগেতে ইহা দেখিয়া
নজরে। ছাপাইবার তরে সবে কহি
লেন আমারে॥ রসিক লোগের অধিক
খাহেষ দেখিয়া। ছাপাইলাম এই পুথি
মেহনৎ করিয়া॥ এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান
প্রেশ নাম। চিতপুররোড মধ্যে প্রেশ মোদাম॥
শ্রীযুত ছেরাজদ্দীন জমাদ্দার নাম। এই ছাপাখা-
নার তিনি মোক্তার তামাম। ছাপাইলাম পুথি
আমি তাঁহার প্রেশে। সকল রসিক লোগের দেলের
খাহেষে॥ এই কেতাবের যাহার দরকার হইবে।
শিয়ালদহ মধ্যে যাইলে অবশ্য পাইবে॥
সেখ মনাজদ্দীন নাম নিকটে তাহার।
তল্লাস করিলে পুথি পাইবেন আমা-
র॥ সন ১২৬৬ সালের দিবস
রবিবার। ১১ আশ্বিন মাহা
তারিখ ইহার॥
৯২ নং বাটী।

জামালনামা (১৮৫৯)

○ হাদেরেসনে মোতবারা ○
○ এই ○
○ কেতাবের ○
○নাম দরবেসনামা○
○মুনসিআবদলআজিজ○
○করিলেন তরজমা ।। দিনদারি○
○কাম জত মারফত কালাম । কেতাবে ○
○ হুকুম জেয়ছা লিখিল তামাম ।। লোগের ○
○খাহেস বড়া হইল তাহাতে । দেলবিচে ভিনি ফের○
○লাগিল ভাবিতে ।। মওলানা কারামত আলি নোর○
○নেম তাহার ।। তারকাছে গেলো কেতাব ছহি করিবার○
○তহকিক করিয়া নরাকেবা মসাহেদা । ছাপাইয়া দিল○
○ফের খুলিয়া কায়দা ○ কেতাব জার লিখিতার ঘরের○
○ঠিকানা । ওাকেফ হইয়া লেহ শুনে সর্বজনা ।। তাহার○
○দোকান জেথা আছে কেলহাল । ঝালুকাটী বন্দরে জান○
○জেলা বরিসাল○ছেয়ারর্দ্দিন জমাদার ছাপার ○
○ মালেক । তাহার ইমান কাএম রেখেছেন ○
○খালেক○কলিকাতা সহরেতে মেরাল○
○দহ গ্রাম ।। কাদরিয়া প্রেসে○
○ছাপা হইল তামাম○
○কহেহিন ছদরদ্দি জোনাবে সবার । কম্পজ ক্রেট হারা ○
○ করিনু এহার ।। কোনো বাতে এর বিচে পাবে জদি ○
○খাতা । মেহের করিয়া মুদো করিবেন আতা ।। মসুহর○
○পুরেবর জানিবে আমার । মহাম্মদ কাবুনাম আমার○
○ পিতার ।। ফিকরো জেয়াদা দার সবাকে ছালাম । ○
○দোওা দিবে মোর তরে হতেক এহসান○ইতি সমাপ্ত○
○সন১২৭২সাল তারিখ ৭ [illegible] চাঁদ ১ মাহ্রব মঙ্গলবার○

দরবেসনামা (১৮৬৫)

পেয়েছে, অর্থাৎ তরজমা-কার নিজেই জানাচ্ছেন যাবতীয় ব্যাপার। যাই হোক, সেই যুগে ইসলামি জগতের প্রাচীন গ্রন্থের বঙ্গীয় তরজমায় প্রকাশের ক্ষেত্রে যা দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে, তার ধারাবাহিকতা ছিল কি না, বা থাকলে কতদিন, সেসব আমাদের অজ্ঞাত। পুরোনো বাংলা বইয়ে অনেক সময় গ্রন্থশেষে তার বিজ্ঞাপন স্বরূপ কিছু কিছু বিক্ষিপ্তভাবে দেখার যতটুকু স্মৃতি আছে, তার সঙ্গে এর ঠিক তুলনা চলে না।

৩

স্তবকবন্ধ কবিতার যেমন, গদ্যকবিতার ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য কিছু কম নেই দৃশ্যরূপে। কিন্তু সেসব একদিনে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে বহুজনের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের ভাষায়। তবে এই প্রসঙ্গ যতটা পরিসর দাবি করে আলোচনার জন্য, আপাতত আমরা সেরকম আলোচনায় যাব না। এক্ষেত্রে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব বৈচিত্র্য আসার আগের অবস্থা কীরকম ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র জানাচ্ছেন — তাঁর *গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক* (১৮৭৮)-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ অর্থাৎ তাঁর ভূমিকায় —

> ... এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা।...

আর একথা জ্ঞাপন করার সময় তাঁর পদ্যর সঙ্গে তখন *মেঘ*, *বৃষ্টি*, এবং *খদ্যোৎ* শীর্ষক তিনটি রচনা, যাদের তিনি 'গদ্য প্রবন্ধ' বলেছেন, পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেন। (দ্র. বঙ্কিম রচনাবলী : ২, সাহিত্য সংসদ) বলতে দ্বিধা নেই, ওই তিনটি রচনার চেয়ে অনেক বেশি কবিতাগুণে সম্পন্ন রচনা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের ভেতর পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম তাঁর ওই তিনটি রচনা গদ্যের অনুচ্ছেদের মতো লিখেছিলেন এবং সেভাবেই প্রকাশ করেন। সুতরাং বঙ্কিমের কাছে যা 'গদ্য প্রবন্ধ' স্বরূপ বিবেচিত হয়েছিল তা কোনো উল্লম্ব আকৃতির মিলহীন পঙ্‌ক্তি সমাবেশ ছিল না। বরং তার বিপরীতে অনুভূমিক। গদ্য যেরকম পঙ্‌ক্তি সমাবেশে গাঢ় এবং প্রসারিত থাকে — পুথির ক্ষেত্রে কবিতা যেভাবে দৃশ্যমান। যাই হোক, একটু আগে যে-কথা তাঁর উপন্যাসের গুণ স্বরূপ উল্লেখ করেছি — সেখান থেকেই দেখে নেওয়া যাক — *দেবী চৌধুরাণী* —

> বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা — পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর — স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে, — সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে — গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে — কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে সে বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

কিংবা, *রজনী*-তে সেই, 'ওহে ধীরে! রজনী ধীরে। ধীরে ধীরে...' এবং আরও বহু ক্ষেত্রে গদ্যকবিতাই মনে হয় সেসব। *দেবী চৌধুরাণী* থেকে যে-অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হল, সে তো পরিষ্কার মাত্রা মেপে শব্দবিন্যাস! গদ্য কি এরকম কবিতার মতো মাপা মাত্রায় লেখা হয়? ওই অংশটুকুই যদি ছোটো-বড়ো পঙ্‌ক্তিতে কবিতার মতো উল্লম্বভাবে সাজিয়ে তোলা যায়, সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্যরূপ পাওয়া যাবে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের *লিপিকা*-র কিছু রচনাকেও সেভাবে সাজানো যায় এবং সেক্ষেত্রেও দৃশ্যরূপ বদলে যাবে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিধার বশবর্তী হয়েই তা করেননি, সেটা অজানা নয় আমাদের, সে প্রসঙ্গে তাঁকে পরবর্তীকালে মন্তব্য করতেও হয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই, উত্তরকালে বাংলা কবিতায় গদ্যরীতি যখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হল কবিদের চর্চায়, আরও অনেক কিছুর মতোই এ ব্যাপারেও বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রণী ভূমিকাকে স্মরণই করা হল না, সাড়াশব্দহীন হয়ে রইল। যিনি নিজের হাতে গড়া উপন্যাসের ছাঁদ ভেঙে *কমলাকান্তের দপ্তর*-এর মতো ভিন্নধর্মী আখ্যানের কথা ভাবতে পেরেছিলেন, সেই তাঁরই মানসে আরও অনেক আগে পদ্যরীতি ছাড়িয়ে গদ্যরীতিতে কবিতা লেখার ভাবনাও জাগ্রত হয়েছিল। অথচ অসাড় হয়ে রইলাম আমরা! যদি বাস্তবিকই আমাদের জিজ্ঞাসা থাকত গদ্যরীতির কবিতা প্রসঙ্গে, তাহলে হয়তো ওই প্রস্তাবের সূত্রে আরও অন্যত্র আমাদের সন্ধানী দৃষ্টিপাত হতে পারত। অন্তত ঐতিহাসিক কারণেও তার গুরুত্ব উপলব্ধির মতো জায়গা থাকত। যাই হোক, ঘটনা এই, যে-বছর মাইকেলের *মেঘনাদবধকাব্য* প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ আঠারোশো একষট্টি, ওই একই বছরে প্রকাশ পায় *সদ্ভাবশতক*, যাঁর রচনাকার কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার — সেই 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে / দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে'-র লেখক, ভাবসম্প্রসারণের জন্য পাঠ্যপুস্তকে অবধারিতভাবে থাকত যা এবং প্রশ্নপত্রে দেওয়াও হত, তিনি কী কারণে কে জানে *গর্ব্বিত রাজার প্রতি* শীর্ষকে একটি রচনা ওই গ্রন্থে পেশ করেন, সেকালের রীতি ভঙ্গ করে গদ্যকবিতার আদলে। এখানে সেটি দেওয়া গেল। নাট্যসংলাপধর্মী, বিবেকের চেতাবনি যেন — লক্ষ করুন —

গর্ব্বিত রাজার প্রতি।

ভো রাজন্! গর্ব্ব পরিহর;
স্মর স্মর পূর্ব্ব ভূপগণ কাহিনী।
তব রূপ নরেশ কত
শাসিত সাগরাম্বরা ধরা;
সম্পদ-মদ-মত্ততায়,
ভাবিত তৃণ তুল্য অখিল বিশ্বপুর;
সে সব ভূপ কোথায়?
কই বা সে পদ-মদ-মত্ততা?
সে ক্রোধ-রাগ-রঞ্জিত-
লোচন; যাহা বর্ষিত অগ্নিকণা
দীন অধীন জনপ্রতি;
সে আর্ত্তনাদ শ্রবণ-বধিরা
শ্রুতি; সে কর্কশভাষিণী
কোমল রসনা; পর পীড়নোদ্যত
সে করযুগল কোথা হে?
মৃত্তিকায় ইদানীং পরিণত।
কোন-চিহ্ন-যথা সলিলে
লুপ্ত-মেঘ-বিম্ব-নাহি ভবমণ্ডলে।
এই যে মম পদ-রেণু,
ছিল ভূপ-শির অংশ একদিন।
ধন জন যৌবন সম্পদ
রাজ্য প্রভুত্ব জীবন বিম্ব সম।
এ অনিত্য ভবমণ্ডলে,
কিছু নিত্য নহে কিছু নিত্য নহে।
অন্য কর-পল্লব হইতে
তব করযুগলাগত, এরাজ্য; পুনঃ
কিছুকাল পরে নিশ্চয়
হবে অন্যদীয় হস্তগামী।

—

একদা বহুপ্রচারিত হলেও প্রথম সংস্করণের সব রচনা পরবর্তীগুলিতে ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর 'স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী'-র তৎকালীন কর্ণধার কামিনীকুমার গুহ সে-কথা প্রকাশকের জবানিতে জানিয়েছিলেন অষ্টাদশ সংস্করণ (১৩১৪ ব.) প্রকাশ করে। ওইতেই আবার আগের সব রচনা ফিরে আসে, যা বাদ পড়েছিল ওই প্রকাশকের অগ্রজের হস্তক্ষেপে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গদ্যকবিতা রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ওই তিনটি 'গদ্য প্রবন্ধ'র অনেক আগে কৃষ্ণচন্দ্র প্রয়াসী হন। দৃশ্যরূপের প্রশ্ন উঠলে, *গর্ব্বিত রাজার প্রতি* উলম্বভাবে, আর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তিনটি অনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত। আরও দ্রষ্টব্য, এঁদের পরে রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর *বর্ষার মেঘ (পদ্যপৌঙ্ক্তিক পদ্য-গদ্য)* যখন প্রকাশ করেন (আর্য্যদর্শন, শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৭৫-৬) সেটিও উল্লম্বরূপে ছিল এবং অসম মাত্রার পঙ্ক্তিসজ্জায়। মোট তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত দীর্ঘ ওই রচনার অংশবিশেষ এখানে দেওয়া হল।

বর্ষার মেঘ।

(পদ্যপৌঙ্ক্তিক পদ্য-গদ্য)

১

আকাশ নীল—অনন্ত নীল,
মানব-চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
দক্ষিণদিক্‌শোভিনী দিগঙ্গনার অঞ্জলি হ'তে
ধীরে ধীরে বায়ু স্রোতে
একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।
সূক্ষ্ম মেঘ বলিলাম কেন?
অনন্ত নীলাকাশপট্টের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ন্যায় যে মেঘ,
সে কি বৃহৎ?—না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তস্মাদপি ক্ষুদ্র,
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর
যদি অন্য কোন বিশেষণ থাকে,
আমি তাই।
আমি, আকাশ কোলে
ঐ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনায় কালের কোলে
'নাই' বলিলেই হয়।
অহো, তবে কালের চেয়ে অনন্ত কে?—
মহান্ কে?
তা কি জান না?—ঈশ্বর।
একই কথা—যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল।

২

এ কি হ'ল?
এই কয়টি কথা ভাবিতে ভাবিতে
ক্ষুদ্র মেঘ বৃহৎ—বৃহত্তর হ'ল!
বামনমূর্ত্তি বিরাটমূর্ত্তিতে পরিণত হ'ল!
অহো, ক্ষুদ্র মেঘ এত বড়!

আর্য্যদর্শন-এ প্রকাশের সময় রাজকৃষ্ণ রায় দু-এক কথা লিখেছিলেন, যা পাদটীকা স্বরূপ দেওয়া হয় অন্তিমে — তাৎপর্যপূর্ণ সেটি —

> যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙ্ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটী নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।

সেকালের জনপ্রিয় কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়েরও প্রস্তাব তাহলে পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্তাবটির ছ-বছর পর আঠারোশো চুরাশিতে (১২৯১ ব.)। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে পদ্যবন্ধ ছাড়াও গদ্যরীতির পক্ষে দু-জনে দু-ভাবে সওয়াল করেছেন। শুধু তাই নয়, দৃশ্যরূপের দিক থেকেও গদ্যকবিতার শব্দসজ্জা দু-রকমভাবে ঘটেছে। লক্ষণীয় সেটাও। কৃষ্ণচন্দ্র থেকে রাজকৃষ্ণ রায়, মাঝে বঙ্কিমচন্দ্র — ১৮৬১, ১৮৭৮ এবং ১৮৮৪ — তেইশ বছর।

এখন ওই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের *মানসী* গ্রন্থের *নিষ্ফল কামনা* (রচনা ১৮৮৭ 'বৃথা এ ক্রন্দন') প্রত্যক্ষ করি (দ্র. রবীন্দ্র রচনাবলী : ১ এবং সঞ্চয়িতা) পরিষ্কার দেখতে পাব সেটি 'পদ্যপৌঙ্ক্তিক প্রণালীতে' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শৈলীতেই উপস্থাপন করা হয়েছে, — মিলহীন হলেও ওই কবিতা ছন্দবদ্ধ, ছোটো ছোটো পর্ব বিভাজনে, স্বগত সংলাপের মতো।

রবীন্দ্রনাথের ওই সময়কার এবং পরবর্তীকালেরও অন্যান্য রচনার সাপেক্ষে, মিলহীন কিন্তু লিরিকধর্মগুণে সমৃদ্ধ ওই রচনার একটা গুরুত্ব রয়েছে। অন্ত্যমিলহীন কবিতা রচনায় অগ্রসর হতেও অর্ধেক জীবন কেটে গেছে যাঁর — প্রাণ এবং কানের সমর্থন পাননি বলেই কি দীর্ঘকাল ওই জাতীয় রচনার ধারকাছ দিয়ে যাননি? সেরকমই মনে হয়।

যাই হোক, এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ওই কবিতার দৃশ্যরূপটি — পঙ্ক্তিসজ্জায়

রকমফের। যদিও রবীন্দ্র-রচনায় তা দুর্লভ কিছু নয়। কিন্তু আগে উল্লেখিত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের দুটি রচনার পরিপ্রেক্ষিতে এর সর্ববিধ স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহে নজর কাড়ে। আপাতত এখানে অংশবিশেষের উল্লেখ থাকুক, সামগ্রিক রূপের জন্য তাঁর *রচনাবলী* এবং *সঞ্চয়িতা* তো রয়েছেই। যদিও উভয়ক্ষেত্রে কিছু তফাত আছে, সেটা মিলিয়ে দেখলেই ধরা পড়ে। সে-প্রসঙ্গে এখানে বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!

বৃথা এ ক্রন্দন!
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?

নিষ্ফল কামনা-র দুটি অংশ

আর এক্ষেত্রে স্মরণীয় আরও, রাজকৃষ্ণ তাঁর কবিতা ছাড়া নাটকের সংলাপে এবং গিরিশচন্দ্রও তাঁর নাটকের সংলাপে মুক্তকের ব্যবহারে তখন যা পথনির্দেশ রেখে যান — ছন্দের ক্ষেত্রেও যেমন, কবিতায় রীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সেসব উন্নতির সোপান রচনাই হয়েছিল।

এসবের অনেক পরে গদ্যরীতির কবিতা — সে উল্লম্বরূপেই হোক কি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই তিনটি 'গদ্য প্রবন্ধ'র মতো অনুভূমিকই হোক — যা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরও পরবর্তী 'আধুনিক' প্রজন্মের মধ্যস্থতায় তার স্বরূপ স্বতন্ত্র, সেসব আরও বৃহৎ পরিসরে আলোচনার দাবি রাখে। বারান্তরে তার আলোচনা হতে পারে। নমস্কার।

বাংলা টানা গদ্যকবিতা ও গদ্যের কবিতা হয়ে ওঠা

রাশেদুজ্জামান

পড়ার আগেই একজন পাঠক মনে-মনে ঠিক করে ফেলেন, তিনি কী পড়ছেন — কবিতা (পদ্য) নাকি গদ্য? গদ্য ও কবিতা বা পদ্যের মুদ্রণবিন্যাস সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বা পূর্ব-ধারণা তাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। গদ্য লেখা হয় পৃষ্ঠার দুই পাশের মার্জিনে কোনো জায়গা না-ছেড়ে, অন্যদিকে পদ্য বা কবিতার ক্ষেত্রে মার্জিনের পরও দু-পাশে জায়গা থাকে। ফলে রচনাটি গদ্য কি না, তা প্রথম দর্শনেই নির্ধারিত হয়ে যায়। গদ্য যদি না-হয়, তাহলে পাঠের পর বোঝা যায়, ওটি আসলে কোন গোত্রে পড়ে — কবিতা না পদ্য। এ তো সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল : দেখতে পেয়েই বুঝে যাওয়া, এটাই কি প্রথম থেকে হয়ে এসেছিল? রচনার মুদ্রণবিন্যাস (Typography)-এর এই বিভিন্নতা ও তার অভিজ্ঞতা কবে থেকে আমাদের হল? কেন হল? আমাদের মনে হয়, আপাত-সরল এই জিজ্ঞাসাগুলি ঐতিহাসিক অনেক ঘটনা ও বিবর্তনের বিষয়ে নতুন কিছু কৌতূহলকে উৎসাহিত করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে 'টানা গদ্যকবিতা'-নাম্নী সাহিত্যিক রচনার সংরূপ-সংক্রান্ত (Genre) বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করলে, আরও অনেক জিজ্ঞাসাও সামনে চলে আসে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরেরও কিছু অধিক কালের পুরোনো। এই বয়স লিখিত সাহিত্যের নমুনার ভিত্তিতে নির্ণীত। মৌখিক সাহিত্যের বয়স এর চেয়ে হয়তো কিছু বেশি। প্রাচীনতম যা-কিছু সাহিত্য-নিদর্শন মিলেছে, সেসব কবিতাশ্রেণির; তা সত্ত্বেও বলা যায়, বাংলা গদ্যের বয়সও তেমনই হবে। সে-গদ্য লিখিত আকারে না থাকলেও, মুখে-মুখে মানুষ নিশ্চয়ই অনেক গল্প-কাহিনি রচনা করেছে। সেসবের অনেকটাই প্রজন্মান্তরে হারিয়ে গেছে, অনেকগুলি বিবর্তিত হয়েও নানান রূপে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। সর্বোপরি, মানুষ কথা বলেছে যে-ভাষায়, সে তো গদ্য। তাহলে, কোনো সাহিত্যশ্রেণির রচনা, যা মুখে-মুখে তৈরি হয়ে ফিরছে, তাকে মানুষ কীভাবে গদ্য বা পদ্য হিসেবে নির্ণয় করেছে? কিংবা, তা নির্ণয় করা কি খুব জরুরি ছিল তখন?

মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচনাটির পরিবেশনের ধরন কিংবা পাঠের ধরনের পাশাপাশি এর মধ্যেকার কিছু বৈশিষ্ট্য শ্রোতাকে গদ্য-পদ্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। শ্রোতা কীভাবে চিনতে পারেন কবিতাকে, রুথ ফিনেগান (Ruth Finnegan) তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *Oral Poetry*-তে, তা জানাচ্ছেন আমাদের —

> The first and most important point is that in written literature poetry is normally typographically defined... Obviously this rule will not, by definition, work for unwritten poetry. One is thus forced to look for other, apparently more 'intrinsic' characteristics by which something can be delineated as 'poetry' within oral literature... What we must look for is not one absolute criterion but a range of stylistic and formal attributes – features like heightened language, metaphorical expression, musical form or accompaniment, structural repetitiveness (like the recurrence of stanzas, lines or refrains), prosodic features like meter, alliteration, even perhaps parallelism. So the concept of 'poetry' turns out to be a relative one, depending on a combination of stylistic elements no one of which need necessarily and invariably be present.[১]

কবিতার অন্তর্নিহিত এই বৈশিষ্ট্যগুলি বাচ্যার্থ অতিক্রম করে-যাওয়া ভাষা, রূপকশোভিত অভিব্যক্তি, ধ্বনিগত সুষমা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের পুনরাবৃত্তি, ছন্দ ও বিভিন্ন অলংকার — শ্রোতাকে কবিতার আস্বাদ দেয়; কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ যে, এদের কোনোটিই কবিতার জন্য অপরিহার্য নয়। যদিও কবিতা এদের সহযোগেই হয়ে ওঠে। আর তখন এটিকে সাধারণ গদ্যের চেয়ে ভিন্ন বলে মনে হয়। একইভাবে গদ্যকেও শ্রোতা চেনেন এর বিবরণধর্মিতা, সরাসরি বলার প্রবণতা ইত্যাদি গুণের কারণে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগে যখন অনেক কম মানুষই লিখতে জানত, তখন মুখে-মুখে-ফেরা রচনার কাব্যগুণ শুনেই নির্ণয় করতে হত শ্রোতাকে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমাদের তোলা দ্বিতীয় প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ যে, এর আদৌ কতটা দরকার ছিল? সম্ভবত, এটি ততটা জরুরি ছিল না।

এর কারণ একাধিক। সাহিত্য হিসেবে গদ্য তখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। পদ্যের বা কাব্যের যে কাঠামোটি তখন ছিল, তা থেকে এর একটি বিশিষ্টতা টের পাওয়া যায়। কবিতা তখন নির্মাণের বিষয়। ফলে এতে দক্ষতা-অদক্ষতার ব্যাপার ছিল। গদ্যসাহিত্য তখন শুধু মৌখিকই নয়, অসংগঠিতও। অন্যদিকে লিখিত কাব্যেরও একটি মৌখিক দিক ছিল, পরিবেশনের ব্যাপার ছিল। সবাই যেহেতু পড়তে জানতেন না কিংবা পাণ্ডুলিপিও অগণন ছিল না, সেহেতু একজনের পাঠ অনেকের উপভোগের মাধ্যম ছিল। এসব রচনার লক্ষ্যই ছিল সমষ্টি। গদ্যের পরিসর বিস্তৃত, কারণ তার উপযোগিতা বহুমুখি; তা সত্ত্বেও লিখন-মাধ্যম হিসেবে গদ্য না-থাকায় এসবের অনেকটা পদ্যকে মেটাতে হয়েছে। অর্থাৎ এখনকার হিসেবে, তখনকার কাব্য ছিল একইসঙ্গে গদ্য ও কবিতা। এর ফলে, রচনার গদ্যত্ব বা কাব্যত্ব আলাদা করে দেখা তখনকার বাংলা সাহিত্যের পাঠক-শ্রোতা কারো জন্যই তেমন জরুরি ছিল না। কাব্যতত্ত্ব ও অলংকারশাস্ত্রের চর্চা সে-সময়ে বাঙালিরা করেছেন, কিন্তু তা সংস্কৃত সাহিত্য-কেন্দ্রিক ছিল। সাহিত্য-বিচারের আলাদা ধারা না গড়ে ওঠায়, সংরূপ নির্ণয়ের সচেতনতা ছিলই না বলা চলে।

বাংলায় রচিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের পাণ্ডুলিপিগুলিতে দেখা যায়, কাব্য লেখা হয়েছে এখনকার সময়ের গদ্যরচনার মতো করে, অর্থাৎ দু-পাশের মার্জিনের পরে জায়গা না-ছেড়ে। কবিতাকে লিখতে হয় গদ্যের চেয়ে আলাদাভাবে, এর দু-পাশে সাদা স্পেস থাকে। এর পঙ্ক্তি বা ছত্রগুলিই একেকটি লাইন। কবিতা লেখা বা মুদ্রণের এই ধারণা মূলত মুদ্রণযন্ত্র ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের পরবর্তী। মুদ্রণযন্ত্রের আমদানি ও ইউরোপীয় সাহিত্যের দীক্ষার পূর্ববর্তী সাহিত্যে কবিতার দর্শনগত (দেখে চেনা যায় এমন) ভিন্নতা ছিল না। পদ্য তখন গদ্যের মতোই টেনে লেখা হত।

এদেশে মুদ্রণযন্ত্রের আমদানির সঙ্গে বাইবেলের অনুবাদ বা খ্রিস্টধর্ম প্রচার যুক্ত ছিল আমরা জানি। কিন্তু এর আবির্ভাব লেখার বাণিজ্য-সম্ভাবনাকেও সামনে এনেছিল এবং সম্ভব করেছিল। একটি পাণ্ডুলিপি কম সময়ের মধ্যে অসংখ্য অনুরূপ অনুলিপিতে রূপান্তরিত হয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে যেতে প্রস্তুত এখন। শ্রোতাকে যেতে হত গ্রন্থের খোঁজে, গ্রন্থের কাছে। এখন গ্রন্থ আসছে পাঠকের খোঁজে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন সম্ভাবনা সত্য হয়ে দেখা দিল। সাহিত্য সমষ্টি থেকে ব্যক্তির দিকে চলে এল দ্রুত। ছাপাখানা ও মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে সাহিত্য যখন বাণিজ্যিক পণ্য-সম্ভাবনার প্ররোচনাতেও বিকশিত হচ্ছে, তার সমান্তরালেই তখন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি বাঙালির মোহ জাগ্রত হচ্ছে। বাংলায় গদ্যসাহিত্যের চর্চা হচ্ছে। ছাপা হয়ে বেরোচ্ছে। পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এ-সময়েই আমরা শিখে গেছি গদ্যেও এমন কিছু লেখা হতে পারে, যা দৈনন্দিনতার অতিরিক্ত। কবিতা লেখা ও ছাপার ধরন যে অন্যরকম হওয়া চাই, এ-ও তখনকারই শিক্ষা। সেই শিক্ষা চলে আসতে-আসতে এখন সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে।

কবিতা হচ্ছে এমন, এতে এই-এই বিষয় থাকতে পারে, এর বৈশিষ্ট্য এমন — এসব ধারণা পাঠকের হয়তো মোটামুটি ছিল। কিন্তু কবিতা এভাবে

সাজিয়ে লিখতে হবে, বা এভাবে ছাপা হবে — এর পেছনে পড়তে সুবিধা হওয়ার চেয়েও জরুরি সম্ভবত এই বিষয়গুলি যে, এদের বাণিজ্যিক উপযোগিতা আলাদা ও সম্ভাবনা ভিন্ন। পাঠক বা ক্রেতা পড়ে বোঝার আগেই যদি দেখে চিনতে পারেন, তাহলে বিপণন সহজ হয়। কবিতার চাইতে গল্প-উপন্যাস অনেক বেশি লোকে কিনতে চায়। সবগুলি যদি একভাবেই ছাপা হত, তাহলে এদের আলাদা করে নেওয়াটা কি সহজ হত? পুঁজির স্বভাবের দিকে যদি তাকাই, দেখব, তার বৈশিষ্ট্য হল পণ্যসম্ভাবনাকে প্রসারিত করা। আর এ-জন্য ব্যক্তিকে ভোক্তায় রূপান্তর করা তার ধর্ম। বাংলাভাষী পাঠক গদ্য ও কবিতার মুদ্রণবিন্যাসের ভিন্নতায় পরিচিত ও অভ্যস্ত হল আসলে তখনই, যখন সাহিত্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, বিপণন সম্ভাবনাময় ও ব্যক্তিগত উপভোগের বিষয়ে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। এই মুদ্রণগত ভিন্নতার অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় কিছু সুফল রয়েছে। টানা গদ্যকবিতাকে এই বাস্তবতা ও ঐতিহাসিকতার নিরিখে স্থাপন করলে কতগুলি সমস্যা ও জিজ্ঞাসাও অনিবার্যভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

২

'টানা গদ্যকবিতা' — এই নামকরণের মধ্যেই একটি স্ব-বিরোধিতা লুকিয়ে আছে। এটি একই সঙ্গে নির্দেশ করছে গদ্যকে ও কবিতাকে। অবশ্য 'কবিতা' শব্দটির আগে ব্যবহৃত হওয়ায় আমরা যদি 'গদ্য'-কে বিশেষণ হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে 'টানা গদ্যকবিতা'-র মূল পরিচয় হচ্ছে, এটি কবিতা। এখানে 'গদ্য'-কে বিশেষণ হিসেবে বিবেচনা করলেও তার সীমা কতটুকু, বা কতখানি গদ্যবৈশিষ্ট্য এখানে গ্রহণযোগ্য, সেইটি নির্ণয় একটি সমস্যা বটে। ফলে আক্ষরিক ও লাক্ষণিক উভয় বিবেচনাতেই গদ্য ও পদ্যের একটি সহজাত দ্বৈরথ এতে রয়েই যাচ্ছে। এই দ্বন্দ্বকে স্বীকার ও সাঙ্গীকৃত করেই বাংলাভাষী কবিরা বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় টানা গদ্যকবিতা লিখে যাচ্ছেন।

'টানা গদ্যকবিতা' শব্দবন্ধটি নির্দেশ করছে একইসঙ্গে আধার বা কাঠামো এবং আধেয় — উভয়কেই। আধারকে নির্দেশ করে, কারণ এটি গদ্যে রচিত হয়। অন্যদিকে এটি আধেয়কেও বোঝায়, কেননা, এতে গদ্য ও কবিতা — উভয়ের উপাদান আছে। আমরা যাকে বর্তমানে 'টানা গদ্যকবিতা' বলছি, ইংরেজিতে তা 'Prose Poem' নামে পরিচিত। Prose Poem বলতে বোঝানো হয়ে থাকে এমন রচনাকে, যা বহন করতে পারে কবিতার সমস্ত গুণাবলি, যদিও দেখতে গদ্যের মতো। ফরাসি ও ইংরেজিতে তুলনামূলক বেশি চর্চিত এই সাহিত্য-প্রকরণটি কবিতাভুক্ত, না কি গদ্যগোত্রীয়, অথবা এ দু-এর সংকর (Hybrid) ও ভিন্ন শ্রেণির রচনা, তা পাঠককে বিভ্রান্ত করে তোলে।

১৯১৯ সালে ফরাসি প্রতীকবাদী ঘরানার কবি জি লাভ্যু (Guy Lavaud) বলেছিলেন, 'The prose poem cannot be defined, it just exists'[২]। সমস্যাটি এখনও একইরকম আছে। বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট টানা গদ্যকবিতা লেখা হলেও, সাহিত্যকোষ বা সমজাতীয় গ্রন্থে এই সংরূপটির কোনো সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়নি। এতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, অনেক চর্চা ও চমৎকার উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও, বাঙালি গবেষক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা এর অস্তিত্বকে অনুভব করছেন না। ইংরেজি সাহিত্যকোষ বা সমজাতীয় গ্রন্থে 'Prose Poem'-এর ভুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রচুর গবেষণাকর্ম ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত হয়েছে। সংজ্ঞা-নির্ভরতার একটি ক্ষতির দিকও রয়েছে; যেমন এমিল এম. চোরান (Emil M. Cioran) বলেছেন, 'To embrace a thing by definition, however arbitrary... is to reject that thing, to render it insipid and superfluous, to annihilate it'[৩]। চোরানের সতর্কবার্তা সম্ভবত এই জন্য যে, সংজ্ঞায়ন সাধারণত বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, কিংবা তার সম্বন্ধে এমন ধারণা দেয় যাকে বহুদূর পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় না। এতে বিকাশমান বিষয়ের সম্ভাবনাটিও নাকচ করা হয়।

Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics-এ Prose Poem বা টানা গদ্যকবিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমিল চোরানের সতর্কবার্তা বিবেচনায় নিয়েও, প্রাথমিকভাবে আমরা এটিকে অনুসরণ করতে পারি, যদিও জানি, এটিও যথেষ্ট নয় —

> **PROSE POEM** (poem in prose). A composition able to have any or all the features of the lyric, except that it is put on the page – though not conceived of – as prose. It differs from poetic prose in that it is short and compact, from free verse in that it has no line breaks, from a short prose passage in that it has, usually, more pronounced rhythms, sonorous effects, imagery, and density of expression. It may contain even inner rhyme and metrical runs. Its length, generally, is from half a page (one or two paragraphs) to three or four pages, i.e., that of the average lyrical poem. If it is any longer, the tensions and impact are forfeited, and it becomes – more or less poetic – prose. The term 'Prose poem' has been applied irresponsibly to anyting from the Bible to a novel by Faulkner, but should be used only to designate a highly conscious (sometimes even self-conscious) art form.[৪]

এখানে লেখক সংজ্ঞা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, নিকটবর্তী অন্যান্য সাহিত্য-সংরূপ থেকে এর পার্থক্য দেখিয়ে, টানা গদ্যকবিতা কী, তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তা সত্ত্বেও, তাকে 'usually', 'generally', 'if' প্রভৃতি অনিশ্চায়ক শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে, কেননা শিল্পকলা বা সাহিত্যক্ষেত্রে গাণিতিকভাবে অব্যর্থ কোনো সংজ্ঞা বা চৌহদ্দি নির্ণয় অসম্ভব। আর তাই এখানেই এই সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা যে, সম্ভাবনার ব্যাপ্তিকে স্বীকার করার পরিবর্তে এটি একটি ধ্রুব পরিসীমা রচনা করতে চেয়েছে। টানা গদ্যকবিতা গদ্য ও কবিতা উভয় সংরূপের বৈশিষ্ট্যকে আরও বেশি আত্মীকরণের মাধ্যমেই বিকশিত হচ্ছে। কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শৈলীগত উপকরণ, যেমন — চিত্রকল্প, উপমা, প্রতীক, অনুপ্রাস, অভিব্যক্তির গাঢ়তা, ছন্দ ইত্যাদি থাকতে পারে; গীতিকবিতাসুলভ ব্যক্তিগত আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসও আমরা পেতে পারি। কিন্তু একইসঙ্গে এটিও মনে রাখা প্রয়োজন, এসবের বিপরীত বৈশিষ্ট্যও এতে থাকতে পারে অনায়াসে। ইংরেজি টানা গদ্যকবিতার বিখ্যাত জার্নাল *The Prose Poem : An International Journal*-এর প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক পিটার জনসন এই বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'Just as black humor straddles the fine line between comedy and tragedy, so the prose poem plants one foot in prose, the other in poetry, both heels resting precariously of banana peels.'[৫]।

৩

গদ্য ও পদ্য উভয়ের দ্বন্দ্বমধুর নির্বিকল্প সম্পর্ক টানা গদ্যকবিতার ভেতরে প্রতিফলিত হচ্ছে, এর শিল্প-স্বীকৃতিকে দ্বিধান্বিত করে তুলছে। গদ্যের আকারে টেনে লেখা বিশেষ ধরনের সংক্ষিপ্ত এই রচনা পাঠকের জন্য যুগপৎ বিস্ময় ও অস্বস্তির কারণ হয়েছে। রচয়িতার তরফ থেকেও একটি দ্বিধা ও অস্বস্তি যে রয়েছে, তা রচনাটির ভেতরে প্রবেশ করলে আমরা বুঝতে পারি। পাঠকের অস্বস্তিকে আরও উৎসাহিত করেছে কবিতাগ্রন্থের ভেতরে পদ্যকাঠামোর কবিতার সঙ্গে গদ্য-আকারের এমন রচনার অন্তর্ভুক্তি[৬]। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে টানা গদ্যকবিতার চর্চা বাংলা ভাষায় অনেক বেড়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, পাঠকের অস্বস্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুনশ্চ (১৯৩২) কাব্যের ভূমিকায় *লিপিকা*-র (১৯২২) রচনাগুলি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ'।[৭] আমরা এই কথার মধ্যে টানা গদ্যকবিতা বিষয়ে কবির দ্বিধা লক্ষ করি। *লিপিকা*-র লেখাগুলি নিয়ে তিনি সংশয়ে ভুগেছেন, কারণ এগুলিকে কবিতা হিসেবে রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করেননি। অন্যদিকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন, *লিপিকা*-র লেখাগুলি কবিতা — 'গদ্যবেশী কাব্য'। *পায়ে চলার পথ, সন্ধ্যা ও প্রভাত* ইত্যাদি লেখাগুলো,

বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, 'যে-মুহূর্তে চেঁচিয়ে পড়া যায়, তখনই এদের কাব্যরূপ ফুটে ওঠে'।[৮] ওই রচনাগুলোতে তিনি লক্ষ করেছিলেন উপমার স্বপ্নময়তা, চিত্রময়তা। গদ্য ও কাব্যের ব্যবধানকে অতিক্রম করে-যাওয়া রচনাই শিল্পোৎকর্ষ লাভ করে, তিনি এমন ধারণার প্রচার করে গেছেন। তা সত্ত্বেও, টানা গদ্যকবিতা তিনি লেখেননি। তিনিও সম্ভবত দ্বিধান্বিত ছিলেন, অভ্যাসকে অতিক্রম করতে চাননি। ত্রিশের কবিদের কেউই তা করেননি। বাংলা সাহিত্যে বোদলের ও আধুনিকতাবাদের প্রচারক বুদ্ধদেব বসুও লেখেননি টানা গদ্যকবিতা, যদিও তিনি *Le Spleen de Paris*-এর মুগ্ধ পাঠক ছিলেন।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে জার্মান কবি নোভালিস প্রেমিকার মৃত্যুজনিত বিষাদকে রূপ দিয়েছিলেন *Hymnen an die Nacht* (*Hymns to the Night*) কবিতাগ্রন্থে, যেখানে পদ্যকাঠামোর কবিতার সাথে টানা গদ্য মিলিয়ে লেখা মোট ছয়টি রচনা আছে।[৯] এই প্রচেষ্টাকে বলা যেতে পারে টানা গদ্যকবিতার প্রথম স্পষ্ট পূর্বাভাস। ফরাসি লেখক ফেনলঁ (François Fénelon)-র কাহিনিধর্মী গদ্যরচনা 'তেলেমাক' (*Les aventures de Télémaque*)-এবং উৎকর্ষপূর্ণ ভাষা-ব্যবহার একে টানা গদ্যকবিতার পূর্বসূরির মর্যাদা দিয়েছে। সে-সময়কার ফরাসি বিশ্বকোষে 'তেলেমাক'-কে লক্ষ করে 'Poémes en Prose'-এর সংজ্ঞাও পাওয়া যায়, অবশ্য তা নির্দেশ করেছে ভাষাগত দিক দিয়ে কবিতার বৈশিষ্ট্য-সংবলিত, উৎকর্ষপূর্ণ ও অ্যাডভেঞ্চারধর্মী গদ্য লেখাকে।[১০] বিশ্বসাহিত্যে অবশ্য টানা গদ্যকবিতার পূর্বসূরি আরও রয়েছে। *বাইবেল*-এর কিং জেমস সংস্করণের গদ্যকে অনেকেরই মনে হয়েছিল কবিত্বপূর্ণ,[১১] যার কারণে, এর অনেক অনুকারী যুগে-যুগে ইংরেজি সাহিত্যে দেখা গিয়েছিল। চিনে হান রাজবংশের (২০৬ খ্রি. পূ.-২২০ খ্রি.) সময়ে এক ধরনের অন্ত্যমিলযুক্ত গদ্যের চর্চা ছিল, যা 'ফু' নামে পরিচিত ছিল। 'ফু'-কে অনেকেই বিবেচনা করতে চান টানা গদ্যকবিতার আদি নিদর্শন হিসেবে।[১২]

সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যে কাব্য হওয়ার শর্ত হিসেবে ছন্দে-বিন্যস্ত পদকেই অনিবার্য বিবেচনা করা হয়নি, বলা হয়েছে পদ্যের ছন্দ থাকবে, গদ্যে সেটা থাকবে না। সেখানে গদ্যকেও কাব্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যদি তার মধ্যে রস থাকে। এ-জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্যের স্বীকৃতি আছে।[১৩] এসব গদ্যকাব্য মূলত গদ্যে রচিত রোমাঞ্চকর কাহিনি, যার ভাষা কাব্যিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উদাহরণস্বরূপ বাণভট্ট রচিত বিখ্যাত গদ্যকাব্য (অন্য নাম, 'কথা') *কাদম্বরী*-র কথা বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'চম্পুকাব্য' নামে এক ধরনের প্রকরণের সাক্ষাৎ আমরা পাই, যেখানে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ থাকত। মধ্যযুগের বাংলায় *শূন্যপুরাণ* নামে একটি চম্পুকাব্য রচিত হয়েছিল। যদিও এর কাব্যিক গুণাবলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

বিশ্বসাহিত্যে টানা গদ্যকবিতার স্বীকৃত আবির্ভাব ঘটে আধুনিকতাবাদি সাহিত্যের জনয়িতা শার্ল বোদলের-এর হাতে। তার রচিত বহুনন্দিত গ্রন্থ *Le Spleen de Paris* বা *Petites Poémes en Prose* (১৮৬৯)-এর মাধ্যমে টানা গদ্যকবিতা কাব্যপিপাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও শিল্প হিসেবে আত্মমুদ্রা লাভ উভয়ই করতে সমর্থ হয়। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল কবির মৃত্যুর দু-বছর পরে।[১৪] বই-এর ভূমিকায় বন্ধু আরসেন হুসেই-এর উদ্দেশে এমন ধরনের লেখা লেখবার জন্য নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কবি। কবিতার প্রথাবাহিত কাঠামো ও ছন্দ-প্রশাসন ভাঙা এই নতুন শিল্প-প্রকরণকে অমরতা দিয়েছেন বোদলেরই। তার পূর্বসূরি ছিলেন অ্যালয়সিয়াস বর্ত্রাঁ (Aloysius Bertrand)। বোদলের বর্ত্রাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বর্ত্রাঁর বই *Gaspard de la nuit* (১৮৪২)। এটিও লেখকের জীবদ্দশায় ছেপে বের হয়নি।[১৫] ফরাসি কবিদের এই প্রয়াস অচিরেই সারা পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বোদলের পরবর্তী র‍্যাঁবো, ম্যালার্মে, মরিস মিতারলিকদের হাতে এই ধরনের রচনা প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়। ইংরেজি সাহিত্যে উনিশ শতকের শেষের দিকে 'ব্রিটিশ অবক্ষয়বাদী' হিসেবে খ্যাত অস্কার ওয়াইল্ড প্রথম টানা গদ্যকবিতা প্রকাশ করেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে টানা গদ্যকবিতার প্রচেষ্টা ইংরেজি সাহিত্যে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যায়, কারণ ইমেজিস্ট ধারার কবিরা উৎসাহী ছিলেন ফ্রি ভার্স বা ভার্স লিবরে-তে। অন্যদিকে টি এস এলিয়ট নিজে একটিমাত্র টানা গদ্যকবিতা[১৬] লিখলেও, পরবর্তীকালে এর কঠোর সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন।[১৭] বলা হয়ে থাকে, তার প্রভাবে এই সংরূপের চর্চা দীর্ঘদিন প্রায় থেমে ছিল। যদিও তখন দু-একজন, যেমন, রিচার্ড অ্যাডলিংটন, গার্ট্রুড স্টেইন, এমি লওয়েল প্রমুখ লেখকের চর্চা নানাভাবে চলছিল। ছয়ের দশকে ইংরেজি সাহিত্যে এই সংরূপটি পুনর্জাগরণ লাভ করে বলা যায়। শুধু ইংরেজি নয়, এই সংরূপটি বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টিশীল লেখকদের আকৃষ্ট করেছে। যেমন, রাইনার মারিয়া রিলকে, স্টেফান গিয়র্গে, গিয়র্গ টাকল, তুর্গেনেফ, বোলেসাফ প্রুস, ফ্রান্সিস মারিশ, অক্তাভিও পাজ, এনজেল ক্রেসপো প্রমুখ। ইংরেজি, এস্পানিওল, ফরাসি, জাপানি-সহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে টানা গদ্যকবিতার সংকলন।

বাংলা কবিতার ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *লিপিকা*-র রচনাগুলোতেই টানা গদ্যকবিতার উন্মেষ লক্ষ করি। কিন্তু বাংলাভাষায় টানা গদ্যকবিতার প্রথম কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার *গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক* গ্রন্থে তিনি তিনটি টানা গদ্যকবিতা প্রকাশ করেছিলেন। তখন পর্যন্ত বাংলা কবিতার যে-ইতিহাস ও সংস্কার, তাতে এমন সিদ্ধান্তগ্রহণ বেশ বৈপ্লবিক বলা যায়। তিনি টানা গদ্যকবিতা লিখেই ক্ষান্ত হননি, গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে জানিয়েছিলেন, পদ্যমাত্রই কাব্য নয়, এবং 'অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী'। 'গদ্যকবিতা' নামটি তাঁর দেওয়া[১৮], যদিও পরবর্তীকালে এই নামে ভিন্ন ধরনের কবিতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উদাহরণগুলি টানা গদ্যকবিতা হিসেবে কতটা সার্থক, সেটা বিচার্য নয় এ-কারণে যে, তাঁর প্রয়াস ছিল নিরীক্ষামূলক ও কবিদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য। এমন উদাহরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ *লিপিকা*-র রচনাগুলিকে কবিতার স্বীকৃতি দিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। রবীন্দ্র-অনুসারী বা বিদ্রোহী কোনো কবিগোষ্ঠীই এই ধারায় চর্চা করেননি।

ফরাসি কবিতার অনুরাগী ও র‍্যাঁবোর অনুবাদক কবি অরুণ মিত্র ১৯৫৫ সালে টানা গদ্যে লেখা কিছু কবিতাসহ একটি কবিতাগ্রন্থ *উৎসের দিকে* প্রকাশ করেন। বাংলায় এটি টানা গদ্যকবিতার প্রথম সচেতন প্রয়াস। কবি অরুণ মিত্রের কবিতার মাধ্যমে যে-প্রয়াস শুরু হয়, তা অগ্রসর হয়েছে সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক হয়ে অতি সাম্প্রতিক কালের প্রায় সকল কবি পর্যন্ত। বহু কবির চর্চায় এই প্রকরণটি হয়ে উঠেছে আরও বেশি প্রকাশক্ষম ও বৈচিত্র্যময়। দেখা যাচ্ছে যে, বাংলায় টানা গদ্যকবিতা বাংলা কবিতার মৌল প্রবণতাগুলোর অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য — বিশেষত, সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা কবিতার যে-ইতিহাস আমরা লক্ষ করেছি, তাতে দেখা যায়, টানা গদ্যকবিতা উদ্ভবের সঙ্গে যাকে বলা হয় 'ছন্দমুক্তি', তার সম্পর্ক সামান্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গদ্য-আঙ্গিকে কবিতার কথা ভেবেছিলেন; কবিতায় ছন্দের শাসন দুরূহ হয়ে উঠেছিল — এমন ভাবনা থেকে নয়, বরং কবিতা সম্পর্কিত আঙ্গিক-নিরপেক্ষ (গদ্য বা পদ্য) দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই। এটি স্পষ্টভাবে আঙ্গিক বা শিল্প-কাঠামো ও তার নির্যাস বিষয়ে ভাবনার ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের আঙ্গিকভাবনা ও নিরীক্ষা তার উপন্যাস তথা গদ্যভাষার দিকে মনোযোগ থেকে উদ্ভূত কি না, তা অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবে, আমরা জানি যে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *মেঘনাদবধ কাব্য*-র আলোচনায় কবিতার আঙ্গিক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ কথা বলেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে *পুষ্পাঞ্জলি* (১৮৮৫) থেকে *লিপিকা* (১৯২২) পর্যন্ত রবীন্দ্রগদ্যের ও কবিতার বিবর্তন ও বাঁক-পরিবর্তনকে যদি বিবেচনায় নেওয়া যায়, তাহলে বাংলা ভাষায় টানা গদ্যকবিতার উন্মেষকে ছন্দ-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে তেমন সম্পৃক্ত করা যায় না, যতটা অঙ্গীভূত করা যায় শিল্প-আঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধান ও ভাবনার সঙ্গে।

আকৃতি ও ছন্দ বিবেচনায় টানা গদ্যকবিতার সম্পর্ক গদ্যের সঙ্গে; কিন্তু উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের ব্যবহার-কৌশলে, ভাবের বহুবর্ণিলতায় কিংবা

অন্তর্গত প্রাণস্পন্দনে এটি কবিতার মতো। এই দ্বৈততার কারণে এর শ্রেণি-নির্ণয়ে লেখক ও সমালোচকদের দ্বিধা লক্ষণীয়। কেউ-বা এটিকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংরূপ হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এটির কবিতা পরিচয় নিয়ে দ্বিধা নেই কারোরই। বাঙালি কবিরা এই সংরূপটিকে কবিতা হিসেবে ব্যবহার করেছেন ভাব ও অনুভবের আরও সূক্ষ্ম ও বিচিত্র দিককে আয়ত্ত করার প্রয়াসে, যা পদ্যকাঠামোতে সম্ভব ছিল না। তাই, টানা গদ্যকবিতাকে বাংলা কবিতার ইতিহাসের অংশ হিসেবে পাঠ ও অনুধাবন করা যেতে পারে। গদ্যের দিক থেকে যে-উপাদানগুলি টানা গদ্যকবিতায় আমরা লক্ষ করি, তার মূল্যায়ন এখানে আবশ্যিক। বিশেষত আমেরিকা ও ইউরোপে টানা গদ্যকবিতায় গদ্যের নিজস্ব বিচিত্র বিষয়ও এমনভাবে রচয়িতারা ব্যবহার করতে পেরেছেন যে 'চৈতন্যের নানা অবদমন'-কে কিংবা 'যা আগে বলা অসম্ভব ছিল' তাকেও এখানে ব্যক্ত করা গেছে অনেকখানি। আমাদের সাহিত্যে এই সম্ভাবনাটি এখনও ব্যবহৃত হয়নি বলা যায়। ফলে সংরূপ হিসেবে স্থায়ী ও স্বতন্ত্র হতে গেলে আরও গদ্যবৈশিষ্ট্যের এখানে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে।

আমাদের সন্দেহ নেই যে, গদ্যে রচিত রচনাকে 'টানা গদ্যকবিতা' হিসেবে চিহ্নিতকরণ একটি সমস্যা — কারণ, 'টানা গদ্যকবিতা' শব্দবন্ধটি অতিব্যাপ্ত। 'গদ্য' শব্দটি এর আঙ্গিককেও নির্দেশ করে; গদ্য টেনেই লেখা হয়। অর্থাৎ, গদ্যে বাক্য কখনো পঙ্‌ক্তিতে খণ্ডিত হয় না, এর বিস্তার পৃষ্ঠার উভয় মার্জিনের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে। টানা গদ্যকবিতার ইংরেজি প্রতিরূপ Prose Poem, এবং সেখানে নামটি সুপ্রযুক্ত। কিন্তু বাংলায় 'গদ্যকবিতা' বলতে পদ্য-পঙ্‌ক্তির ছন্দ-বর্জিত কবিতা বোঝানো হয়, যা মূলত ইংরেজি ফ্রি ভার্সের সঙ্গে তুলনীয়। তাই বলা যায়, এটিও বিভ্রান্তিকর। অন্যদিকে যাঁরা গদ্যে-লেখা কবিতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাঁরা অনেকেই এটিকে 'টানা গদ্যকবিতা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন, অরুণ মিত্র, আবদুল মান্নান সৈয়দ। স্মরণ করা যেতে পারে, আবদুল মান্নান সৈয়দের *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* নিয়ে কবি শহীদ কাদরী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ সংখ্যা *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ লিখেছেন, 'তাঁর প্রথম কবিতার বই 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' আগাগোড়া টানা-গদ্যে লেখা (যা কিনা বিশ্বব্যাপী 'কন্টিনেন্টাল [Continual?] প্রোজ পোয়েম' নামে পরিচিত)। আমার ধারণায় 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' বইটি গোটা বাংলা কবিতার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।' শহীদ কাদরী সম্ভবত এখানে 'টানা গদ্যকবিতা' শব্দটির ইংরেজিতে আক্ষরিক রূপান্তর ঘটিয়েছেন, যা এ-বিষয়ে বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে। টানা গদ্যকবিতাকে কোথাও 'কন্টিনেন্টাল [Continual?] প্রোজ পোয়েম' বলে অভিহিত করা হয়নি, বরং ইংরেজিতে এটি যেমন 'Prose Poem' নামে পরিচিত, ফরাসিতে একে তেমন '*Poéme en Prose*' নামে ডাকা হয়।

৪

একটি লেখা কাগজে নির্দিষ্ট বিন্যাসে মুদ্রিত হয়ে উপস্থিত হয়; এবং এ-থেকে আমরা সাধারণভাবে এটিকে গদ্য বা কবিতা হিসেবে গ্রহণ করি। এটি ঘটে পাঠ করার আগেই। আর এর ফলে আমরা লেখাটির বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখাই। এই যে অভ্যস্ত দর্শনভিত্তিক প্রতিক্রিয়া, এটিকেই আক্রমণ করে টানা গদ্যকবিতা। পদ্যভিত্তিক কবিতা-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মাধ্যমে এটি একটি বৈপ্লবিক সংরূপ হিসেবে আমাদের সামনে নিজেকে জানান দেয়। আমরা তখন হয় একে উপেক্ষা করি, প্রত্যাখ্যান করি, অথবা মেনে নিই। অর্থাৎ, মুদ্রণবিন্যাস হচ্ছে একটি রচনা গদ্য নাকি পদ্য, তার নির্ণায়ক। এটি পদ্য বা প্রথাগত কবিতাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে, কখনো-বা দর্শনীয় করে তোলে।[১৯] পদ্য-ধারণার সাথে যুক্ত মুদ্রণ-বিন্যাসের আন্তর্বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পঙ্‌ক্তি-খণ্ডন। পদ্যের কাঠামোতে বাক্য কবির ছন্দমাফিক কিংবা পরিকল্পনা বা ইচ্ছানুসারে ছত্রে খণ্ডিত হয়ে বিন্যস্ত হয়। বিষয়টিকে বলা যেতে পারে, পঙ্‌ক্তি-খণ্ডন বা ছত্র-বিন্যাস (Line-Break)। ছন্দে লেখা বা ছন্দবর্জিত পদ্য-কাঠামোর কবিতার ক্ষেত্রে এই ছত্রবিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকৌশল, যা কবির আয়ুধ। টানা গদ্যকবিতা এই প্রকৌশল থেকে বঞ্চিত। ফ্রি ভার্স বা ছন্দবর্জিত কবিতার সাথে টানা গদ্যকবিতার পার্থক্য এই ক্ষেত্রেও ঘটে। এই ভিন্নতার ফলে কী ঘটে, সেইটি অনুসন্ধান আমাদের নতুন কিছু বিষয়কে বিবেচনায় নিতে সহায়তা করবে। এ-প্রসঙ্গে মার্কিন কবি ডেনিস লেভেরতভ (Denise Levertov)-এর বিশ্রুত প্রবন্ধ *On the Function of the Line* (১৯৭৯) থেকে নীচের কথাগুলি উদ্ধার করতে চাইব, যেখানে তিনি বলছেন —

> The most obvious function of the line-break is rhythmic: it can record the slight (but meaningful) hesitations between word and word that are characteristic of the mind's dance among perceptions but which are not noted by grammatical punctuation.[২০]

বাক্যের সাধারণ নিয়মানুযায়ী আমরা কবিতাতেও বিরাম বা যতিচিহ্নের প্রয়োগ হতে দেখি। যতিচিহ্নের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে পাঠককে রচনাটির পঠনে সহায়তা করা। এই সহায়তা বাক্যের অর্থবোধ ও পাঠ-স্বাচ্ছন্দ্য, উভয় দিকেই। যতিচিহ্ন মূলত ভাবানুযায়ী ব্যবহৃত হয়। তা সত্ত্বেও যতিচিহ্ন কবিতার অন্তর্গত তাল বা ছন্দস্রোতকে সহায়তা করতে পারে, পাঠককে নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন বিরতিতে থামিয়ে। যেকোনো গদ্য-রচনার ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটে। নিয়মিত বিরতিচিহ্নের ব্যবহার ব্যাকরণ ও যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত একটি বিষয়। কিন্তু কবিতার চলন সবসময় যুক্তিকে মান্য করে না, যুক্তিকে অতিক্রমও করে যায় কবিতা। কবি অনেকসময় সৃষ্টি করতে চান দ্ব্যর্থতা, কিংবা যুক্তিহীনতা। ব্যাকরণের কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে কিংবা কিছুটা বিপর্যস্ত করে ফেলা কখনো কবির অভিপ্রায় হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তি-খণ্ডন কবির জন্য অতিরিক্ত যতিচিহ্নের মতো ভূমিকা রাখতে পারে। পদ্য-কাঠামোর কবিতায় বাক্য ছত্রে বিন্যস্ত হওয়ার ফলে প্রতিটি ছত্রের শেষে একটা বিরতি প্রচ্ছন্নভাবে নির্দিষ্ট হয়েই থাকে। এই ছত্রবিন্যাস পঙ্‌ক্তির অন্তর্গত ছন্দস্পন্দনকে ও তালকে সহায়তা করে। সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ রচিত এই পঙ্‌ক্তিগুলি পড়া যেতে পারে —

> হে প্রভাত, খোলো, ধীরে, স্বচ্ছ পাপড়িগুলি, আমি দেখি
> নিমিষের ফাঁকে-ফাঁকে বেগুনি টুটুতে প্রিমা দোন্না
> নাচে — এক পবিত্র স্ট্রিপটিজ, আহা, এত পবিত্র যে
> মনে হবে খোলা নয়, পরা হচ্ছে শুভ্র উলঙ্গতা,[২১]

দ্বিতীয় লাইনের খণ্ডনের ফলে 'নাচে' শব্দটি তৃতীয় লাইনে এসে পড়ে অভূতপূর্ব এক সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে। মনে হতে পারে ছন্দের অনুরোধে কবি এমনটি করেছেন, কিন্তু এর ফলে লেভেরতভ কথিত 'the slight (but meaningful) hesitations between word and word that are characteristic of the mind's dance'-ই শুধু রক্ষিত হয়নি, তৈরি হয়েছে আকস্মিকতা, অনুচ্চ-সংগীতময়তা। পঙ্‌ক্তি-খণ্ডনের মাধ্যমে কবিতায় কবি সৃষ্টি করতে পারেন একটি সুরের প্রবাহ বা সংগীতময়তা। এটি তৈরি হয় পঙ্‌ক্তি থেকে পঙ্‌ক্তিতে বিভিন্ন অনুরণনের ধ্বনির বিন্যাস ও তাদের মধ্যে বিরতির পরিকল্পিত ব্যবহারে। এ-বিষয়ে পঙ্‌ক্তি-খণ্ডন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ভাস্কর চক্রবর্তীর এই কবিতাংশটি —

> ছিল বাহাদুরি। আমি
>   ছিলাম খেলায়
>   মগ্ন, ওগো
> সহসা শুনেছি আজ
> নদীর ওপার থেকে
> ঘুমের ওপার থেকে —
>   'লেখো লেখো,
> ইডিয়ট, লেখো।'[২২]

এই কবিতাংশটিতে ছত্রবিন্যাসে বিশেষত্বের সঙ্গে মুদ্রণবিন্যাসেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম পঙ্‌ক্তি বামপাশের মার্জিন থেকে শুরু

না-হয়ে, কয়েক স্পেস পরে শুরু হয়েছে। এভাবে বিন্যাসের ক্ষেত্রে কবির নিজস্ব ভাবনা যে ক্রিয়াশীল, সন্দেহ নেই। এ-বিষয়টিকে অন্য একজন কবির কবিতা লেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে —

> কবিতার গদ্য সোজা ছত্রের বদলে অনেক সময় অসমান ছত্রে সাজানো হয়। আমিও তা করি। এর পেছনে তাগিদ থাকে কবিতার বিশেষ উচ্চারণের। এক একটা বাক্যবন্ধকে আলাদা ক'রে বিশিষ্ট করতে চাই বা এক একটা শব্দবন্ধের উপর জোর দিতে চাই, কথার এক একটা গুচ্ছকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমন্বিত করে যতিপাত করতে চাই এবং এইসব বিভিন্নকে নিয়ে একটা সমগ্র গড়তে চাই। তাছাড়া, আর একটা কারণও প্রায়ই থাকে। বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ এক দুর্বলতার উৎস। আমাদের সাধারণ বাক্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ উহ্যও রাখা হয়। কবিতার গদ্য অসমান ছত্রে লিখলে প্রয়োজনে ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে বাক্যকে সংহত করা সম্ভব হয়।[২৩]

অরুণ মিত্র এখানে অসমান পঙ্‌ক্তিতে কবিতার ছত্র-বিন্যাস করার ক্ষেত্রে শব্দকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, ছত্রবিন্যাসের কারণে কবিতার পঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্নতা তৈরি হয়, এভাবে বিশিষ্ট করে দেওয়া শব্দের উচ্চরণে ঝোঁক ও গুরুত্বের সৃষ্টি হয়। ছত্রবিন্যাস না থাকার কারণে টানা গদ্যকবিতা পঙ্‌ক্তি-খণ্ডনের প্রকৌশলগুলি কাজে লাগাতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে ধ্বনি ও সাংগীতিক প্রভাব ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

আমেরিকার Wisconsin-Milwaukee বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক প্রুডেন্স বায়ার (Prudence P. Byers) তাঁর গবেষণায় পরীক্ষা করেছেন সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ছন্দহীন রচনা কীভাবে উচ্চস্বরে পাঠ করে থাকে। যেহেতু গবেষণাটি ইংরেজি ভাষা-কেন্দ্রিক ছিল, তিনি বিবেচনায় নিয়েছিলেন রচনায় ব্যবহৃত প্রস্বরযুক্ত ও প্রস্বরহীন অক্ষরের (Syllable) সংখ্যাসহ বিভিন্ন দিক। গবেষণায় দেখা গেল, ফ্রি ভার্স কবিতায় ব্যবহৃত প্রস্বরযুক্ত সিলেবলের সংখ্যা টানা গদ্যকবিতার চেয়ে সর্বদা বেশি।[২৪] বাংলা প্রস্বরপ্রধান ভাষা নয়, বাংলার ছন্দও প্রস্বরপ্রধান নয় — অক্ষরকেন্দ্রিক। স্বরবৃত্ত ছন্দেই আমরা প্রতিটি পর্বের শুরুতে প্রস্বর বা ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষ করি। কিন্তু পদ্যে লিখিত কবিতায় সাধারণভাবে প্রতিটি পঙ্‌ক্তির শুরুর সিলেবলে একটা ঝোঁক লক্ষণীয়, কবিতার আবৃত্তিকালে ভাবগত বিশেষত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন শব্দের ওপরে জোর ও ঝোঁক পড়তে পারে। কবিতার মুদ্রণ-বিন্যাস ও পঙ্‌ক্তি-খণ্ডনের কৃৎকৌশল এখানে ভূমিকা পালন করে থাকে। টানা গদ্যকবিতায় এমন হওয়ার সুযোগ কম। এছাড়া টানা গদ্যকবিতায় কবির লক্ষ্য থাকে ভিন্ন। কবি অরুণ মিত্র উল্লিখিত প্রবন্ধে নিজের কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা থেকে জানাচ্ছেন আমাদের —

> যখন টানা গদ্যে লিখি তখন সমগ্রতাই প্রধান। আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে শব্দাবলীর প্রকৃতিকে অবলম্বন করে এক অখণ্ড ভাব বা বক্তব্য ফুটে উঠুক, এই ভাবি। সেখানে ব্যবহৃত শব্দের তাৎপর্যই যতির নিয়ামক, বিন্যাসের আর প্রয়োজন দেখি না।[২৫]

টানা গদ্য কবিতায় গদ্যের বৈশিষ্ট্যকেই অনেকটা অনুসরণ করে রচনাটি। বিভিন্ন শব্দকে তার অনুরণনসহ প্রবল হয়ে উঠতে না দিয়ে কবির লক্ষ্য থাকে একটি সমগ্রতা নির্মাণ, যেখানে সকল শব্দ ও পদ একটি মিলিত প্রবাহ তৈরি করে।

৫

অনেকদিন আগে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ *Preface to Lyrical Ballads*-এ বলেছিলেন, 'I do not doubt that it may be safely affirmed, that there neither is, nor can be, any essential difference between the language of prose and metrical composition'।[২৬] তাঁর সময় বিবেচনায় বলা এই কথাগুলি টানা গদ্যকবিতা রচয়িতাদের উৎসাহিত করতে পারে। টানা গদ্যকবিতা কবিতা থেকে আলাদা হয়ে যায়, কেননা এটি দেখতে অন্যরকম। অন্যদিকে তা গদ্য থেকে ভিন্ন হয়ে যায়, যেহেতু এর ভাষা স্বতন্ত্র।

কবিতাকে চিহ্নিত করে যে-সকল ভাষাগত নির্দেশক, সেগুলিকে আমরা টানা গদ্যকবিতার ভাষাতেও লক্ষ করি —

> ১.
>
> জ্যোৎস্না ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে দরোজায়, সব দরোজায়, আমার চারিদিকে যতোগুলি দরোজা আছে সময়ের নীলিমার পাতালের; জ্বলছে গাছসকল সবুজ মশাল; বাস একটি নক্ষত্র, পুলিশ একটি নক্ষত্র, দোকান একটি নক্ষত্র : আর সমস্তের উপর বরফ পড়ছে। — এরকম দৃশ্যে আমি অহত হয়ে শুয়ে আছি পথের উপর, আমার পাপের দুচোখ চাঁদ ও সূর্যের মতো অন্ধ হয়ে গেল, আর যে-আমার জন্ম হলো তোমাদের করতলে মনোজ সে অশোক সে : জ্যোৎস্না তার কাছে ভূত কিন্তু একটি গানের উপর, দরোজা তার কাছে পুলিশ কিন্তু একটি জন্মের উপর, মৃত্যু তার কাছে দোজখ কিন্তু একটি ফুলের উপর।[২৭]
>
> ২.
>
> একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিল। সাদা তুষারে ঢাকা পিটার্সবুর্গের রাস্তাঘাটের ব্যবহার তখন কম। রাত্রি ছিলো। আলোকিত কক্ষ। টেবিলে জ্ব'লে যাচ্ছে মোমের বাতি।...
>
> এই স্বপ্নটা আমি একদিন নয়, দু-দিন নয়, তিনদিন দেখলাম।
>
> গাড়ি যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজছে গাড়িওয়ালার হাতে। ভেতরে জিভাগো ছিলেন না। (উপন্যাস কার প্রতিবিম্ব?) ছিলেন পাস্তেরনাক নিজে। কবি। লেখক। মৃত্যু ভয়ে চিন্তিত। প্রেমিক। এবং যাঁর পশমের ওভার কোটের ভেতরে লুকানো থাকতো বাচ্চাদের কান্না! চতুর্থ দিন আবিষ্কার করলাম, স্বপ্নটা আর কিছুই নয়। একটা ক্রোধ। সেই ক্রোধটা হ'লো আমি আরও একবার এক মৌলিক দীর্ঘাঙ্গীর প্রেমে পড়েছি।[২৮]

বাংলায় রচিত টানা গদ্যকবিতা থেকে এই উদাহরণগুলি নেওয়া হয়েছে। এখানে প্রথম উদাহরণে পরাবাস্তব আবহ এর ভাষাকে সাধারণ গদ্যভাষা থেকে অনেকখানি দূরবর্তী করে তুলেছে। ওপরের সূত্রে যে অস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা, যুক্তিহীনতার কথা বলা হয়েছে, তা এখানে আছে। এছাড়া রয়েছে চিত্রকল্প ও রূপক এবং ধ্বনিগত কিছু আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তিও। এখানে শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ করি। কিন্তু যা স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নায়ক, তা হল, মাত্র দু-টি বাক্যে সম্পূর্ণ এই রচনাটিতে কবি অনেকগুলি পদ ও উপবাক্য পরপর বসিয়ে গেছেন যুক্তি ও ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করেই। ফলে তৈরি হয়েছে অর্থবোধে বিপর্যয়। অন্যদিকে, পরের উদাহরণে লক্ষ করি, একটি গল্প বা আখ্যান তৈরি করা হয়েছে। ছোটো-ছোটো বাক্যে গল্পের মতোই তা বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ গদ্যভাষার সাথে এর পার্থক্য সামান্যই। শুধু একটি বাক্য ব্যতিক্রম — 'এবং যাঁর পশমের ওভার কোটের ভেতরে লুকানো থাকতো বাচ্চাদের কান্না!'। এখানে এসে ভাষা বর্ণনাকে অতিক্রম করে গেছে। গল্পটি অবশেষে যেভাবে সমাপ্ত হয়, তাতে একটা অস্পষ্টতা কিংবা রহস্য তৈরি হয়। এভাবে দু-টি টানা গদ্যকবিতায় যে ভাষা লক্ষ করি আমরা, তা প্রকৃতপ্রস্তাবে পাঠককে এমন দ্বিধায় ফেলে যে, তিনি এদের গদ্যগোত্রীয় বলতে চান গঠন ও বর্ণনাত্মক ভঙ্গি কিংবা আখ্যানবর্ণনার দিকে তাকিয়ে; কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে একে কবিতার সগোত্রীয় মনে হয়। এবার পড়া যাক এই রচনাটি —

> হয়বদন গীটার তু তু বাঁশি জেব্রা ঢোল ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম নাইকুণ্ডলি মাইক হাঃ হাঃ শ্যামলবাবু ট্যাক্সি ভাড়াটা আগেই নিয়ে রাখুন তার আগে বলুন দেখি এই টু-পিন প্লাগটা কোথায় ঢুকবে ট্যাক্সি না পেলে শীলাদির লিফট নেবেন সাউথে যাঁরা যাবেন বাঁ-দিকে বসুন রেডিও আর্টিস্ট হতে গেলে গাড়ি চাই টিভির জন্য টেলিফোন জেব্রা ঢোল কোন্ জঙ্গল দুলে উঠছে ঐ পায়ের শব্দে পিকোলো কোন্ ঝর্না পথ বদলালো হায় হায় রে দিন যায় রে আলুলায়িত সোনি টেপ অমন মাথায় বেন্ধে দেব টেক ওয়ান রেডি শিলাদি দস্যু স-গুলো সামলাবেন রেডি টেক ওয়ান ঝড়-ঝুমুর গলাটা গেছে দেখি আপনার গানের স্কুল খুলে বসুন একতলার ভাড়াটে তুলে দিন জল বন্ধ করুন সে যাবে রেন্ট

> কন্ট্রোলে তো আপনি যাবেন তরুণ সঙ্ঘে সেকেন্ড তবলা বাইরে গিয়ে কেশে আসুন ঝেড়ে কাশুন দেখেছিলাম সারানে ওরে সারানে।[২৯]

এখানে পুরো রচনার শেষে মাত্র একটি যতিচিহ্ন 'দাঁড়ি' ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য প্রসঙ্গ বাক্য-উপবাক্যে গেঁথে দিয়েছেন লেখক একনিশ্বাসে। গদ্যের ভাষা একেবারে আটপৌরে ধরনের। এমনসব বিষয়, যেগুলো কখনোই কবিতায় ব্যবহৃত হয় না, এখানে এসেছে। যেন একটি আলাপচারিতার মধ্যে অন্য অনেক আলাপ ও প্রসঙ্গ ঢুকে পড়েছে। বর্ণনা ছাড়াই চলমান জীবনের ছবিগুলি একের পর এক এসে গেছে এখানে। ভাষা কবিতার গীতলতা বা উপমা-চিত্রকল্প বহুলতাকে বর্জন করেছে, কিন্তু তবু এটিকে সাধারণ গদ্য-রচনার সঙ্গেও মেলানো সম্ভব না। ফলে এর শ্রেণি-নির্ণয় পাঠকের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই পটভূমিতে তাই গদ্য ও কবিতার দ্বন্দ্বের বিভিন্ন মাত্রাই শুধু নয়, এর বাইরের বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানকে নির্দেশ করা প্রয়োজন, যা বাংলা কাব্যধারায় টানা গদ্যকবিতাকে বেছে নিতে ও এর হয়ে ওঠাকে চিহ্নিত, নির্দিষ্ট, বহুচর্চিত ও অবদমিত করছে ও করেছে এবং এর স্বীকৃতিকে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে বাধা দিচ্ছে।

৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *লিপিকা*-র লেখাগুলিকে গদ্যকবিতা কেন বললেন না, বা এরকম আরও লেখা কেন লিখলেন না? *পুনশ্চ*-র কবিতাগুলিকেই কেন গদ্যকবিতা বলা হল? বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যে কবিতা লেখার কথা বলেছিলেন; প্রশ্ন হল, তার সময় বা রবীন্দ্র-প্রভাবিত কালে টানা গদ্যকবিতা লেখার বা সংরূপ হিসেবে এর প্রতিষ্ঠার কোনো বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে ছিল কি?

যে-বাস্তবতা আমাদের সাহিত্যকে দ্রুত মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে গেছে, সে-বাস্তবতা গদ্য ও পদ্যের ভিন্ন নিয়তি তৈরি করেছে। কল্পনা, ভাব ও চিন্তার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট রয়েছে পদ্য ও গদ্যের স্বতন্ত্র ধরন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রস্তাবিত পথে যদি আমাদের তখনকার কবিরা উৎসাহিত হতেন, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা তখনকার বিকাশমান সাহিত্য-বাজারের প্রবণতার বিপক্ষে বিদ্রোহের মতো হত। বাজার কিন্তু মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করে। আবার সমষ্টির মনস্তত্ত্বকে স্বীকার করেই বাজার প্রসারিত হয়। প্রথা-উপাসক ঐতিহ্য-আশ্রয়ী বাঙালি চরিত্রে তখন সাহিত্যের যে-ধারণা বা বোধ গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে বাণিজ্যের কোনো সম্পর্ক পরোক্ষেও ছিল না, এমন ভাবা ঠিক না।

একেবারে গদ্যে কবিতা লেখা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রস্তাবনার পেছনে তাঁর সংস্কৃত-সাহিত্যের দীক্ষা কিছুটা সহায়তা করে থাকতে পারে, কেননা আগেই জেনেছি সংস্কৃতে গদ্যকাব্য আছে। অন্য কবিরা এই গদ্যকাব্যকে 'প্রোজ-রোমান্স' বলে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের শ্রেণিকরণ মেনে নিয়েছিলেন। নতুন সাহিত্যবীক্ষা তাঁদের শিখিয়েছিল, কবিতা কেবল পদ্যেই লিখিত হইবে। এই বীক্ষা কিংবা শিক্ষাটি ইউরোপীয় সাহিত্য-আশ্রিত ও নতুন সাহিত্য-বাণিজ্যকে মেনে নিয়েই। টানা গদ্যকবিতা একে আহত করে। কারণ সংজ্ঞার সংকীর্ণতাকে এটি অস্বীকার করে ব্যাপক বিস্তৃতি দাবি করে। রবীন্দ্রনাথও একে মেনে নিয়েছিলেন বলেই *লিপিকা*-র গদ্যগুলিকে কবিতা বলে মেনে নিতে পারেননি। কবিতা হিসেবে টানা গদ্যকবিতার আবির্ভাব ও বিকাশ তাই সে-সময়ে অসম্ভব ছিল। কী হত যদি রবীন্দ্রনাথ আরেকটি *লিপিকা* লিখতেন? স্বাভাবিকভাবেই তখন এর শ্রেণি বা সংরূপ-সংক্রান্ত প্রশ্নটি উচ্চকিত হত। *লিপিকা* নিয়ে তাঁর দ্বিধা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। *লিপিকা*-র ধরনে যা বলা যেত, তার অনেকটাই গদ্যকবিতায় *পুনশ্চ* ও অন্যান্য বই-এর কবিতায় বলেছেন। *লিপিকা*-র গদ্যকে তিনি বলেছেন, 'rythmic prose'।[৩০] গদ্যকবিতা বলতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকেরা ছন্দহীন কবিতাকে বুঝিয়েছেন। এর ভাষা ছন্দের বন্ধনমুক্ত, তাই তাঁদের বিবেচনায় এটি গদ্য, আর যেহেতু এটি পদ্যের মতো পঙ্‌ক্তি ভেঙে লেখা হয়েছে, সেহেতু এটি কবিতা — গদ্যকবিতার জন্য যুক্তি সম্ভবত এটুকুই। অর্থাৎ, কবিতা শব্দের সঙ্গে যে-সংস্কার ইতোপূর্বে অর্জন করেছিলেন তাঁরা, তা ভাঙা অসম্ভব এখনও।

এভাবে গড়ে-ওঠা বাঙালি মনন তিনের দশকে এসে প্রায় প্রবল পশ্চিমাকরণের আঘাতে বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু গদ্য ও পদ্যের সীমানা-প্রাচীরকে টপকাতে আরও কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে। পাঁচের দশকে অরুণ মিত্রের প্রচেষ্টার পর বাঙালির সাহিত্যের এই অর্গল খুলেছে ছয়ের দশকে, যখন সারা দুনিয়াই নানা রিফর্মেশনের হাওয়ায় উত্তাল ছিল। তখনই দেখি, চল্লিশের সৈয়দ আলি আহসান, পঞ্চাশের শঙ্খ ঘোষ, উৎপলকুমার বসুরা একটি-দুটি করে টানা গদ্যে কবিতা লিখছেন। আমরা পেলাম আবদুল মান্নান সৈয়দ বা সিকদার আমিনুল হকদের প্রয়াসগুলি। কিন্তু প্রকৃত জোয়ার এসেছে আশি-নব্বই-এর পর থেকে। এখন তো টানা গদ্যকবিতার একক গ্রন্থও আমরা পাচ্ছি।

৭

'বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়'[৩১] — রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কিত এই দৃষ্টিভঙ্গি টানা গদ্যকবিতার কাঠামোগত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় হতে পারে। মাধ্যম গদ্য হওয়ার কারণে বিচিত্র বিষয়কে টানা গদ্যকবিতা নিজের অংশ করে নিতে পারে, যা পদ্য-কাঠামোর মধ্যে থেকে সম্ভব নয়। বহু বিষয়কে এভাবে সংশ্লিষ্ট করে ফেলার মাধ্যমে টানা গদ্যকবিতা তার একটি পরিচয়কে নির্মাণ করে ফেলে, যাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারা বা নির্দিষ্ট করা কঠিন। কবিতা হয়ে ওঠার প্রথাগত শর্তকে শিথিল করে এটিকে যদি কবিতা হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলেও সমস্যাটি এখানে তৈরি হয় যে — এর রীতি বা নিয়মকানুন কী, যা একে নির্দেশ করতে পারে? একটি সনেট, হাইকু বা সাধারণভাবে গীতিকবিতাকে যেভাবে নিয়মের সাহায্যে নির্দিষ্ট করা যায়, টানা গদ্যকবিতাকে যায় না, কেননা, গদ্যে সাজিয়ে লিখলেই এর হয়ে ওঠা নিশ্চিত হয় না। পদ্যে লেখা যেকোনো কবিতা, ছন্দে লেখা বা ছন্দবর্জিত যা-ই হোক না কেন, টানা গদ্যকবিতার সাথে যে-সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য বহন করে, পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস বাদ দিলে, এতই অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট যে, তা আমাদের সংশয় ও দ্বিধা থেকে মুক্ত করতে পারে না। এ-জন্যই সম্ভবত চার্লস সিমিক (Charles Simic) টানা গদ্যকবিতাকে বলেছেন 'সাহিত্যিক সংকর' (literary hybrid)[৩২] —

> ...an impossible amalgamation of lyric poetry, anecdote, fairy tale, allegory, joke, journal entry, and many other kinds of prose. Prose poems are the culinary equivalent of peasant dishes, like paella and gumbo, which bring together a great variety of ingredients and flavors, and which in the end, thanks to the art of the cook, somehow blend. Except, the parallel is not exact. Prose poetry does not follow a recipe. The dishes it concocts are unpredictable and often vary from poem to poem.

সিমিক এখানে টানা গদ্যকবিতাকে 'সাহিত্যিক সংকর' বলার ক্ষেত্রে যে সংমিশ্রণ বা রসায়নের কথা বলেছেন, তা মূলত উপাদান-কেন্দ্রিক। এই উপাদানগুলির বেশিরভাগই গদ্য-কাঠামো নির্ভর। আবার কিছু বিষয় রয়েছে, যা এই দুই-এর তথা সাহিত্যজগতের বাইরের। টানা গদ্যকবিতা এদের আত্মীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে নিজের আঙ্গিক বা শৈলী বিষয়ে একটি ভুল ধারণা দিতে থাকে। অর্থাৎ, গদ্য-আঙ্গিকের আশ্রয়ে রচনাটি নিজের হয়ে ওঠার সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। এতে মোটা দাগে গদ্য ও কবিতাবিশ্বের উপাদানের যে দ্বৈরথ ও সমন্বয় চলতে থাকে, তা আসলে এর আঙ্গিককে প্রভাবিত করে এমন পরিণতির দিকে যায় যে, আমরা এর আঙ্গিক ও উপাদানকে আলাদা করতে পারি না। কবিতা স্বভাবতই, আমরা জানি, ভাষার দিকে তার ফোকাস বা প্রেক্ষণবিন্দুটি রাখে — কিন্তু গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে লক্ষ করি, কবিতার প্রথাগত উপাদানের পাশাপাশি গদ্যভুবনের সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক এতসব বিষয়কে এই সংরূপটি নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে পারে যে, এর ভাষাও, পাঠককে, কবিতা ও গদ্য

উভয়ের থেকে ভিন্নভাবে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। টানা গদ্যকবিতার ভাষাগত বিষয় নিয়ে ব্রুক হোরভাথ (Brooke Horvath)-এর পর্যবেক্ষণ এমন —

> As... one's language affects how one sees and thinks, consequently what one sees and knows. As a subsystem, if you will, of a language, poetry is generated by a double set of rules that exert control over what can be thought [...] To write, then, poetry in prose is to pursue poetry via a different subsystem, a different grammar, in the hopes of thinking new thoughts.[৩৩]

হোরভাথের কথার নিহিতার্থ হল, টানা গদ্যকবিতা লেখার অর্থ হচ্ছে, একটি ভাষিক উপ-ব্যবস্থা সৃষ্টি বা আবিষ্কার করা। স্বভাবত জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়, সামগ্রিক ভাষাব্যবস্থার অন্তর্গত এই উপ-ব্যবস্থাকে কোন বিশেষ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে বুঝব? কেননা সামগ্রিক ভাষাব্যবস্থা এতই বিমূর্ত ও অনির্দিষ্ট যে একে তুলনার মানদণ্ড করা সম্ভব নয়। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে ইয়ান মুকারোফিস্ক (Jan Mukarovsky)-এর তত্ত্ব — কবিতার ভাষা ভাষার একটা নর্ম্ থেকে সরে যায়। এই সরে যাওয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়োজনে। মুকারোফিস্ক মনে করেন, মান্য ভাষাই (Standard Language) সেই নর্ম্, যা থেকে কবিতার ভাষা সরে যায়। অবশ্য মান্য ভাষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি যে বিভ্রান্তিকর, তা রোলা বার্থ দেখিয়েছেন; কারণ আদর্শ সন্ধান, তাঁর মতে, পেঁয়াজের শাঁস সন্ধানের মতো ব্যাপার। তাই তুলনা যদি করতে হয়, তা করা উচিত রচনাটির (১) নিকটতম প্রতিবেশীর সঙ্গে, (২) রচনাটির রূপাদর্শ বা মডেলের সঙ্গে। তাহলে, টানা গদ্যকবিতার নিকটতম প্রতিবেশী ও মডেল কোনটি? কবিতা না কি গদ্য? গদ্যের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে প্রশ্ন আসে, কোন বিশেষ ধরনের গদ্যের ভাষার সঙ্গে টানা গদ্যকবিতার ভাষা বিচার্য? হোরভাথ আমাদের ভিন্ন ব্যাকরণের একটি স্বতন্ত্র উপ-ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তাঁর 'to pursue poetry'-র মধ্যে যে ইঙ্গিত পাই, তার অর্থ হল — টানা গদ্যকবিতা, কবিতার এমন এক রূপান্তর যেখানে নতুন ব্যাকরণ-কাঠামো একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষিক উপ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। কেননা এটা সেই উপায়, যাতে অব্যক্ত ও নতুন চিন্তা ভাষা পায়। ফলে টানা গদ্যকবিতার ভাষা তুলনীয় হতে পারে প্রথমত কবিতার ভাষার সঙ্গে এবং দেখা যেতে পারে কবিতার সাথে এর বিচ্যুতির মাত্রা কতখানি।

এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় নিলে, টানা গদ্যকবিতাকে কবিতাশ্রেণিভুক্ত করতে হয়, কেননা এর যাত্রা ও বিকাশ বাংলায় কবিতারই বিশেষ বৈচিত্র্য হিসেবে। বিশ শতকের চারের দশকের কবি অরুণ মিত্র ও সৈয়দ আলি আহসান টানা গদ্যকবিতা লিখলেও তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন কবিতাগ্রন্থের ভেতরে। একই ঘটনা প্রায় সকল কবির ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এমনকী, বাংলা সাহিত্যে কোনো উপন্যাস অথবা ছোটোগল্প রচয়িতা কিংবা নাট্যকার নেই, যিনি টানা গদ্যকবিতাকে আত্মপ্রকাশের দ্বিতীয় বা স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রতিককালে অনেক কবির টানা গদ্যকবিতার একক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি বলা যায়। এখন পর্যন্ত এই সংরূপ বিষয়ে কবি ও সমালোচকদের মধ্যে 'সন্দেহহীন সিদ্ধান্ত' বিরাজ করায়, কোনো উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান ও প্রশ্ন-উত্থাপন করতে আমরা দেখি না। বাঙালি কবিদের কাছে এই সংরূপটি রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো সুসাধ্য এবং পদ্যে বলা-যায়-না-এমন বিষয়ে বলার একটি কবিতা-শৈলীতে। এমনটি হওয়ার ফলে, বাংলাভাষায় টানা গদ্যকবিতা তার সম্ভাবনার দিক থেকে কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ-বিষয়টিকে আঁরি মেশো (Henry Meschonnic) কথিত 'being ventriloquized by a tradition'-এর সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়। একই সঙ্গে মেশো আমাদের বলেন, 'One doesn't choose what one writes, nor to write. No more than one chooses to be born into one's language, there and then'।[৩৪] কিন্তু বিপরীতক্রমে এ-ও মনে রাখতে চাই, এই সীমাকে অতিক্রম করেই শিল্প অগ্রসর হয়, নির্মিত হয় নতুন দিগন্ত।

প্রসঙ্গসূত্র

১. Ruth Finnegan, *Oral Poetry: Its Nature, Significance and Social Nature*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977. p. 25.

২. উদ্ধৃত : Agnieszka Kluba, 'Theory of a (Non)genre: The Prose Poem as the Act of Experience.' *https://www.academia.edu/3658899/Agnieszka_Kluba_Theory_of_a_Non_genre_The_Prose_Poem_as_the_Act of Experience* [Accessed: 12/11/14].

৩. E. M. Cioran, *A Short History of Decay*, Trans. Richard Howard. Cited in Peter Johnson, 'Introduction,' *The Prose Poem: An International Journal*, Eds. Peter Johnson, Vol. 5, Providence: Providence College Press, 2000.

৪. Alex Preminger and T V. F. Brogan (ed.), *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*, Enlarged Edition, Princeton, N.J: Princeton University Press, 1974, p. 664.

৫. Peter Johnson. 'Introduction,' *The Prose Poem: An International Journal*, Vol. 1, Providence: Providence College Press, 1992. p. 2.

৬. অরুণ মিত্রের বই *উৎসের দিকে* (১৯৫৪), সৈয়দ আলি আহসানের বই *উচ্চারণ* (১৯৬৮) — উভয়টিতেই পদ্যকাঠামোর কবিতার পাশাপাশি টানা গদ্যকবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। এছাড়া, আবদুল মান্নান সৈয়দের বই *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* (১৯৬৭)-এ টানা গদ্যকবিতাই মুখ্য। কিন্তু এর সঙ্গে আছে ছন্দে লেখা কয়েকটি কবিতা।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *পুনশ্চ*, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-৮, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০১১, পৃ. ২৩১।

৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'ছন্দমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, সম্পা. অমিয় দেব, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃ. ২৫১।

৯. *http://www.britannica.com/EBchecked/topic/421030/Novalis* [Accessed: 07/12/2014]

১০. উদ্ধৃত : Fabienne Moore, *Prose poems of the French Enlightenment : delimiting genre*, Farnham: Ashgate, 2009, p.1.

১১. কবি শেলি বলেছিলেন, 'The King James Bible...was a triumph of prose as a vehicle for 'astonishing' [English-language] poetry.' উদ্ধৃত : Sarah Manguso, 'The Fallacy of Prose Poetry: an Extension of Eliot's 'Reflections on Vers Libre'. *http://www.poets.org/poetsorg/text/fallacy-prose-poetry-extension-eliotsreflections-vers-libre*

১২. Morton Marcus, 'Essay: The *Fu*: China And The Origins Of The Prose Poem,' *The Prose Poem: An International Journal*, Vol. 8, Article 64. 1999. *http://digitalcommons.providence.edu/prosepoem/vol8/iss1/64* [Accessed: 07/02/2013]

১৩. M. Krishnamachariar, *History of Classical Sanskrit Literature*, Third Edition Reprint, Delhi : Motilal Banarsidass, 1989, p. 436.

১৪. গৌতম পাল, 'দু'চার কথা', *শার্ল বোদল্যারের লিপিকা প্যারিস স্প্লীন*, অনু. গৌতম পাল, কলকাতা : আনন্দ, ২০১০, পৃষ্ঠাঙ্কন নেই।

১৫. পূর্বোক্ত।

১৬. তাঁর টানা গদ্যকবিতাটির নাম *Hysteria* এবং এটি বেরিয়েছিল ১৯১৫ সালে এজরা পাউন্ড সম্পাদিত ক্যাথলিক অ্যান্থলজিতে। কবিতাটি এখানেও পাওয়া যাবে : *http://www.poetryfoundation.org/poem/173475*. [Accessed: 07/12/2014]

১৭. দ্রষ্টব্য : *http://en.wikipedia.org/wiki/Prose_poetry*. [Accessed: 07/12/2014]

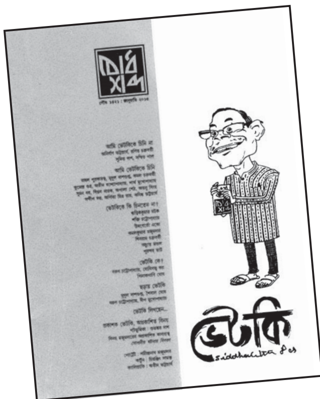
১৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক (বিজ্ঞাপন),' বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পা. যোগেশচন্দ্র বাগল, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৪১৭, পৃ. ৯৬৪।

১৯. মুদ্রণবিন্যাসের কারণে কবিতা ঐতিহ্যগতভাবে দেখে চেনা যায়, কিন্তু কবিতার ইতিহাসে এমন চর্চাও অনেক মিলবে যেখানে মুদ্রণবিন্যাসের বিশেষত্ব কবিতাকে ছবি বা চিত্র করে তুলেছিল। এ-ধরনের কবিতা ভিজুয়াল পোয়েট্রি বা চিত্রিত কবিতা বলে অভিহিত হতে পারে। ফরাসি কবি গিয়োম আপলিনের (Guillaume Apollinaire) ১৯১৮ সালে *Calligramme* (এর উপ-শিরোনাম ছিল 'যুদ্ধ ও শান্তির কবিতা ১৯১৩-১৯১৬') নামে কবিতার যে-বই প্রকাশ করেছিলেন, তাতে শব্দ ও বর্ণবিন্যাস এমন ছিল যাতে বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ের নকশা ফুটে উঠেছিল। কবিতার বিষয়বস্তুকে আরও গ্রাহ্য করি তুলতে শব্দ-বর্ণে চিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : *http://en.wikipedia.org/wiki/Calligrammes*। এছাড়া, আমরা স্মরণ করতে পারি সৈয়দ শামসুল হক রচিত *গেরিলা* কবিতাটি, যেখানে মুদ্রণকৌশলে কবিতাটি দৃশ্যত একজন গেরিলার আকার গ্রহণ করেছিল।

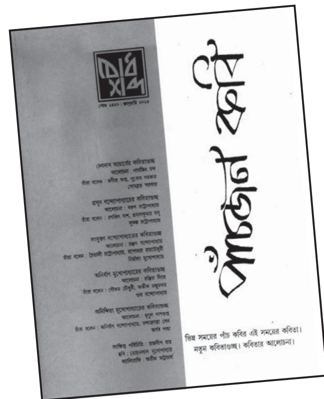
২০. Denise-Levertov, 'On the Function of the Line,' *http://www.everypoet.org/pffa/showthread.php?31654-Denise-Levertov-quot-On-the-Function-of-the-Line-quot&s=* [Accessed: 13/03/2013]

২১. সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, ‘উষাসূক্ত ১’, *আমাকে ধারণ করো অগ্নিপুচ্ছ মেঘ*, ঢাকা : আদর্শ, ২০১৩, পৃ. ৫৭।
২২. ভাস্কর চক্রবর্তী, ‘লেখো,’ *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮।
২৩. দ্রষ্টব্য : অরুণ মিত্র, ‘কবিতা, আমি ও আমরা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।
২৪. Prudence P. Byers, ‘The Contribution of Intonation to the Rhythm and Melody of Non-Metrical English Poetry,’ Ph.D. diss., Univ. of Wisconsin-Milwaukee 1977, p. 31. উদ্ধৃত : Robert Alexander. ‘Prose/Poetry.’ *The PartyTrain: A Collection of North American Prose Poetry*, ed. Robert Alexander, Mark Vinz, and C. W. Truesdale, Minneapolis: New Rivers Press, 1996, p. xxv-xxxiii.
২৫. অরুণ মিত্র, পূর্বোক্ত।
২৬. William Wordsworth, ‘Preface to Lyrical Ballads’, *Norton Anthology of English Literature*, 8th Edition, Ed. Stephen Greenblatt & MH Abrams. New York: W. W. Norton & Company, 2006, p. 268.
২৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, ‘অশোককানন’, *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*, ঢাকা : ধ্রুপদ, ১৯৬৭, পৃ. ৯।
২৮. সিকদার আমিনুল হক, ‘নতুন প্রেম’, *বাতাসের সঙ্গে আলাপ*, ঢাকা : আজকাল, ১৯৯৭।
২৯. উৎপলকুমার বসু, ‘সই লুডো খেলা’, *কবিতা সংগ্রহ*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ১৩৬।
৩০. ‘বাংলায় rythmic prose নেই। এক সময় আমি rythmic prose রচনার চেষ্টা করেছি। লিপিকাতে সে rythm ধরতে পারবে।’ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘ছন্দ বিচার প্রথম পর্যায়’, *ছন্দ*, ঢাকা : আজকাল, ২০০২, পৃ. ১২৬।
৩১. দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘গদ্যকাব্যের ছন্দপ্রকৃতি প্রথম পর্যায়’, *ছন্দ*, পৃ. ২৩২।
৩২. Charles Simic, ‘A Long Course in Miracles, ’ In Peter Johnson. *Pretty Happy!* Fredonia: White Pine Press, 1997, p. 15.
৩৩. Brooke Horvath. “Why the Prose Poem?’ *Denver Quarterly* 25. 1991. pp. : 111-12.
৩৪. Henri Meschonnic, *Critique du rythme: anthropologie historique du langage*, Paris: Verdier, 1982, p. 21. Cited in Marjorie Perloff. ‘After Free Verse: The New Non-Linear Poetries.’ p. 145.

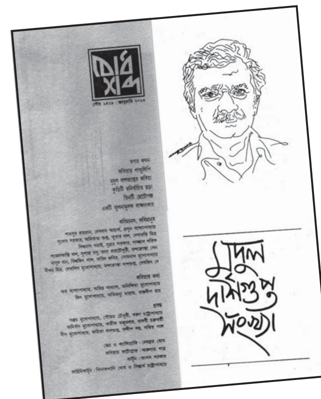




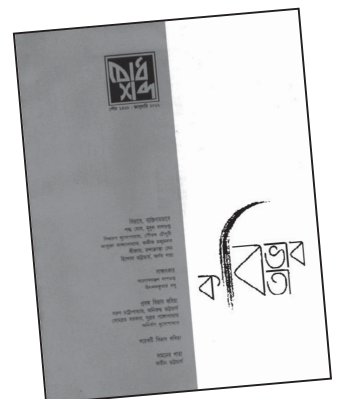
ভেটকি
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৫



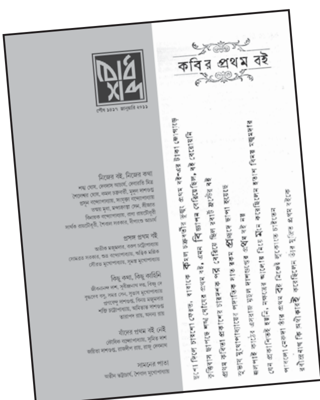
পাঁচজন কবি
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৪



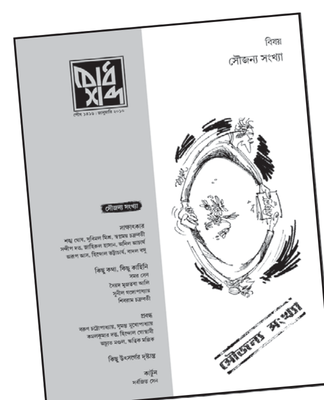
মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৩



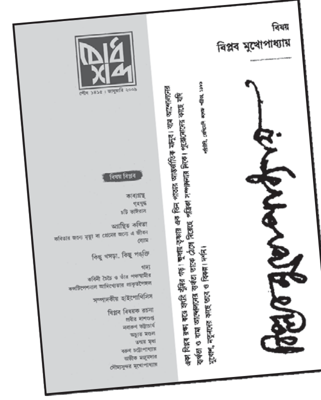
বিভাব কবিতা
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১২



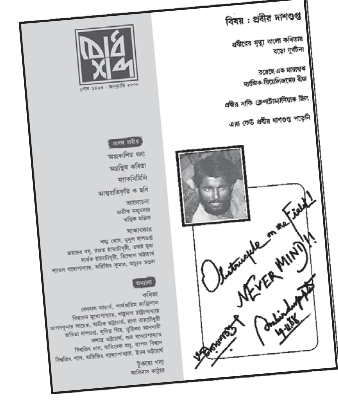
কবির প্রথম বই
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১১



সৌজন্য সংখ্যা
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১০



কবি বিপ্লব মুখোপাধ্যায়
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৯



কবি প্রবীর দাশগুপ্ত
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৮

আঁখি আখর অবয়ব : অরসিকের কবিতাপাঠ

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি অধিবেশনে তাঁর সংগৃহীত একটি তান্ত্রিক কৌলমার্গ বিষয়ক খণ্ডিত পুথির বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন প্রিয়রঞ্জন সেন।[১]

> সাধক-রঞ্জনের লিখন-রীতি ইহা হইতে ভিন্ন — সাধক-রঞ্জন উভয় পৃষ্ঠে লেখা; আর এটী এক পৃষ্ঠে। সাধক-রঞ্জনের প্রতি পৃষ্ঠায় ৬-৭ পঙ্‌ক্তি ধরিয়াছে, ইহার পৃষ্ঠা-প্রতি ৯-১০ পঙ্‌ক্তি দেখিতে পাইতেছি। সাধক-রঞ্জনে মোট প্রায় ৮০০ পঙ্‌ক্তি বা ৪০০ শ্লোক — ত্রিপদীকে তিনের স্থলে এক পঙ্‌ক্তি ধরিয়া; ইহাতে আছে প্রায় ২০০ পঙ্‌ক্তি।

বাংলা পুথি সংগ্রহ বিশারদেরা আবিষ্কৃত পুথির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার একটা নিজস্ব কানুন গড়ে নিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক মানক বিষয়ে নিরুপায়ভাবে অজ্ঞ প্রবীণজনকৃত সেই কানুন সাদাসিধে এবং কার্যকর। এককেটি পুথি আগাপাশতলা যথাসাধ্য অনুপুঙ্খসহ বর্ণনা করাই মোটের উপর রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল — যে পদ্ধতিকে সচরাচর আমরা বলে থাকি 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্'। আন্তর্জাতিক পুথিসংগ্রহবিদ্যা সম্পর্কে অবহিত হলেও অবশ্য প্রিয়রঞ্জন পরিষৎ পত্রিকায় সাবেক রীতিই, অর্থাৎ 'যা দেখি তা লিখি' পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন — অন্তত এ-ক্ষেত্রে তো বটেই। কৌলমার্গের অন্য একটি পুথির সঙ্গে প্রতিতুলনায় পৃষ্ঠাপ্রতি পঙ্‌ক্তির হিসেব দেওয়ার সময় 'ত্রিপদীকে তিনের স্থলে এক পঙ্‌ক্তি ধরিয়া' হিসেব করেছেন তিনি। যদি একেই আমরা আপাতত সাবেক রীতি বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে তদ্দ্যোতাবেক ত্রিপদীর তিন পঙ্‌ক্তিকে এক পঙ্‌ক্তি ধরে নিলেন প্রিয়রঞ্জন। পরিষদের পত্রিকায় যখন তাঁর বক্তৃতা ছাপা হল, তখন কোনো আলোকচিত্র বা নকশা ছাপা হয়নি। তবে পুথি নিয়ে নাড়াচাড়া করা এবং ত্রিপদী সম্পর্কে অবহিত পাঠকজন অবশ্য ব্যাপারটি আন্দাজ করে নিতে পারবেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠবেই। ত্রিপদীর অধোত্রিভুজসদৃশ ঢং তো এই বিন্যাসে হারিয়ে গেল। অনেক ক্ষেত্রেই স্বয়ং কবি এবং লিপিকর উভয়েই পুথি লিখতেন এই রীতিতে — তিনকে এক করে, কিন্তু তাতে কি এক অলক্ষ্য নয়-ছয় ঘটে যেত না? পড়ছি ত্রিপদী, বুঝছি ত্রিপদী, কিন্তু ত্রিপদী তো দেখছি না! কবিও যে না দেখেই পয়ার-ত্রিপদী আরামসে লিখতেন, তার একটি নমুনা পেশে ব্যাপারটি সাফ হবে।[২] *মহাভারত*-এর এই পদটি অতিপামরে না জানলেও, আপামর বাঙালি সম্ভবত জানেন —

পুথির লিপিকর এমত লিখলেও, যদি অপটিকনার্ভস্য স্পন্দন আঁচ করি, তাহলে এই বিশ্রুত পয়ার কিন্তু মানসচক্ষু প্রতিভাত সুপরিচিত রূপে ও ভাবে —

> মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
> কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

আরেকটি নজির নিচ্ছি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর জন্মখণ্ড থেকে। প্রথমে পুথিচিত্র, অতঃপর সংগ্রাহক ও সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়ের পাঠ অবলম্বনে ছাপার বিন্যাস[৩] —

> দিনে দিনে বা[৫৭২]ঢ়ে তনু লীলা।
> পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা॥
> দৈবেঁ কৈল কাহ্নু মনে জাণী।
> নপুংসক আইহনের রাণী॥ ৩॥
> দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
> মাঅক বুয়িল আইহনে॥
> বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
> গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥
>
> গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥
>
> আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
> ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে। ল বড়ায়ি॥

এক্ষেত্রে দু-টি একাবলি স্তবকের মাঝে রাগতালের উল্লেখ-সহ টানা অনেকটা অংশ ('আইহনে॥' থেকে 'পদুমার') লিপিকর (অথবা কবি?) ধরিয়ে ফেলেছেন এক পঙ্‌ক্তিতে। জানা নেই, এক্ষেত্রে পাঠে এই বিখণ্ডগুলিতে কোনো অতিনিভৃত যতির আভাস থেকে যেত কিনা। মুদ্রিত হওয়ার পর ভিন্নতর দেখাল এই অংশ, কিন্তু ভিন্ন হল কি? কাশীদাসি ভণিতায় পাঠক অভ্যস্ত। এক পঙ্‌ক্তি, দুই-আড়াই পঙ্‌ক্তি ঠাসা থাকলে তিনি যথাবিধি পয়ারই বুঝবেন। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের অংশটিতে কি কবির বা লিপিকরের অভিপ্রায় তত সহজে বিকলন হতে পারে? 'দেখায়'-এর সঙ্গে 'বোঝায়', 'হয়', বা এর কি একটা বিরোধ সেঁধিয়ে যাচ্ছে না? চোখে দেখার সংস্কার কি আদৌ কবিতার কোনো তর-তম ঘটায়? পয়ার-ত্রিপদীকে যদি টানা গদ্য বা অন্য কোনোরকম দেখায়, তাহলে কি ওই গড়নটা বানচাল হয়ে যায়? বানচাল হয়ে না গেলেও, নিদেনপক্ষে তার কবিত্ব কি প্রভাবিত হয়?

কবিতাকে কবিতার বিষয়ে কে কী বলেন, সে বড়ো ঝকমারির ব্যাপার। কোবিদগণ এ-ব্যাপার বিশদ করার জন্য বহু বাক্য ব্যয় করেছেন, এবং অধিকাংশে বৃথাই ব্যয় করেছেন। এরকম একটা গিঁট-পড়ে-থাকা বিষয় হল, কবিতার ভাব ও রূপ। 'নীরব কবিত্ব ও আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস' রবীন্দ্রনাথের মতে, সাফ বাজে কথা! তাঁর কথায় মৃদু বিরোধের চকিত ছায়া ফেলে প্রমথ চৌধুরী বললেন —

> নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ।
> বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,

তবে যেভাবেই যা-কিছু বলা হোক, আকার পাওয়া যে আবশ্যিক, সে-বিষয়ে ঐকমত্য আছে। কবিতার ভিত্তি রচনা, স্পষ্ট কথায় রূপায়ণ। রচিত এবং লিখিত, রচিত-লিখিত অক্ষরসমবায়কে যখন পাঠ করা হচ্ছে, তখন কবিতা ছাড়াও অনিবার্যভাবে বুদ্ধদেব বসুর দাওয়ায় বসা পূর্বপুরুষদের মতো অলক্ষ্যে কিন্তু শুধু মৃদু কানাকানিমুখরতা নিয়ে নয়, অত্যন্ত প্রবলভাবে — পাঠক এবং লিখিত কবিতার মাঝখানে থাকে লেখা ব্যাপারটি। অর্থাৎ লিখনসূচ, পৃষ্ঠা বা পট, সেই লিখনক্ষেত্রে কবির পামিস্ট্রি — এইসব বাদ দিয়ে থাকে না লিখিত কবিতা। এতদ্ব্যতিরেকে, যখন রচন-লিখন দু-টি স্তরের পর পঠনের আগে মুদ্রণ এসে পড়ে, যা প্রচলিততম প্রকরণ, তখন পাঠক এবং কবির মাঝখানে কবিতার আনুষঙ্গিকের সংখ্যা এবং আনুষঙ্গিকসমূহের অপ্রত্যাশিত এবং অনিয়ন্ত্রিত উপস্থিতি প্রায় নিরসনের অতীত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, জানেনও কবিতাকর্তাকর্মীরা অধিকাংশই, কবিতার রচন ও লিখন নিয়ে একটা ব্যাসকূট আছে। রচিত হয়ে লিখিত হয়, নাকি লিখনটাই রচনা — এইসব দ্বিধা অবচেতনে সম্ভোগ করতে-করতেই — কখনো ঈষৎ চেতনে তুলে এনে ওম নিতে-নিতে — পঠন চলে।

দেখে-দেখে না লিখলেও, লিখতে-লিখতে, অর্থাৎ রচনা করতে-করতে, ঘটমানতায় কবিও কবিতাটিকে দেখেন — নেহাতই অত্যুন্মাদনায় থরথর তুরীয় দশায় না পৌঁছে গেলে, ওই অতিগৌণ দেখাটা রচনাকে কোথাও ঝাপটা মারে। তাতে মূল সৃজনকাণ্ড না টললেও, খানিক দোলে। লিখতে গেলে, ইদানীং টাইপ করতে গেলে তো দেখতেই হয় — দেখে লিখতে হয়, পড়তে-পড়তে এবং দেখতে-দেখতে লিখতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কবিরা কতটা দেখাতে চান, আর কতটা দেখিয়ে 'ফ্যালেন'! সনেটস্রষ্টা ও সনেটতত্ত্বপ্রাজ্ঞ মোহিতলাল মজুমদারের রচনার একটি নমুনা দিলে কথা এগোতে সুবিধে হবে।

১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭

বিবাহের রাত্রে কোন্ বাসর-ভবনে,
এক রাশি ব্রীড়াহাসি করিলে চয়ন?
নবোঢ়ার লাজদীপ্ত আরক্ত বদনে,
ফুটাবারে মুকুলিত নিমীল নয়ন,
কত চেষ্টা! খোঁপা হতে চাঁপা গেছে খসি,—
কুন্তলের ফুলদানি দিয়াছ ভরিয়া।
সরমভরমময়ী কবির প্রেয়সী,
ছল করি, মান করে পতিরে হেরিয়া,—
পুলকিত, আকুলিত সোহাগ-রভসে,
বুঝেও বোঝেনা তাঁর হৃদয়ের কথা ;
বৈশাখী চুম্বন ফোটে অধর-সরসে,
তবুও ঘোচেনা হায়, বিরহের ব্যথা!
তাই সাধ "গাঁথিছ যে বকুলের মালা,
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা।"

নমুনাটিতে আট ও ছয় মাত্রায় মোট চোদ্দো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত পঙ্‌ক্তিগুলি দৃশ্যত অসমান। বলাই বাহুল্য, কবির অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক অভিপ্রায় ছাড়া এ-নির্মাণ কম্পোজিটারের খেয়ালে হতে পারে না। মোহিতলালের সনেটকীর্তির আলোচনায় অধ্যাপক-গবেষক উত্তমকুমার দাশ খুঁজে পেয়েছিলেন শিল্পায়নের ভাস্কর্যধর্মিতা — অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই —

> কবিশিল্পী হিসেবে মোহিতলালকে বলা যায় ভাষা-ভাস্কর। শিল্পায়নের এই ভাস্কর্যধর্মিতা তাঁকে উৎকৃষ্ট সনেটকারের গুণাবলীতে বিভূষিত করেছে; কেন না সুললিত গীতিকবিতার রাজ্যে সনেট একান্ত ভাবেই ভাস্কর্যধর্মী কলাকৃতি।[৪]

মোহিতলালের ষোলো বছর বয়সের লেখা *দেবেন্দ্র মঙ্গল* সংকলনে ৬ সংখ্যক সনেটটির পঞ্চম পঙ্‌ক্তিটি চোখে দেখলেই স্পষ্ট হয়, 'খসি' শব্দটিকে বন্ধুর দক্ষিণপ্রান্তের মেরুতে স্থাপন করা হয়েছে।

বিবাহের রাত্রে কোন্ বাসর-ভবনে,
এক রাশি ব্রীড়াহাসি করিলে চয়ন?
নবোঢ়ার লাজদীপ্ত আরক্ত বদনে,
ফুটাবারে মুকুলিত নিমীল নয়ন,
কত চেষ্টা! খোঁপা হতে চাঁপা গেছে খসি,—
কুন্তলের ফুলদানি দিয়াছ ভরিয়া।
সরমভরমময়ী কবির প্রেয়সী,
ছল করি, মান করে পতিরে হেরিয়া,—
পুলকিত, আকুলিত সোহাগ-রভসে,
বুঝেও বোঝেনা তাঁর হৃদয়ের কথা ;
বৈশাখী চুম্বন ফোটে অধর-সরসে,
তবুও ঘোচেনা হায়, বিরহের ব্যথা!
তাই সাধ "গাঁথিছ যে বকুলের মালা,
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা।"

এইবার যদি সমগ্র সনেটটির দেহাবয়ব দেখা যায়, তাহলে বোঝা যায়, ক্রমহ্রাসমান এবং ক্রমবর্ধমান দু-টি কৌণিকতার সংঘাতকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত আছে ওই শব্দটি। শব্দের পর দু-টি যতিচিহ্ন ',' ও '—' বাড়তি একটা ঝোঁক দিয়ে অধিকতর প্রলম্বিত করে দিয়েছে পঙ্‌ক্তিটির রেসালট্যান্ট বা লব্ধিবল। কবিতাটির অবয়বকে একটি অখণ্ড ক্ষেত্র ধরে যদি তার পরিসীমা চিহ্নিত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, ওই 'খসে' শব্দটি অনেকটা হারের লকেটের মতো উচ্ছ্রিত হয়ে আছে।

এতক্ষণ একটি শব্দকে এক টুকরো দৃশ্যচূর্ণ হিসেবেই দেখা চলছিল, যেমন দেখা হয়ে থাকে কোনো চিত্রের কম্পোজিশনের অন্তর্গত একটি খণ্ডকে। এবার যদি সনেটটির প্রেক্ষিতে, অর্থময়তার বিচারে দেখা যায় — তাহলে তো মনে হয়, অর্থগতভাবেও একটি করুণ বিচ্ছিন্নতা বহন করে 'খসে' শব্দটি।

মোহিতলালের কাব্যনির্মাণকুশলতা আরও বিস্ময়কর মনে হয় অন্য একটি তথ্য সামনে এলে। এই কবিতাটির শেষ দু-টি পংক্তি তিনি কলন করেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেনেরই, অর্থাৎ যাঁর মাহাত্ম্যবর্ণনাই বিষয়বস্তু মোহিতলালের এই প্রথম কাব্যসংকলনের, তাঁর কবিতা থেকে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের *অশোকগুচ্ছ* কাব্যগ্রন্থের *আমি* কবিতাটির শেষ দুই পঙ্‌ক্তি হল —

> চিকনিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা, —
> আমারেও ওইসাথে গেঁথে ফেল বালা!

এই সনেট রচনার সময় কীভাবে ব্যূহ সাজাচ্ছিলেন ষোলো বছরের কিশোর মোহিতলাল? কোথা থেকে শুরু করেছিলেন? দেবেন্দ্রনাথ সেনের পঙ্‌ক্তি দু-টি রাখার কথা কি গোড়া থেকেই ভাবছিলেন? তাহলে তো তাঁকে ভাবতে হয়েছিল কবিতার চোখে-পড়া শরীরটা নিয়েও। এটা আদৌ প্যাটার্নকুশলতা নয়, তার চেয়ে অনেক জটিল এক নির্মাণ। কী ছিল তাঁর অগ্রাধিকার? অর্থ, সনেট-কানুন, অন্ত্যমিলস্পন্দ না দৃশ্যরূপ?

২

মন্ত্রকে কোন গোপন প্রকরণে জাগাতে হয়, তা শুধু গুণিনই জানেন বটে, কিন্তু সেই মন্ত্র যখন অতিপ্রাকৃতের দীক্ষাহীন কোনো গবেষক সংগ্রহ করতে চান, তাঁকে

টেপরেকর্ডার ব্যবহার করতে হয় এবং তারপর হয়তো মন্ত্রবিভূতিহীন হয়ে-পড়া সেই ধ্বনিসমবায়কে অক্ষর দিয়েই লিপিবদ্ধ করতে হয়। এর মধ্যে টেপরেকর্ডার যন্ত্রটিকে বাদ দিয়েও যে কাজ হয়, তার প্রমাণ বেদ ও বেদোত্তর শ্রুতি ঐতিহ্যের লিখনরূপ। লিপিকে আশ্রয় করে স্মরণীয় হওয়ার আগে বহুকাল বেদের একাংশ, একটা বড়ো অংশই বেঁচে ছিল লোকমুখে, অপৌরুষেয় বাণী লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে বিধিনিষেধও কম ছিল না। মহাভারতকার অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম মারফত যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েই দিয়েছিলেন, যারা অর্থের বিনিময়ে বেদ লেখে, 'বেদানাং লেখকাশ্চৈব', তারা 'নিরয়গামিনঃ', নরকে যায়। মানুষের একটা বড়ো অংশ কোনোকালেই নরকের ভয়ে টসকায়নি বলেই অনেক কাজের কাজ হয়েছে — অপৌরুষেয়কে অক্ষরে বেঁধে ফেলাও তার মধ্যে একটা। কয়েক দশক আগেও বাদাবনের গুণিনরা, গবেষককে মন্ত্র লিখে নেওয়ার সময় বাধা দিয়েছেন, শাপশাপান্ত করেছেন।

কিন্তু সুভাষ মিস্ত্রীর মতো কোনো-কোনো নাছোড়বান্দা হাল ছাড়েন না। এই গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক বাদাবনের গুণিনদের কাছ থেকে মন্ত্র সংগ্রহ করার পর কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলেন সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে তোলার সময়। হয়তো নিজের সচেতন অভিপ্রায়ের অতীত স্বতঃস্ফূর্ত কোনো পর্যবেক্ষণে বার বার খেয়াল করে ফেলছিলেন উচ্চারিত মন্ত্র, শ্রুত মন্ত্র ও মন্ত্রের লিখিত রূপের আন্তঃক্রিয়া। সংগৃহীত শ্রুতিকে অক্ষররূপ দেওয়ার সময় তাই তাঁকে অনেক কথাই বলতে হচ্ছিল যতিচিহ্ন-পঙ্‌ক্তি-স্তবক ইত্যাদি নিয়ে —

> গদ্যে রচিত বাংলা লৌকিক মন্ত্রগুলি যথেষ্ট অভিনবত্বের দাবি রাখে। কিছু মন্ত্রে কমা, পূর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি যতি চিহ্নের ব্যবহার আছে, আবার কিছু মন্ত্রে এ-সবের কোনো বালাই নেই। ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল নগেন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলেন — বেদ-পুরাণ ইত্যাদি গদ্য-পদ্য উভয় ভাবেই রচিত। ওখানে অবশ্য কমা, পূর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি আছে। প্রাচীন ভূর্জ্জপত্র, পুঁথি, পাঁচালি মুনি-ঋষিগণ যেভাবে লিখতেন আমাদের মন্ত্রবিদ্‌রাও সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। তাঁদের কথা হলো — আগে শ্রুতি, তারপর স্মৃতি, অবশেষে লেখনী। অপরদিকে মন্ত্র এক দমে বা নিশ্বাসে সম্পূর্ণ করবার বিধি-নিয়ম গুণিন সমাজে প্রচলিত। এতে নিজেদের প্রভাব অন্যের কাছে আরও প্রকট হয়। তাঁদের মতে — দম ফেলে ফেলে বা নিশ্বাস ছেড়ে মন্ত্র বলার নিয়ম অনেক সময় চলে না। এরকম করলে মন্ত্রের 'বাঁধন' ছিন্ন হয়, নষ্ট হয় যাবতীয় আট ঘাট। তাই 'আজ্ঞে'-'কালাম'-'তালাক'-'দহাই' দেবার সময় গুণিনগণ দীর্ঘ 'ফুঁ' দেন। এবং তখনই দম বা নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ হয়। এইসব বিধি-বিধানের জন্যই কমা, পূর্ণচ্ছেদ দেবার নিয়ম পূর্বেকার মন্ত্রে ছিল না, ছিল না ছন্দের মিল। এখন সবই হচ্ছে। কেউ কেউ মন্ত্র সংস্কার করে মিল-ঝিল, কমা-পূর্ণচ্ছেদ বসাচ্ছেন। আমরাও মন্ত্র চিকিৎসকদের মন্ত্র উচ্চারণের সময় দেখেছি, তাঁরা একটির পর একটি টানা মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন — কি পদ্য-ছন্দের মন্ত্র কি গদ্যে লেখা মন্ত্র — থামবার অবকাশ না নিয়েই। নিছক গদ্যে রচিত মন্ত্র সংখ্যায় খুবই অল্প। এগুলি সম্ভবত ছড়া রূপ থেকে পরবর্তী কালে গদ্য রূপ পেয়েছে। **অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্র খাতায় লেখবার সময় মন্ত্রের কারবারীরা ছড়া-পয়ার বা অন্য যে কোনো ভাবে লেখা কাব্য-মন্ত্র সবই গদ্যের আদলে লেখেন। এতে এক নিমেষে বা এক নিশ্বাসে মন্ত্র পড়বার সুবিধা হয় বলে গুণিনরা মনে করেন।** এই পদ্ধতির আরও একটা কারণ — মন্ত্র সমূহ অন্যকে না বুঝতে দেওয়া।[৫]
> (বোল্ড হরফ লেখকের)

গুণিনদের খাতায় গদ্যাকারে মন্ত্র লিখে রাখার উদ্দেশ্য যে এক ধরনের সংকেতবর্ম তৈরি করে নেওয়া, সে-ইঙ্গিত সুভাষবাবুর পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু ফুঁ দেওয়া জাতীয় ক্রিয়ার সমতুল্য অক্ষরবিন্যাস কতটা সম্ভব? 'হেঁইয়ো' জাতীয় অনুকারী শব্দের মতো গুণিনকাম্য শ্বাস-প্রশ্বাস আখরের আকারে ধরে রাখার চেষ্টা করা সঙ্গত কি না, তার নিরসন ভাষাতাত্ত্বিকেরা বিচার করতে পারেন। দীক্ষিত তালিব-হাকিমরা কিন্তু চেষ্টার কসুর করেননি। জেনারেল লাইব্রেরি-র বাজার চলতি *বৃহৎ তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড মঞ্জরী*-তে কাগজ-কলম-কালি নিয়ে যে আয়োজন, তা একবার দেখলে ব্যাপারটা আন্দাজ করা যায় —

> ...একবার এইসব যন্ত্রের বর্ণনা করছি, এবং কি ধরনের লেখনী দ্বারা ও কালির সাহায্যে এইসব যন্ত্র আঁকা হবে, সেটা উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধে এখানে তার উল্লেখ করা হলো। যেমন —
>
> ১। **অষ্টগন্ধের কালি** — কেসর, কস্তুরী, অগরু, তগর, গোরোচনা, শ্বেতচন্দন, লালচন্দন এবং সিন্দুর একসঙ্গে মিশিয়ে।
> ২। **পঞ্চগন্ধ** — কেসর, কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন ও গোরোচনা সব মিশিয়ে।
> ৩। **ত্রিগন্ধ** — তিনটি গন্ধ দ্রব্য। যেমন — সিঁদুর, কুমকুম ও হলুদ।
> ৪। **অন্যান্য কালি** — শ্মশানের ছাই, শ্মশানের কয়লা, রক্ত, রস, গাছের আঠা প্রভৃতি।
>
> **কলমের প্রকারভেদ এবং ব্যবহার** — সাধারণ কলম, পেন, পেনসিল, স্কেচ পেন ছাড়াও যন্ত্র অঙ্কনে সোনা, তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্মিত কলম, আম, আকন্দ, অশ্বত্থ, নিম, চামেলী, ডালিম প্রভৃতি বৃক্ষের ডাল বা কাঁটা দ্বারা তৈরী কলম, তাছাড়া পাখীর পালক, যেমন ময়ূর ও প্যাঁচার সাদা বা কালো পালক, কাটা এবং সরকণ্ডের কলম প্রয়োগ করা হয়।
>
> ষট্‌কর্ম অনুসারে কলম ও যথা নির্দিষ্ট কলমগুলি প্রয়োগ করতে হবে। যন্ত্র রচনার সময় কোন না কোনও মন্ত্র অবশ্যই পাঠ করতে হবে ও পাঠ করতে করতে লিখতে হবে। চুপচাপ করে লেখা মন্ত্র অল্প ফলপ্রদ হয়ে থাকে।
> (ক) সর্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য চামেলী ফুলের গাছের কলম ব্যবহার করবেন।
> (খ) স্তম্ভন কার্যের জন্য বটগাছের ডালের কলম প্রয়োগ করতে হবে।
> (গ) বশীকরণ কাজের জন্য কুশের কলম ব্যবহার করবেন।
> (ঘ) আকর্ষণ কার্যের জন্য চামেলী, ডালিম বা জামগাছের শাখার কলম ব্যবহার করবেন।
> (ঙ) ভূত-প্রেত নিবারণের জন্য অশ্বত্থ শাখার কলম ব্যবহার করবেন।
> (চ) শুভ কার্যের জন্য রূপা বা সোনার কলম ব্যবহার করবেন।
> (ছ) শত্রু নাশের জন্য (মারণাদি) কার্যের জন্য লোহার, হাড়ের অথবা নিম গাছের ডালের কলম ব্যবহার করবেন।
>
> **যন্ত্র রচনার জন্য কাগজ পত্রাদি** — সাধারণ কাগজ, ভুর্জপত্র, তামা, সোনা, রূপা, অষ্টধাতু এবং শ্মশানের বস্ত্রাদির প্রয়োগ যন্ত্র লেখার জন্য দরকার হয়ে থাকে। কোনও যন্ত্র আবার গাধা, ঘোড়া, উট, বাঘ ইত্যাদির চামড়ার ওপর লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু সব চেয়ে সহজসাধ্য হলো শুদ্ধ কাগজ এবং ভুর্জপত্রের ব্যবহার।

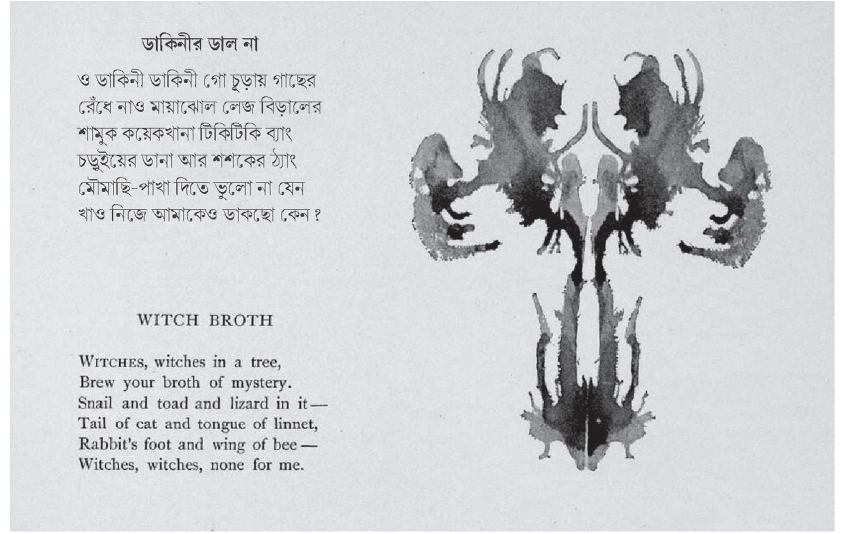
এ-সবই হয়তো নেহাত আনুষ্ঠানিক, তবে অঘটনঘটনপটু হওয়ার সাধে অনেকেই মন্ত্রসিদ্ধ হওয়ার সাধনা করে, গুণিন এবং কবিও।

৩

এলোপাথাড়ি কালির দাগে সৃষ্ট দৃশ্যখণ্ড নির্ভর একটি মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়নের পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন জার্মান-সুইস মনোবিদ হেরম্যান রোড়শাক। তাঁর নামানুগ পরিচয়েই 'রোড়শাক নিরীক্ষা' (Rorschach Test) নামে বিখ্যাত এই মনোনিরীক্ষায় এক-একটি ছবি দেখিয়ে নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়ে থাকে। পদ্ধতিটা মোটের উপর বেশ সাদামাটা। কাগজের উপর পড়ে যাওয়া বা ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলা কালি শুকোনোর আগে কাগজটিকে পর পর ভাঁজ করে ওই কালির দাগের বেশ কয়েকটি আয়না-প্রতিছাপ তৈরি করে নেওয়া হয়। এই জাতীয় কয়েকটি প্রতিসম ছবি পর পর দেখিয়ে মনোনিরীক্ষক তাঁর সাবজেক্ট, অর্থাৎ পরীক্ষাধীন ব্যক্তির কাছে জানতে চান, ওই বিমূর্ত ছবির মধ্যে সে কোনো পরিচিত অবয়ব দেখতে পেল কি না। ছোপগুলির মধ্যে অনেকরকম অবয়ব লুকিয়ে থাকে। ব্যক্তিভেদে চিহ্নিতকরণের আগাপাশতলা পালটে যায়। কেউ দেখে প্রজাপতি, কেউ ডাকিনী। এই পন্থায় বিশ্বাসী পেশাদাররা মনে করেন, এই ছবির মধ্যে কে কী দেখছে, তার সঙ্গে তার মানসিক অবস্থা বা বৈশিষ্ট্যের একটা যোগাযোগ আছে। মোট দশটি ছবির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের বিচারে সর্বাধিক কয়েকটি উত্তর পাওয়া গেছে, যেগুলি মোটিফ বা ধ্রুবপটের মতো ফিরে-ফিরে আসে।

গত শতকের দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় দশকে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল। অবশ্য এ-নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল অনেককাল আগেই।

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত *Gobolinks or Shadow Pictures for Young and Old* বই-এ এই ছবি-নিরীক্ষার আইডিয়া অনেকটাই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 'গবলিংক' (Gobolinks) কথাটির অর্থ : গবলিন + ইংক, অর্থাৎ, কালির বোতলবন্দি বিশ্বাসযোগ্য ভূত। কালির দাগ থেকে প্রাণিত হয়ে পদ্য লেখার প্রণালী উদ্ভাবনের একটা পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন বইটির নির্মাতা রুথ স্টুয়ার্ট আর অ্যালফ্রেড পেইন। 'এ-নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল' কথাটির অর্থ এই বই-এ কয়েকটি কালির ছোপের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ছোটো পদ্য, কখনো-কখনো হাইকু বা লিমেরিক। আসল বিষয় ছিল ছবিটাই, পদ্যটা নয়। অর্থাৎ, এই বইতে ইলাস্ট্রেশন ছিল না। আদতে ছিল ঠিক উলটো — বলা যেতে পারে, পদ্য ছিল ছবির সহায়ক। পাশের নমুনা থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে পারে।



ডাকিনীর ডাল না

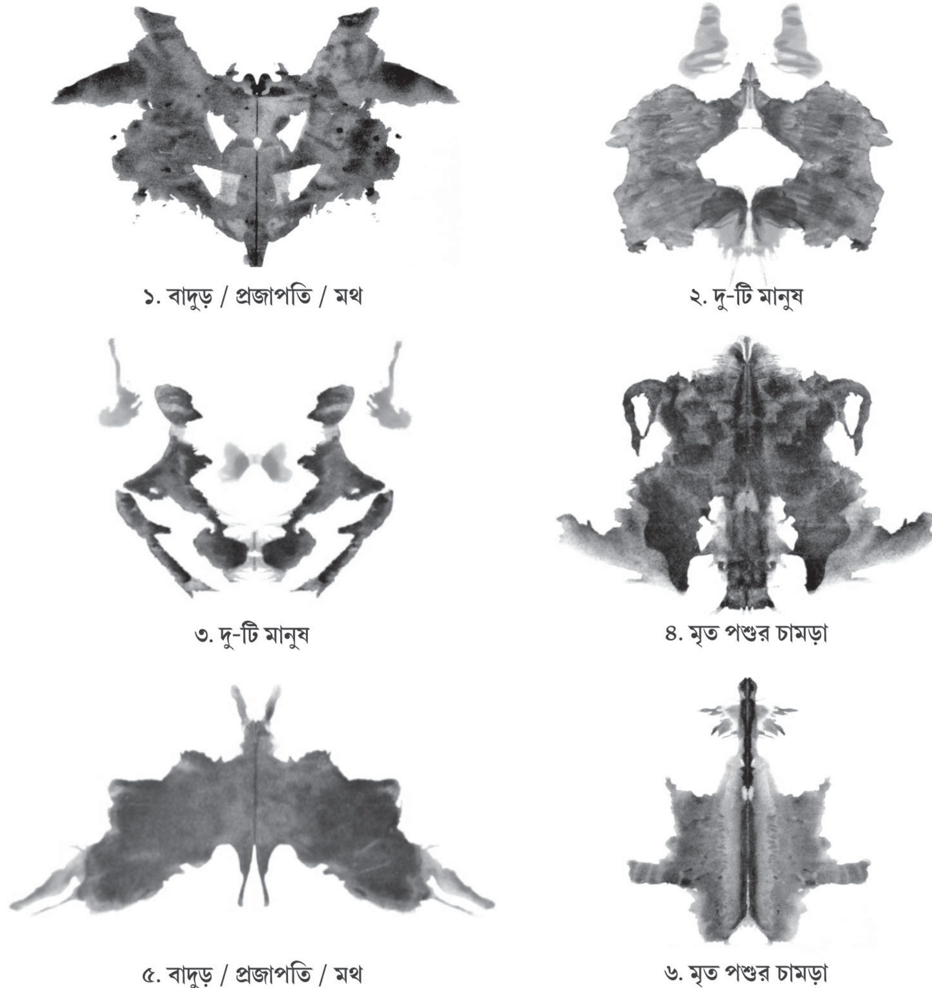
ও ডাকিনী ডাকিনী গো চূড়ায় গাছের
রেঁধে নাও মায়াঝোল লেজ বিড়ালের
শামুক কয়েকখানা টিকিটিকি ব্যাং
চড়ুইয়ের ডানা আর শশকের ঠ্যাং
মৌমাছি-পাখা দিতে ভুলো না যেন
খাও নিজে আমাকেও ডাকছো কেন?

WITCH BROTH

WITCHES, witches in a tree,
Brew your broth of mystery.
Snail and toad and lizard in it—
Tail of cat and tongue of linnet,
Rabbit's foot and wing of bee—
Witches, witches, none for me.

Gobolinks or Shadow Pictures for Young and Old বই-এর একটি পাতা (অনুবাদ লেখকের)

ডাকিনীর ঝোলের মতোই এই ছবির মধ্যে বহুবিধ বিদঘুটে ছবির ভজকট ঘণ্ট হয়ে আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ছবিতে কি সকলেই ডাইনিবুড়ি দেখতে পাবে? যিনি ছাপটা বেছে নিয়েছেন, তিনি কি আদৌ সচেতনভাবে ডাইনির ছবি রাখতে চেয়েছিলেন? এই জাতীয় চিত্রল-পাজল ব্যবহার করা হয়ে থাকে রোড়শাক নিরীক্ষায়। অনেক রদবদলের পর এই নিরীক্ষায় সর্বমান্য মানক বা স্ট্যান্ডার্ডাইজড দশটি ছবি ব্যবহার করা হয়ে থাকে —



১. বাদুড় / প্রজাপতি / মথ

২. দু-টি মানুষ

৩. দু-টি মানুষ

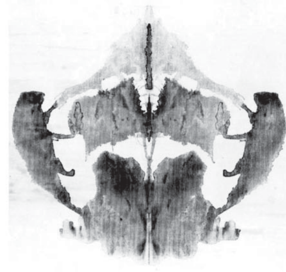
৪. মৃত পশুর চামড়া

৫. বাদুড় / প্রজাপতি / মথ

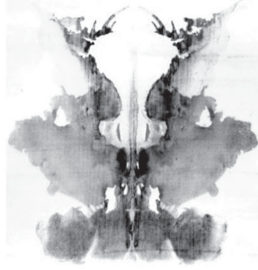
৬. মৃত পশুর চামড়া



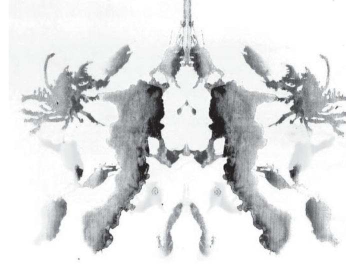
৭. মানুষের মুখ



৮. কুকুর ও বিড়াল ব্যতিরেকে অন্য অচেনা প্রাণী



৯. মানুষ (উত্তরের সর্বাধিক ঐকমত্য)

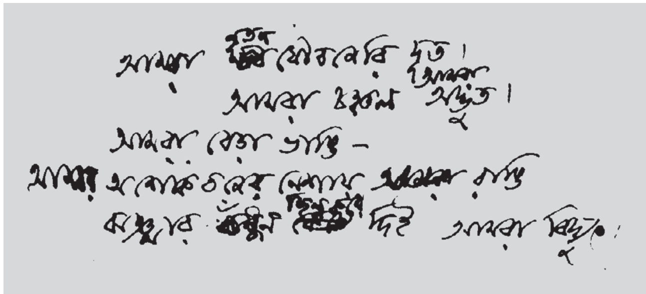


১০. কাঁকড়া, চিংড়ি, মাকড়সা

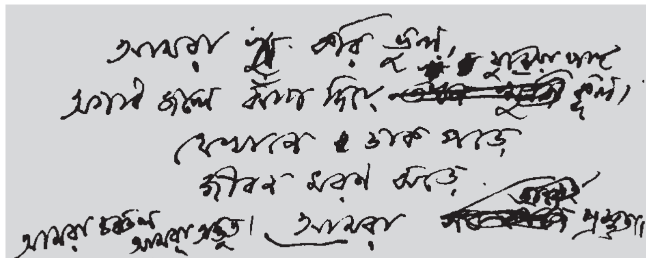
রোড়শাক নিরীক্ষায় ব্যবহৃত দশটি ছবি (আগের পাতা সহ)

এই ছবিগুলো পর পর দেখানোর সময় যে কত বিচিত্র উত্তর বেরিয়ে এসেছে, তা অকল্পনীয়। এইসব গৌরচন্দ্রিকার পর বলতে চাই, লেখা কবিতা বা ছাপা কবিতার যে বাহ্যিক চেহারা, যে জ্যামিতিকতা, তা কতটা সংশ্লিষ্ট কবিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আদৌ কি এই জাতীয় সঙ্গতি কবির ঈপ্সিত কিছু? মোহিতলালের উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, কবিকুল এ-বিষয়ে উদাসীন তো ননই, বরং রীতিমতো খুঁতখুঁতে। মোহিতলালের কবিতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলে হয়তো তাঁর বুননপ্রণালীর সামগ্রিকতা স্পষ্টতর হত, কিন্তু সেরকম কিছু হাতে পাওয়া মুশকিল। অতএব অগতির গতি সেই রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে অবশ্য অগতির গতি বলাটা অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে কবিতার উথালপাথাল রূপ-রূপান্তর এবং সেই পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপা কবিতার চূড়ান্ত রূপ — এইসব আন্তঃক্রিয়া বিস্ফোরক, অতুলনীয়। শুধু একটি নমুনা দিতে চাই।

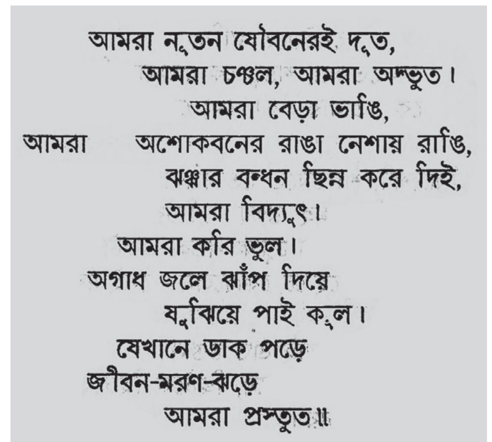
'নূতন যৌবনেরই দূত' এবং 'আমরা চিত্র অতি বিচিত্র' — *তাসের দেশ*-এর এই দু-টি গান দুই মেরুর চিহ্ন, চরম বৈপরীত্যের প্রতিনিধি। দু-টি পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত রূপে এই দু-টি গানের বহিরাবয়ব বা জ্যামিতিক অবয়বের প্রতিতুলনায় কবিতার চোখে-দেখা ব্যাপারটা বোধ হয় উপসংহারের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে দিতে পারে। বিশ্বভারতী লেখ্যাগারের 9A এবং 96(i) সংখ্যক খাতায় *তাসের দেশ*-এর দু-টি খসড়া পাণ্ডুলিপিতেঁ দু-টি গানের দু-টি লিখিত রূপ আছে। এই *তাসের দেশ*-এর রাজপুত্রের অতিপরিচিত গানটির লিখনরূপ এবং তার মুদ্রিত একটি রূপ (*রবীন্দ্র রচনাবলী*, শতবার্ষিকী সংস্করণ) পাশাপাশি রাখা হল প্রতিতুলনার জন্য, তার ভিত্তিতে কয়েকটি কথা বলতে চাই।



পাণ্ডুলিপিচিত্র : 9A



পাণ্ডুলিপিচিত্র : 9A (পৃষ্ঠান্তর)



আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,
আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভুল।
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত।।

রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিকী সংস্করণ)

পাণ্ডুলিপিচিত্র : 9A

পাণ্ডুলিপিচিত্র : 96(i)

আমরা চিত্র অতি বিচিত্র,
অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র।
আমাদের যুদ্ধ নহে কেহ ক্রুদ্ধ।
ওই দেখো গোলাম অতিশয় মোলাম।
নাহি কোনো অস্ত্র খাকি-রাঙা বস্ত্র।
নাহি লোভ, নাহি ক্ষোভ।
নাহি লাফ, নাহি ঝাঁপ।
যথারীতি জানি, সেই মতে মানি।
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র।
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা॥

রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিকী সংস্করণ)

রাজপুত্রের গান 'নূতন যৌবনেরই দূত' এবং তাসফৌজের 'আমরা চিত্র অতি বিচিত্র' — এই দু-টি গানের মধ্যে যদি কেউ না ঢোকেন, যদি গান হিসেবে না শোনেন — শুধু দেখেন খুঁটিয়ে — একটিতে অনিয়মের হিল্লোল, অপরটিতে গথিক থামের নিষ্প্রাণ স্থবির পাথুরেপনা — একভাবে, অক্ষরবিন্যাসের দৃশ্যেও কিন্তু অর্থের মেরুকরণ সমর্থন পায়। অবয়বে আত্মার সমর্থন আছে বলে মনে হয়।

একাধিক স্তরের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য দিয়ে বোনা হয়েছে *তাসের দেশ*-এর নাট্যবিন্যাস। মোটা কথায়, *তাসের দেশ*-এর হিমায়িত স্থিতি এবং আতপ্ত জঙ্গমতা আছে এই নাট্যনকশার দুই মেরুতে এবং এ-দুটোর মধ্যে — এই স্থিতি ও গতির মধ্যে সারাক্ষণ ঠোকাঠুকি চলছে। ধাক্কাটা বাইরে থেকে নিয়ে এসেছে নবীনাসন্ধানী রাজপুত্র। এবং এসে ধাক্কা খেয়েছে তাসবংশীয়দের অতলান্ত স্থৈর্যে। এই নৃত্যনাট্য-গীতিনাট্য বা অপেরা — প্রকরণ এখানে অবান্তর বলে তা-নিয়ে বাগ্‌বিস্তার বৃথা। এর আড়ালে 'একটা আষাঢ়ে গল্প' নামের একটা গল্পও ছিল। পালাগোত্রের, অর্থাৎ, পারফরমেন্সের আকরের ছাঁচ পাওয়ার পর একাধিকবার লিখতে হয়েছে এর খসড়া। একাধিক খসড়া পাণ্ডুলিপিতে নানারকম বদল ঘটেছে। এইসব খসড়া থেকে দু-টি গান, গাওয়ার আগে ভাষারচিত দু-টি কবিতা বেছে নেওয়া হয়েছে লিখনক্ষেত্রের পাতা-কালিতে তৈরি নকশার তুলনার জন্য। 'আমরা

চিত্র অতি বিচিত্র' কোরাস গানের জবাবে রাজপুত্র চাপান গান হিসেবে গেয়েছে 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত'। তাসের দলের গান অত্যন্ত সচেতন মনোটনি ঠাসে বাঁধা। কোরাস, অর্থাৎ, সমস্বর হলেও ওঠা-নামা নেই, একইরকম। রচনাটি সম্পাদকীয় স্তম্ভের মতো অনড়। পরে, বিশ্বভারতীর শতবার্ষিকী সংস্করণে, এটিকে ভাঙা হয়েছে জোড়া কলামে। অনড়তাকে অনড়তর করার প্রয়াসেই হয়তো। বিপরীতে রাজপুত্রের গানে চৌহদ্দিটা এলোমেলো। বিষমতায় বন্ধুর — তবে চকিত অন্ত্যমিলে ছন্দিত বলে, এক অর্থে বাঁধা তো বটেই। লেখার প্রায় সব খসড়ায়, এবং ছাপাতেও, এই গোড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো আগাগোড়া আছে — রাখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি-চিত্র 9A-র খসড়ায় এই লিখনটিকে কাটা-ছেঁড়া করা হয়েছে, রান্না চলাকালীন তেল-মশলা এক হয়ে যাওয়ার মতো। এই ক্ষেত্রে যদি আমরা পাণ্ডুলিপির দুই পৃষ্ঠা জুড়ে নিয়ে (আগের ছবি) একটু খুঁটিনাটিতে যাই, তাহলে এই তুলকালামের অনুপুঙ্খ ঠাহর করা যাবে। যেমন, 'অশোকবনের' আগে ঠেলে 'আমরা'-কে যেভাবে নিয়ে আসা। 'যেখানে ডাক পড়ে / জীবন মরণ ঝড়ে' — এই দু-টি পঙ্‌ক্তির সদৃশতাকে যেন ঘষে এলোমেলো করে দেওয়া হল। সঙ্গে-সঙ্গে কি স্বরলিপিটাও তৈরি হয়ে উঠছিল? সে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর, তাসের দলের গান। দ্রষ্টব্য, ওই খাতারই অংশ (আগের ছবি)। অর্থবোধ থামিয়ে, শুধু চোখের দেখা সম্বল করে তাকালেই এই দুটোর ঠোকাঠুকি বোঝা যায়। টানা লেখা — বাজার সরকারের ফর্দ বা মুদির লেজারের মতো। এই দুটোর ঠোকাঠুকি চোখে দেখলেই বোঝা যায়।

চোখ দিয়ে দেখতে না-পাওয়া পাঠকের কাছে কবিতার চেহারাটা কীভাবে প্রতিভাত হয়? সাধারণভাবে এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না খোঁজাই সঙ্গত — কারণ সে-অনুভূতি চক্ষুষ্মানের অবাঙ্মনসগোচর। প্রশ্নটা খানিকটা বৈধতার আওতায় চলে আসে, যখন ব্রেইল বই ব্যবহার করতে দেখা যায়। ব্রেইল বই যখন কেউ ব্যবহার করে, আঙুল দিয়ে পড়ে, তা দেখা যায় বলেই, চক্ষুষ্মান হিসেবে প্রশ্ন জাগে, যিনি এভাবে ছুঁয়ে পড়ছেন, তিনি কি দেখছেন? এবং, তিনি কী দেখছেন? এ-ও হয়তো আগমের মতোই, যা প্রশ্নের বিষয় নয়। কোনো গার্গী এ-প্রশ্ন তুললে হয়তো তাঁকে নিবারিতই করবেন কোনো যাজ্ঞবল্ক্য। তবু এ-প্রশ্ন যত নিবারিতে চাই নিবার না যায়। আঙুল দিয়ে কিছু চিহ্নসমাবেশ এবং কবিতার রসবস্তু — এই দু-এর মাঝে কী ধরনের আবেগ ও সংযোগবর্তনী রয়েছে? এই কৌতূহল নিরাকরণের কোনো প্রয়োজন আছে কি না, তা বলা মুশকিল। চক্ষুষ্মানের ক্ষেত্রেও কবিতার লেখাই-ছাপাই চেহারার সঙ্গে রসবস্তুর ওই সংযোগবর্তনীর সংযোগের স্বরূপ-জিজ্ঞাসার কোনো সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হবে কি?

অক্ষরবিরচিত প্রকরণসমূহের মধ্যে বাচ্যার্থ বা বক্তব্য, এবং বিবরণ বা বিবৃতির প্রতি আনুগত্য সবচেয়ে কম সম্ভবত কবিতার। 'ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন / শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন' — এ-কথা অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে সনেট প্রসঙ্গেই বলেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি 'শিল্পী' শব্দটির সাধারণীকরণ করি, একটু পাক খুলে যদি বলা যায়, চূড়ান্ত স্বাধীনতাভোগী অস্মিতা আছে বলে শিল্পী মাত্রেই কোনো না কোনো বন্ধনের প্রতি অনুরক্ত। কবিতা বাঁধনের দিকে চলেছে না বাঁধনমুক্তির দিকে ধাবমান, তার নিরসন শুদ্ধতর তাত্ত্বিকদের কাজ। আমরা শুধু প্রস্তাবের আকারে বলতে পারি, অক্ষরগুচ্ছ যখন কবিতাপদবাচ্য হয়, দেহধারণ করে, সেই দেহও কবিতার অন্তর্গত কোনো সত্যকে বহিরঙ্গে বহন করে। ব্যাপারটার সঙ্গে রোড়শাক-এর কালির দাগের একটা জায়গায় অন্তত মিল আছে — কবিতার দেহও একাধিক রূপের আভাস দেয়। একই সঙ্গে একাধিক পরস্পর বিরোধিতাকেও হয়তো লালন করে। কিন্তু অসংখ্য ভ্যারিয়েবলের আড়ালে কবিতাশরীরে একটি কনস্ট্যান্ট থেকে যায়। কবি যতক্ষণ না সেই অবয়ব দেখতে পান, ততক্ষণ তিনি অনুমোদন করেন না তাঁর রচনার সমাপ্তি। যেকোনো সফলতাই যেহেতু বিরল, এক্ষেত্রেও খুব কম কবিই তাঁর ধ্যানের অবয়ব খুঁজে পান; যে-ক-জন খুঁজে পান, তার অতি নগণ্য অংশ রূপায়িত করে তোলেন। অন্তত এমনটা হতে পারে। হলেও হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. *কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি*, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, সপ্তত্রিংশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ১২৫), ১৩৩৭। ১৯শে পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

২. পাণ্ডুলিপিচিত্র : EAP759/1/2: Mahabharata [19th century] / EAP759_Mahabharata2_007. tif_L/http://eap.bl.uk/database/overview_item.a4d?catId=258196;r=6334

৩. শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

৪. উত্তমকুমার দাশ, *বাংলা সাহিত্যে সনেট, কবি ও কবিতা*, ১৯৬০, পৃ. ২৯১

৫. সুভাষ মিস্ত্রী, *দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র*, পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃ. ৭০

৬. রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপিচিত্রসমূহ, বিচিত্রা প্রকল্প, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কালি-কলম ও মন : বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে

অনির্বাণ ভট্টাচার্য

'কালি-কলম-মন লেখে তিনজন' — এ আমরা জানি, কিন্তু এই সহযোগের ফল যে-কবিতা তা-তো লেখকের ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপি অথবা খেরোর খাতা। কিন্তু অধুনা পাঠক তো খেরোর খাতা বা পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতা পড়ে না, কিংবা দেওয়াল-লিখন, ভূর্জপত্র বা প্রস্তরফলক থেকে — আমরা কবিতা মূলত পড়ি ছাপার অক্ষরে — ছাপানো কবিতা, যা পাঠকের কাছে পৌঁছোয় মুদ্রণশিল্পী, সম্পাদক, প্রকাশক আর বিক্রেতার মধ্যস্থতায়। কবিতার রসগ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত ভাবতে গেলে তাই এই সলতে পাকানোর বিষয়টাকেও স্মরণ করতে হয় বাধ্যত।

ছাপাছাপির এই গোটা ব্যাপারটা গুটেনবার্গের ছাপার পদ্ধতি বিষয়ক আবিষ্কারের সময়কাল থেকে আজ সমকালে বহুতর জটিল হয়ে উঠেছে, সম্ভাবনা ও পরিধিও বিস্তারিত হয়েছে অনেক — মুদ্রণযন্ত্রের বিবর্তন, সম্পাদক-প্রকাশকের কুশীলতা, বিনিয়োগ-বাণিজ্য এবং অবশ্যই পাঠক / ক্রেতার রুচির হস্তক্ষেপে। হয়তো এক অর্থে, কবিতা ছাপা অবস্থায় এক প্রকারের কমোডিটি — এর মধ্যে কবির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের আর বিশেষ কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না — কবিতা হয়ে যায় পাঠকের, কেননা পাঠক এই কবিতাকে দেখে, শুনে, পড়ে এবং নিজের মতো করে ভেবে পৌঁছোতে পারেন কবির মনোজগতে, মাথার ভিতরে। কিছু তাত্ত্বিক তাই এই পঠনপক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন এক ধরনের হিংস্রতা (aggression) হিসেবে — ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণের একটি চলমান প্রক্রিয়া সাপেক্ষে। আজকের সময়ে যখন পার্সোনাল কম্পিউটার ও বিবিধ সফ্‌টওয়্যারের সহযোগিতায় একা এক ব্যক্তিই একযোগে হয়ে উঠতে পারেন কবি, সম্পাদক এবং প্রকাশক এবং কোনো অতিরিক্ত বিনিয়োগ ছাড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য চালিয়ে যেতে পারেন তাঁর কবিতাপ্রয়াস — তখন ছাপানো কবিতার দৃশ্যরূপ পাঠকের মন ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে কী-এমন বিক্রিয়া করে, যার জন্য এখনও আমরা কবিতার বই বা ম্যাগাজিন বা অন্যসব গ্রন্থিত কবিতা কিনি, পড়ি বা সংগ্রহ করি — তা-নিয়ে সুনির্দিষ্ট কৌতূহল জাগ্রত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বই কী। প্রসঙ্গত, এই বিষয়টি কেবলমাত্র কবিতাপ্রেমী বা কবিতার বাণিজ্য নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁদের পরিসরেই কেবল সীমাবদ্ধ নেই — যাঁরা মানুষের ভাবনাচিন্তার প্রক্রিয়া নিয়ে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে সন্ধিৎসু, অর্থাৎ Cognitive Science এবং মনস্তত্ত্ব, উভয় বিষয়ে আগ্রহীরাও এ-নিয়ে বা এরই আরও প্রসারিত কোনো ফাঁকফোকরকে কাটা-ছেঁড়া করে খুঁজে পেতে চাইছেন কোনো সদুত্তর।

'পহলে দর্শনধারী' এই আপ্তবাক্যের কতটা ছাপানো কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? কবিতার গুণমান বিচার করার ক্ষেত্রে ছাপানো কবিতাটি কেমন দেখায় বা দেখাচ্ছে, সেটা কি আমাদের মননশীলতাকে আদৌ প্রভাবিত করে? এর

মোটাদাগের উত্তর (যদিও বিতর্কসাপেক্ষ) হল : প্রভাবিত করে। যদিও ছাপানোর উৎকর্ষ, পদ্ধতি ও দৃশ্যরূপের সঙ্গে কবিতার অন্তরিন মানের (quality) কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, সম্ভবত খুব ভালো একটি কবিতা খুব খারাপভাবে ছাপা হলেও হয়তো পাঠকের তা একইরকম ভালো লাগবে, কিন্তু সেটা হয়তো তখনই জোর দিয়ে বলা যায়, যখন পাঠকের আগে থেকেই জানা আছে যে এটি একটি 'ভালো' কবিতা বা অমুক বিখ্যাত বা কুখ্যাত কবির লেখা কবিতা। অন্যভাবে ভাবতে গেলে, যদি এটি কোনো অজানা কবির অচেনা কবিতা হয়, তাহলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে খারাপভাবে ছাপা হলে, বা কবিতাটি যদি আপনার চোখে না-লাগে, তাহলে আপনি সেটি আদৌ শেষ পর্যন্ত পড়বেন কি না। এখন ধরা যাক, একটি অত্যন্ত 'বাজে' কবিতা খুব সুচারুভাবে ছাপিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত করা হল, সেক্ষেত্রে সেটি না পড়ে, কেবলমাত্র এক বার দেখেই কি আপনি তাকে 'বাজে' বলে খারিজ করে দিতে পারবেন? এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে এই প্রশ্ন আসে যে এই 'সুচারু'-ভাবে ছাপানোর বিষয়টি কী? এই যে প্রথম দেখার অভিঘাত (impression) তা কী-কী বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়? অবশ্যই এক্ষেত্রে পাঠকই বিচারের কাঠগড়ায় — কেননা গোটা দেখার বিষয়টাই পাঠকের ব্যক্তিগত, শারীরবৃত্ত-রুচি-পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং তিনি কী 'আশা' করছেন (expectation), তার দ্বারা সংজ্ঞায়িত। সুতরাং কবিতার দৃশ্যরূপ শেষাবধি পাঠকের মন ও মগজের দ্বারাই যেহেতু ইন্টারপ্রেট করা হয়, তাই এবার এই দৃশ্যরূপের কী-কী বিভঙ্গ আমাদের মন ও মগজকে প্রভাবিত করে, সেই বিষয়ে আসা যাক।

স্থান-কাল-পাত্র

একটা কবিতা লেখার পর সেটা ছাপা হতে কতটা সময় লাগে? এর সম্ভাব্য উত্তর হল : এক সপ্তাহ থেকে এক হাজার বছরের মাঝামাঝি কিছু-একটা। আবার 'কফিহাউসের সেই আড্ডাটা...' গানে উল্লিখিত অমলের একটাও কবিতা যেমন কখনো ছাপাই হল না (যদিও সে একক এবং একাকী নয়, আমরা অনেকেই দু-একজন অমলকে চিনি)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, অ-সমসাময়িক কবিতার ক্ষেত্রে এবং অন্যভাষা থেকে অনূদিত কবিতার ক্ষেত্রে কবির আত্মপরিচয় কি কবিতার দৃশ্যরূপ ও তার মাধ্যমে কবিতার রসগ্রহণের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রভাবিত করে? এই প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর আমার অজানা — সুতরাং হ্যাঁ বা না-এর প্রসঙ্গে না গিয়ে বিষয়টিকে খানিকটা বিস্তারিত করছি মাত্র।

ধরা যাক, ছেলেবেলায় ঠাকুমা-দিদিমার মুখ থেকে শোনা সেইসব ছেলে-ভুলানো ছড়ার কথা — কে যে সেইসব ছড়া লিখেছিল, কবে লিখেছিল, তার কোনো হদিশ কি আছে নির্দিষ্ট? হয়তো আছে, কিন্তু মোটের উপর আন্দাজি একটি বিষয় এখন বারংবার শুনে, বলে, সেইসব ছড়া আপনার মাথায় গেঁথে গেছে — যদিও কখনো সেই ছড়াকে আপনি চাক্ষুস করেননি — নিজেও সম্ভবত মাথার থেকে বার করে তাকে কাগজের মধ্যে আনার চেষ্টা করেননি — এবার আপনি বড়ো হলেন বা বুড়ো হলেন, আর একদিন আপনার হাতে এসে পড়ল সেইসব ছেলে-ভুলানো ছড়ার একটি সংকলন — এই প্রথম চাক্ষুস করতে যাবেন আপনি সেই চিরচেনা ছড়াটিকে — এক্ষেত্রে আপনার কবিতার দৃশ্যরূপগত আশা-আশঙ্কার অনেকটাই কি রুচি-বিবেচনা ইত্যাদি দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হয়ে নেই? অনেকের হয়তো মনে হবে একটু ইলাস্ট্রেশন থাকলে ভালো হত — নাহলে কেমন নেড়া-নেড়া লাগছে — পাতায় অনেক ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে হয়তো — হয়তো অক্ষরগুলো আরেকটু বড়ো হলে ভালো লাগবে অনেকের, দেখার সুবিধে হবে (হয়তো কেবলমাত্র বৃদ্ধ হয়েছেন আর চোখে ভালো দেখতে পান না বলেই) — ইত্যাদি। আবার ধরা যাক, আপনি বেড়ে উঠেছেন দ্রোহকালে (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে হয়তো সাতের দশক) — জানি না দেওয়ালে সত্যি-সত্যিই কবিতা লেখা হত কিনা — তবু যুক্তির খাতিরে ধরা যাক যে হত — এবার সেইসব রক্তরঞ্জিত বা প্রতিবাদ-বিপ্লব-মুখরিত কবিতাগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে (দেওয়াল থেকে টুকে নিয়েছিলেন আপনি তখন, যখন ছোটো ছিলেন) আপনি ছাপিয়ে দিলেন দামি গ্লসি পেপারে — পাতার চার কোণে ফুলকারি করা, এক-একটি পাতায় একটি করে ছোটো কবিতা — কী দেখবেন আপনি তখন? যদি বিশেষত এ-ধরনের সংগৃহীত নামহীন কবিতা অজানা লেখকের লেখা হয় (এক্ষেত্রে সেটাই হবার সম্ভাবনা বেশি, কেননা দেওয়াল-লিখনে কবির নাম-ধাম লেখার প্রচলন নেই বলেই জানি), তাহলে কনটেক্সট-এর বিচারে একনজরে এগুলোকে প্রেমের কবিতা বা শায়েরি জাতীয় কিছু বলে মনে হবে না? যদি এই প্রতিপাদ্য সত্য হয়, তাহলে এটা মনে করা যেতে পারে যে, কবিতার দৃশ্যরূপ শুধুমাত্র শব্দ-অক্ষরের সরলরৈখিক বিস্তারের উপর নির্ভর করে না। গোটা পাতার মধ্যে কোথায় তাকে স্থান দেওয়া হচ্ছে, পাতায় বর্ডার আছে কি না, অন্য কোনো ছোটো বা বড়ো ইলাস্ট্রেশন আছে কি না, ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে একটা গোটা কম্পোজিশন-এর মতোই আমরা তাকে দেখি প্রথম নজরে — তারপর এক-এক করে ডিটেইলগুলোতে যাই — এক্ষেত্রে যদি কবিতার কনটেন্ট আর কম্পোজিশন সহাবস্থিত না হয় — যদি এদের মধ্যে কোনো সাযুজ্য না থাকে, বা পরস্পরের পরিপন্থী হয় — তাহলে এক ধরনের negative cognitive feedback তৈরি হয়, যা আমাদের পঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত থেকে কবিতার রসগ্রহণের প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত প্রভাবিত করতে থাকে। ঠিক একই যুক্তিতে, আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত *গালিবের গজল থেকে* বা কান্তিচন্দ্র ঘোষের *রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম* জাতীয় মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতা (পাঠকের কাছে) থেকে এই প্রতীতি দৃঢ় হয়, কেননা তাঁরা কৌশলী বিবেচনার দ্বারা নির্ণয় করেছিলেন, ঠিক কী ধরনের ইলাস্ট্রেশন বা কম্পোজিশন সমকাল, অর্থাৎ যে-কালে এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল, সেই সময়ের স্থাপত্য, ডিজাইন বা লিখনশৈলীর কতকগুলি আইকনিক ফিচার-কে রিপ্রেজেন্ট করে, এবং তার নিপুণ ব্যবহারের দ্বারা পাঠকের মনে এক ধরনের পাঠের পূর্বপ্রস্তুতি তৈরি করতে পেরেছিলেন। এ-ধরনের পূর্বপ্রস্তুতির জন্য অবশ্য পাঠকের নিজস্ব কিছু রুচিগত বা কালচারাল প্রস্তুতির আবশ্যকতা আছে — সহজেই বোঝা যায় যে, যদি আপনার কোনোভাবেই সেই সময়ের স্থাপত্যকলা ও শৈলীর বিষয়ে কোনো ধারণাই না থাকে, সেক্ষেত্রে এই জাতীয় subtle stimulus আদৌ আপনার মনে কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করবে না এবং আপনার কবিতার দৃশ্যরূপ বিচারের ক্ষেত্রে সহায়ক বা অন্তরায়, কোনোটাই হয়ে দাঁড়াবে না। এ-জাতীয় unbiased পাঠকের প্রেক্ষিত (perspective) থেকে বিষয়টিকে বিচার করার জন্য এবার আমাদের যেতে হবে শব্দ ও অক্ষরের সরলরৈখিক বিস্তার (বাম থেকে দক্ষিণে) নিয়ে গঠিত যে নিখাদ কবিতা-শরীর, তার প্রসঙ্গে।

অক্ষর, শব্দ ও যতি

ভালো ও খারাপ কবিতা — দুই-ই লেখা হয় শব্দ দিয়ে, এমনকী নৈঃশব্দ্য সংক্রান্ত কবিতাও শব্দ দিয়েই লিখতে হয়। যেমন, ভাষা ছাড়া আমরা ভাবতে পারি না — ঠিক তেমনই হরফ বা অক্ষর ছাড়া লেখা যায় না। ছাপানো কবিতার ক্ষুদ্রতম একক হল অক্ষর, কিন্তু তার একটি দোসর আছে, যা হল স্পেস। দু-টি অক্ষরের মধ্যে যেমন স্পেস থাকে, তেমন দু-টি শব্দের মধ্যেও স্পেস থাকে। এখন প্রাথমিকভাবে কবিতা কেমন দেখায়, তা নির্ধারিত হয় অক্ষরগুলি দেখতে কেমন, তার দ্বারা — সংস্কৃত, তেলেগু আর চিনা ভাষার অক্ষরগুলি ভিন্ন ধরনের — কিন্তু সংস্কৃত আর তেলেগু ভাষার মধ্যে অন্তত একটা গূঢ়তর মিল রয়েছে — এই দু-টি ভাষাই phonologic; অপরপক্ষে চিনা ভাষা হল logographic, অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে এক-একটি অক্ষর এক-একটি 'symbolic unit of meaning' হিসেবে কাজ করে। ভাষাতত্ত্বের গভীরে না ঢুকে এ-প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই উল্লেখ করছি যে, একটা গোটা বাক্য বা শব্দের সমষ্টি ছাড়া phonologic ভাষা, যেমন বাংলা, কোনো ধারণা বা তথ্য বা কোনো 'অর্থ' (meaning) বহন করতে পারে না। সুতরাং বাংলা ভাষায় লেখা যেকোনো কবিতাকেই একাধিক শব্দের অর্থবহ সমষ্টি হতে হবে। এক্ষেত্রে কবিতার কনটেন্ট, যা নির্ধারণ করে কবিতায় শব্দ-সাজানোর বিষয়টি, তা কবিতাটি কেমন দেখাচ্ছে বা দেখাবে, সেটির অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। প্রথমে অক্ষরের বিষয়ে বলি যে, নানা

পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নিত্যনতুন হরফ উদ্ভাবন করা হচ্ছে মূলত একটাই কারণে, পাঠকের কথা ভেবে। যাতে পাঠের সুবিধে হয়, বোঝার সুবিধে হয়, কোনো বিশেষ ধরনের হরফ কোনো এক ধরনের বিশেষ text-এর সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায় — পাঠকের মাথায় এক ধরনের 'priming' হয়, যার ফলে text-এর মর্মোদ্ধার তাড়াতাড়ি করা যায়, ইত্যাদি। এই ধরনের cognitive manipulation-এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছেন যে, Microsoft Word-এর ১৯৯৮-পরবর্তী ভার্সনগুলোতে 'Helvetica' নামক বহুল জনপ্রিয় sans-serif গোত্রের ফন্টটি 'available font'-এর তালিকা থেকে বাদ গেছে। এর নেপথ্যে ১৯৯৭-৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা একটি জনসমীক্ষার রিপোর্ট, যাতে বলা হয়েছিল যে Helvetica-এ লেখা কোনো দীর্ঘ text পড়লে অনেক ব্যক্তির এক ধরনের মানসিক উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি হতে থাকছে, যদিও তার কোনো শারীরবৃত্তীয় কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। আরও বিস্তারিত খোঁজ করে, পরে অনুমান করা হয় যে, এর কারণ হচ্ছে আমেরিকার ট্যাক্স-রিটার্ন ফর্মটি সচরাচর Helvetica-তেই ছাপা হয়ে থাকে, ফলত, Helvetica-এ লিখিত কোনো দীর্ঘ text পাঠকের মনে তার অজান্তেই কর সংক্রান্ত স্মৃতির জন্ম দিচ্ছে বা সেই স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করছে — আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে ট্যাক্স রিটার্ন-এর ক্ষেত্রে স্মৃতি সততই সুখের না-ই হতে পারে! এই উদাহরণের সমান্তরাল কোনো কিছু আমাদের বাংলায় ছাপানো-কবিতা পাঠের সময় ঘটে থাকে কি না, সে-সম্বন্ধে কোনো তথ্য আমার জানা নেই। তবে মনে হয়, আমাদের যত-সব ইস্কুলের প্রশ্নপত্র, ছোটো-বড়ো বেঢপ মাপের মোটা-মোটা সহায়িকা বা ছাত্রবন্ধু (যা ছাত্রদের বন্ধু হবার বদলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক প্রকারের বিভীষিকা!) যেসব ফন্ট ও কাগজ ব্যবহার করে ছাপানো হয়, সেই একই হরফ ও কাগজে যদি অতি উৎকৃষ্ট মানের কোনো কবিতাও ছাপানো হয়, দেখতে তো ভালো লাগবেই না, আদৌ পড়তে বা বুঝতেও চাইবে কি না পাঠক, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এবার আসি স্পেস-এর বিষয়টিতে। এক-একটি অক্ষরের সমন্বয়ে যে-শব্দ, সেই শব্দগুলির মধ্যে কতটা ফাঁক থাকলে তা পাঠযোগ্য হয়, সেটা খানিকটা নির্ভর করে শব্দের মধ্যে কী-কী অক্ষর কোথায়-কোথায় রয়েছে, তার উপর — যেমন, 'ভ', 'ত', 'ল' এই জাতীয় অক্ষরগুলি বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে, তাই শব্দের শুরুতে বা শেষে এই অক্ষরগুলি থাকলে, বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে ছাপলে, পড়তে অসুবিধে হয়। খুব গোদা ভাষায় বললে, এটা আমাদের চোখের দেখার বা পড়ার পদ্ধতির দ্বারাই সীমাবদ্ধ। যখন আমরা কিছু পড়ি, তখন চোখ দিয়েই সেটা দেখতে হয় — আর চোখ যেহেতু ক্যামেরার লেন্স-এর মতো একটা জৈবিক ব্যবস্থা, তাই শব্দগুলিকে চোখের 'focus'-এ রাখার জন্য চোখের পেশিগুলির সংকোচন-প্রসারণ করতে হয় ক্রমাগত। তাছাড়া আমরা সাধারণত যখনই কোনো কিছু দেখার চেষ্টা করি, তখন সেই object-এর একটি বিশেষ কোনো বিন্দুতে focus না করে, আমরা মূলত তার একটা topographic random scan করতে থাকি — তাই বাম থেকে দক্ষিণে, এই ক্রমাগত scan করতে-করতে চোখ ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হয় — text-এর মর্মোদ্ধার করতে অসুবিধে হতে থাকে। আবার শুধু ডান-বামের ব্যাপারেই এটা সীমাবদ্ধ নয়, কেননা প্রায় সব কবিতাতেই একাধিক লাইন থাকে, ফলে চোখকে উপরে-নীচেও scan করতে হয়। এখন আমাদের কবিতাপাঠের পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে আমরা প্রথমে একটা overall scan করি, তারপর একটা detail scan করি, আর সবশেষে প্রতিটি স্পেস এবং শব্দের উপর এক-এক করে focus করি — এই গোটা জটিল প্রক্রিয়ার পাশাপাশি চলতে থাকে মর্মোদ্ধারের বিষয়টি — যেটি আরও বহুতর জটিলতায় ভারাক্রান্ত — কিন্তু সেই প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়।

তাহলে মোটের উপর কবিতার দৃশ্যরূপের সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে, তা-নিয়ে দ্বিধা নেই। কিন্তু নিছক দৃষ্টিগ্রাহ্যতা ছাড়াও আরও কয়েকটি সূক্ষ্মতর বিষয় রয়েছে, যা আদতে Semantics-এর আওতায় পড়লেও কবিতার দৃশ্যরূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল দু-টি শব্দের মধ্যেকার ফাঁক বা দূরত্ব। কবিতায় ব্যবহৃত একটি বিশেষ শব্দকে (বাক্যের অন্তর্গত) যদি বাদবাকি শব্দগুচ্ছের থেকে একটু তফাত করে ছাপা হয়; যেমন ধরা যাক, একটা বাক্যে পাঁচটা শব্দ রয়েছে; প্রথম থেকে চতুর্থ শব্দগুলির প্রতিটির মধ্যে X পরিমাণ ফাঁক আছে, কিন্তু চতুর্থ আর পঞ্চম শব্দটির মধ্যে 3X পরিমাণ স্পেস দেওয়া হল, সেক্ষেত্রে পাঠক প্রথমেই সেই শব্দটিকে, অর্থাৎ পঞ্চম শব্দটিকে লক্ষ করবে — কারণ এটির novelty বা স্থানিক বৈশিষ্ট্য। তারপর আবার অভ্যাসবশত বাম থেকে ডানে পড়ে, পঞ্চমে পৌঁছে বোঝার চেষ্টা করবে, কেন এমনটা করা হয়েছে — এটা কি নিছক মুদ্রণপ্রমাদ, অথবা কী মাহাত্ম্য রয়েছে এই শব্দটির বিশিষ্ট ব্যবহারে (এই বাক্যের এবং গোটা text-এর সাপেক্ষে), যাতে একে তফাত করে দেওয়া হল বাকিদের থেকে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 'দূরে বহুদূরে' এই শব্দ দু-টিকে পাশাপাশি রাখা যায়, আবার 'দূরে ⟷ বহুদূরে' এভাবেও উপস্থাপন করা যায়। সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে এর দ্বারা দৃশ্যগতভাবে (visually) এবং মর্মগতভাবে (Semantically) এক ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করা যায়। একই শব্দের দু-রকম মানে হতে পারে, এমন সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে আবার একটিকে সোজা ও অন্যটিকে ইটালিক্‌স-এ ছাপানো যায় — অন্যটির উপর জোর দেওয়ার জন্য বা তার প্রয়োগবিধির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করার জন্য। এই স্পেস সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কবিতার ক্ষেত্রে, সম্ভবত জনপ্রিয় করেছিলেন ফরাসী কবি মালার্মে। তাঁর বিচারে শব্দ আর শব্দের চারপাশের শূন্যস্থান — উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ, একে অপরের পরিপূরক। দীর্ঘ কবিতা, গদ্যকবিতা কিংবা চলছে-তো-চলছেই টাইপের জীবনানন্দীয় কবিতা — যতই গভীরভাবে মর্মস্পর্শী হোক না কেন, ঠিকমতো বা যত্নসহকারে ছাপা না হলে একটা জমাট শব্দ-ঠাসা আয়তক্ষেত্রের মতো দেখায় ভিসুয়ালি — পড়তে ক্লান্ত তো লাগতেই পারে, ঠিকমতো বুঝতেও পারা যাবে কি না, সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না, বিশেষত যেহেতু ছেদ-যতির জটিল ব্যবহার রয়েছে এইসব text-এ। এ-তো গেল শব্দের মধ্যেকার ফাঁকের পজিটিভ দিক, আবার অন্যপক্ষে শব্দের মধ্যে খুব বেশি-বেশি ফাঁক রাখলেও যে তা পড়তে বিশেষ সুবিধে হয়, তা হয়তো সত্য নয় — কেননা প্রথমত, বেশি ফাঁকওয়ালা শব্দগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে হয় না, চোখকেও একটা শব্দ থেকে অন্য শব্দের উপর ক্রমাগত লম্ফ দিয়ে যেতে হয় — এই প্রক্রিয়া চোখের পক্ষে ক্লান্তিকর তো বটেই, উপরন্তু এতে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে, শব্দসমষ্টির ফলশ্রুতি যে-বাক্য, তার মর্মার্থ উদ্ধারেও অসুবিধে হয়। দৃশ্যগতভাবে অক্ষর / হরফের আকার স্পেসের সঙ্গে আনুপাতিক না হলে, শব্দমধ্যবর্তী স্পেস সামগ্রিকভাবে কবিতাটিকে একটা গোটা subject-এর মতো না দেখিয়ে কতগুলো fragmented unit-এর assembly-র মতো করে দেখায় — তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও খুব-একটা দৃষ্টিসুখকর নয়। ছোটোদের জন্য লেখা ছড়ার বইতে অনেকসময় এই ঘটনাটি ঘটে থাকে — নতুন পাঠপ্রক্রিয়ায় যারা অংশ নিতে সবে শুরু করেছে, অর্থাৎ ছোটোরা, তাদের সুবিধের জন্যই বড়ো-বড়ো হরফে বেশ ফাঁক-ফাঁক করে কবিতা ছাপানোর একটা রীতি আছে — কিন্তু এতে ছোটোদের কবিতার রসাস্বাদনে কতটা সুবিধে হয়, তা গবেষণার বিষয়। সম্ভবত ছোটোবেলার এই শিক্ষার ফলে বড়োবেলায় আমাদের কবিতাপাঠের এবং কবিতাকে কীভাবে দেখব, তার একটা imprint তৈরি হয়ে যায়, যা আমাদের কবিতার রসগ্রহণ ও মর্মোদ্ধারের ক্ষমতা ও অভ্যাসকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

সহজপাঠ-এর কথা এই প্রসঙ্গে না উল্লেখ করে পারা যায় না, কারণ আমাদের অধিকাংশের কবিতাপাঠের সূচনা সেখানেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে *সহজপাঠ* কিন্তু কেবল ছড়া / কবিতার সংকলন নয় — তা ইলাস্ট্রেটেড কবিতা — এক্ষেত্রে কবিতা এবং ইলাস্ট্রেশন পরস্পরের পরিপূরকই শুধু নয়, আকারের (dimension) নিরিখেও তুলনীয়। এতে বড়ো (অপেক্ষাকৃত) হরফে ছাপা অক্ষরগুলি ছবি বা ইলাস্ট্রেশনের মতোই সরল ও বক্ররেখার সমষ্টি বলে

মনে হয় — সেক্ষেত্রে উপরোক্ত distraction-এর বদলে অক্ষরের প্রতি এক ধরনের কৌতূহল ও ভালোবাসা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। কিন্তু অধুনা অনেক ছড়া-ছবির বইতেই এই ঘটনাটি ঘটে না — ছবিটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড়ো হয়ে থাকে গোটা ছড়াটির তুলনায় — উপরন্তু রঙিন বা রং-বেরঙের ছবি ব্যবহার করা হয় — যখন হরফগুলি হয় কালো — সাদা-কালোর যে contrast, তার সঙ্গে multi-colour ছবির contrast মেলে না — এতে উপকারের বদলে distraction তৈরি হয় — ছোটোরা হয় ছবিটাই দেখে, নয় লেখাটা পড়ে। অথবা দুটোর একটাও ভালোমতো না করে পাতা উলটিয়ে চলে যায়। এ-প্রসঙ্গে মানুষের চোখের বিষয়ে আবার একটা কথা উল্লেখ করা উচিত — অধিকাংশ ক্যামেরার লেন্স-এর মতোই মানুষের চোখও colour-corrected নয় (একে Chromo Steropsis বলা হয়), অর্থাৎ বিভিন্ন রং, যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন (মনে করুন, বেনীআসহকলা), তাদের ধরার জন্য বা তাদের মধ্যে তফাত করার জন্য চোখকে ক্রমাগত focus বদল করতে হয় — যে-রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত ছোটো (লালের সবচেয়ে কম), তাকে তত দূর থেকে আমরা পরিষ্কার দেখি — এখন যত বড়ো / দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রং ছাপায় থাকবে, চোখকে তত বেশি পেশি সংকোচন করতে হবে তাকে ধরার জন্য — সুতরাং multicolour printing দেখার ও চোখের পরিশ্রমের প্রেক্ষিতে খুব-একটা উপকারি বলে মনে হয় না। বস্তুত, সাদা-কালোর contrast-ই মানুষের চোখের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে সহজগ্রাহ্য এবং কার্যকরী বলে দেখা গেছে। ছবির সঙ্গে রঙিন হরফে ছাপা কবিতার তুলনা এই কারণেই করা যায় না, যেহেতু ছবি (picture, artwork) হল এক ধরনের logographic language , এখানে একটিই unit রয়েছে (যেমন, ক্যানভাস) এবং তার মধ্যে অনেকগুলি subunit রয়েছে বা থাকতে পারে — কিন্তু তাদের distribution in space রৈখিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই (যেটা শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিক), আর তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কও Semantically যুক্ত নয় — প্রতিটি subunit-ই স্বতন্ত্রভাবে কোনো বিষয় (subject) বা অর্থ বহন করতে সক্ষম হয়ে থাকতে পারে, আবার তাদের পারস্পরিক অবস্থান গোটাগুটি আরেকটা নতুনতর বিষয়, বক্তব্য বা অর্থের জন্ম দিতে পারে। এটা কীভাবে বা কেন ঘটে, সেটা যদিও পরিষ্কার নয়, তবু ভাষা-মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় এটা প্রমাণ করা গেছে যে, অধুনা আমাদের কাছে লিখিত রচনাই প্রধান রিপ্রেসেন্টেশন, ছবি নয়। ছবি অনেক বেশি বিমূর্ত বা প্রতীকী হওয়ার ফলেই হয়তো ছবিকে বহুবিধভাবে দেখা এবং বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় — একপক্ষে এটা যেমন সুবিধেজনক, তেমন অন্যভাবে ভাবলে, এটা এক ধরনের অসুবিধেও। কেননা 'subjectivity of interpretation' ভাষার যোগাযোগের বিষয়টিকে অপরিষ্কার করে দেয়, কোনো সাধারণ মতামত তৈরি হতে বাধা দেয়, এবং ব্যাপকার্থে কোনো বক্তব্যকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মানুগ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। কবিতা যদিও এক অর্থে খুব-একটা সরল বক্তব্যবাহী text না-ও হতে পারে, কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই, কবিতা সাধারণভাবে সংক্ষেপে অনেক কথা বলার চেষ্টা করে (অবশ্যই বর্ণনাত্মক এবং আরও বহুবিধ কথকতা-ছাঁদের কবিতায় এবং অন্যত্র এর বহু ব্যতিক্রম রয়েছে)। কিন্তু এখানে এই যে Semantic মতবিনিময় ও মগজ-যুদ্ধ পাঠক ও কবির মধ্যে ক্রমাগত ঘটে চলতে থাকে কবিতাপাঠের সময় — পাঠক কিন্তু তাতে উৎসাহের সঙ্গেই যোগদান করে — জটিলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে তাকে এড়িয়ে যায় না। আবার গবেষণার প্রসঙ্গে আসি — এক্ষেত্রে উদাহরণ দেব একটি সমীক্ষার, যেখানে কয়েকজন পাঠককে এক বিখ্যাত কবির একটি আপাত-অজানা (বা, বহুপঠিত নয় এমন) কিন্তু জটিল বাক্যবিন্যাসযুক্ত একটি কবিতা এবং অপর আরেকদল পাঠককে ওই কবিতাটিরই একটি সহজপাচ্য পাঠ (গবেষকদলের তৈরি করা একটি ভার্সন) পড়তে দেওয়া হয় — পাঠক্রিয়ার কালে তাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সক্রিয়তা MRI (Magnetic Resonance Imaging) করে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের যেসব অংশ আমাদের কবিতা, ছবি ও ভাষার মর্মোদ্ধারের জন্য দায়ী, আমাদের আবেগ ও আনন্দের জন্য দায়ী, এবং আমাদের বিশ্রাম-বোধের জন্য দায়ী — এই তিনটি অংশই প্রথম দলের পাঠকের ক্ষেত্রে বেশি উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। মর্মোদ্ধার ও আবেগ সংক্রান্ত অংশগুলির উজ্জীবন হতে পারে, এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক বলে — কিন্তু কঠিন কবিতা পড়বার সময় মস্তিষ্ক বিশ্রামের বোধ করবে, আর সহজ কবিতা পড়ার সময় ততটা বিশ্রাম বোধ করবে না — এটা সম্ভবত আশা করা যায়নি। কিন্তু মোটের উপর এর থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে, মস্তিষ্ক কোনো জটিল বিষয়ের মর্মোদ্ধার করতে পেরে বা করার ঐকান্তিক চেষ্টা করে যতটা শান্তি ও বিশ্রাম বোধ করে, সহজপাচ্য কোনো জোলো কবিতা সহজেই উদ্ধার করতে পেরে, ততটা শান্তি পায় না।

পূর্বের এইসমস্ত আলোচনা থেকে সারবৃত্তান্ত যা সামনে আসে, তা হল, কবিতার দৃশ্যরূপ বস্তুত একটি subjective বিষয় — যা ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্কের বিশিষ্টতা, দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা, ব্যক্তিগত রুচি ও পূর্ব অভিজ্ঞতা, এমনকী কবিতাপাঠের বা কবিতাশরীরকে চাক্ষুষ করার সমসাময়িক শারীরবৃত্তীয় অবস্থা — এ-সবকিছুর দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। কবিতার বাণিজ্যকরণ অর্থাৎ ছাপার অক্ষরে তাকে বহুজনলভ্য করে তোলার জন্য, কবিতাকে পাঠযোগ্য ও দৃশ্যরূপগতভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য, তাকে অযথা আকর্ষণীয় করে তোলার, যেমন রংবেরঙে চিত্রিত করার বা চমক-লাগানো কোনো অক্ষররীতি ব্যবহার করার যে খুব-একটা প্রয়োজন বা সুফল আছে, তার কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমৃদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার চেয়ে বরং দেখা যায় যে, কোনো কবিতা যদি নাম বা কবির নাম বা এ-জাতীয় কোনো পূর্ব পরিচিতি ছাড়াই পরিচ্ছন্নভাবে ছাপানো হয়, তাহলে কবিতা যারা পড়েন, বা যাদের কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা আছে, তারা একে প্রায় সমগুরুত্ব — বা, যদি পড়তে অসুবিধে না হয়, তাহলে কোনো-কোনো সময় অধিক গুরুত্ব দিয়েও পড়ে থাকেন। সম্ভবত এ-কারণেই ভিসুয়াল বা কংক্রিট পোয়েট্রি জাতীয় উদ্ভাবনী কাব্যশরীর নিয়ে বহুবিধ চর্চা হতে থাকলেও, প্রথাগত অক্ষরে-ছাপা কবিতা আজও সর্বজনগ্রাহ্য ও আদরণীয় হয়ে রয়ে গেছে।

কবিতা-ছবি

হিরণ মিত্র

কবিতায়, অর্থাৎ তার পাঠে ছবি দেখার কথা নয়। সাধারণ পাঠক, সাধারণভাবে কোথাও ছবি দেখতে পারেন না। ছবির উৎস বা দৃশ্যের উপস্থিতি আধিভৌতিক উপস্থিতি। এ কখন পাশে এসে দাঁড়ায়, টের পাওয়া যায় না। হঠাৎ মনে হয়, কেউ যেন উঁকি মারছে। এর চারচৌকো ছবি মনের মধ্যে ছায়া ফেলে। কেন, কীভাবে, এর উত্তর বহু খুঁজেছি, পাইনি। কারো-কারো মনে হয়, গানের সুর, কবিতার ছত্র, ভাষা, নাটকের চলা-ফেরা, নাচের ছন্দ, এমনকী চলচ্চিত্রের দ্রুত সরে যাওয়া, দেখা, তা-ও ছবি দেখায়। তবুও এর উত্তর পাওয়া গেল না।

আমার মনে হতে লাগল, তিন বিন্দুর খেলা। উৎস, শিল্পী, শিল্পীর মন। উৎস পালটায়, মন পালটায়, দেখা পালটায়। এই উৎস বিভিন্ন রূপ ধরে।

আজকে এই নিয়ে কথা তার রূপ, ভাষা, কবিতা, তার ছন্দ অথবা ছন্দহীনতা। ছবি দেখার আবেগ, তার সংস্কার, তার অভ্যেস এমন ঘটনা ঘটাতেও পারে।

সাধারণ অর্থে যা শুরুতেই বলছিলাম, আমাদের চারপাশে কোনো ছবি নেই। ছবি একটা কৃত্রিম প্রয়াস। বিশেষ কিছু মানুষ, এই প্রয়াসে ঢুকে পড়ে, আবিষ্কার করে দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যকে। রং ও আকারকে সংঘঠিত করে একটা ক্ষেত্রভূমিতে, যেভাবে বিপ্লব সংঘঠিত হয়, মাঠে-ময়দানে, একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে, সমস্বরে একটা মিলিত ধ্বনি, তেমনি আকার ও রঙের মিলনে ঘটে ওঠে একটা অনুষ্ঠান,

একটা আন্দোলন, দোলাচল, অথবা কখনো এসবকে বাতিল করে, শান্ত জলে ছায়া ফেলা আনমনা চুপচাপ সঙ্গে থাকার ছবি। এভাবেই চলল হাজার বছরের দৃশ্য পরিক্রমা। ইতিহাস দৃশ্যের, ইতিহাস ভাষার, ইতিহাস দৃশ্য-ধ্বনির। ইতিহাস-সঙ্গ বা যাপন করার ইতিহাসও আমাদের গঠন করে।

আমরা যেমন দৃশ্য গঠন করি, দৃশ্যও আমাদের গঠন করে। এই মেনে নেওয়া সচরাচর ঘটে না। আমরা একতরফা গঠনের গর্ব করি। এবং বিপত্তি ডেকে আনি।

কবিতার স্পর্শে আমাদের দেখা বহুসময় বিশেষ হয়ে ওঠে, কিন্তু সেখানে বিপদও ওত পেতে থাকে। কবিতার ভাষায় যে-লুকোনো সংকেত থাকে, তার পাঠে বিপথগামিতার আশঙ্কা থাকে। পাকদণ্ডীতে হেঁটে যাওয়ার সময় বা চুড়োয় পৌঁছোবার রাস্তায় ভুল হলে, খাদের কিনারে জীবন সংশয়। এ তেমনি। আবার সংকেত ও চিহ্নের কোনো একক রূপ নেই। সে বিবিধ। ভ্রম নির্মাণকারী।

শিল্পের পূর্ব শর্তই ভ্রম। ভ্রম কোনো ইলিউশন নয়। পাশ্চাত্যের ভ্রমসৃষ্টিকারী ত্রিমাত্রিক অবয়ব নয়। দ্বিমাত্রায়, দ্বিমাত্রিক গোপন রং ও রেখার এমন সহজ চলনও নয় তার। জটিল আবর্তিত, ঘূর্ণায়মান, বার বার সন্দেহের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টিকারী একটি ঘোর। একে ব্যাখ্যা করতে চাইলেই, তা ব্যাখ্যাতীত হয়ে যায়। বৃত্তের মধ্যে ছুঁতে গেলেই, বৃত্ত দৃশ্যহীন হয়ে পড়ে — বৃত্তের মধ্যে থাকা বা না-থাকা প্রতি মুহূর্তেই একটা বেড়াজালে শিল্পী, দর্শক, পাঠক, শ্রোতাকে বার বার বিভ্রান্ত করে। আবার পথ দেখায়, স্থিত করে আবার অস্থিত! বুদ্ধি-অতিক্রান্ত একটা আবেগ, বর্ণনারহিত একটি অবস্থার সৃষ্টি করে, যা আজও ব্যাখ্যার অতীত। রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়ে যখন ঋত্বিক ঘটক তথ্যচিত্র বানাচ্ছেন, তখন ভরদুপুরে, বীরভূমের প্রচণ্ড রৌদ্রস্নাত খোলা মাঠে, চিত্রগ্রাহক, সহযোগীদের সামান্য দূরে সরিয়ে, জ্বলে যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে, মাঠের ঘাসে পাশাপাশি শুয়ে অনন্ত কথোপকথনে দুই শিল্পী ব্যস্ত হয়ে পড়েন, অন্যদের জানান, 'ক্যামেরা বন্ধ রাখো, আমরা একটু আলোচনায় ব্যস্ত' — তখন কী কথা কাহার সাথে? দৃশ্যের বাইরে দৃশ্য রচিত হয়। কথার বাইরে কথা, ভাষার বাইরে ভাষা। ধ্বনির বাইরে ধ্বনি।

আর এক বার নতুন বছর
অর্থাৎ অগুন্তি বলিরেখার ভিড়ে আর একটি ভাঁজ
রাত্রি যে-সব আলো ক্ষইয়ে দেয়, দিচ্ছে সব
গোল টেবিলের উপরে গোল কাচের খোলসে যে-মোমবাতিটা
জ্বলছে, তার হৃৎপিণ্ড ক্রমশ শূন্য হচ্ছে
ভাবিনি যে, তার পরেও জানালার সবুজ কাচ
বাইরে পেতে দেবে চৌকোনো সব সবুজ উঠোন
দিয়েছে, এবং দরজা এই বার সর্বাধিক পরিচিত হয়ে উঠছে
অর্থাৎ, আলাদা হয়ে যাওয়া
অর্থাৎ, পাপ আর খেদ আর অনুতাপ
যাচ্ছি, যাই, প'ড়ে যাচ্ছি, দ্যাখো
যদি চাও, দু' হাত বাড়াতে পারো, তুলে ধরতেও পারো
যেতে-যেতে চোখের কোনায় দেখে নিচ্ছি
টেবিলের চার-পাশে গোল হয়ে ব'সে তারা মদ ঢালছে গেলাসে-গেলাসে
তারা ব'সে আছে, ডুবে আছে, থাক
এ-রকমই স্মৃতি :
যারা আছে, মনে করতে পারছি তাদের
যারা নেই, কোন কালে চ'লে গেছে দরজা খোলা পেয়ে
মনে করতে পারছি তাদেরও
সবাই রয়েছে

— *এক-কালের বসত বাড়িটি*, ভূমেন্দ্র গুহ

কবিতায় কোনো দাঁড়ি (।) যতিচিহ্ন নেই শেষে। এই না-থাকাটাই ছবির হাত ধরে ঢুকে পড়ে ভাষা ও চিত্রের আবহে।

'এই জন্মানো এই মৃত্যু — প্রায় সত্যেন বসুর এস্রাজ' — দ্বিধা একসময় ছবি দেখাল। যেমন, জন্ম-মৃত্যুর ধ্বনি, বাজল এস্রাজ তেমনি, চিত্রে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, আমাদের সম্পদ হল। যেখানে নিশ্চয়তা, যা স্থির, তা-ই মৃত্যু। এমনই প্রতীতি আমার।

বৃষ্টি হলে, মনে হয়, আমি ঐ বৃষ্টির জলের
সঙ্গে ঢুকে মিশে যাবো পড়ে-থাকা ভুবনে, মাটিতে —
কিন্তু কোন্‌ভাবে যাবো? কেনই বা যাবো?

আকাশে কেটেছে কাল, বাতাসের সাঁতারে সন্ধ্যায়
ভেসে চলে যেতে হতো পাখির মতন কোন গ্রামে
তাদের নদীর পাশে গাছের পাতার অন্তরালে
মানুষের সব কিছু ভুলে গিয়ে পাখি হওয়া যেতো —

সেই সুখ-দুঃখ ছেড়ে চলে যাবো ভুবনে, মাটিতে?
কিন্তু, কোন্‌ভাবে যাবো? কেনই বা যাবো?

— *কেন যাবো?*, শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কবিতার ছত্রে আপাতভাবে অনেক চিত্র-উপাদান থাকে। কিন্তু সমস্ত উপাদানকে সেইভাবে গ্রহণ করলে দেখা যায়, তা বিভ্রান্তি ছড়ানো চিত্র-অবস্থান। কবিতা চিত্রার্পিত, চিত্র কবিতা শোনায়। দুটো পাঠের ভঙ্গি আলাদা। অনেকদিন আগের লেখা কয়েকটি বাক্য আমাকে আজ অস্থির করছে —

প্রতিটা অক্ষর একটা প্রতীক। একটা অনুমোদিত, সর্বজনগ্রাহ্য প্রতীক। কিন্তু
সেই প্রতীকেও আরেক প্রতীক যোগ হয়। ব্যক্তির প্রতীক, তার মন-প্রতীক।
এই মন-প্রতীক তার মানচিত্র। তাতে নদ-নালা, ভূমি, জল সবের
হদিশ রেখে যায়। বহুদিন পরেও তার পাঠ নিতে গিয়ে আমরা হারিয়ে যাই
সেই সময়ে, সেই বয়সে, সেই শরৎকালে।
ওখানেই ছবিতে কাল আসে।
কাল রেখা হয়। নগ্ন রেখা। রেখায় সময়। রেখায় ছবির আত্মা ধরা থাকে।
রেখা কখনো চিকন। তীক্ষ্ণ, নখের দাগ ফেলে, জমাট রক্তের লাল ছোপ
নরম চিহ্ন রাখে।
রেখা সুডৌল, সুডৌল নিতম্বের মতো উরু বেয়ে নীচে অথবা পাশে
বেয়ে যায়। সুডৌল নগ্ন হাত, তরঙ্গ হয়ে আঙুলে স্পর্শ রেখে যায়। রেখা
স্তনকে দু-ভাগে চিরে নাভিকে প্রণাম করে।

রেখা গ্রীবায়, উদ্ধত চোখে, মনি বিস্ফারিত,
রেখা চুল হয়ে নেমে যায় পিঠ ভূমি মেরুদণ্ডে।
রেখা তখন রমনী হয়।
রেখা শরীরের প্রান্ত-হাঁটা আনমনা অচঞ্চল
বেগুনিরঙা পিঁপড়ের মতো বয়ে যায়।

রেখা ধ্যানে, রেখা সমাধিতে
রেখায় আটকে থাকা চোখ কখনো পিছলে যায় —
অসতর্ক অবগুণ্ঠনে —
রেখার ঘোমটা খসে পড়ে।
রেখায় লজ্জা আসে, দু-চোখ ভরে লজ্জা,
ঠোঁট ভিজে ওঠে, চিবুক ভরা ঘাম।
রেখা ভ্রূকুটি হয়। কানের লতিতে ঠান্ডা স্পর্শ
নরম পালক রেখার মতো, আশ্চর্য হালকা চুল
তার গাল বেয়ে ঘামে লেপ্টে থাকে।

নব্বই দশকের এই লেখা, এখনও আমার সাথে-সাথে চলেছে।

চিত্র কোনো বিবরণ নয়। কবিতাও কিছু বিবরণ করে না। উৎপলকুমার বসু লিখছেন — 'কবিতা আমরা জানি কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়। কবিতা, পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারীপদ্ধতি। এই পদ্ধতি-কেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নশ্বরতা তৈরি হয়েছে। ...কবিতার মৃত্যু হয়। লুপ্ত হয় তার ভাষা, সংকেত, উপদেশ ও কলাকৈবল্য...।'

চিত্রের ভাষাও কি অনন্ত? তার পাঠ চিরকালই কি একই সংকেত বহন করে? সভ্যতা পালটায়, নতুন জনপদ সৃষ্টি হয়, ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। শিল্পীর আজকের দেখা, আগামীর দেখায় তেমনি ছেদ পড়ে। চিত্রভাষায় যে-রূপনির্মাণ, যে-রূপের প্রতি সাময়িক মোহ শিল্পীকে স্থিত করেছে, তা-ও একসময় প্রশ্নের মুখে পড়ে। তার পাঠ নেওয়াও অসম্ভব মনে হয়, দৃশ্য-ভাষা চর্চায়।

নামি অস্তাচলে
        অবশিষ্ট মেঘরাশি স্বাগত জানায়
বলে, যাবতীয় লেখালেখি ভুলে এসো মুখোমুখি বসি
অনন্ত সুখের কথা আলজিভ বলতো আবারও
বলো গ্রীবাভঙ্গি তার কীভাবে লেহন করে
                        বাতিল দেবতা

বিচিত্র পুষ্পের মতো ঘ্রাণ জাগে মনে হয়, কাছে
বিচিত্র গানের পাখি জেগে আছে শীতে ও আগুনে
সমস্ত দক্ষতা ভুলে অনন্তে চাইছি আজ ছিঁড়ে
                        ফেলা অক্ষরের স্বর
ক্ষিপ্র এই নশ্বরতা, নিরীহ আত্মার স্বেদ
                        কামনাজর্জর

— *কলোনির কবিতা*, রাহুল পুরকায়স্থ

নানা ইন্দ্রিয় আমাদের নানা ছিদ্র তৈরি করেছে। প্রবেশ করে নানা অবস্থান, বোধ ও স্পৃহা; চিত্রের অনুষঙ্গ সবের সাথেই সহবাস করে। কীভাবে করে, কেমন তার রূপ, একে নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়। বিশেষ করে আমাদের পূর্ব ভূখণ্ডে যে-চিত্রচর্চার ঐতিহ্য, তাতে তার বিবরণে এমন গড়ে তোলার রেওয়াজ নেই।

সেখানে প্রতিটা চিত্র-ধ্বনির নির্মাণে, নির্দিষ্ট তাল-লয় বাঁধা আছে। কিন্তু সেই তাল-লয়কে মান্যতা দিয়েও, চিত্রের অনুষঙ্গ ও অবস্থান বদলে, ভিন্ন রূপচর্চার রেওয়াজ শুরু হয় বিগত শতকের মধ্যভাগ থেকেই। তারও আগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চায় এর আভাস পেলাম। কবিমন চিত্রীমনে পরিবর্তিত ও উন্মোচিত হবার বাসনায় এমন এক পটের সামনে কাব্যভাষাকে অতিক্রম করে, সম্মুখে মেলে ধরলেন, অজস্র অকথিত ভাষা, সংকেত, তার দিগন্তটিকে মুহূর্তে দু-বাহু মেলে বিশাল, বিস্তৃত, বিস্ময়কর করে দিল।

আমার জন্মের পনেরো বছর আগের ঘটনা এটা, এবং তার পনেরো বছর পর ষাটের শুরুতে, বিশ শতকে বিমূর্ততাকে আবিষ্কার করলাম, বলা যায়, প্রথম স্বাদ পেলাম। কবির শতবার্ষিকী তখন। রামকিঙ্কর বেইজের কাজে এর, এই বিমূর্ততার ছোঁয়া।

সাধারণভাবে মূর্ত, বিমূর্তে একটা আপাত বিরোধ বর্তমান। কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের সহাবস্থান জরুরি একটা আবিষ্কারের নেশা। গভীর কি অগভীর, এ-প্রশ্নও এইখানে বড়ো নয়।

এইখানে মাইল-মাইল ঘাস ও শালিখ রৌদ্র ছাড়া কিছু নেই।
সূর্যালোকিত হয়ে শরীর ফসল ভালোবাসি :
আমারি ফসল সব — মীনকন্যা এসে ফলালেই
বৃশ্চিক কর্কট তুলা মেষ সিংহ রাশি
বলয়িত হ'য়ে উঠে আমাকে সূর্যের মতো ঘিরে
নিরবধি কাল নীলাকাশ হ'য়ে মিশে গেছে আমার শরীরে।
এই নদী নীড় নারী কেউ নয়; — মানুষের প্রাণের ভিতরে
এ পৃথিবী তবুও তো সব।

— *সূর্য রাত্রি নক্ষত্র*, জীবনানন্দ দাশ

মাতাল ঢেউ এসে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে, মৎস্যজীবীর শরীর। সামান্য এক ছোট্ট নৌকায় ভারসাম্য রেখে, যুঝে চলেছে তার সমস্ত দেহপট। কালো নিকষ, সুঠাম ও মেদহীন। দুটো পা দু-দিকে ছড়িয়ে রেখে, হাল ধরে দুটো বাহু, অস্ত্র শানাচ্ছে বিশাল ঢেউ-এর আছড়ে পড়া আঘাতকে। অবাক হয়ে দেখছি এই মানুষ-প্রকৃতির যুঝে চলার দৃশ্য। ভাবছি, কীভাবে সম্ভব হচ্ছে এই ঘটনা। ভাবতে-ভাবতে স্বপ্নে পেলাম সেই উত্তর, আসলে ওই মৎস্যজীবী নিজেই সমুদ্র। সমুদ্র কি সমুদ্রে ডুবে যায়? সমুদ্র কি সমুদ্রে সাঁতরে বেড়ায়? সমস্ত শরীরটায় সমুদ্র ধারণ করে অপূর্ব দক্ষতায় সে চিত্রের মতো, কবিতার মতো, সঙ্গীতের মতো।

এবার যদি আমি ফিরে আসি তবে আমি নীল রঙ হয়ে ফিরে আসব।
বৃষ্টিশেষে মেঘের ফাঁক দিয়ে বাংলার আকাশে যে নীল রঙটুকু দেখা যায়
আমি তারই মতো হাল্কা কিছু বলার চেষ্টা করব —
যে-কথায় কোনোও জড়তা নেই — যাকে না বুঝলে
কারো ভাতকাপড়ে টান পড়বে না — কেউ বলতে পারবে না
তোমাকে বুঝলুম না হে, তোমাকে একেবারেই বোঝা গেল না।

তখন তুমিও সাদা রঙ হয়ে ফিরে এসো।
হাতে-বোনা খদ্দরের হিংসাহীনতা হয়ে তুমি যেন আমাদের
সবার চৈতন্য ছড়িয়ে পড়তে থাকো — যে সাদা রঙ দাবী করে
'আমাকে বুলেটবিদ্ধ করো, আমাকে রক্তছাপে ভরিয়ে তোলো,
আমাকে স্বাধীনতা দাও।'

— *কহবতীর নাচ*, উৎপলকুমার বসু

চিত্র ও কবিতার এমনই দুই অবস্থান। একটার ভিতর আরেকটা, বার বার মিলনে ও বিরহে মুখোমুখি হয়। কুয়াশা-ঢাকা প্রান্তর, রোদ উঠলে বেলা বাড়লে যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, আবার সন্ধের আঁধারের অপেক্ষা, তেমনি ধ্বনি, দূর থেকে ভেসে আসা শব্দ, আমাদের বিভ্রান্ত করে, নানা সংকেত পাঠায় — ঠারেঠোরে বলে যাওয়া, দেখা যাওয়া একটা অস্তিত্ব —

ঘুম আর বোঝাপড়ার মাঝখানে ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত সঙ্গীতময় সরীসৃপ আর
দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কত দূর

— *বৌভাত*, উৎপলকুমার বসু

অনুনয়-বিবাদ, আগুন আর ছায়া

অভীক মজুমদার

'আমার ছায়াটা' নামে আশ্চর্য একটি কবিতায় দেহ আর দেহের ছায়া নিয়ে লিখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় —

আগুন মুখে ক'রে
একটা দড়ি
বেড়ার গায়ে দুলছিল

সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
দেয়ালের গায়ে
চোখ পড়ল

ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে
আমাকে অবিকল নকল করছে
আমার ছায়া।

পড়তে-পড়তে মনে হয়, পুরো দৃশ্যকল্পটিকে কাব্য অনুবাদের সমস্যা বিষয়ে চালান করে দেওয়া যেতে পারে। মনে পড়ে গেল, ২০১০ সালে প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের একটি অনুবাদগ্রন্থের নাম *ইরাকি কবিতার ছায়ায়*। ভূমিকায় অবশ্য 'ছায়ায়' শব্দব্যবহারকে কবি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন দূরবর্তিতার অনুষঙ্গে। কিন্তু, তরজমা কি অন্য অর্থে মূল কবিতাকে ছায়ার মতোই অনুসরণ করতে চায় না? অবিকল ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে না, এমনকী মূল কবিতার অবয়ব, তার ছায়াশরীর? আমি কিন্তু, 'কংক্রিট পোয়েট্রি'-র বিশেষ উদ্দেশ্যকে বাইরে রেখেই প্রশ্নটি তুলেছি। ত্রিপদী, চৌপদী কিংবা চতুর্দশপদী সকলেরই তো আকারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। উপরন্তু, অনেক সময়ই দেখা যায় শব্দ, পঙ্ক্তি, যতিচিহ্ন এসবের বিন্যাসে কবি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। এ শুধু 'আধুনিক' বৈশিষ্ট্য নয়, আমাদের মনে পড়তে পারে এমনকী ভারতচন্দ্রের কথাও। সাল-তারিখ সাহিত্য-ইতিহাসে তো তিনি 'আধুনিক' পূর্বযুগের কবি। চকিতে মনে হয় আরও পিছিয়ে *মেঘদূতম্* আর *কুমারসম্ভবম্*-এর পঙ্ক্তিদৈর্ঘ্য আর বিন্যাসে কি বিষয়সংযোগ একেবারেই নেই? সুতরাং, অনুবাদের ক্ষেত্রে, অনুবাদকের এদিকে

তীক্ষ্ণ নজর রাখা প্রয়োজন। তবে, বড়ো, মান্য অনুবাদকেরা এ-বিষয়ে, কোনো সন্দেহ নেই, যথেষ্ট সচেতন। *শার্ল বোদলেয়র : তাঁর কবিতা* (জানি না, কবে থেকে এবং কেন প্রচ্ছদে 'শার্ল' শব্দটি নেই!) বই-এর ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছিলেন, 'মোটের উপর, আমার বিশ্বাস এই অনুবাদগুলি বোদলয়রের ভাবনা বা অভিপ্রায় থেকে কোথাও ভ্রষ্ট হয়নি, এবং উপমায়, চিত্রকল্পে ও প্রতিটি কবিতার রূপকল্পে এরা বিমুগ্ধভাবে মূলের অনুসারী।' অন্যদিকে, *তুমি রবে কি বিদেশিনী* অনুবাদসংকলনের প্রাক্‌কথনে বিষ্ণু দে লেখেন, 'যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে।' লক্ষণীয় যে, বুদ্ধদেব বসু উল্লিখিত 'রূপকল্প' আর বিষ্ণু দে কথিত 'কবিতার বিন্যাস' আদতে একই ভাবনার প্রতিবিম্ব। তার গভীরে রয়েছে কবিতার অবয়বকে, তার ছায়াশরীরকে অটুট রাখার অভীপ্সা।

বাঙালি অনুবাদকদের অধিকাংশেরই আর-এক 'কর্তাভজা' মানসিকতা বর্তমান। মেকলে তাঁদের মগজে এক আশ্চর্য উপনিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন। কবিতার অনুবাদে তাঁরা বিশ্বকে ইংরেজিতেই প্রত্যক্ষ করেন। র‍্যাঁবো বা নেরুদা, হাইনে থেকে ইকবাল, সিম্বোর্সকা থেকে নামদেও ধসাল — কেউই যে ইংরেজিতে লেখেননি, সে-কথা এঁরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত। ফলে, মূল কবিতার অবয়ব সংস্থান এঁরা ইংরেজি অনুবাদের ঘোলে আস্বাদন এবং তরজমা করেন। 'দুধ' সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকেন। ফলে, তরজমায় বাংলা কবিতা উৎসকায়া থেকে বেশ কয়েকধাপ বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আমার এক অকালপ্রয়াত বন্ধু, অচ্যুত মণ্ডল, বলতে ভালোবাসতেন, 'অনুবাদ হল, মূলের প্রতি অনুনয়, মূলের সঙ্গে বিবাদ'! অধিকাংশ বাংলা অনুবাদ আবার ইংরেজি কাব্য-অনুবাদের অনুসারী! তাকে হয়তো 'অনু-অনুবাদ' বলা চলে। সেক্ষেত্রে অনুবাদে মূল কবিতার শরীর বাংলায় কত দূর রক্ষিত, সে-নিয়ে কথা বলা বেশ সংকট-সংকুল।

২

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে একটি চিঠিতে নীরেন্দ্রনাথ রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা অনুরূপ হয়েচে।' *অনুরূপ* আর *প্রতিরূপ*-এর এই ভাবনাটিরই হয়তো প্রতিফলন দেখা গেল *Song Offerings*-এর ইংরেজি কবিতা অনুবাদের মধ্যে। প্রথমত, বাংলা কবিতার স্তবক বিন্যাসের প্রতিবিম্ব সরিয়ে দেখা দিল গদ্যভঙ্গির চলন। দ্বিতীয়ত, মূল ভাবকে অনুসরণ করে তিনি ইংরেজি অনুবাদগুলিকে গড়ে তুললেন সংহত অবয়বে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। *Song Offerings*-এর বিখ্যাত কবিতা (XXVII), 'Light, oh where is the light?', মূল : 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।' মূল রচনাটি ত্রিশ পঙ্‌ক্তির, ভাষান্তরিত হয়েছে মাত্র চোদ্দোটি বাক্যে। অথবা, LXIII সংখ্যক 'Thou hast made me known to friends whom I knew not' মূলে 'কত অজানারে জানাইলে তুমি' কবিতাটি। কুড়ি পঙ্‌ক্তির মূল থেকে মাত্র সাতবাক্যে অনুবাদ। আমাদের ভাষার বরেণ্য অনুবাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অনুবাদ' শব্দের মধ্যে 'বাদ' আছে বলে, পছন্দ করেন 'তরজমা' শব্দটি। কেননা তাতে আছে 'জমা'। জানি না, অনুবাদ যে 'বাদ' দেয়, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর মনে রবি ঠাকুরের *Song Offerings*-এর কুঠার কোনো ছায়াপাত ঘটিয়েছিল কিনা!

প্রসঙ্গত, বলতে হয়, পুষ্কর দাশগুপ্তের দীর্ঘ প্রবন্ধ *কবিতার অনুবাদ*-এর কথা। *কবিতার অনুবাদ ও আরো দুটি প্রবন্ধ* বইটি যেকোনো তরজমাকারীর অবশ্যপাঠ্য, ভূমিকার অর্বাচীন অশালীনতাটুকু বাদে। সেই প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট জানান, '...দুটি জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দ-সম্ভার ও ভাষা-সংস্থান কখনো একরকম হতে পারে না।' বহু বিশিষ্ট উদাহরণ, তুলনামূলক বিচার, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর মননশীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে অনুবাদ প্রক্রিয়ার স্বরূপ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। পাশাপাশি, তাঁরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা-ভাষ্য সমন্বিত *আপলিনের-এর কবিতা*-এ তিনি বেশ কিছু Concrete Poetry-র অসামান্য তরজমা আমাদের উপহার দিয়েছেন। আপলিনের চিত্রকবিতা ছাড়াও ছেদচিহ্নের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বা অন্যান্য কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে কাব্যশরীরে নানা ধরনের চমকপ্রদ বিন্যাস ঘটিয়েছেন। পুষ্কর দাশগুপ্ত বহু পরিশ্রমে তার গূঢ় আস্বাদ বাঙালি পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

Visée

A Madame René Berthier

Chevaux couleur cerise limite des Zélandes
Des mitrailleuses d'or coassent les légendes
Je t'aime liberté qui veilles dans les hypogées
Harpe aux cordes d'argent ô pluie ô ma musique
L'invisible ennemi plaie d'argent au soleil
Et l'avenir secret que la fusée élucide
Entends nager le Mot poisson subtil
Les villes tour à tour deviennent des clefs
Le masque bleu comme met Dieu son ciel
Guerre paisible ascèse solitude métaphysique
Enfant aux mains coupées parmi les roses oriflammes

নিশানা

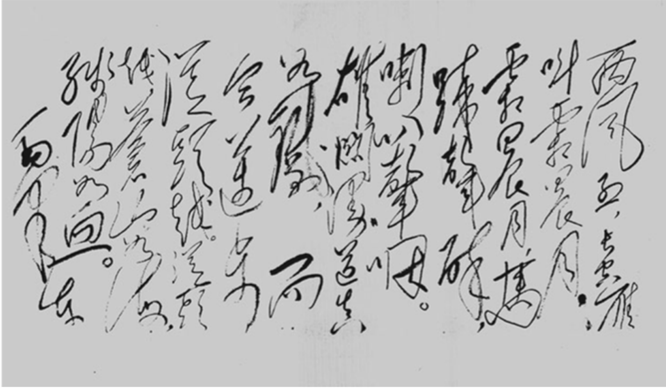
মাদাম রনে বের্তিয়ে-কে

ঘোড়াগুলি চেরিরঙের জিল্যান্ডের সীমারেখা
সোনার মেশিনগানগুলি ইতকথা মকমক করছে
স্বাধীনতা আমি তোমায় ভালোবাসি তুমি পাহারা দাও মাটির তলার কবর
রুপোর তারওয়ালা হার্প আহারে বৃষ্টি আহারে আমার সঙ্গীত
অদৃশ্য শত্রু রুপোর ক্ষত রোদ্দুরে
আর গোপন ভবিষ্যৎ হাউই যাকে স্পষ্ট করে তোলে
শোন শব্দ সাঁতার কাটছে গোপন মাছ
শহরগুলি একের পর এক চাবিতে পরিণত হয়
যেরকম ঈশ্বর পরেন তাঁর আকাশ তেমনই নীল মুখোসটা
শান্তিময় যুদ্ধ সন্ন্যাস নিঃসঙ্গতা দার্শনিক চিন্তা
চারদিকে গোলাপী ফুলগুলির মধ্যে কাটা শিশু

গিয়োম আপলিনের-এর কবিতা ও তার পুষ্কর দাশগুপ্ত-কৃত অনুবাদ

৩

রবার্ট লোয়েল তাঁর *ইমিটেশন্‌স* গ্রন্থটিতে তরজমাকে স্বাধীনতার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়েছেন। অনুবাদকে মৌলিক সৃষ্টি বা অনুসর্জনে পরিণত করতে তিনি ছায়াশরীর নির্মাণ করেছেন, কায়াশরীরকে সম্পূর্ণ এলোমেলো করে দিয়ে। মূল কাব্যশরীর, তার অবিকৃত ছায়াকে অনুবাদে নিয়ে আসার পুরো আলোচনাটিই কিন্তু, এ-প্রসঙ্গে ফিরে দেখার। খুব গভীরে গিয়ে ভাবলে, দু-একটি মর্মান্তিক প্রশ্ন তরবারির মতো পুরো প্রকল্পটিকেই ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। ধরা যাক, মূল ভাষা আর অনূদিত ভাষার প্রসঙ্গ। আরও গভীরভাবে বলা চলে, বর্ণমালা আর লিখনভঙ্গিমার প্রসঙ্গ। বর্ণমালা মূলে যদি হয় চিত্রাক্ষর আর উল্লম্ব পদ্ধতিতে যদি হয় তার চলন, তাহলে আনুভূমিক বর্ণলিখনে তাকে কীভাবে অনুবাদ করা সম্ভব? অনুবাদ যদি-বা হয় ভাববস্তুর, ছায়াশরীর কীভাবে কায়াশরীরকে প্রতিবিম্বিত করবে? করা সম্ভব? ধরা যাক, মাও সে তুং-এর একটি কবিতা *Laushan Pass*।



মাও সে তুং-এর একটি কবিতা

বাংলা অনুবাদে দেহবিম্বে একে কীভাবে আনা যাবে? আনা যাবে ইংরেজি অনুবাদে? এমনকী, আরবি বা উর্দু কবিতার ক্ষেত্রেও একথা অনেকাংশে সত্য। একই কথা আরও একটু সম্প্রসারিত করে বলা চলে কামিংস-এর কবিতার তরজমার ক্ষেত্রে। কামিংস তো তাঁর কবিতায় বর্জন করেন ক্যাপিটাল লেটার। বাংলা তরজমায় কী হবে তার রূপকল্প? গিনসর্বাগ বা নিকানোর পাররা-র কবিতায় (প্রতিকবিতা?) তো হঠাৎ ঢুকে পড়ে একগাদা লাইন, ক্যাপিটালে। বাংলা, হিন্দি, গুজরাতি বা ওড়িয়ায় কী হবে তার অনুবাদের ছায়াশরীর? বিশ্বকবিতার অনুবাদ সংকলন (আধুনিক ইংরেজি অনুবাদে / মলাটে লেখা, 'World Poetry in Modern Verse Translation') *Poem into Poem*-এর সম্পাদকীয় মুখবন্ধে একই ধরনের প্রশ্ন তোলেন George Steiner — 'And how can a translation carry over into a Roman Alphabet the pictorial suggestions, the relations of space and graphic incitement which are a vital part of the total statement made by a Chinese or Persian lyric?'

তাহলে কি কায়াশরীর আর ছায়াশরীর, মূল আর তরজমা সেসব ক্ষেত্রেই অন্বিত হয়, যেখানে ভাষা-অক্ষর-বর্ণমালা-চলন পরস্পর সদৃশ না-হলেও সমগোত্রীয়?

৪

বাংলা কবিতার এক বহুবিচিত্র অত্যুজ্জ্বল সংকলন *সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত*। সম্পাদনা করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভূমিকায় যৌথস্বাক্ষরে (*অনুবাদ কবিতা আধুনিকতা / ব্যক্তি ও বিশ্ব*) প্রথমাংশে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইঙ্গিত বর্তমান। '...অনুবাদক নিছক দোভাষী নন। বরং অনুবাদকের কাজ মাতার না হলেও ধাত্রীর। জন্মগ্রহণের পর শিশুকে বারে বারে জন্ম নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং ধাত্রীর হাতে সে একটি মায়াবী সামঞ্জস্য লাভ করে অতঃপর পিন্ডারকথিত সুঠাম যৌবনে বিবর্তিত হয়ে যায়।' একই সুর ধরে শঙ্খ ঘোষ তাঁর *বহুল দেবতা বহুস্বর* অনুবাদ সংকলনের গোড়ায় বলে দেন, 'অনুবাদের প্রসঙ্গে ভালেরি বলেছিলেন একটা ''approximation of form''-এর কথা।... কবিতাগুলি যদি বাংলায় কিছুমাত্র কবিতার মতো না শোনায়, তদ্‌গত হবার আপ্রাণ চেষ্টায় যদি আড়ষ্টতাই শুধু থেকে যায় লেখায়, তাহলে অনুবাদ করবার আর মানে থাকে না বড়ো।'

তাহলে, ছায়াশরীরের প্রতিলিপিটি কি অবিকল রাখা সম্ভব জন্মান্তরের এই মহাআখ্যানে?

বরং ফিরে যাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই *আমার ছায়াটা* কবিতায়। শেষাংশে বলা আছে —

> পেছন থেকে সামনে লাফিয়ে পড়ল
> আমার সেই ছায়া
>
> ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরিয়ে নড়িয়ে
> অনেক চেষ্টা করেও
> আমি তাকে ছাড়াতে পারলাম না।
>
> তখন আমি এই ব'লে তাকে শাসালাম —
>
> শয়তান,
> এবার আমি আগুনের মধ্যে যাব।

অনুবাদক কি বোঝেন এই আগুন? নিশ্চয়ই বোঝেন। নইলে, বর্হেস-এর সেই কিমিতিবাদী কিস্‌সা (মূল নাম : PIERE MENARD, AUTOR DEL QUIJOTE) থেকে তার মুক্তি নেই। এই MENARD সম্পূর্ণ *ডন কিহোটে* উপন্যাসটি স্প্যানিশভাষা শিখে স্প্যানিশভাষাতেই অনুবাদ করে, তবে তার একটি শব্দ বা বাক্য বা বাক্যবিন্যাসকেও না পালটে। অবিকল একই হতে থাকে তার 'তরজমা'। অস্পষ্ট ঠেকছে? তাহলে রসায়নের দ্বারস্থ হওয়া যাক। মিশ্রণ থেকে যৌগ তৈরি হয় আগুনে। এ-আগুন সেই আগুন। কায়াশরীর থেকে ক্রমে উদ্গত হয় ছায়াশরীর। তখন যমজ ভাই নয়, উৎপন্ন হয় নবসন্তান। প্রণাম সেই আগুনকে, যা অনুবাদককে স্রষ্টার সঙ্গে একাসনে, সম-কক্ষে দহনান্তিক উচ্চতা দেয়।

কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্যতা : নানা কালে, নানা ভাষায়

পুষ্কর দাশগুপ্ত

১. প্রাক্কথন

১.১. ছবি পড়া

একজন পাঠকের সামনে একটা ভাষিক রচনা[১] রাখা হল। রচনাটা লিপিবদ্ধ (হাতে লেখা / ছাপানো, পাথরে খোদাই করা), কম্পিউটার, ট্যাবলেট বা টেলিফোনের বা অন্য কোনো ধরনের পর্দায় / সাইনবোর্ডে বা অন্য কোনো মাধ্যমে উপস্থাপিত। পাঠক রচনাটি পড়তে শুরু করলেন, অর্থাৎ প্রথমেই পাঠকের চোখ বা দৃষ্টি সক্রিয় হয়ে, বর্ণ, অক্ষর, শব্দ, বাক্য, বাচন[২], রচনাকে এক করে বা / এবং একক হিসেবে আলাদা-আলাদা করে পাঠোদ্ধার করতে শুরু করল। বলা যায়, পড়ার শুরুতেই রয়েছে দেখা, পড়ায় প্রথম ভূমিকা হল দৃষ্টির। এদিক থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা হল তাবৎ লিপিবদ্ধ রচনার সাধারণ চরিত্র, আর এই সাধারণ চরিত্র সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। এই স্বতঃসিদ্ধ সাধারণ চরিত্রের সীমা পার হয়ে রচনার বিশেষ একটি বর্গের লিপিবদ্ধ / মুদ্রিত রূপের পঠনে[৩] দৃষ্টিগ্রাহ্যতার বিশেষ ভূমিকা হল আমাদের আলোচ্য। রচনার এই বর্গটি হল কবিতা। বলা যায়, বর্তমান আলোচনায় আমাদের আলোচ্য হল লিপিবদ্ধ (হাতে লেখা / ছাপানো) কবিতার উপস্থাপনায় বিশেষ ধরনের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার সৃষ্টি আর তার ব্যঞ্জক[৪] গুরুত্ব।

১.২. সংবিধির[৫] মিশ্রণ

অন্যদিক থেকে বলা যায় ভাষিক বাচন বা রচনা চরিত্রগতভাবে একাধিক সংজ্ঞাপন[৬]-সংবিধির মিশ্রণ।

১. গুরু গর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে (সংজ্ঞাপনের উদ্দিষ্ট : ক. দৃষ্টি — চোখ দিয়ে লিপ্যোদ্ধার অর্থাৎ পাঠ, 'নীপমঞ্জরী শিহরে' চিত্রকল্প কল্পনায় দেখা, খ. শ্রুতি — নীরবে পড়া : নিজের কানে শোনা, সরবে পড়া : নিজে শোনা আর অন্য শ্রোতাকে শোনানো, ছন্দ : ৬+৬+৩; গ, জ, ন, র-এর অনুপ্রাস; উ, অ, ই, এ-র স্বরসাম্য[৭] পঙ্‌ক্তিটিকে শ্রুতির কাছে সুখকর করে তুলেছে।)

২. (পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত...) পায়স পয়োধি সপসপিয়া, পিষ্ঠকপর্বত কচমচিয়া (সংজ্ঞাপনের উদ্দিষ্ট : ক. শ্রুতি — ছন্দ : ধ্বন্যাত্মক ভাবধ্বনি[৮] 'সপসপিয়া', 'কচমচিয়া'; প, স, ক-এর অনুপ্রাস; অ, আ, ই-র স্বরসাম্য, খ. আস্বাদ — (খাবেন) পায়স, পয়োধি, পিষ্ঠকপর্বত, গ. স্পর্শ — তরল, নরম : পায়স পয়োধি সপসপিয়া, শক্ত : পিষ্ঠকপর্বত কচমচিয়া, দৃষ্টি — (পঞ্চমুখে শিব খাবেন) পায়স, পয়োধি, পিষ্ঠক।)

১.৩. ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন : প্রতিষঙ্গ

প্রত্যেক শিল্পের মধ্যে বিশেষ কোনো-একটি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আবেদন প্রাধান্য লাভ করে। ওই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের আবেদনের প্রণালী ধরে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রতিষঙ্গের[৯] মাধ্যমে শিল্প-উপভোগ আমাদের মানসিক নান্দনিক অভিজ্ঞতার পরিণতি লাভ করে। সঙ্গে-সঙ্গে এটাও দেখা যায়, কোনো-একটি শিল্পের অনুশীলনকারী শিল্পী অন্য কোনো শিল্পের চরিত্রকে আত্মস্থ করার জন্য ওই শিল্পের সংবিধির সঙ্গে নিজের শিল্পের সংবিধির মিশ্রণ ঘটান। এভাবে প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন শিল্পকলার চারিত্রিক মিশ্রণের, বা অন্যভাবে বললে, সেতুবন্ধনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সাহিত্য বা কবিতা হল ভাষাশিল্প; ভাষাশিল্প কবিতার বাচিক[১০] সংবিধির সঙ্গে চিত্রশিল্পের রং-রূপ-রেখার সংবিধির মিশ্রণে কবিতার মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা সৃষ্টির প্রয়াসের ইতিহাসই আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়।

২. লেখা, পড়া, ছাপানো

২.১. ভাষার লিপি

প্রসঙ্গত, আধুনিক যুগে রচনার, বিশেষভাবে কবিতার পঠনে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে বলার আগে ভাষার লিপির প্রসঙ্গে অল্প কিছু কথা বলা দরকার বলে আমাদের মনে হয়েছে। পৃথিবীতে বর্তমানে পাঁচ হাজারের কিছু বেশি ভাষা বর্তমান, এই ভাষাগুলির শতকরা সাতাশি ভাগের কোনো লিপি নেই, অর্থাৎ সংজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে ওই ভাষাগুলির ব্যবহার মৌখিক। অতীত থেকে আজ অব্দি মানুষের ব্যবহৃত লিপির সংখ্যা ছ-শোর মতো। এই লিপিগুলি সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয় যে, ভাষার সংকেত[১১] (শ্রুত প্রতিমান[১২] + ধারণা[১৩] / সংকেতক[১৪] + সংকেতিত[১৫]) যখন লিপিবদ্ধ হয়ে উপস্থাপিত হয়, তখন তার পরিগ্রহণের প্রথম অপরিহার্য পর্যায় হল চোখে দেখা। তা সেই লিপি কীলকাকার লিপি (Cuneiform), চিত্রলিপি (Hieroglyph), ভাবলিপি (Ideograph), খোদাইলিপি (Glyph), বর্ণমালা (Alphabet) যাই হোক না কেন। কিন্তু যেসব ভাষার কোনো লিপি নেই, সেসব ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম[১৬]।

২.২. বাংলা ভাষার মৌখিক-শ্রাব্য পুথি-সংস্কৃতির যুগ থেকে মুদ্রণের যুগ

২.২.১. হাতে-লেখা পুথি

বাংলা ভাষার আদি কাল থেকে এই ভাষার বর্ণভিত্তিক লিখিত রূপ ছিল। তবে অনেক দিন পর্যন্ত এদেশে, এই সমাজে পড়তে-জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম[১৭], ছাপাখানাও ছিল না। হাতে-লেখা পুথির সামান্য সংখ্যক নকল করা হত, *রামায়ণ*, *মহাভারত*, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি। পড়তে-জানা কেউ একজন পড়ত, বাকিরা শুনত। লেখা হত সমিল পদ্যে, প্রায় ধুয়া বা ধ্রুবপদ সহ। পড়া হত সুর করে, ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের (পয়ার, লাচাড়ি...) আর ভিন্ন-ভিন্ন বর্গের (লক্ষ্মীর পাঁচালি, *রামায়ণ*, মঙ্গলকাব্য...) রচনার জন্য সুর ছিল ভিন্ন। এক বা একাধিক জ্ঞাতি-সম্পর্কিত পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজে পেশাদারি পাঠক বা কথক ছিল। বিশেষ কোনো-একটা দিন বা উৎসবে কথকের ডাক পড়ত। কথক রচনায় যোগ করত গান, সুরবৈচিত্র্য, ব্যাখ্যা। বাংলা কবিতার, প্রসারিত অর্থে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের এই যুগটিকে আমরা বলতে পারি মৌখিক-শ্রাব্য[১৮] পুথি-সংস্কৃতির যুগ[১৯]। এই যুগের বিস্তার ছিল *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* থেকে আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত। লিপিহীন ভাষার মৌখিক-সংস্কৃতির মতোই মৌখিক-শ্রাব্য পুথি-সংস্কৃতির যুগে সাহিত্যের / কবিতার অর্থাৎ ভাষিক রচনার পরিগ্রহণে[২০] যে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা ছিল প্রধান, তা হল কান। এই পরিগ্রহণ ছিল গোষ্ঠীর যৌথ কর্ম। এছাড়া এই সাহিত্য ছিল প্রধানত ধর্ম-কেন্দ্রিক কাহিনি-প্রধান, স্বভাবতই শ্রোতা-পরিগ্রাহকের ভক্তিভরে শোনা, কাহিনির অন্তর্গত অনুকাহিনিগুলির[২১] সমন্বয়ে কাহিনির গতি অনুসরণ করা। এর পাশাপাশি যে এলিট বা বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ছিলেন, তাঁরা ছিলেন হাতে-গোনা আর তাঁদের জ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃত, মুসলমান আমলে অন্য একদলের আরবি বা / এবং ফারসি।

২.২.২. ছাপাখানা

তারপর উনিশ শতকের গোড়ায় একদিকে ছাপাখানায় ইংরেজি আর বাংলা বই ছাপা আর অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শিক্ষার শুরু বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এল। প্রধানত শহরাঞ্চলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই ধীরে-ধীরে হলেও[২২] বাড়তে শুরু করল। ছাপাখানা আর ঔপনিবেশিক ইংরেজি শিক্ষার ফল হল :

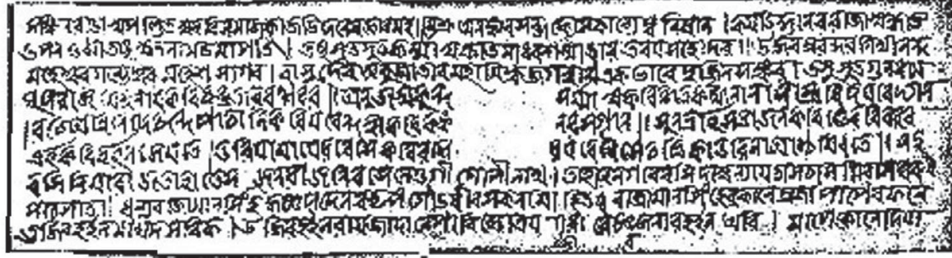
২.২.২.১. ব্যক্তি-পাঠকের সৃষ্টি। ওই পাঠক নিজের রুচি ও পছন্দ অনুসারে বই (বাংলা বা / এবং ইংরেজি) কিনে বা কারো কাছ থেকে নিয়ে বই পড়তে শুরু করল। বই-এর সংখ্যা আর বৈচিত্র্যের কারণে ধর্ম বা ভক্তির ভূমিকা কমে গেল।

২.২.২.২. ইংরেজি (ইউরোপীয়) সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে, ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাহিত্য (*রামায়ণ, মহাভারত*, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, গেয় পদাবলি) পেরিয়ে ব্যক্তি-পাঠকের পড়ার, উপভোগের / বিনোদনের জন্য কবিতা আর গদ্যে সাহিত্য-সৃষ্টি শুরু হল।

২.২.২.৩. ওই সাহিত্য মুদ্রিত বই-এর আকারে ব্যক্তি-পাঠকের হাতে এল।

২.২.২.৪. লিপিবদ্ধ বা / এবং মুদ্রিত সাহিত্যের পড়ার শুরু হল চোখে দেখা দিয়ে। চোখে দেখার মাধ্যমেই লিপ্যোদ্ধার থেকে পাঠোদ্ধার, অর্থাৎ পঠন-পরিগ্রহণের শুরু। হাতে-লেখা পুথিতে সাধারণত শব্দ, বাক্য, পঙ্ক্তি, চরণ, স্তবক আলাদা করার রীতি ছিল না; যিনি পড়ে শোনাতেন, তিনি কথা বলার নিয়মে কম বা বেশি বিরতির সাহায্যে ভাষিক রচনার বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা করতেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের হাতে-লেখা পুথির একটা পাতার প্রতিলিপিতে এই একটানা লেখার নমুনা আমরা দেখতে পাই। আনুভূমিক উপস্থাপনায় চরণগুলি তথা চরণের শব্দগুলি ফাঁকহীনভাবে একটানা লেখা, এক ও দুই দাঁড়ি ছাড়া কোনো রকমের ছেদচিহ্নের ব্যবহার নেই।



চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের হাতে লেখা পুথি

২.২.৩. ছাপাখানার বিবর্তন

২.২.৩.১. ছাপাখানার প্রথম যুগে *রামায়ণ, মহাভারত* বা অন্য কোনো পুরোনো রচনা ছাপানো শুরু হয় :

চ্যবনমুনিরপুত্রনামরত্নাকর। দস্যুবৃত্তিকরেসেইবনেরভিতর।।
বিরিঞ্চিনারদদোঁহেসন্ন্যাসীহইয়া। রত্নাকরকাছেদোহেমিলিলআসিয়া।।
বিধাতারমায়াহৈলরত্নাকরপ্রতি। সেইদিনেসেইপথেকারোনাহিগতি।।

প্রথম যুগে হাতে লেখা পুথির অনুকরণে রচনাগুলি মুদ্রিত হত। বোঝা যায়, তখনও মৌখিক-শ্রাব্য (একজন শব্দ, বাক্য, বাচন আলাদা করে বোধগম্যভাবে পড়বে, অনেকে শুনবে) যুগ থেকে বেরিয়ে এসে, সাহিত্য ব্যক্তি-পাঠকের পাঠ্য হয়ে ওঠেনি।

২.২.৩.২. ছাপাখানার দ্বিতীয় যুগে যেভাবে কৃত্তিবাসি *রামায়ণ* বা অন্য কোনো পুথি ছাপানো হত :

চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর। দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।। বিরিঞ্চি
নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী হইয়া। রত্নাকর কাছে দোহে মিলিল আসিয়া।।
বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকর প্রতি। সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি।।

আনুভূমিক উপস্থাপনায় চরণের শব্দগুলি আলাদা হয়েছে, তার ফলে চরণের সংগঠন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক ও দুই দাঁড়ি ছাড়া কোনো রকমের ছেদচিহ্নের ব্যবহার হয়নি। তবু বোঝা যায়, রচনার দৃষ্টিগ্রাহ্য পাঠ্যতা সম্পর্কে অস্পষ্ট সচেতনতা দেখা দিচ্ছে।

২.২.৩.৩. ছাপাখানার আধুনিক যুগে যেভাবে *রামায়ণ, মহাভারত* বা অন্য কোনো রচনা ছাপানো হত, বা আজও ছাপানো হয় :

চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।।
বিরিঞ্চি নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী হইয়া।
রত্নাকর কাছে দোহে মিলিল আসিয়া।।
বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকর প্রতি।
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি।।

বোঝা যাচ্ছে, নিঃশব্দে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। দু-পাশে দৃষ্টিগ্রাহ্য খালি জায়গা রচনার পদ্যরূপ (ছন্দে লেখা চরণ) আর মুদ্রিত রচনার কাব্য হিসেবে পাঠ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট সচেতনতা দেখা দিচ্ছে। এই পড়ায় যে-কর্মেন্দ্রিয় প্রথম ভূমিকা গ্রহণ করছে, তা হল দৃষ্টি।

৩. লিপিবদ্ধ মুদ্রিত রচনার শ্রেণি ও বর্গ বিভাজন

৩.১. ভাষাশিল্প : সাহিত্য

উনিশ শতকে ধর্মকেন্দ্রিক পুথি-সংস্কৃতির যৌথ পঠন-শ্রবণের মৌখিক যুগ থেকে বের হয়ে বাংলা সাহিত্য একদিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে, অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেরণায় ব্যক্তি-পাঠকের পঠন-রসানুভূতির যুগে প্রবেশ করল।

সাহিত্য শিল্পকর্ম, ভাষার উপাদানে নির্মিত শিল্প, বলা যায়, ভাষাশিল্প; আর এই ভাষাশিল্পের উৎপাদক হলেন ভাষাশিল্পী। যে-ভাষা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক সংজ্ঞাপনের মাধ্যম, তা-ই আবার একই সঙ্গে শিল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে। মানবিক ভাষার এটাই হল আশ্চর্য চরিত্র। শিল্পের প্রাথমিক স্তর হল কারিগরি, শিল্পী হলেন প্রাথমিকভাবে কারিগর। ভাষাশিল্পীও ভাষাকে অন্য যেকোনো শিল্পের উপাদানের মতোই ব্যবহার করেন, কারিগর হিসেবে ভাষাকে রূপান্তরিত করে (রূপকার্থে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, বাঁকিয়ে, চুরিয়ে, কারুকাজ করে) নির্বাচিত শব্দের ধ্বনি-সংগঠনে, বিশেষ বাক্যপ্রকরণে, বাচন-সংস্থানে তথা বাচন-কৌশলে আর সাদা

পাতার ওপর আনুভূমিক[২৩] বা / এবং উল্লম্ব[২৪] লিপিবিন্যাস আর বর্ণের (মুদ্রিত রচনায় মুদ্রণবিন্যাস আর হরফের) বৈচিত্র্যের ব্যবহারে ভাষিক শিল্পবস্তু সৃষ্টি করেন। ভাষার উপাদানে তৈরি বাচিক শিল্প বা ভাষাশিল্পের উৎপাদনকেই বলা হয় সাহিত্য। এই সাহিত্য ঐতিহ্য-নির্ধারিত বিভিন্ন বর্গ[২৫] ও উপবর্গের (কাহিনি, কাব্য, উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, মহাকাব্য, গীতিকবিতা) উপরাচনিক[২৬] শ্রেণি-অভিধা দ্বারা চিহ্নিত হয়।

৩.২. ভাষিক উৎপাদনের শ্রেণিবিভাগ

আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী এর পরের পর্যায় সম্পর্কে বলতে গেলেই ভাষিক রচনার চরিত্র আর উদ্দেশ্য অনুসারে রচনার শ্রেণিবিভাগে আসতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় শব্দশাস্ত্রী ও কাব্যমীমাংসাশাস্ত্রীদের চিন্তার অনুসরণে আমরা ভাষিক রচনার বাচিক সংজ্ঞাপনের চরিত্র ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী রচনাকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি :

বাচিক রচনা		অভিধা	লক্ষণা	ব্যঞ্জনা	রচনার শ্রেণি
ব্যবহারিক-জ্ঞাপক	গদ্য / পদ্য	(+)	+	+	বাচক (অভিধাবৃত্তি-প্রধান)
সৃজনশীল	গদ্য / পদ্য	+	(+)	+	লক্ষক (লক্ষণাবৃত্তি-প্রধান)
	গদ্য / পদ্য	+	+	(+)	ব্যঞ্জক (ব্যঞ্জনাবৃত্তি-প্রধান)

৩.৩. ভাষিক উৎপাদন কবিতা

আমাদের প্রস্তাবিত ভাষিক রচনার বিভাজনের ভিত্তিতে বলা যায়, কবিতা হল গদ্য বা পদ্যে রচিত সৃজনশীল ব্যঞ্জক (ব্যঞ্জনাবৃত্তি-প্রধান) রচনা। এখানে আমাদের আলোচ্য হল সৃজনশীল ব্যঞ্জক রচনা কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্যতার ভূমিকা। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল প্রাথমিকভাবে যেকোনো লিখিত / লিপিবদ্ধ / মুদ্রিত রচনার পড়া শুরু হয় দেখার মাধ্যমে লিপ্যোদ্ধার থেকে। একইভাবে সৃজনশীল ব্যঞ্জক ভাষিক রচনা কাব্যিক বাচনের পঠন-পরিগ্রহণ শুরু হয় চোখ দিয়ে দেখা বা তাকানোর মধ্য দিয়ে। সাদা পাতায় বর্ণ, অক্ষর, শব্দ, বাক্য, বাচন, পঙ্ক্তি, চরণ, স্তবকের বিশেষ আনুভূমিক বা / এবং উল্লম্ব উপস্থাপনা কবিতার ব্যঞ্জক-বৃত্তির অংশ হয়ে ওঠে, আর তা পাঠকের পঠন-পরিগ্রহণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই পঠন-পরিগ্রহণের ক্রিয়ার মধ্যে দেখা (দৃষ্টি) শোনাকে (শ্রুতিকে) জাগিয়ে দেয়, তারপর উভয়ের সমন্বিত অভিজ্ঞতায় শুরু হয় পড়া। এই পড়ার মানসিক উপলব্ধির ভিত্তিতেই পঠনের, অর্থাৎ রচনার উদ্ঘিহিতি-পুনর্নির্মাণের শুরু হয়। বাচক (অভিধাবৃত্তি-প্রধান), লক্ষক (লক্ষণাবৃত্তি-প্রধান) রচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টির ভূমিকা গৌণ হলেও অনুপস্থিত নয়, এ-দুই ধরনের বাচনেও মোটা হরফে (বোল্ড), নিম্নরেখ, ইটালিকস-এ লেখা / মুদ্রিত শব্দ, অসমাপ্ত বাক্য, বাক্য, অনুচ্ছেদ সংজ্ঞাপনে বিশেষ গুরুত্ব নির্দেশ করে পাঠকের পঠনকে নিয়ন্ত্রিত-প্রভাবিত করে। তবে ব্যঞ্জক রচনার দৃষ্টিগ্রাহ্য উপকরণগুলি রচনার ব্যঞ্জনাবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হয়। সাধারণ কবিতা-পাঠক কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদান সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে অসচেতন থাকলেও তা তার কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতার অংশ হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ-প্রকরণের দৃষ্টিগ্রাহ্যতা লিপিবদ্ধ মুদ্রিত ব্যঞ্জক রচনার অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
    সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
    যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
    দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা —
        তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
        এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত!

ওপরে বাঙালি কবিতা-পাঠকের কাছে খুবই পরিচিত রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের দু-টি কবিতার দু-টি অংশ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে সাদা পৃষ্ঠার ওপর দু-দিকে সাদা খালি অংশের মাঝখানে বিশেষ আনুভূমিক বা / এবং উল্লম্ব বিন্যাসে উপস্থাপিত কবিতার মুদ্রিত অংশ দু-টি। দৃষ্টি বিশেষ বিন্যাসে উপস্থাপিত ভাষিক উপাদানগুলি শব্দ, বাক্য, সিঁড়ির মতো বিন্যস্ত পঙ্ক্তি ও স্তবক-সংগঠনের পথ ধরে এগিয়ে যায়। এর সঙ্গে প্রথম কবিতাংশটির ছন্দ, মিল, অনুপ্রাস, স্বরসাম্য আর দ্বিতীয় কবিতাংশের রূপক মিশ্রিত বর্ণনা, শেষে মাঝখানে বিরতি-নির্দেশক ফাঁক দিয়ে একই বাক্যাংশ 'তোমার নগ্ন নির্জন হাত'-এর পুনরাবৃত্তি দৃষ্টির মাধ্যমে শ্রুতির অভিজ্ঞতার পরিণতি লাভ করে আর উভয়ের মিথস্ক্রিয়ায় কবিতার পঠন-পরিগ্রহণের অভিজ্ঞতাকে ঋদ্ধ করে। তারপর সেই আবেদন পাঠকের দৃষ্টি আর শ্রুতির প্রণালী ধরে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে ছড়িয়ে পড়ে রচনার পঠন-পুনর্নির্মাণের মানসিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির সৃষ্টি করে। যদি পৃষ্ঠায় দৃষ্টিগ্রাহ্য বিন্যাসের সাদা অংশ যথাসম্ভব মুছে দিয়ে, শব্দ-সংগঠন সামান্য পালটে দিলে কীভাবে ভাষিক রচনার কাব্যত্ব লোপ পায় তার পরীক্ষা করা যায় :

> সন্ধ্যা যদিও মন্দ মন্থরে আসছে, ইঙ্গিতে সব সংগীত থেমে গেছে, অনন্ত অম্বরে যদিও সঙ্গী নেই, ক্লান্তি যদিও অঙ্গে নেমে আসছে, মহা আশঙ্কা মৌন মন্তরে জপছে, অবগুণ্ঠনে ঢাকা দিক্-দিগন্ত — বিহঙ্গ, তবু ওরে আমার বিহঙ্গ, অন্ধ, এখনি পাখা বন্ধ কোরো না।
>
> তরমুজ মদ রক্তিম গেলাসে, রৌদ্রের রক্তাভ বিচ্ছুরিত স্বেদ পর্দায়, গালিচায়। নির্জন নগ্ন তোমার হাত; তোমার হাত নির্জন নগ্ন!

৩.৪. বাংলা কবিতার ভাববাদী রোমান্টিক আলোচনার অনুবৃত্তি

বাংলা ভাষার কবিতার আলোচক-সমালোচকরা সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ বা / এবং মুদ্রিত ভাষিক রচনার, বিশেষ করে কবিতার ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার অর্থাৎ ভাষিক উপাদানের বিন্যাস, ছন্দস্পন্দনের গতি বা ছন্দবিরতি নির্দেশক সাদা অংশ আর মুদ্রিত শব্দ বা / এবং বাক্যের সংগঠন (যেমন প্রথম কবিতাংশে সিঁড়ির বিন্যাসে ছন্দস্পন্দনের ঢেউ-এর তরঙ্গায়িত উত্থান-পতন, স্তবকের ছন্দস্পন্দনের অবরোহী গতি, দ্বিতীয় কবিতাংশে 'তোমার নগ্ন নির্জন হাত' পঙ্ক্তিটির সাদা অংশের বিরতির পর পুনরাবৃত্তি) এসব নিয়ে আলোচনা তো দূরের কথা, উল্লেখ পর্যন্ত করেন না। এর কারণ, এ-দেশে কবিতা সম্পর্কে আলোচনা আজও উনিশ শতকীয় ভাববাদী অ্যাংলো-স্যাক্সন ধ্রুপদী রোমান্টিক কাব্যমীমাংসার (সেন্টসবেরি, ম্যাথু আর্নল্ড, রোমান্টিক কবিরা...) দ্বারা একান্তভাবে প্রভাবিত বিদ্যায়তনিক ও ব্যক্তিগত পঠনের দ্বারা নির্ধারিত। অতএব, পাঠক তথা আলোচক-সমালোচকরা মুদ্রিত কবিতার ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার ভূমিকা সম্পর্কে নীরব, কিন্তু নীরব হলেও তাঁরা কবিতাপাঠক হিসেবে, হয়তো-বা অসচেতনভাবে, এই দৃষ্টিগ্রাহ্যতার ভূমিকা উপলব্ধি করতে বাধ্য।

৪. ছবি লেখা[২৭]

৪.১. ছবি লেখা : অন্তরঙ্গ : চিত্রকল্প

কবিতার ভাষিক সংবিধির মধ্যে মানসিক দৃষ্টিগ্রাহ্যতা সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস হল চিত্রকল্পের ব্যবহার। সাধারণভাবে কোনো রচনায় বর্ণনা, ভাবধ্বনির ব্যবহার, তুলনামূলক বিভিন্ন অর্থালংকার, ছন্দস্পন্দন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির কাছে আবেদন করতে পারে। এর মধ্যে যা দৃষ্টির কাছে আবেদন জানায়, তাকে আমরা সাধারণত 'চিত্রকল্প' বলি। আবেদন শ্রুতি, গন্ধ, স্পর্শ বা স্বাদের কাছেও হতে পারে, অথবা মিশ্র, অর্থাৎ একই সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাছেও হওয়া সম্ভব। তাই আমরা 'চিত্রকল্প' শব্দটির অর্থ-পরিধি পার হয়ে 'ভাবকল্প' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি।

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরশিঃ।
(মহেশ্বরও চাঁদ ওঠার শুরুতে সমুদ্রের জলরাশির মতো সামান্য অশান্ত হয়ে উঠলেন।)

বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি সন্ধ্যাতারা সম ওঠে ফুটি।

ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি বহ্নি আকাশ জুড়িল।

মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে আলতাপাটি শিম।

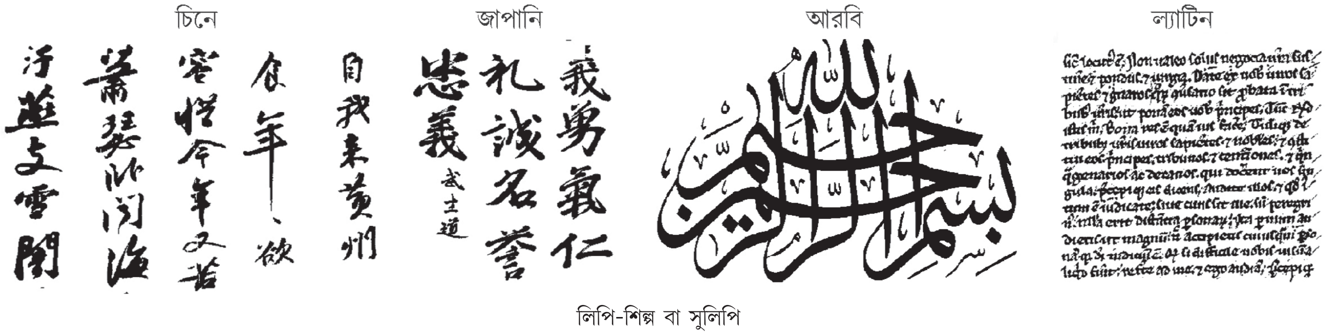
ওপরে উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলির মধ্যেও শ্রুতির কাছে আবেদনের সঙ্গে দৃষ্টির কাছে আবেদনের মিশ্রণে পাঠকের উপলব্ধিতে গড়ে উঠেছে দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবি।

৪.২. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ

রচনায় চিত্রকল্পের ব্যবহার, অর্থাৎ বর্ণনার মাধ্যমে চিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি ভাষাশিল্পী লিখতে গিয়ে কাগজ বা অন্য কোনো স্থানিক উপাদানের ওপর ভাষার লিপির (উল্লম্ব ও আনুভূমিক রেখাচিত্র) ব্যবহারের মধ্যেই দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পবস্তু (রং ও রেখার) সৃষ্টির অনুপ্রেরণা বোধ করেন। গিয়োম আপলিনের তাঁর চিত্রকবিতা লেখার যুগে এই মানসিকতা থেকে তাঁর চিত্রকর বন্ধুদের কথা মনে রেখে বলেছিলেন, 'আর আমিও তো চিত্রশিল্পী' (Et moi aussi je suis peintre)। এই মনোভাবের প্রেরণায় প্রাচীন যুগ থেকে বিভিন্ন ভাষায় রচনার, বিশেষ করে ব্যঞ্জক রচনার লিপির রূপায়ণে ভাষাশিল্পীর শিল্পচিন্তা দৃষ্টিগ্রাহ্যতার নান্দনিক অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যে ব্যঞ্জক রচনা লিপিবদ্ধ করার দৃষ্টিগ্রাহ্য নান্দনিক পদ্ধতিগুলো দেখা যায়, তাকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

৪.২.১. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ : লিপি-শিল্প

সাধারণভাবে বিভিন্ন ভাষায় লিপির ব্যবহারে কিছু লিখতে বা কোনো রচনা নকল করতে গিয়ে লিপিকারদের মধ্যে কারো-কারো মনে হত, আজও মনে হয়, লেখাকে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় করা যায়। সুন্দর করে লেখার চেষ্টার মাধ্যমে তৈরি হল সুলিপি বা লিপি-শিল্প[২৮]। লিপির রৈখিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোনো-কোনো ভাষায় (যেমন, জাপানি, চিনে, কোরীয়) তা ঐতিহ্যময় শিল্পের পরিণতি লাভ করেছে। আবার ইসলাম ধর্মে যেহেতু মহম্মদের কোনো ছবি আঁকা নিষিদ্ধ, তাই আরবিতে কোরানের পবিত্র বাণী (ছুরা) লেখার বা খোদাই করার প্রথা সুলিপির ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করল।



লিপি-শিল্প বা সুলিপি

মুদ্রণের যুগে ধীরে-ধীরে লিপি-শিল্পের অনুসরণে বিভিন্ন অলংকৃত হরফ উদ্ভাবিত হয়, আর মুদ্রণেও লিপি-শিল্পের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.২.২. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ : লেখা + ছবি



একাদশ-দ্বাদশ শতকের বৌদ্ধ-তান্ত্রিক পুথি



মধ্যযুগীয় ল্যাটিন পুথি

রচনার চিত্রায়ণ[২৯], অর্থাৎ লেখা বা রচনার বিষয়বস্তু অনুযায়ী রচনার মধ্যে বা সঙ্গে ছবির উপস্থাপনা। উপরচনা হিসেবে এই ছবি পাঠকের পঠন-পরিগ্রহণের সহায়ক।



বাশো-র হাইকু

৪.২.৩. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ : ছবির ওপর লেখা

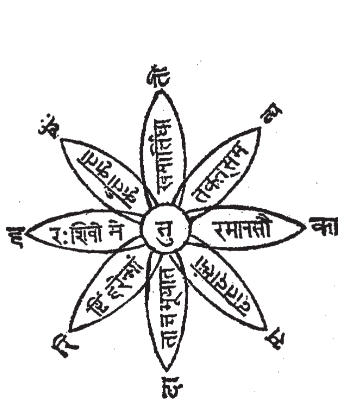
কবিতার বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গত ছবির মধ্যে লেখাকে স্থান দিয়ে রচনাকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার রীতি জাপানি হাইকু-র একটা বৈশিষ্ট্য (যেমন, জাপানি কবি বাশো-র কিছু হাইকু)।

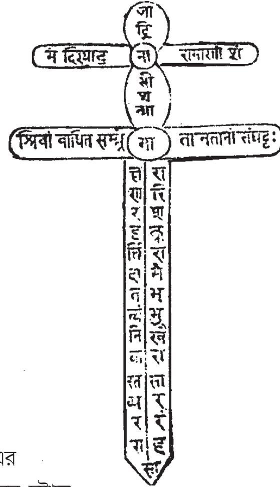
৪.২.৪. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ : চিত্রকবিতা

লিপিবদ্ধ রচনার দৃষ্টিগ্রাহ্য উপস্থাপনায় আরও কিছু পদ্ধতি গড়ে উঠল, যার ফলশ্রুতিকে আমরা 'চিত্রকবিতা' নামে অভিহিত করছি। চিত্রকবিতায় রচনাকে ছবির আকার দিয়ে (ছবির আকারে সাজিয়ে) উপস্থাপিত করা হত বা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রচনার বিষয় ও ছবির আকারে বিন্যাসের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকত বা থাকে।

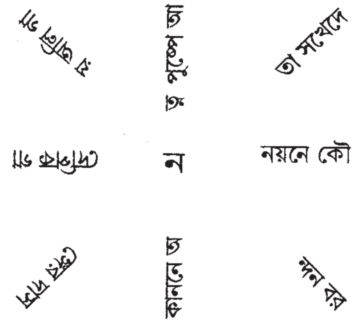
৪.২.৪.১. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ : সংস্কৃত কবিতায় 'চিত্রালংকার'

রচনার শব্দালংকার হিসেবে রচনাকে বা তার অংশকে চিত্রাকারে বিন্যস্ত ও উপস্থাপিত করাকে চিত্র বা চিত্রালংকার বলা হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে এই শব্দালংকার-এর সংজ্ঞার্থ হল : 'পদ্মাদ্যাকারহেতুত্বে বর্ণানাং চিত্রমুচ্যতে' (পদ্ম ইত্যাদি আকারে বিন্যস্ত বর্ণগুলিকে চিত্র বলে)। তারপর বলা হয়েছে : 'আদি শব্দাৎ খড়্গ-মুরজ-চক্র-গোমূত্রিকাদয়ঃ' (আদি শব্দে খড়্গ, মুরজ, চক্র, গোমূত্র ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে)। উনিশ শতকে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর *কাব্যনির্ণয়* (প্রথম সংস্করণ, ১৮৬২) গ্রন্থে শব্দালংকার বিভাগে চিত্রালংকারের যে সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন তা হল : 'শব্দ দ্বারা কোনরূপ চিত্র অঙ্কিত করার নাম চিত্রালংকার'। চিত্রালংকারের দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি একটি পদ্মবন্ধ উপস্থাপিত করেছেন :





বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত *সাহিত্যদর্পণ*-এর
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত টীকায় চিত্রালংকারের দৃষ্টান্ত



কাব্যনির্ণয়, লালমোহন বিদ্যানিধি

৪.২.৪.২. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ : চিত্রকবিতা : 'শিল্পের খেলা'

প্রাচীন গ্রিসে এ-ধরনের কবিতাকে বলা হত 'শিল্পের খেলা' (তেখনোপেখনিয়া / τεχνοπαίγνια)। ধ্রুপদী গ্রিক চিত্রকবিতার দুটো শ্রেণি দেখা যেত। ১. বেদি-কবিতা, অর্থাৎ কোনো দেবতা বা মহৎ পুরুষের উদ্দেশে কোনো স্মৃতি-স্তম্ভ বেদিতে খোদাই করার জন্য বেদির আকারে লেখা বা বিন্যস্ত কবিতা। ২. প্রধানত যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত কোনো অস্ত্রের আকারে বিন্যস্ত কবিতা।

ΣΙΜΙΟΥ ΩΙΟΝ.

Κωτίλας
Τῆ τόδ' ἄτριον νέον
Πρόφρων δὲ θυμῶι δέξο· δὴ γὰρ ἁγνᾶς
Τὸ μὲν θεῶν ἐριβόας Ἑρμᾶς ἔκιξε κᾶρυξ
Ἄνωγε δ' ἐκ μέτρου μονοβάμονος μέγαν πάροιθ' ἀέξειν
Θοῶς δ' ὕπερθεν ὠκὺ λέχριον φέρων ἆλμα ποδῶν σποράδην πίφαυσκεν
Θοαῖς ἴσ' αἰόλαις νεβροῖς κῶλ' ἀλλάσσων ὀρσιπόδων ἐλάφων τέκεσσιν
Παλιγκραίπνοισιν ἄκρων ὑπὲρ ἱέμεναι ποσὶ λόφων κατ' ἀρθμίας ἴχνος τιθήνας
Καί τις ὠμόθυμος ἀμφίπαλτον αἶψ' αὐδὰν θὴρ ἐν κόλπωι δεξάμενος θαλαμᾶν μυχοιτάτωι
Καὶ τᾶσδ' ὦκα βοᾶς ἀκοὰν μεθέπων ὅγ' ἄφαρ λάσιον νιφοβόλων ἀν' ὀρέων ἔσσυται ἄγκος
Ταῖσιν δὴ κλυτὸς ἴσα θεὸς ταχιναῖσι θοοῖς δονέων ποσὶ πολύπλοκα μεθίει μέτρα μολπᾶς
Ῥίμφα πετρόκοιτον ἐκλιπὼν ὄρους' εὐνάν, ματρὸς πλαγκτὸν μαιόμενος βαλιᾶς ἑλεῖν τέκος
Βλαχαὶ δ' οἰῶν ἔτι πουλυβότων ἀν' ὀρῶν νομὸν ἔβαν τανυσφύρων τ' ἐς ἄντρα Νυμφᾶν
Ταὶ δ' ἀμβρότωι πόθωι φίλας ματρὸς ῥώοντ' αἶψα μεθ' ἱμερόεντα μαζόν
Ἴχνει θενὼν βροτοῖσι τὰν παναίολον Πιερίδων μονόδουπον αὐδάν
Ἀριθμὸν εἰς ἄκραν δεκάδ', ἰχνίων κόσμον νέμων τε ῥυθμόν
Φῦλ' ἐς βροτῶν ὑπὸ φίλας ἑλὼν πτέροισι ματρός
Λίγειά νιν κάμ' ἶφι ματρὸς ὠδίς
Δωρίας ἀηδόνος
Ματέρος.

ΔΩΣΙΑΔΟΥ ΒΩΜΟΣ.

Ἦν ἄρσενός με στήτας
Πόσις μέροψ δίστιβος
Τεῦξ', οὐ σποδεύνας ἶνις Ἐμπούσας, μόρος
Τεύκροιο βούτα καὶ κυνὸς τεχνάσματος,
Χρύσας δ' ἀΐτας ἆμος ἐψάνδρα
Τὸν γυιόχαλκον οὖρον ἔρραισεν
Ὃν ὠπάτωρ δίσευνος
Μόγησε ματρόριπτος.
Ἐμὸν δὲ τεῦγμ' ἀθρήσας
Θεοκρίτοιο κτάντας
Τριεσπέροιο καύστας
Θῶυξεν αἶν' ἰύξας·
Χάλεψε γάρ νιν ἰῶι
Σύργαστρος ἐκδὺς γῆρας.
Τὸν δ' αἰλινεῦντ' ἐν ἀμφικλύστωι
Πανός τε ματρὸς εὐνέτας φώρ
Δίζωος ἶνίς τ' ἀνδροβρῶτος ἰλορραιστᾶν
Ἦρ' ἀρδίων ἐς Τευκρίδ' ἄγαγον τρίπορθον:

'শিল্পের খেলা' : দু-টি প্রাচীন গ্রিক কবিতা

৪.২.৪.৩. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ : চিত্রকবিতা : কার্মিনা ফিগুরাতা

ল্যাটিনে এ-ধরনের চিত্রকবিতাকে বলা হত 'কার্মেন ফিগুরাতুম' (আকৃতি যুক্ত কবিতা, একবচন, — বহুবচনে 'কার্মিনা ফিগুরাতা' / carmina figurata)। ল্যাটিনে গ্রিক চিত্রকবিতার অনুকরণে রচিত বেদির আকারে ও মানুষ বা পশুর আকারে চিত্রকবিতা ছাড়া নবজাগরণের যুগে কালো হরফের রচনার মধ্যে কিছু হরফকে লাল করে পবিত্র কোনো শব্দ বা বাক্য তৈরি করা হত।

AVGVSTO VICTORE IVVAT RATA REDDERE VOTA

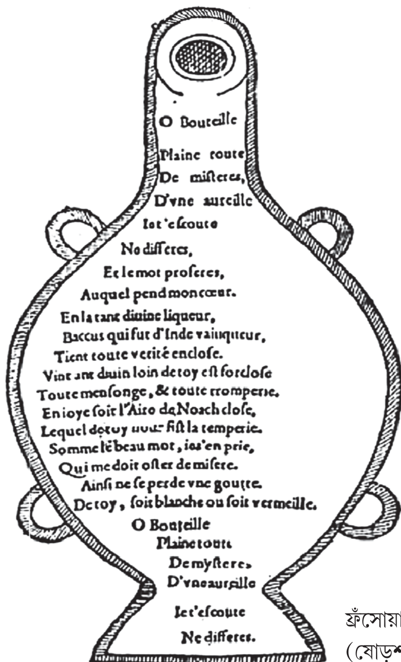
POSTMARTIOSLABORES OSIDIVISOMETIRILIMITECLIO
ETCAESARVMPERENNES VNALEGESVIVNOMANANTIAFONTE
VIRTVTIBVSPERORBEM AONIOVERSVSHEROIIVREMANENTE
TOTLAVREASVIRENTES AVSVRODONETMETRIFELICIATEXTA
ETPRINCIPISTROPAEA AVGERILONGOPATIENSEXORDIAFINE
FELICIBVSTRIVMPHIS EXIGVOCVRSVPARVOCRESCENTIAMOTV
AVGVSTARITESAECLIS VLTIMAPOSTREMODONECFASTIGIATOTA
EXSVLTATOMNISAETAS ASCENSVIVGICVMVLATOLIMITECLAVDAT
VRBESQVEFLOREGRATO VNOBISSPATIOVERSVSELEMENTAPRIORIS
ETFRONDIBVSDECORIS DINVMERANSCOGENSAEQVARILEGERETENTA
TOTISVIRENTPLATEIS PARVANIMISLONGISETVIASDISSONAMVLTVM
HINCORDOVESTECLARA TEMPORESVBPARILIMETRIRATIONIBVSIDEM
CVMPVRPVRISHONORVM DIMIDIVMNVMERORYTHMOTAMENAEQVIPERANDO
FAVSTOPRECANTVRORE HAECERITINVARIOSSPECIESAPTISSIMACANTVS
FERVNTQVEDONALAETI PERQVEMODOSGRADIBVSSVRGETFECVNDASONORIS
IAMROMACVLMENORBIS AERECAVOETTERETICALAMISCRESCENTIBVSAVCTA
DATMVNERAETCORONAS QVISBENESVBPOSITISQVADRATISORDINEPLECTRIS
AVROFERENSCORVSCAS ARTIFICISMANVSINNVMEROSCLAVDITQVEAPERITQVE
VICTORIASTRIVMPHIS SPIRAMENTAPROBANSPLACITISBENECONSONARYTHMIS
VOTAQVEIAMTHEATRIS SVBQVIBVSVNDALATENSPROPERANTIBVSINCITAVENTIS
REDDVNTVRETCHOREIS QVOSVICIBVSCREBRISIVVENVMLABORHAVDSIBIDISCORS
MESOBSINIQVALAETIS HINCATQVEHINCANIMATQVEAGITANSAVGETQVERELVCTANS
SOLLEMNIBVSREMOTVM COMPOSITVMADNVMEROSPROPRIVMQVEADCARMINAPRAESTAT
VIXHAECSONARESIVIT QVODQVEQVEATMINIMVMADMOTVMINTREMEFACTAFREQVENTER
TOTVOTAFRONDEFOEBI PLECTRAADAPERTASEQVIAVTPLACITOSBENECLAVDERECANTVS
VERSVQVECOMPTASOLO IAMQVEMETROETRYTHMISPRAESTRINGEREQVICQVIDVBIQVEEST

SANCTEDECVSMVNDIACRERVMSVMMASALVTIS
LVXPIATERRARVMTESOLOPRINCIPESAECLIS
INMENSVMGAVDEREBONISDATVRAVREAVENIT
SVMMOMISSADEOFVSISPATERALMETYRANNIS
IVSTITIAINTERRASETGLORIACANDIDAVERI
TEQVEDVCEMAGERATAPIDESETIVRARENATA
TOTAQVEPERCVLSISINGENTIMOLETYRANNIS
ASPERAVISPOSITAESTBELLIRESITALAIVRE
SCEPTRADABITPOPVLISVOTOPIVSORBISEOI
AVGVSTHINVICTASNVNDITRANSIBISINORAS
TEQVESVPLEXTOTISDVCIBVSSTIPATASYENE
ORATIVBACVPITLVCISSIBIGAVDIANOSTRAE
OPTATAMATFALLAXENPERFIDATELAPVGARVM
PARTHVSDEPOSVITEVITORISVNDIQVERVBRI
LITORISAETHERIOENVTVCERTAMINEAMORIS
MEDVSARAPSMOXOMNISOVATLAVDARESERENI
ORISLVSTRATVIDATVERISSANCTETROPAEIS
HAECMAGEFELICESTITVLOSVINCASVTAMORE
AVREAPERPETVORESTAVRANSSAECVLAMVNDO
INDVSETAVRORAEMILESQVOSFLVMINENILVS
TANGITFECVNDISVENTVRVSPRVGIFERVNDIS
ORANTESPIAIVRAPETENTGENSNOBILISORTV
AETHIOPESCVNCTIPARENTOPTATAQVEMVNDI
TEMPORALAETADEDITNOBISFELICIVSAEVVM
ENSVPLICESPERSAEIVRASIBIREGIANOLVNT
TEDOMINVMMALVNTFVSITVASEMPERADORANT
ORASVISCVPIVNTTOTISTIBICEDEREREGNIS
TVPIVSETIVSTIVEREMEMORINCLYTELAETIS
DARESPONSABONOSEMPERMITISSIMVSORBIS
INPERTIRETVVMCLEMENTERETADDITONVMEN
SVNTMAGEFELICESPARITERQVOSALMETVERE
ENREPARATAIVGANSMAESTIDIVORTIAMVNDI
ORBESIVNGEPARESDETLEGESROMAVOLENTIS
PRINCIPETEINPOPVLOSMITIFELICIVSAEVO
OMNIALAETENTVRFLORENTIBVSAVREAREBVS

'আকৃতি যুক্ত কবিতা' : দু-টি ল্যাটিন চিত্রকবিতা

৪.২.৪.৪. ছবি লেখা : বহিরঙ্গ : আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় চিত্রকবিতা

ষোড়শ শতকের ফরাসি লেখক ফ্রঁসোয়া রাবলে-র (François Rabelais, ১৪৮৩ বা ১৪৯৪-১৫৫৩) রচনাবলির পঞ্চম গ্রন্থে পবিত্র বোতল (La dive bouteille), অর্থাৎ মদের বোতলের ছবির মধ্যে বাকুসের বন্দনা দেখা যায়। এই পঞ্চম গ্রন্থ রাবলের রচনা কিনা, এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবু একে ফরাসি ভাষায় প্রথম চিত্রকবিতা বলে অভিহিত করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শার্ল-ফ্রঁসোয়া পানার-এর (Charles-François Panard, ১৬৮৯-১৭৬৫) মুদ্গারকবিতা (Vers rhopaliques), বোতল, পানপাত্র খুবই বিখ্যাত। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় চিত্রকবিতা দেখা যায়।



ফ্রঁসোয়া রাবলে
(ষোড়শ শতক)

Das Horn der Glükkseligkeit.

Schöne Früchte:
Blumen/ Korn/
Kirschen/ äpfel/
Birn'/ und Wein/
Und was
sonst mehr
kan seyn/
sind hier
in diesem
HORN/
das Glükk/
auf daß
es uns
erquikk'/
hat selbst
es so
mit hüll
und füll
erfüllt.
wol dem/
dem es
ist
mild.

স্বর্গসুখের শিঙা, ইয়োহান স্টেইনমান
(সপ্তদশ শতক)

Nous ne pouvons rien trouver sur la terre.
Qui soit si bon ni si beau que le verre.
Du tendre amour berceau charmant
C'est toi, champêtre fougère,
C'est toi qui sers à faire
L'heureux instrument
Où souvent pétille,
Mousse et brille
Le jus qui rend
Gai, riant,
Content,
Quelle douceur
Il porte au cœur !
Tôt,
Tôt,
Tôt,
Qu'on m'en donne,
Qu'on l'entonne,
Tôt,
Tôt,
Tôt,
Qu'on m'en donne,
Vite et comme il faut ;
L'on y voit sur ses flots chéris
Nager l'allégresse et les ris.

Que mon
Flacon
Me semble bon !
Sans lui
L'ennui
Me nuit ;
Me suit,
Je sens
Mes sens
Mourans
Pesans.
Quand je le tiens
Dieux ! Que je suis bien !
Que son aspect est agréable !
Que je fais cas de ses divins présens !
C'est de son sein fécond, c'est de ses heureux flancs
Que coule ce nectar si doux, si délectable
Qui rend tous les esprits, tous les cœurs satisfaits.
Cher objet de mes vœux, tu fais toute ma gloire ;
Tant que mon cœur vivra, de tes charmants bienfaits
Il saura conserver la fidelle mémoire.
Ma muse, à te louer se consacre à jamais.
Tantôt dans un caveau, tantôt sous une treille,
Ma lyre, de ma voix accompagnant le son,
Répétera cent fois cette aimable chanson :
Règne sans fin, ma charmante bouteille ;
Règne sans cesse, mon cher flacon.

শার্ল-ফ্রঁসোয়া পানার
(অষ্টাদশ শতক)

Si
J'ai fui
Jusqu'ici
La tendresse,
C'est que sans cesse
L'on nous y redresse :
L'amant, dès qu'un doux sort
Paye son transport,
Prend la fuite,
Nous quitte
Et vite
Sort.

শার্ল-ফ্রঁসোয়া পানার
(অষ্টাদশ শতক)

হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান।
ফল্গু সম লুপ্ত আজি মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে!
দিবসের হৈমজ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল-অনিমিখ্,
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্ছিত দশদিক্!
রৌদ্র আজ রুদ্র ছবি আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল —
খিন্ন পিপাসায়;
হায়!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের *কুহু ও কেকা* (১৯১২) কাব্যগ্রন্থের
গ্রীষ্মের সুর কবিতার প্রথম স্তবক

Who
Are you
Who is born
In the next room
So loud to my own
That I can hear the womb
Opening and the dark run
Over the ghost and the dropped son
Behind the wall thin as a wren's bone ?
In the birth bloody room unknown
To the burn and turn of time
And the heart print of man
Bows no baptism
But dark alone
Blessing on
The wild
Child.

ডিলান টমাস
(১৯১৪-১৯৫৩)

৫. মালার্মে : কবিতার ভাষা-ব্যবহারে বিপ্লব

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কবিতা মহৎ ভাব, মহৎ আবেগ, প্রকৃতির রহস্য, ভাষার পরিশীলিত শুদ্ধতা, সুন্দর আর মঙ্গলের ধারণা, আর তারই সঙ্গে কবিত্ব ও কাব্যিকতার সাজানো আশ্রয় ছেড়ে অন্বেষণের অন্য এক জগতে বেরিয়ে পড়েছিল। এই অন্বেষণের শুরু ফরাসি কবিতায়। এই নতুন কবিতার কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন — বোদলের, র‍্যাঁবো, ভের্লেন, লোত্রেআমোঁ, মালার্মে। মালার্মে সবসময় ভাবতেন, '...tout, au monde, existe pour aboutir à un livre' (জগতে, সব কিছুই রয়েছে একটা বই-এ পরিণত হওয়ার জন্য)। তিনি এমন একটা কিছু লিখবেন, যা হবে তাঁর **বই**, যাতে থাকবে সবই, চিত্র আর সংগীত, যাতে তিনি জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দগুলিকে শুদ্ধতর একটা অর্থ দিতে পারবেন। তাঁর দীর্ঘকালের চিন্তা আর অন্বেষণ আর উপলব্ধির ফসল তাঁর শেষ কাব্যিক রচনা *পাশার একটা চাল কখনো আকস্মিকতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না* (*Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*); মালার্মের এই কবিতাটি একটি মুখবন্ধসহ ১৮৯৭ সালের মে মাসে *কসমোপোলিস* (*Cosmopolis*) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি দু-পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত বাক্যের শব্দগুলি বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন ধরনের বড়ো হাতের আর ছোটো হাতের হরফের; বাক্যগুলি আনুভূমিক আর উল্লম্বভাবে (সম্ভবত জাপানির অনুকরণে) পড়তে হবে। এর সঙ্গে পাতার বিরাট সাদা অংশ, বিরতি-নির্দেশক ফাঁক, ছেদচিহ্নের অনুপস্থিতি — এই রচনার পঠন-পরিগ্রহণে এ-সমস্ত উপাদান ব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। এই ১০ x ২ = ২০ পৃষ্ঠার কবিতাটি একই সঙ্গে পাঠ্য (রচনা), দৃশ্য (ছবি) আর শ্রোতব্য (সংগীত); অর্থাৎ এর মধ্যে রয়েছে তিনটি সাংকেতিক সংবিধির মিশ্রণ। এছাড়া এর আগের কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্যতার উপাদানগুলি প্রধানত আলংকারিক, কিন্তু মালার্মের আলোচ্য কবিতায় পৃষ্ঠার সাদা অংশ, ভাষিক উপাদানগুলির বিভাজন আর বিন্যাস, সব মিলিয়ে কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদানগুলি ভাষিক উপাদানের সমান গুরুত্বে রচনার অংশ। পাঠক-পরিগ্রাহক সমান্তরালভাবে দেখা-পড়ার মাধ্যমে রচনাটির পঠন-পুনর্নির্মাণ করেন। রইল রচনাটির একটি (যুগ্ম) পৃষ্ঠা।

মালার্মের 'পাশার চাল...' অনুবাদ করার দুঃসাহস কখনো আমার হয়নি। যেসব পাঠক কবিতাটির সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের খুবই অস্পষ্ট একটা ধারণা দেওয়ার জন্য বাংলায় একটা অনুরচনার খসড়া সঙ্গে দিলাম। ইংরেজিতেও বহু অনুবাদের মধ্যে 'ভালো' বলতে পারি, এমন কোনো অনুবাদ চোখে পড়েনি।

COMME SI

Une insinuation *simple*
au silence *enroulée avec ironie*
ou
le mystère
précipité
hurlé
dans quelque proche *tourbillon d'hilarité et d'horreur*
voltige *autour du gouffre*
sans le joncher
ni fuir
et en berce le vierge indice

COMME SI

যেন বা

সহজ একটা *কটাক্ষ*
নিস্তব্ধতার ভেতর *শ্লেষে মোড়ানো*
বা
ছুঁড়ে মারা
আর্তনাদ করা
রহস্য
কাছাকাছি কোনো *হাসাহাসি* *আতঙ্কের ঘূর্ণিতে*
অতল গহ্বরকে ঘিরে *উড়ে বেড়াচ্ছে*
তাকে ছড়িয়ে না দিয়ে
বা পালিয়ে না গিয়ে
আর তার অপাপবিদ্ধ লক্ষণকে দোলনায় দোলাচ্ছে

যেন বা

শুধুমাত্র কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্যতার আলোচনায় নয়, সাধারণভাবে ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার লিখন আর পঠনের ইতিহাসকে **মালার্মের আগে** আর **পরে** — এই দু-টি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়, মেক্সিকোর কবি ওক্তাভিয়ো পাস-এর সঙ্গে একমত।

৬. মালার্মের পরে : 'আমাদের চাই নতুন ধ্বনি নতুন ধ্বনি নতুন ধ্বনি'

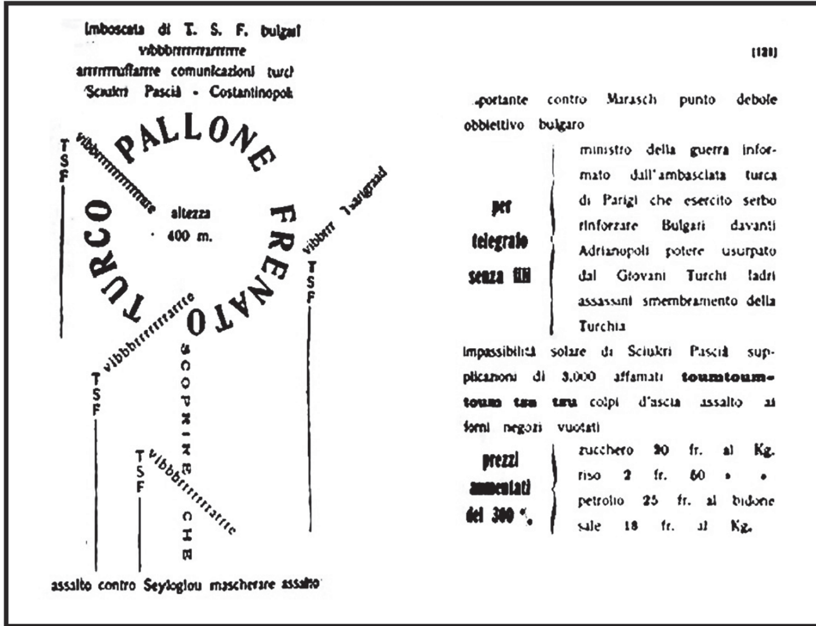
বিশ শতকের শুরু থেকে পাশ্চাত্যে শিল্প-সাহিত্যের জগতে নানা আন্দোলনের ভাঙা-গড়া শুরু হল। তার মধ্যে বিশেষভাবে সাহিত্য জগতের কয়েকটি আন্দোলনের কথা আমরা বলব। এই আন্দোলনগুলির পাশে কয়েকজন ব্যক্তি-কবির প্রয়াসের কথাও বাদ দেওয়া সম্ভব হবে না। মালার্মের আগে পর্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্যতা ছিল কবিতার ভাষিক উপাদানের পাশাপাশি দৃশ্য আকারপ্রদ উপাদান। বিশ শতকে অনেকের রচনায় শ্রুতিগ্রাহ্য আর দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদান অবিচ্ছেদ্যভাবে একাকার হয়ে গেল। এছাড়া বহু-ব্যবহৃত ভাষার সংজ্ঞাপন-ক্ষমতা সম্পর্কেও অটল বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছিল।

> আর এই পুরোনো ভাষাগুলো এমনই মরোমরো যে
> সত্যি বলতে কি শুধু অভ্যাসবশে আর সাহসের অভাবে
> আজও ওদের কবিতায় ব্যবহার করা হচ্ছে
>
> — *বিজয়*, গিয়োম আপলিনের

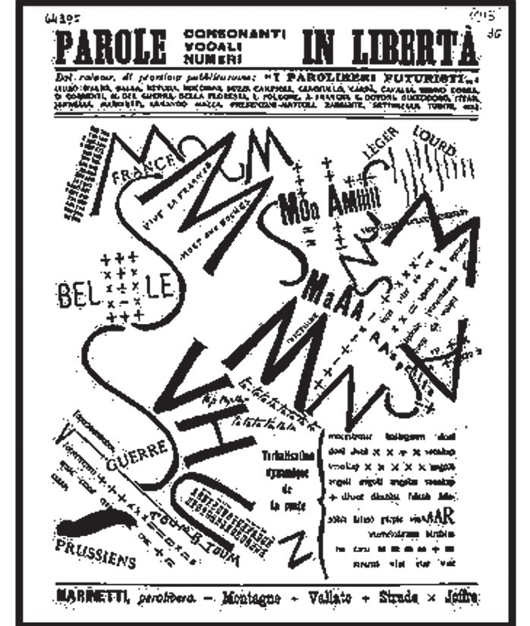
আর ওই মুমূর্ষু ভাষা, তার ব্যাকরণ আর তার শব্দগুলিকে ভাঙচুর করার প্রবণতাও নতুন সাহিত্য-আন্দোলনকে চিহ্নিত করল।

৬.১. ভবিষ্যৎবাদ : শব্দের মুক্তি

১৯০৯ সালে ইতালিয়ান ফিলিপ্পো তোম্মাজো মারিনেত্তি (Filippo Tommaso Marinetti, ১৮৭৬-১৯৪৪) ফরাসি পত্রিকা *ল ফিগারো*-তে (*Le Figaro*, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯) ভবিষ্যৎবাদী শিল্প-আন্দোলনের ইস্তাহার বা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। ভবিষ্যৎবাদ পুরোনো শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করে নতুন পৃথিবী, গতিশীল যন্ত্রযুগ আর নাগরিক জীবনের পক্ষপাতী শিল্পসৃষ্টির কথা বলে। মারিনেত্তি ভাষার পুরোনো ছক ভেঙে রচনা করেন 'মুক্তি পাওয়া শব্দ' (Parole in liberta) আর ধ্বনিময় কবিতা। ১৯১২ থেকে ১৯১৪ সালে বলকান যুদ্ধে রিপোর্টার হিসেবে কাজ করার সময় আদ্রিয়ানোপল-এর অবরোধের লড়াই-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে 'জাং তুম্ব্ তুম্ব্' (*Zang Tumb Tumb*) নামে মারিনেত্তির একটি রচনা প্রকাশিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা, বিভিন্ন ধরনের গুলি-গোলার আওয়াজ, সবকিছুর সমন্বয়ে এই রচনার মধ্যে রয়েছে মুক্তি পাওয়া শব্দ, ধ্বনি-কবিতা (তৈরি করা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যার আবেদন দৃষ্টির প্রণালী ধরে শ্রুতিতে), বিভিন্ন ধরনের আর মাপের হরফ আর মুদ্রণবিন্যাসের বিভিন্ন সম্ভাবনার ব্যবহার। বস্তুত ভবিষ্যৎবাদীদের সৃষ্টির মধ্যে শিল্পবিপ্লবের পরের বিশ শতকের পৃথিবীর দৃষ্টিগ্রাহ্য নতুন কবিতার আবির্ভাব অনুভব করা যায়।



জাং তুম্ব্ তুম্ব্-এর দু-পৃষ্ঠা, মারিনেত্তি



মুক্তি পাওয়া শব্দ (*Parole in liberta*), মারিনেত্তি

৬.২. গিয়োম আপলিনের আর ব্লেজ সঁদ্রার

ভবিষ্যৎবাদ আর তার পরের শিল্প-আন্দোলন দাদা আর সুররিয়ালিজম-এর মাঝখানে দু-জন ফরাসি ভাষার কবির নাম করতে হয়। এ দু-জন হলেন গিয়োম আপলিনের আর ব্লেজ সঁদ্রার। দু-জনেই ছিলেন ওই সময়ের তরুণ শিল্পী আর সাহিত্যকারদের বন্ধু। এ দু-জনের কবিতায় তাঁদের সমকালীন ও পরবর্তীকালের সমস্ত শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলনের সূত্রপাত রয়েছে। এই দু-জনের কবিতাতেই বিশ শতকের কবিতার আধুনিকতার শুরু।

৬.২.১. গিয়োম আপলিনের : মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে নতুন একটা ভাষা

গিয়োম আপলিনের-এর প্রথম বই মধ্যযুগের 'পশুকথা'-র (ল বেস্তিয়ের / Le Bestiare) ছকে লেখা *পশুকথা*। মধ্যযুগের 'পশুকথা' লেখা হত প্রধানত বাইবেলে উল্লিখিত বাস্তব ও কল্পিত পশুপাখিদের চরিত্র অনুসরণ করে, কিছু নীতি উপদেশ থাকত। আপলিনের পরিচিত পশুপাখিদের কথা কৌতুক করে বলেছেন, তার মধ্যে কখনো-কখনো যোগ করেছেন পুরাবৃত্ত। ছোটো (প্রধানত চার পঙ্‌ক্তির, একটি পাঁচ পঙ্‌ক্তির আর কয়েকটি ছয় পঙ্‌ক্তির) কবিতাগুলির সঙ্গে রয়েছে রাউল দ্যুফি-র (Raoul Dufy, ১৮৭৭-১৯৫৩) কাঠখোদাই ছবি। এই ছবিগুলি উপরচনার স্তর পেরিয়ে রচনার দৃষ্টিগ্রাহ্য অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। এরপর ১৯১৪ সালে *লে সোয়ারে দ পারি* (*Les soirées de Paris*) পত্রিকার চতুর্বিংশতি সংখ্যায় (জুন) 'সমুদ্র-পত্র' (*Lettre-Océan*) নামে আপলিনের-এর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি কবির ছোটোভাই আলবেরকে (Albert) উদ্দেশ করে লেখা। কবিতাটির শব্দগুলি প্রথমে কয়েকটি পঙ্‌ক্তির আকারে থাকলেও, তার পরেই জ্যামিতিক বিন্যাসে চারদিকে ছড়ানো আর একটা বিশেষ আকারে সাজানো — যেন শব্দ দিয়ে একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবি তৈরি করা হয়েছে। আপলিনের এর নাম দিলেন 'ইদেওগ্রাম লিরিক' (Idéogramme lyrique)। চারদিকে আলোড়ন উঠল। পরে আপলিনের এ-জাতীয় চিত্রকবিতাকে 'ইদেওগ্রাম'-এর পরিবর্তে 'কালিগ্রাম' (Calligramme) নামে অভিহিত করলেন। 'Idéogramme' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'দৃশ্য-লিপি'। ভাষাতাত্ত্বিক অর্থে 'Idéogramme' বলতে বোঝায়, সেই লিপি, যাতে ধারণাকে ন্যূনতম রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এই লিপিতে ন্যূনতম রেখাচিত্র ধ্বনিমূল (ফোনিম) বা ধ্বনির পরিবর্তে শব্দমূল (মর্ফিম) বা শব্দকে সংকেতিত করে। চিনা ভাষার লিপির মৌলিক রূপ এই চিত্রলিপি। আর আপলিনের 'Calligramme' শব্দটি উদ্ভাবন করেন 'Calligraphie' (ইং. Calligraphy) শব্দ থেকে। শব্দটির মূল হল গ্রিক শব্দ 'কালিগ্রাফিয়া'। গ্রিক 'কালোস' শব্দের অর্থ : সুন্দর, সু, ভালো; আর 'গ্রাফিয়া' মানে হল : লিখন, অক্ষর, হস্তাক্ষর। এভাবে 'কালিগ্রাম' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় : সুলিখন বা সুন্দর হস্তাক্ষর। আপলিনের 'Calligramme' শব্দটির যে অর্থ দিলেন, তা হল : চিত্র-লিখন। তাঁর চিত্রকবিতাগুলি *কালিগ্রাম* (*Calligrammes*) কাব্যগ্রন্থে স্থান পেল। এই চিত্রকবিতা কবির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা কাব্যগ্রন্থটির নাম থেকে বোঝা যায়। প্রাচীন কাল থেকে যে চিত্রকবিতা রচিত হত, তা ছিল কৌতূহল জাগানো রচনার বহিরঙ্গ অলংকার, তার দৃষ্টিগ্রাহ্যতা রচনার অবিচ্ছেদ্য ব্যঞ্জক উপাদানে পরিণত হত না। আপলিনের তাঁর বন্ধু অঁদ্রে বিলি-কে একটি চিঠিতে জানান —

‘কালিগ্রাম’-এর কথায় বলতে হয়, ওগুলো হল মুক্তছন্দের কবিতার আদর্শ রূপ আর চলচ্চিত্র আর গ্রামোফোনের মতো পুনরুৎপাদনের নতুন মাধ্যমের উষায় মুদ্রণের হরফ যখন গৌরবের উজ্জ্বলতার মধ্যে তার কর্মময় জীবন শেষ করতে চলেছে, তখন সেই হরফের নিখুঁত কাজ।

রইল অনুবাদ সহ আপলিনের-এর দু-টি কালিগ্রাম —

IL PLEUT

Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir
cest vous aussi quil pleut merveilleuses rencontres de ma vie ô gouttelettes
et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires
écoute sil pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique
écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas

বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টির ধারায় ঝরে পড়ছে মেয়েদের কণ্ঠস্বর যেন তারা স্মৃতির মধ্যেও আর বেঁচে নেই
তোমরাও তো বৃষ্টির ধারায় ঝরে পড়ছ আমার জীবনের আশ্চর্য পরিচয়গুলি ও গো ছোট্ট ছোট্ট জলের ফোঁটা
আর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ঐ মেঘগুলি হ্রেষাধ্বনিতে ডেকে ওঠে শ্রুতিময় শহরে গড়া পুরো একটা জগত
বৃষ্টি হচ্ছে কিনা শোন অনুতাপ আর ঘৃণা যখন কান্নায় ধ্বনিত করে তোলে পুরনো একটা সঙ্গীত
শোন তোমাকে ওপরে নিচে বেঁধে রাখা বাঁধনগুলি সব ঝরে ঝরে পড়ছে

গিয়োম আপলিনের-এর চিত্রকবিতা ও তার লেখক-কৃত অনুবাদ

CŒUR COURONNE ET MIROIR

MoN CœUR PAREIL à UNE FLAMME RENVERSÉE

L R Q U M R
ES OIS UI EUR ENT
TOUR A TOUR
RENAISSENT AU CŒUR DES POETES

DANS CE MI ROIR JE SUIS EN CLOS VI VANT ET VRAI COM ME ON I MA GI NE LES AN GES ET NON COM ME SONT LES RE FLETS

Guillaume Apollinaire

হৃদয় রাজমুকুট আর আয়না

হৃদয় একটি উল্টে দেওয়া আগুনের শিখা মত

ঐ সব রাজারা যাঁরা কিনা একে একে মারা গিয়েছেন তাঁরা আবার জন্ম নেন কবিদের হৃদয়ে

এখানে এই আয়নাটার মধ্যে আমি আবদ্ধ জীবন্ত আর বাস্তব যেরকম দেবদূতদের কল্পনা করা হয় আর প্রতিবিম্বের মতন নয়

গিয়োম আপলিনের

গিয়োম আপলিনের-এর চিত্রকবিতা ও তার লেখক-কৃত অনুবাদ

৬.২.২. ব্লেজ সঁদ্রার : আমাকে নিয়ে চলো জগতের শেষ সীমায়

ব্লেজ সঁদ্রার কোনো আন্দোলনের মধ্যে না থাকলেও আপলিনের-এর পাশাপাশি বিশ শতকের আধুনিকতার অন্যতম প্রবক্তা। কী করে জীবনের সবকিছুই কবিতার বিষয় হতে পারে, সঁদ্রারের কবিতায় তা দেখা যায়। ১৯১৩ সালে শিল্পী সোনিয়া দলনে-র ছবির মধ্যে সঁদ্রারের *ট্রান্সসাইবেরিয়ার গদ্য...* কবিতাটি ছাপা হয়। বইটির দৈর্ঘ্য হয় দু-মিটার। যুগপৎ চিত্র আর কবিতার মিলিত এই সৃষ্টি, কবিতার দৃশ্য-পাঠ্যতার নতুন অভূতপূর্ব ইতিহাস রচনা করে। তাঁর অন্যান্য কবিতার মধ্যেও (যেমন, *Sonnets dénaturés* / *চরিত্র পালটানো সনেট*) পঙ্‌ক্তিগুলোর উপস্থাপন ও বিভিন্ন ধরনের হরফের ব্যবহার কবিতার ব্যঞ্জক দৃষ্টিগ্রাহ্যতার প্রতি সঁদ্রারের মনোযোগের স্বাক্ষর।



ফেরনাঁ লেজে-র চিত্রায়ণ সহ ব্লেজ সঁদ্রার-এর রচনা *পৃথিবীর শেষ*

OPOETIC

à Jean COctO

quels crimes ne cOmmet-On pas en tOn nOm !

Il y avait une fOis des pOètes qui parlaient la bOuche en rOnd
ROnds de saucissOn ses beaux yeux et fum*ée*
Les cheveux d'Ophélie Ou celle parfum*ée*
D'Orph*ée*
Tu rOtes des rOnds de chapeau pOur trOuver une rime en ée-aiguë cOmme des dents qui grignOtteraient tes vers
BOuche *bée*
Puisque tu fumes pOurquOi ne répètes-tu fum*ée*
C'est trOp facile Ou c'est trOp difficile
Les 7 PiOns et les Dames sOnt là pOur les virgules
Oh POE sie
Ah ! Oh !
CacaO
Puisque tu prends le tram pOurquOi n'écris-tu pas tramw*ée*
VOis la grimace écrite de ce mOt bien franç*ée*
Le clOwn anglais la fait avec ses jambes
COmme l'AmOur l'Arétin
L'Esprit jalOuse l'affiche du cirque et les pOstures alphabétiques de l'hOmme-serpent
Où sOnt les pOètes qui parlent la bOuche en rOnd ?

Il faut leur assOuplir les O s. z enfant h

POESJE

ব্লেজ সঁদ্রার (১৮৮৭-১৯৬১)-এর একটি সনেট

৬.৩. দাদা : দাদা হল একটা চিৎকার, দাদা-র কোনো মানে নেই

ইউরোপে তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে আগ্রহহীন ইউরোপীয় কিছু তরুণ লেখক আর শিল্পী নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জুরিখে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদেরই একজন য়ুগো বাল (Hugo Ball, ১৮৮৬-১৯২৭) লেখক আর শিল্পীদের মিলিত হবার জায়গা হিসেবে কাবারে ভলতের (Cabaret Voltaire) নামে একটি নাইট ক্লাব খোলেন। এখানেই ফরাসি ভাষার লেখক রুমানিয়ান ত্রিস্তঁ জারা-র সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় দাদা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ক্রমশ আন্তর্জাগতিক চরিত্র লাভ করে। শিল্পের বহু-ব্যবহৃত উপকরণগুলির সংজ্ঞাপন ক্ষমতা আর নেই, যাকে শিল্পত্ব কি কবিত্ব বলা হয়, তা আসলে কিছু রং-চটা ক্লিশে ছাড়া কিছুই নয়।

অতএব দরকার সবকিছু ভেঙে দেওয়া, ভেঙে নতুন করে গড়া। ভবিষ্যৎবাদের ভাঙাচোরা বাচিক উপাদান — বিভিন্ন ধরনের হরফ, পুরো বাক্যের বদলে বাক্যাংশ বা বিচ্ছিন্ন শব্দ, সাদা পাতায় উল্লম্ব, আনুভূমিক, সোজা, বাঁকা, বৃত্তাকার, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন মাপের হরফ — সব মিলিয়ে একটা সংরচনা[৩৩]। এই সংরচনার প্রাথমিক আবেদন দৃষ্টিগ্রাহ্যতা।

Le Corset Mystère

Mes belles lectrices,

à force d'en voir de **toutes les couleurs**
Cartes splendides, *à effets de lumière,* Venise

Autrefois les meubles de ma chambre étaient fixés solidement aux murs et je me faisais attacher pour écrire :

J'ai le pied marin

nous adhérons à une sorte de **Touring Club** sentimental

UN CHATEAU A LA PLACE DE LA TÊTE
c'est aussi le **Bazar de la Charité**
Jeux très amusants pour tous âges;
Jeux poétiques, etc.

Je tiens Paris comme — pour vous dévoiler l'avenir — votre main ouverte

la taille bien prise.

অন্তর্বাস রহস্য (১৯১৯), অঁদ্রে ব্রতোঁ (১৮৯৬-১৯৬৬)

kp' erioUM lp'er ioum
Nm' periii pERnououm
bpretiBerree eRREbe e e
ONNOo gplanpouk
konmpout pERIKOUL
RrEEe e EEee rrrreeeeA
oapAerrre EEE
mgl ed padANou
MTNou tnoum t

রাউল হাউসমান-এর রচনা (১৮৮৬-১৯৭১)

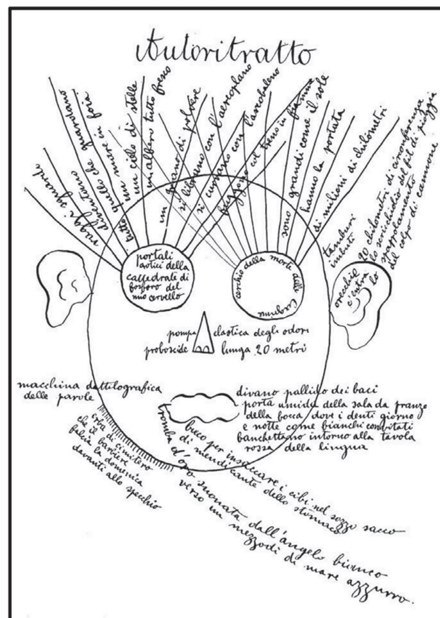


কেটে দেওয়া কবিতা (১৯২৪), মান রে (১৮৯০-১৯৭৬)

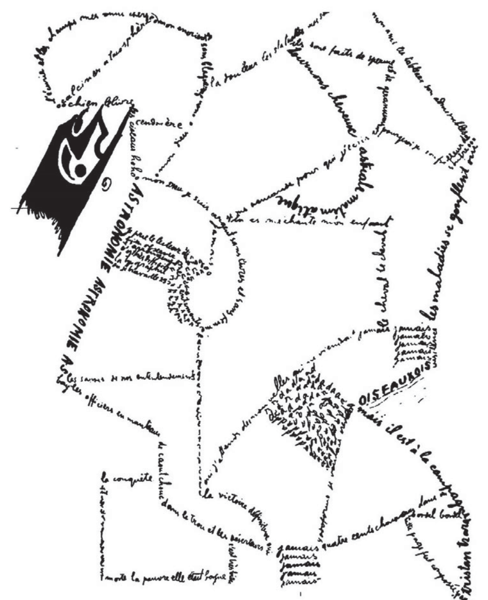
SUICIDE

A b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w
x y z

আত্মহত্যা (১৯২০), লুই আরাগোঁ (১৮৯৭-১৯৮২)



আত্মপ্রতিকৃতি (১৯১৫), কোর্রাদো গোভোনি



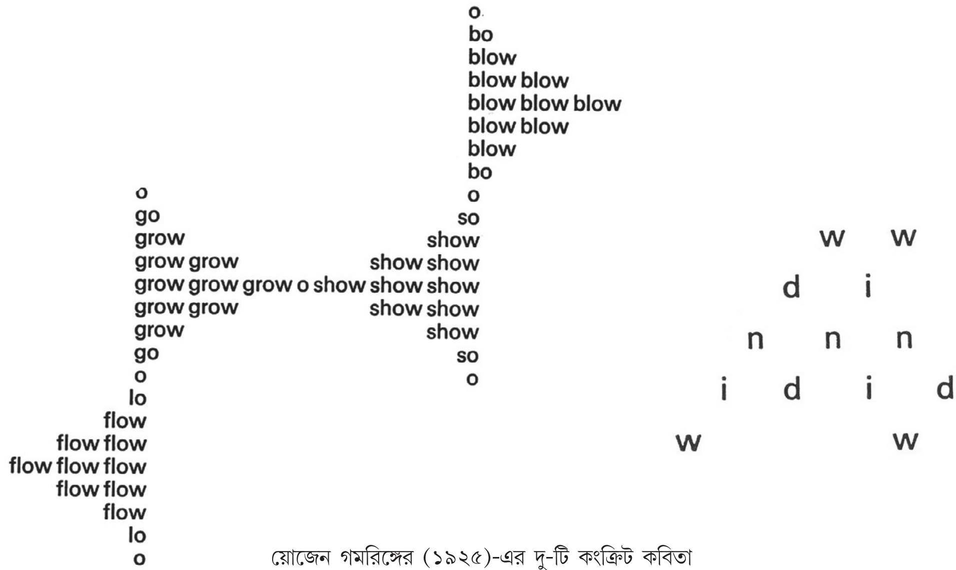
কালিগ্রাম, ত্রিস্তঁ জারা (১৮৯৬-১৯৬৩)

৬.৪ সুররিয়ালিজম : তাবৎ নান্দনিক বা নৈতিক দুর্ভাবনা পেরিয়ে

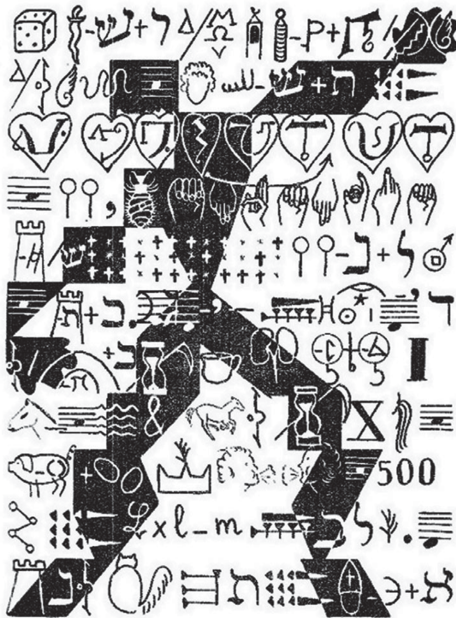
যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু-বছর পর ১৯২০ সালে দাদা-র প্রধান কেন্দ্র জুরিখ থেকে প্যারিসে এল। প্যারিসে আঁদ্রে ব্রতোঁ (Andre Breton), পল এল্যুয়ার (Paul Eluard), লুই আরাগোঁ (Louis Aragon) ইত্যাদি অনেকেই দাদা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে ব্রতোঁ-র প্রথম সুররিয়ালিস্ট ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার পর দাদা আন্দোলনের সমাপ্তি আর সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন শুরু হল। নাস্ত্যর্থক দাদা আন্দোলনের ভাঙা-গড়ার অভিজ্ঞতা, তার আগের প্রতীকী কবিতার প্রকাশ-প্রকরণ, ফ্রয়েড-এর মনোবিশ্লেষণ, মার্কসবাদ, হেগেল-এর দ্বন্দ্বতত্ত্ব সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে আত্তীকৃত হল।

৬.৫. লেত্রিজম, কংক্রিট কবিতা ইত্যাদি

এরপর লেত্রিজম, কংক্রিট কবিতা, ধ্বনিময় কবিতা, ডিজিটাল কবিতা, দৃশ্য কবিতা... ছোটো-বড়ো বিভিন্ন আন্দোলনে ভবিষ্যৎবাদ আর দাদা-র ঐতিহ্যেরই বিবর্তন দেখা যায়। এসব আন্দোলনের উৎপাদন প্রাথমিকভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য, এসব রচনার ভাষিক উপাদানকে দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদান থেকে আলাদা করা যায় না। তাই এই রচনাগুলির পঠন-পরিগ্রহণ তথা পুনর্নির্মাণ শুরু হয় দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদান থেকে।



য়োজেন গমরিঙ্গের (১৯২৫)-এর দু-টি কংক্রিট কবিতা



ইজিদর ইজু (১৯২৫-২০০৭)-র একটি লেত্রিস্ত কবিতা



টি. ফান টিজেন-এর একটি কোব্রা কবিতা

৭. শ্রুতি-র অন্বেষণ

গত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি, ১৯৬৫ সালে চটি (দুই থেকে তিন ফর্মার) একটা কবিতার কাগজ বের হয়। কাগজের কোনো প্রচার হয়নি, কাগজ বিক্রি হত না, বিলি করা হত। আমার অস্থির ভবঘুরে জীবনে অনেক কিছুর মতো এই কাগজের দু-টি বাদে বাকি সংখ্যাগুলো আমার কাছে আর নেই। এই কাগজের সঙ্গে আমার

নাম আজও জড়িয়ে আছে, তার কারণ বোধ হয় এই পত্রিকায় কবিতা সম্পর্কে আমাদের তখনকার বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে তাত্ত্বিক রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার বেশিরভাগই ছিল আমার লেখা। তাছাড়া শ্রুতি-র প্রথম সংখ্যায় বেদির ছকে সাজানো 'সূর্যস্তোত্র' নামে কাব্যিক রচনা অনেককে আলোড়িত করে, তারপর দ্বিতীয় সংখ্যায় আমি কবিতার মুদ্রণবিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার কথা বলি, এছাড়া কবিতায় ছেদচিহ্নের ব্যবহারও অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করি। পণ্ডিত পাঠকরা কংক্রিট কবিতার অনুসরণ বলে সোরগোল তোলেন, কেউ-কেউ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস, রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট, হার্বার্ট রিড ইত্যাদি পণ্ডিতদের উক্তি এবং উদ্ধৃতি সহ কবিতা কী বোঝাতে থাকেন। আরেকদল অমুকদা-তমুকদার কবিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দেন। একবার এক আলোচনায় এক পণ্ডিতমশায় বললেন, তুমি নাকি বলেছ কংক্রিট কবিতা নিয়ে তোমার কোনো মাথাব্যথা নেই, মালার্মে-র শেষ কবিতা তোমাকে চিন্তিত করেছে। এদেশে একমাত্র সুধীন্দ্রনাথ দত্তই মালার্মে বুঝতেন। অতিষ্ঠ হয়ে বললাম, জানি, সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মালার্মে-র কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট', কিন্তু তাঁর করা মালার্মে-র কবিতার অনুবাদ (যেমন, *নীলিমা*) পড়লেই বোঝা যায় যে তাঁর মালার্মে-র পঠন ছিল ভ্রান্ত পঠন (misreading)। আমার স্পর্ধায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। যদ্দুর মনে পড়ে, শ্রুতি-র এগারোটি সংখ্যা বের হয়। শেষ দু-টি সংখ্যায় আমি ছিলাম না।

অনেকের ধারণা, শ্রুতি-তে কংক্রিট কবিতা জাতীয় কবিতা প্রকাশিত হত। ধারণাটা ভুল। অন্যদিকে বলা দরকার, শ্রুতি কোনো সাহিত্যান্দোলন ছিল না, শ্রুতি ছিল কবিতার নতুন ভাষার অন্বেষণ। সেই কারণেই ক্ষুধার্ত, ধ্বংসকালীন, উত্তর-আধুনিক জাতীয় কোনো একটা অভিধার আন্দোলনের পতাকার তলায় আমরা জমায়েত হইনি। শ্রুতি-র পরেও আমরা / আমি চেষ্টা করেছি ভাষার বিভিন্ন সূচকের ব্যবহার, মুদ্রণবিন্যাস, ব্যাকরণের সম্ভাবনা আবিষ্কার। বাংলা কবিতাকে বদ্ধমূল রোমান্টিকতার জগতের গারদ থেকে মুক্ত করার প্রয়াসই ছিল শ্রুতির লক্ষ্য। কিন্তু দু-টি কারণে আমরা সফল হতে পারিনি। প্রথমত, বাঙালি পাঠক তার বিদ্যায়তনিক শিক্ষা আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-নির্ধারিত প্রত্যাশার দিগন্ত-অনুযায়ী (রাবীন্দ্রিক) রোমান্টিকতার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি, পারে না। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষায় গল্প-কবিতা লেখা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, উচ্চশিক্ষা বা প্রশাসনে এই ভাষার কোনো ব্যবহার নেই। তাই এই ভাষায় গেঁজিয়ে-ওঠা বদ্ধ জলায় জন্মানো একঘেয়ে আবেগের প্রলাপই 'কবিতা' বলে স্বীকৃত। বাংলা কবিতার জগৎ এখনও সুকুমার রায় বর্ণিত 'ভাবুক সভা'।

প্রসঙ্গসূত্র

১. রচনা — 'Text', এই পারিভাষিক শব্দের বাংলা হিসেবে আমরা 'রচনা' শব্দটি ব্যবহার করেছি। বাংলায় ভাষাবিজ্ঞানীরা text-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'বয়ান' বা 'পাঠ' ব্যবহার করেছেন। আমরা যে যুক্তিতে 'রচনা' শব্দটি ব্যবহার করেছি তা হল :
   ১. আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও সংকেতবিজ্ঞান এবং এই দুই বিজ্ঞান-নির্ভর সাহিত্যতত্ত্বে 'text' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হলেও শব্দটি ভাষাবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে তৈরি হয়নি। আসলে 'text', এই পুরোনো শব্দটিকে ব্যবহারের মাধ্যমে পারিভাষিক তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে বাংলায় পুরোনো 'রচনা' শব্দটি গ্রহণ করে বিশেষ তাৎপর্য দেওয়া যায় বলে আমাদের মনে হয়েছে। যাঁরা 'বয়ান' শব্দটি ব্যবহার করেন, তাঁরা যুক্তি হিসেবে 'text' শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। শব্দের ব্যবহারের ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাছাড়া 'রচনা' শব্দটি 'text' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ধারণা থেকে খুব-একটা দূরে সরে যায় না।
   ২. 'বয়ান' (বর্ণনা / বিবরণ / ভাষাবন্ধ) বা 'পাঠ' (পড়া / lesson) — এই দুইটি শব্দের ক্ষেত্রে 'text'-এর পারিভাষিক তাৎপর্য দেওয়ার জন্য শব্দ দু-টিকে প্রচলিত অর্থ থেকে মুক্ত বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে হয়। 'রচনা' শব্দ বাঙালি পাঠকের ভাবানুষঙ্গে সাধারণভাবে বাচিক বা ভাষিক নির্মাণ বোঝায়। এই অনুষঙ্গকে 'text'-এর পারিভাষিক তাৎপর্যের বিস্তার দেওয়া কঠিন নয়। তাছাড়া 'রচনা' শব্দটি নতুন পারিভাষিক শব্দের দ্বিধা বা ভীতি তৈরি করে না।
   ৩. পারিভাষিক শব্দ হিসেবে 'text' শব্দটি ভাষাবিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বে একটি পরিভাষাগুচ্ছ গঠনের ভিত্তিশব্দ। 'রচনা' শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ বা / এবং প্রত্যয় যোগ করার সম্ভাবনা উন্মুক্ত। 'বয়ান' বা 'পাঠ' শব্দের ভিত্তিতে এই পরিভাষাগুচ্ছের প্রতিশব্দ গঠন কঠিন বা বাঙালির কানে অস্বাভাবিক। 'রচনা'-র ক্ষেত্রে অভ্যাসগত বাধাটা কম :

	রচনা		text
	রাচনিক		textual
	রাচনিকতা		textuality
অধি		meta	
পরা		trans	
আন্তঃ		inter	
উপ		para	
সং		acrhi	
অভি		hyper	
অব		hypo	
প্রসূ		geno	
প্রকট		pheno	

২. বাচন — discourse : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যতত্ত্বে প্রায়শ ব্যবহৃত 'রচনা' শব্দটির সংজ্ঞার্থ অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। আমরা 'রচনা' বলতে বুঝিয়েছি বাচিক বা অবাচিক সংকেত-শৃঙ্খল, যাকে একটি স্বায়ত্ত সংজ্ঞাপক একক হিসেবে গণ্য করা যায়। ভাষাবিজ্ঞানের পর্যায়ক্রমিক ধারণা অনুসারে বাচিক বা ভাষিক সংজ্ঞাপনের ভিত্তিমূলক একক হল বাক্য। প্রথাগতভাবে ভাষাবিজ্ঞানের অনুধাবনের সীমান্তবিন্দু বাক্য। আর বাক্যের পরবর্তী ধাপের একক হল বাচন (discourse)। বাচনের পরবর্তী ধাপের একক রচনা। এখানে বিভাগ বা পার্থক্যের সীমানির্দেশ একান্তভাবে মন্ময়। সাধারণভাবে বলা যায়, বাচন হল অনন্য একটি বিষয়ের অবলম্বনে উক্তি বা উক্তি-সমবায়। স্বভাবতই বাচনের ধারণার সঙ্গে 'বিষয়'-এর ধারণার ভাবানুষঙ্গ রয়েছে, তাই বলা হয় 'ঐতিহাসিক বাচন', 'দার্শনিক বাচন', 'কাব্যিক বাচন', 'আখ্যানিক বাচন' (narrative discourse) ইত্যাদি। এখানেও বলা যায়, সংজ্ঞাপক একক হিসেবে বাচন ও রচনার বিভাজন নির্ভর করে মন্ময় বিচার-ভিত্তিক কিছুটা অস্পষ্ট স্বায়ত্ততার ধারণার ওপর। তাই রচনা ও বাচনের সীমা একই সঙ্গে শেষ হতে পারে অথবা না-ও হতে পারে। বাচন হতে পারে একটি (সম্পূর্ণ বা উহ্যপদ) বাক্য কিংবা একাধিক বাক্যের সমবায়। রচনা (সম্পূর্ণ বা উহ্যপদ) একটি বাক্যের বাচন, বাক্যসমবায়ে গঠিত একটি বাচন অথবা একাধিক বাচনের সমবায় হতে পারে। অন্যদিকে বাচন একটি রচনার সীমা অতিক্রম করে একাধিক রচনায় বিস্তার লাভ করতে পারে।

   ইংরেজি 'discourse' শব্দের প্রয়োগসিদ্ধ অর্থ একাধিক :

   > discourse n. & v - n. 1. literary a conversation; talk b a dissertation or treatise on an academic subject. c a lecture or sermon. 2. Linguistics a connected series of utterences; a text [*The Concise Oxford Dict.*]

   'discourse' শব্দটির ফরাসি প্রতিশব্দ 'discours'-এর অর্থও এভাবে একাধিক। আমরা ভাষাবিজ্ঞান, ভাষাদর্শন ও সাহিত্যতত্ত্বে ব্যবহৃত ওপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় (2) অর্থে 'বাচন' শব্দটি ব্যবহার করে আসছি। 'discours'-এর এই অর্থে 'সন্দর্ভ' শব্দের ব্যবহার আমাদের চোখে পড়েছে। প্রথাগতভাবে বাংলায় 'সন্দর্ভ' শব্দটি discourse-এর 1b অর্থে উনিশ শতক থেকে ব্যবহৃত — তাই দেকার্ত (Descartes)-এর গ্রন্থ *Discours de la Methode* (*Discourse of the Method*)-এর বাংলা অনুবাদ 'পদ্ধতি বিষয়ক সন্দর্ভ'। আমরা 'বাচন' বিশেষ্য পদটির সংশ্লিষ্ট বিশেষণ হিসেবে 'বাচনিক' (discursive) শব্দটি ব্যবহার করেছি। প্রসঙ্গত 'বাচন'-এর ধারণা সম্পর্কে 'রচনা' শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. পঠন reading (পরিগ্রহণ + পুনর্নির্মাণ)

৪. ব্যঞ্জক suggestive (ব্যঞ্জনাবৃত্তি-প্রধান)

৫. সংবিধি code

৬. স্বরসাম্য assonance
৭. সংজ্ঞাপন communication
৮. ভাবধ্বনি ideophone
৯. প্রতিযঙ্গ correspondence
১০. বাচিক verbal
১১. সংকেত signe
১২. শ্রুত প্রতিমান acoustic image
১৩. ধারণা concept
১৪. সংকেতক signifier
১৫. সংকেতিত signified
১৬. যেসব ভাষার... ব্যাপারটা অন্যরকম : যেসব মানুষের ভাষার কোনো লিপি নেই, তাদের সাহিত্য নেই ইতিহাস নেই ভাবাটা একেবারেই ভুল। তাদের সাহিত্য, ইতিহাস (হতে পারে পাশ্চাত্যের ধারণানুগ কালানুক্রমিক, কালপঞ্জির ইতিহাস নয়, পুরাবৃত্তের রূপকের মধ্যে মিশে-যাওয়া ইতিহাস) থাকে বংশপরম্পরায় এক ধরনের গায়ক-কথকের (যেমন, আফ্রিকার গ্রিয়োদের) স্মৃতিতে, মুখে। এসব জাতির সংস্কৃতিকে আমরা বলি, মৌখিক সংস্কৃতি। তার চরিত্র আর বৃত্তি লিখিত ভাষার চরিত্র আর বৃত্তি থেকে ভিন্ন, তার পরিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতও তাই। এই পরিগ্রহণে কান বা শ্রুতির সক্রিয় ভূমিকা হল প্রথম।
১৭. এই সমাজে পড়তে-জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম : ইংরেজরা যখন এদেশে আসে, তখন এখানে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে তিন ভাগ।
১৮. মৌখিক-শ্রাব্য oral-audio
১৯. পুথি-সংস্কৃতির যুগ manuscript culture
২০. পরিগ্রহণ reception
২১. অনুকাহিনি episode
২২. খুবই ধীরে-ধীরে হলেও... : ইংরেজরা যখন বিদায় নেয় (১৯৪৭), তখন ভারতীয় উপমহাদেশে সাক্ষরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে এগারো ভাগ।
২৩. আনুভূমিক horizontal
২৪. উল্লম্ব vertical
২৫. বর্গ genre
২৬. উপরচনা paratext, বিণ. উপরাচনিক paratextual
২৭. 'ছবি লেখা' : আন্তঃরাচনিক (intertextual), ঋণ স্বীকার : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৮. সুলিপি বা লিপি-শিল্প calligraphy
২৯. চিত্রায়ণ illustration
৩০. সংরচনা composition

সংস্কৃত কবিতার কারুশিল্প

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনুষ্যসভ্যতায় মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার তার মুখের ভাষা। ভাষা ও বুদ্ধির উৎকর্ষে মানুষ অন্যের প্রতি তার প্রভুত্ব কায়েম রাখে। ভাষার দুই রূপ — মৌখিক এবং লেখ্য। অ-বাক্ মানুষ সুদীর্ঘকালের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অব্যক্ত বাক্ থেকে ব্যক্ত ভাষার ব্যবহার করতে শিখেছে। তারপর দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধ্বনি বা বর্ণমালার (alphabet) আবিষ্কার করে, লেখ্য ভাষার মাধ্যমে আপন জ্ঞানগোচর সর্ববিধ বিষয়কে ভাষা বা বাঙ্ময়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম।

মৌখিক ভাষা ব্যবহারের আদি পর্বে মানুষ মুখে-মুখে ছোটো-ছোটো কবিতা, সদুক্তি, সুবচনী, ধাঁধা, ধর্মবাণী, প্রার্থনা, জাদুমন্ত্র, সুখ-দুঃখ-ভয়ের অভিব্যক্তির প্রকাশাত্মক রচনাবন্ধ তৈরি করতেন এবং শ্রুতিতে কণ্ঠস্থ রাখতেন। পরবর্তীকালে লিখিত সাহিত্যের ঐতিহ্যে প্রাচীন মৌখিক কবিতার ভাব-ভাষা-রচনাশৈলী খ্যাত-অখ্যাত কবিদের দ্বারা অনুসৃত হয়।

কাব্যপাঠক, সমালোচক ও সাহিত্যরসিক বিদ্বজ্জন প্রাচীন ভারতীয় কবিদের প্রশংসা করে বলেছেন — কবি অভিনন্দ 'বাগীশ্বর', বাক্পতিরাজ 'অর্থেশ্বর', কালিদাস 'রসেশ্বর', বাণভট্ট 'সর্বেশ্বর'। কবিতা কেমন হবে — ললিতমধুরা, সালংকারা মনোরমা; কবিতার বাণী শোনামাত্রই পাঠকের চিত্তে চমৎকার অনুভূতি হয় (যদ্বাণী শ্রুতিমাত্রকেণ সুধিয়াং চেতশ্চমৎকারিণী, অর্থাৎ কবির যে-বাণী কর্ণগোচর হওয়ামাত্র সুধীজনের চিত্ত চমৎকৃত হয়)। মধু মধুর, সুধা মধুরতর, তদপেক্ষা মধুর কবির বাণী (মধু মধুরং তস্মাচ্চ সুধা, তস্যাঃ কবের্বচঃ)। সংগীতের মাধুর্য যেমন শ্রোতার মনোরঞ্জন করে, তেমনই শ্লোকের মাধুর্য, ঔদার্য, মনোহারিত্ব (অহো গীতস্য মাধুর্যং শ্লোকানাং চ বিশেষতঃ। বিচিত্রার্থপদম্ অবিস্তরম্ অসন্দিগ্ধম্ সংস্কারসম্পন্নম্। অর্থাৎ সংগীতের কী অপূর্ব মাধুর্য! বিশেষত, কবিতার মনোহারিতা শব্দ এবং অর্থের অননুকরণীয় বৈচিত্র্য! পদগুলি সংক্ষিপ্ত, কোনো বাহুল্য নেই, আতিশয্য নেই। অর্থ পরিস্ফুট, পরিমার্জিত, শোভন)। গীতগোবিন্দকার জয়দেব আপন কাব্যের শৃঙ্গারসারস্বত বাণীর প্রশংসায় বলেছেন — ওগো মধু, তোমার মধুরতা আর নেই; শর্করা হল কর্কর (চিনি কাঁকরতুল্য); দ্রাক্ষা, কেউ তোমায় দেখবে না; অমৃত, তুমি মৃত; ক্ষীর, তোমার স্বাদ যেন নীর (জলের মতো); মাকন্দ, তুমি ক্রন্দন করো (আমের মঞ্জরি, তুমি কাঁদবে); প্রিয়তমার অধর, তুমি রসাতলে যাও।

অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মহাকাব্যে ক্বচিৎ অনুপ্রাস ও যমকের চাতুর্য, 'চিত্রকাব্যে'র বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। রাজসভার বিদগ্ধ কবিরা (court poets) বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য কাব্য রচনা করতেন। কালিদাসের উত্তরসূরি ভারবি, মাঘ, ভট্টি প্রভৃতির মহাকাব্যে মননশীলতা ও বৈদগ্ধ্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষ করি, অথচ তাঁরাই পাণ্ডিত্যের গুরুভারে কৃত্রিমবন্ধ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। ভারবি (৭ম খ্রি.) থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কৃত্রিম শ্লোক রচনার একটি ধারা প্রচলিত ছিল।

কিংবদন্তি অনুসারে বিক্রমাদিত্য রাজার নবরত্নসভার অন্যতম কবি ঘটকর্পর তাঁর স্বনামাঙ্কিত 'ঘটকর্পর' নামক ২২ শ্লোকের কাব্যে প্রতিজ্ঞা করেছেন যমক অলংকারের চাতুর্যে যে-কবি তাঁকে পরাজিত করবেন, তাঁর পা-ধোওয়ার জন্য ভাঙা ঘটে জল বয়ে আনবেন (বহেয়ম্-উদকং ঘটকর্পরেণ)। এই প্রতিজ্ঞা শুনে কবি কালিদাস তাঁর *রঘুবংশ* কাব্যে (নবম সর্গে) পরপর চুয়ান্নটি শ্লোকে পদান্ত যমক প্রয়োগ করেন — যমবতামবতা..., মহীনমহীনপরাক্রমম্, বাগপরুষা পরুষা..., বিতমসা তমসা..., মদয়িতা দয়িতা..., কুসুমিতাসু মিতা..., স্মরমতে রমতে। এখান থেকেই কৃত্রিম কাব্যবন্ধের সূচনা। সমালোচকদের কথায় — কবি মাঘ কবিদের দর্প চূর্ণ করেছেন (কবিমদবধং বিধত্তে); মাঘমাসের শীতে হাড়ে যেমন কাঁপুনি লাগে, মাঘের কবিতা পড়লে তেমন কাঁপুনি ধরবে (কম্পঃ কস্য ন জায়তে)। অন্য কবি বলেছেন — ধনুর বাণ যদি শত্রুর হৃদয় ছিন্নভিন্ন করতে না পারে এবং কবিতা যদি পাঠকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে না পারে, তাহলে তার কী প্রয়োজন (পরস্য হৃদয়ে লগ্না ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ)? ভট্টিকবি তাঁর *ভট্টিকাব্য*-তে আপন রচনার গৌরব সগর্বে প্রকাশ করেছেন — সুধীজনের কাছে এই রচনা উৎসবতুল্য আনন্দদায়ক, কিন্তু অপণ্ডিতের কাছে সুবোধ্য নয় (ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্য / উৎসবঃ সুধিয়ামলম্। হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ / বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥)।

ভট্টির পণ্ডিতম্মন্যতা দেখে আলংকারিক ভামহ যথাযথ প্রত্যুত্তর দিলেন — কাব্য যদি শাস্ত্রের মতো টীকাভাষ্য দ্বারা ব্যাখ্যাগম্য হয়, তাহলে পাণ্ডিত্যের গুরুভারে অল্পবুদ্ধি পাঠকরা মারা পড়বেন (কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ। উৎসবঃ সুধিয়ামেব। অহো দুর্মেধসো হতাঃ) — ভা. কা. ২.২০

কাশ্মীরনিবাসী কবি রত্নাকর। তাঁর মহাকাব্য *হরবিজয়* বৃহত্তম রচনা (৫০সর্গ)। তিনি স্বয়ং 'বাগীশ্বর' 'বালবৃহস্পতি' আখ্যায় আত্মগরিমা প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি — আমার কাব্য পড়ে 'অকবি' 'কবি' হয়, 'কবি' 'মহাকবি' হয় (অপি শিশুরকবিঃ কবিঃ প্রভাবাদ্ / ভবতি কবিঃ মহাকবিঃ ক্রমেণ)। তাঁর কবিত্বদর্পের উক্তিগুলিও রমণীয় — বিকট-যমক-শ্লেষোদ্গার-প্রবন্ধনিরর্গলা / অসদৃশগতীশ্চিত্রে

মার্গে মমোদ্ধীরতো গিরো / ন খলু নৃপতেশ্চেতো বাচস্পতেরপি শঙ্কতে॥ — আমার প্রবন্ধ-রচনার বাণী যমক ও শ্লেষ অলংকারের উৎকট প্রয়োগে দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিত গতির বাহুল্যে, রীতিবৈচিত্র্যে শুধুমাত্র রাজার নয়, বাচস্পতির (অর্থাৎ বিদ্বান পাঠকের) চিত্তেও শঙ্কা জাগায়।

কালিদাসের মহাকাব্যে ক্বচিৎ ব্যাকরণের চমক ও যমকের আপাতরমণীয় চাতুর্য দিয়ে কৃত্রিমবন্ধ কবিতার শুরু। তাঁর উত্তরসূরি ভারবি, মাঘ, ভট্টি, রত্নাকর প্রভৃতি থেকে ১৭শ-১৮শ শতক পর্যন্ত এই ধারাটি চলমান। ভট্টি তাঁর কাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকার শিক্ষাদানের জন্য যে-পদ্ধতিতে শ্লোক রচনা করলেন, তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও চমক তথা পাণ্ডিত্যের গুরুভার লক্ষণীয়। তাঁর দর্শিত পথ ধরে পরবর্তীরা 'ব্যাখ্যাগম্য' জটিল কাব্য রচনায় প্রয়াসী হলেন। এই জাতীয় রচনার নানা বৈচিত্র্য —

১. একটি বা দুটি বা তিনটি বর্ণের শ্লোক — স্বর ও ব্যঞ্জনের প্রয়োগে যেখানে 'বর্ণচিত্র' তৈরি হয়।
২. অনুপ্রাস / যমক / শ্লেষ অলংকারের বিচিত্র প্রয়োগ।
৩. উচ্চারণস্থানের ভেদ অনুযায়ী কতিপয় সজাতীয় বর্ণ বাদ দিয়ে শ্লোক রচনা, যেমন নির্দন্ত (ত-ন বর্ণগুলি বাদ), নিরন্তঃস্থ (য/র/ল/ব/হ বাদ), নিরুষ্মাক (উষ্ম বর্ণ শ/স/ষ/হ বাদ), নিরনুনাসিক (অনুনাসিক ঙ/ঞ/ন/ম/ণ/ং/ঃ বাদ); যা 'স্থানচিত্র' স্বরূপ গণ্য।
৪. ধাতুকাব্য — পাণিনীয় ধাতুপাঠের সংকলিত সূত্র অনুসারে ধাতু অর্থাৎ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ।
৫. পূর্বপরাবৃত্ত শ্লোক (সরল পাঠ ও বিপরীত পাঠে একই রূপ)।
৬. ব্যাকরণ-কাব্য অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ (প্রধানত অষ্টাধ্যায়ী)-সূত্র ব্যাখ্যামূলক শ্লোক।
৭. অলংকারবন্ধে শ্লেষ অলংকারের চাতুর্য — দ্বিসন্ধান, ত্রিসন্ধান, পঞ্চসন্ধান ও সপ্তসন্ধান (একই শ্লোকের ২/৩/৫/৭টি অর্থ)।
৮. একই কবিতায় তিনটি ভাষার (সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ) প্রয়োগ।
৯. মহাকাব্যে অর্ধেক শ্লোক সংস্কৃত ভাষায়, বাকি অর্ধেক প্রাকৃত ভাষায় লেখা।
১০. ধ্রুপদী সংগীত তারানা (নাদির্ দির্ দির্ তুম্ তা-না-না) অনুকরণে জিহ্বার আড়ষ্টতা কাটাতে দুরুচ্চার্য শব্দযোগে শ্লোক রচনা।
১১. শাস্ত্রকাব্য — ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ, দর্শন, কামশাস্ত্র ইত্যাদির ব্যাখ্যা।

চি ত্র কা ব্য

শব্দচিত্র, বাচ্যচিত্র, ব্যঙ্গার্থহীন অর্থাৎ শব্দের চমক বা অর্থের চাতুর্য এর প্রাণ। একাধিক কবির রচিত চিত্রকাব্য — *চিত্রবন্ধ-রামায়ণ*, *লক্ষ্মীসহস্র*, *রামচন্দ্রোদয়*, *গৌরীবিবাহ*, *রামকবচ*, *চিত্ররত্নাকর*, *চিত্রকাব্য*, *বিদগ্ধমুখমণ্ডন*, *কবীন্দ্রকর্ণাভরণ*, *বাগ্‌ভূষণ*, *রামলীলামৃত*, *কমলমালিকাস্তোত্র* প্রভৃতি।

একটি শ্লোকে যমক অলংকারের বিচিত্র বিন্যাস —

স মে সমাসমো মাসঃ / সা মে মাসসমা সমা।
যো যাতয়া তয়া যাতি / যা যাত্যাযাতয়া তয়া ॥

স মাসঃ = সেই মাসটি; মে সমা-সমঃ = আমার কাছে বছরের তুল্য; যঃ যাতি = যে মাসটি পার হয়; যাতয়া তয়া = তার (অর্থাৎ আমার প্রিয়তমার) চলে যাওয়ার পর;

স সমা = সেই বছরটি; মে মাসসমা = আমার কাছে এক মাসের সমান; যা যাতি = যে বছরটি পার হয়; আযাতয়া তয়া = তার (অর্থাৎ আমার প্রিয়তমা) যখন আমার কাছে আসে।

প্রিয়াহীন বিরহের মাস, যেন এক বরষের বাস।
প্রিয়া-সহ মিলনের বর্ষ, সে যেন গো ক্ষণিকের হর্ষ ॥

ভারবির মহাকাব্যে (৭ম খ্রি.) কোনো-কোনো শ্লোকে একটিমাত্র বর্ণের প্রয়োগ — 'ন' ব্যঞ্জনে বর্ণচিত্র —

ন নোননুন্নো নুন্নোনো নানানানাননা ননু।
নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ॥ *কি. ১৫.১৪*

উন-নুন্নঃ = নীচ ব্যক্তির দ্বারা অপমানিত; না = মানুষ; ন = নয়;
নুন্ন-উনঃ = নীচ ব্যক্তিকে হেয়কারী; না = মানুষ; অ-না = অ-মানুষ।
নানা-আননাঃ = ওহে বহুমুখ অর্থাৎ বহুরূপী মানুষ; ননু = নিশ্চয়; নানা = নানাবিধ;
নুন্নঃ = অপমানিত; অনুন্নঃ = অপমানিত নয়; নুন্নঃ ইনঃ = যার প্রভু নীচ এরূপ মানুষ; অনেনা = নির্দোষ নয়; নুন্ননুন্ননুৎ = অতিশয় নীচ ব্যক্তির পীড়াদায়ী।

নীচ ব্যক্তির দ্বারা অপমানিত ব্যক্তি মানুষ নয়, অর্থাৎ অমানুষ; পুনশ্চ, নীচ ব্যক্তিকে হেয়কারী মানুষও অমানুষ। ওহে বহুমুখ, অর্থাৎ বহুরূপী মানুষ — অপমানিত ব্যক্তি, অপমানিত নয় এমন ব্যক্তি নীচ প্রভুর সেবক, দুষ্ট এবং অতিশয় নীচ ব্যক্তির পীড়াদায়ী মানুষও অমানুষ।

মাঘ কবির মহাকাব্যেও একক বর্ণের শ্লোক — এখানে আবার 'দ' ব্যঞ্জন, এও আরেক বর্ণচিত্র —

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী দাদাদো দূদদীদদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদদদোঽদদঃ ॥ *শি. ১৯.১১৪*

দাদ = দান; দাদ-দ = দানপ্রদ; দুৎ = পীড়া; দুৎ-দ = পীড়াদায়ী, খল; দাদী = দায়ক; দুদ্দ-দুৎ-দাদী = খলকে পীড়াদায়ক। দা = দান / শুদ্ধি;
দা-দাদ = শুদ্ধিদাতা; দু = পরিতাপ; দু-দঃ = পরিতাপ-দায়ী; দী = ক্ষয়; দুদ-দী-দদঃ = পীড়নকারী / অত্যাচারীর বিনাশক; দুৎ-দাদং = অস্ত্রকে / পীড়াদায়ককে; দদঃ = দাতা; অ-দদঃ = অদাতা; দুদ্দে = শত্রুর উপর / প্রতি; দদদে = দিলেন; দদ-অদদ-দদঃ = দাতা ও কৃপণের প্রতি দানশীল।

এই শ্লোকে ভগবান কৃষ্ণের গুণাবলির বর্ণনা — শ্রীকৃষ্ণ ধনসম্পদের দাতা, অত্যাচারীর পীড়ক, খলব্যক্তিকে পীড়াদায়ী। তিনি শুদ্ধিদাতা, তিনি দুষ্টকে পরিতাপ দেন, তিনি দুর্জনের পীড়াদায়ী, অত্যাচারীর বিনাশক; শত্রুর অস্ত্রকে পীড়া দেন, তিনি সজ্জনের দাতা, অসজ্জনের অ-দাতা, তিনি দাতা ও কৃপণের প্রতি দানশীল।

ধ্রুপদী সংগীতে তারানার বোল (নাদির্-দির্-দির্-দির্ তুম্-তা-না-না) উচ্চারণে যেমন জিভের জড়তা কাটে, ঠিক তেমনই বিদ্যামঠের ছাত্ররা দুঃস্পৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট শ্লোক পাঠ করে উচ্চারণের জড়তা কাটাত। একাদশ শতকের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ-কবি-পণ্ডিত হেমচন্দ্র *কুমারপালচরিত* নামক মহাকাব্যে ভাষা ও ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। শ্লোকসংখ্যা ২৫০০। মোট ২৮ সর্গের প্রথম দশটি সংস্কৃত ভাষায়, অবশিষ্ট প্রাকৃত ভাষায় লেখা।

৯-কারযুক্ত এবং উৎকট সন্ধি প্রভৃতির দ্বারা দুরুচ্চার্য শ্লোকগুলি লক্ষণীয় —

হোতৃতং পোতৃঌতং মাতৃঌতং পিতৃঌতমুদ্‌গৃণন্।
অত্র স্যাদ্ জড়জিহ্বোঽপি বাগ্মী বিদ্যামঠে পঠন ॥ ১.৭

হোতৃতং = হোতৃ + ঌতং; মাতৃঌতং = মাতা + ঌতং; পিতৃঌতং = পিতা + ঌতং — (যজ্ঞে) হোতার দ্বারা ঌত (ক্লিপ্ত বা কল্পিত), পোতার (পালকের) দ্বারা ঌত (কল্পিত); মাতার দ্বারা ঌত (কল্পিত) এবং পিতার দ্বারা ঌত (কল্পিত); উদ্‌গৃণন্ — উচ্চারণ করে। অর্থাৎ এরকম উৎকট শব্দগুলি উচ্চারণ করে বিদ্যামঠের ছাত্ররা জিভের জড়তা কাটাত। ওই জাতীয় আরও একটি —

অমী অমুমুঈচোস্য / নখাঃ কণ্ঠে ই ঈক্ষিতাঃ।
আ এহি ত্বমু উত্তিষ্ঠ / যদ্যা এব নু মন্যসে ॥ ১.৩০

কণ্ঠদেশে নখক্ষত যথার্থই দেখা গিয়েছিল। এসো, উত্থিত হও, যদি যথার্থই মনে কর।

আলংকারিকরা চিত্রকাব্য আলোচনায় বলেছেন — এখানে শব্দ বা অর্থের বৈচিত্র্য থাকে, কোনো ব্যঙ্গার্থ থাকে না; তাই এগুলি তৃতীয় শ্রেণির রচনা। 'শব্দচিত্রে'র উদাহরণরূপে প্রদত্ত একটি বহুলপরিচিত শ্লোক —

স্বচ্ছন্দোচ্ছলদচ্ছ-কচ্ছ-কুহরচ্ছাতেতরাম্বুচ্ছটা
মূর্চ্ছন্মোহমহর্ষি-হর্ষবিহিত-স্নানাহ্নিকাহ্নায় বঃ ।
ভিদ্যাদুদ্যদুদার-দর্দুরদরী-দীর্ঘাদরিদ্রদ্রুম-
দ্রোহোদ্রেক-মহোর্মিমেদুর-মদা-মন্দাকিনী মন্দতাম্ ।। *সুভা. ৯.১৩১*

আপন গতিতে উচ্ছলিত হয়ে প্রবাহিত মন্দাকিনী (গঙ্গা) তটভূমিতে ঢেউয়ের আঘাতে খাল-বিল সৃষ্টি করেছে, তদ্ভিন্ন তার সবল জলরাশির পরম্পরা নিষ্কলুষ মহর্ষিদের অজ্ঞান বিনাশ করেছে। এই মহর্ষিরা সেই গঙ্গায় স্নান ও আহ্নিক কৃত্য সম্পাদন করেন। সেখানে বলবান ভেক তীরসংলগ্ন স্থানে গহ্বর সৃষ্টি করেছে। তার তীরে দীর্ঘায়ত এবং শাখাপল্লবাদির দ্বারা সমৃদ্ধ বৃক্ষ পতনরহিত হয়ে ঊর্ধ্বে প্রসারিত। তার বিশাল মেদুর ঊর্মিমালা তোমাদের অজ্ঞান নাশ করুন।

ভট্টিকাব্যে যমকবন্ধের চমকপ্রদ কবিতা —

ৰভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ স-মুদ্রো ।১
ৰভৌ মরুত্বান্ বি-কৃতঃ স-মুদ্রঃ ।২
ৰভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো ।৩
ৰভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ স মুদ্রঃ ।৪ *ভট্টি ১০.১৯*

১. বিকৃতঃ স-মুদ্রঃ মরুত্বান ৰভৌ। বিকৃতঃ = বনের গাছপালা লণ্ডভণ্ডকারী; স-মুদ্রঃ = সীতার প্রদত্ত মুদ্রা (আংটি-চূড়ামণি প্রভৃতি)-সহ বর্তমান; মরুত্বান্ = মরুৎপুত্র হনুমান; ৰভৌ = শোভা পেয়েছিলেন।

২. বি-কৃতঃ স-মুদ্রঃ মরুত্বান্ ৰভৌ। বি-কৃতঃ = বিশিষ্ট কর্মদ্বারা যুক্ত (অর্থাৎ রাবণবধরূপ মহৎ কর্মের সাধক; স-মুদ্র = মুদ্রা — অপ্সরা, তাদের সঙ্গে বর্তমান অর্থাৎ অপ্সরাশোভিত; মরুত্বান্ = মরুৎ দেবাতাদের অধিপতি ইন্দ্র; ৰভৌ = শোভা পেয়েছিলেন।

৩. বিকৃতঃ সমুদ্রঃ মরুত্বান্ ৰভৌ। বিকৃতঃ = বায়ুবেগে বিকারযুক্ত বা চঞ্চল; সমুদ্রঃ = সাগর; মরুত্বান্ = মরুৎ বা বায়ুর সহযোগে; ৰভৌ = শোভিত হল।

৪. বিকৃতঃ স মুদ্রঃ মরুত্বান ৰভৌ। বিকৃত = বিকারযুক্ত মন্দগতিঃ; স = সেই, মুদ্রঃ = আনন্দদায়ক; মরুত্বান্ = বায়ুদেবতা; ৰভৌ = শোভা পেলেন।

(অশোকবনের) তরুগুল্ম লণ্ডভণ্ডকারী এবং সীতাপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়-সহ বর্তমান মরুৎপুত্র হনুমান শোভা পেয়েছিলেন। রাবণবধরূপ মহৎ কর্মের সাধক, অপ্সরাশোভিত, মরুৎ দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র শোভা পেয়েছিলেন। প্রবল বায়ুবেগে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র শোভা পেল। মন্দগতি সেই আনন্দদায়ী বায়ুদেবতা শোভা পেলেন।

নসমা নসমা নসমা নসমা-
গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ ।
ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ।। *নলোদয় ২.১৬*

সমান-সমান-সমান = মানসমান (মানসিক সম্মান, তৎসহ যুক্ত) সমানসমান, সমানসমান — সমানের সঙ্গে সমান অর্থাৎ তুল্য বন্ধু; সমাগমম্ ন আপ = সংযোগ হল না।

কামিজনঃ = প্রণয়ী, আপন মনের অনুকূল তুল্য প্রণয়ীজনের সঙ্গে মিলিত হল না। তার কারণ কী? বসন্তনভঃ = বসন্তকালের আকাশকে, সমীক্ষ্য = দেখে, অদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ = অদভ্র — বহু, মদ = মত্ততা যাদের, অর্থাৎ অনেক ভ্রমর, অভ্রমদ = মেঘমালার মতো ভ্রমদাঃ = ভ্রম-উৎপাদক।

পুষ্পমধুপ্রিয় ভ্রমরপুঞ্জ বিভ্রমে বসন্তের আকাশে কৃষ্ণ মেঘমালার মতো শোভা পেয়েছিল। অর্থাৎ বসন্তের আকাশে মেঘমালার উদয় হলে গগনমণ্ডলকে যেন মধুপানোন্মত্ত অলিকুলের দ্বারা সমাকীর্ণ মনে হয়। তা দেখে প্রণয়ার্ত ব্যক্তির মনে হয় যেন কোনো আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনের সমাগম হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথের অতীব প্রিয় ছিল।

স্বরচিত্র (স্বরবর্ণ প্রয়োগের) বৈচিত্র্য বা সৌন্দর্য — 'উ' স্বর দিয়ে —

উরুগুং দ্যুগুরুং যুৎসু / চুক্রুশুস্তুষ্টুবুঃ পুরু ।
লুলুভঃ পুপুষুর্ভুৎসু / মুমুহুর্নু মুহুর্মুহুঃ ।। *শৃ.*

উরুগুং (উরু অর্থাৎ উচ্চ, প্রচণ্ড; গু-ধাতু শব্দ করা অর্থে) = উচ্চ শব্দকারীকে; দ্যুগুরুং = দ্যুলোকের গুরুকে অর্থাৎ দেবগুরু বৃহস্পতিকে; যুৎসু = বিযুক্ত, ভিন্ন করেছিল; চুক্রুশুঃ = আক্রোশ করেছিল; তুষ্টুবুঃ = তুষ্ট করেছিল; পুরু = বারংবার; লুলুভুঃ = লুব্ধ করেছিল, পুপুষুঃ = পুষ্ট করেছিল, মুমুহুর্নু = মুমুহুঃ + নু, যথার্থই মুগ্ধ করেছিল; মুহুর্মুহুঃ = বারংবার।

দ্যুলোকের গুরু যিনি অর্থাৎ দেবগুরু বৃহস্পতির বন্দনা করে দেবতারা তাঁদের যুদ্ধকালে (দেবাসুরের যুদ্ধে) জয়ের আশায় (কারণ তিনি যোদ্ধা, যুদ্ধে সাহায্যশীল এবং জয়দাতা) তাঁর শক্তিমত্তা এবং সন্তোষ কামনা-সহ তাঁদের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টিপাতের জন্য তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করছেন।

ব্যঞ্জনচিত্র —

ক্রূরারিকারী কোরেক / -কারকঃ কারিকাকরঃ ।
কোরকাকারকরকঃ / করীরঃ কর্করোঽর্করুক্ ।। *শি.*

ক্রূরারিকারী (ক্রূর-অরি-কারী) = ক্রূর শত্রুদের বিনাশকারী। কোরেককারকঃ (কোঃ-এক-কারকঃ) = পৃথিবীর একমাত্র কর্তা। কারিকাকরঃ (কারিকা-আকর) = কারিকা — ক্রিয়া অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ইত্যাদি ব্যাপার, তার আকর বা স্থান। কোরকাকারকরকঃ (কোরক-আকার-কর-কঃ) = কোরকের আকারের মতো যার দুই কর বা হাত, অর্থাৎ ফুলের কুঁড়ির মতো রক্তিমাভ যার দুই হাত। করীরঃ (করী-ঈর) = করী অর্থাৎ হাতিকে ছুঁড়ে ফেলতে সমর্থ। কর্করঃ = অতি কঠিন, শক্তিশালী। অর্করুক্ (অর্ক-রুক্) = অর্ক অর্থাৎ সূর্য, তার মতো রুক্ বা দীপ্তি যার।

শ্রীকৃষ্ণ হঠকারী অত্যাচারী শত্রুদের বিনাশক, জগতের কর্তা, বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি প্রভৃতি কর্মের আকর; পুষ্পকোরকের তুল্য রক্তিমাভ তাঁর দুই হাত; হাতিকে দূরে নিক্ষেপ করতে পারেন, অতীব শক্তিশালী এবং সূর্যের মতো দীপ্তিমান।

মাতালের কবিতায় ব্যঞ্জনচিত্র বা শব্দসৌন্দর্য —

পি-পি-প্রিয় স-স-স্বয়ং মু-মু-মুখাসবং দেহি মে ।
ত-ত-ত্যজ দু-দু-দ্রুতং ভ-ভ-ভ-ভাজনং কাঞ্চনম্ ।। *সুভা.*
প্রিয় স্বয়ং মুখাসবং দেহি মে ।
ত্যজ দ্রুতং ভাজনং কাঞ্চনম্ ।।

প্রেমিকের উদ্দেশে প্রেমিকার সংলাপ : ওগো প্রিয়, তুমি নিজে তোমার মুখোচ্ছিষ্ট আসব আমাকে দাও। তোমার হাতের সোনার আসবপাত্র সত্বর আমার হাতে তুলে দাও।

এছাড়াও, পূর্বপরাবৃত্ত শ্লোক — যার সরল এবং বিপরীতক্রমে পাঠ একই প্রকার হয়ে থাকে, যেমন ভারবির কবিতায় —

দেবাকানিনি কাবাদে / বাহিকাস্বস্বকাহি বা ।
কাকারেভ ভরে কা কা / নিস্বভব্যব্যভস্বনি ।। *কি. ১৫.২৫*

এবং এহেন শ্লোকবন্ধের বৈশিষ্ট্যে তার চিত্ররূপেও স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত (দ্র. এই নিবন্ধের শেষে 'গতিচিত্র : সর্বতোভদ্র', চিত্র : ২)।

এখানে যুদ্ধের বর্ণনা প্রদত্ত। দেবাকানিনি (দেব-আকনিন্ ৭মী) = দেবতাদের উদ্দীপিত, উৎসাহিত করে এমন যুদ্ধে, কাবাদে (কু-আবাদ, কু>কা-আবাদ) = পরস্পরের নিন্দাজনক বাক্‌কলহ, তাতে। বাহিকাসু-অস্বকাহে = ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত

যুদ্ধকৌশলের দ্বারা, অ-স্বকান্ = স্বক অর্থাৎ নিজ, অ-স্বক = পর অর্থাৎ শত্রুকে যুক্ত ক'রে, সেরূপ রণক্ষেত্রে। কাকারেভভরে (কাকার-ইভ-ভর) = কাকার — মদস্রাবী, ইভ — হাতি, ইভভরা — গজসমূহ যেখানে, সেরূপ রণক্ষেত্রে। নিস্বভব্যব্যভস্বনি (নিস্ব — নিরুৎসাহ, ভব্য — সোৎসাহ) = উৎসাহহীন এবং উৎসাহযুক্ত উভয়কে সংবৃত করে (নিস্বভব্যব্যভস্বান্ তস্মিন্) এমন রণক্ষেত্রে...।

দেবতাদের পক্ষেও উত্তেজক এহেন যুদ্ধে কেবল কুকথাই পরস্পরকে কলহপর করে না, অন্যের জন্য যুদ্ধে জীবনপণ করে তারা যুদ্ধকৌশলেই পরস্পরের শত্রু হয়ে আছে। মত্ত মদস্রাবী গজসংকুল এমন যুদ্ধক্ষেত্র উৎসাহী আর নিরুৎসুক উভয়কেই সমাচ্ছন্ন করেছে।

কবি দৈবজ্ঞসূর্য 'রামকৃষ্ণ-বিলোম' নামক (৩৬ শ্লোক) কাব্য রচনা করেন। প্রত্যেক শ্লোকের প্রথমার্ধে রামচন্দ্রের এবং দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণের বর্ণনা। দ্বিতীয়ার্ধ বিপরীতক্রমে পাঠ করলে প্রথমার্ধ পাওয়া যায় —

> তারকে রিপুরাপ শ্রী- / রুচা দাসসুতান্বিত ।
> তন্বিতাসু সদাচারু / শ্রীপরা পুরি কে রতা ।। ১৭.৩৫

হে দাসসুতা-যুক্ত, শ্রী অর্থাৎ সীতার / লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের দ্বারা সমৃদ্ধ আপনি স্বর্গে শত্রুকে পেয়েছেন। সর্বদা চারু অর্থাৎ সুন্দর বা শ্রী দ্বারা সমৃদ্ধ নগরীতে তনুযুক্ত হয়ে ব্রহ্মে লীন।

কবি ভট্টভীম 'রাবণার্জুনীয়' নামক ২৭ সর্গের বিশালাকার কাব্যে চতুর্বর্গের আলোচনায় ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যা করতে শ্লোক রচনা করেছেন। পাঁচ বেদাঙ্গর অন্যতম ব্যাকরণ; সুতরাং ব্যাকরণও মোক্ষশাস্ত্র। অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র 'বুধ-যুধ-নশ-জনেঙ্ প্রু-দ্রু-স্রুভ্যো ণেঃ' (অ. ১.৩.৮৬)

> যো ৰোধয়েদরিমমুং যুধি যোধয়ন্তং
> ৰন্ধুর্বিনাশয়তি তস্য বিপত্তিমাশু ।
> অধ্যাপয়েদ্ যদি পুনঃ প্রতিকূলমস্য ।
> তস্যাপদং জনয়তি স্বয়মেব ধাতা ।। ২.৬৪

যঃ = যে, ৰোধয়েৎ = জানাবে, অরিম = শত্রুকে, অমুম্ = এই, যুধি = যুদ্ধে, যোধয়ন্তম্ = যুদ্ধে প্রবৃত্তকারীকে। ৰন্ধুঃ = মিত্র, বিনাশয়তি = বিনাশ করে, তস্য, বিপত্তিম্ = বিপদকে, আশু = সত্বর। অধ্যাপয়েৎ = অধ্যাপিত করে, শেখায়, যদি = যদি, পুনঃ = পুনরায়, প্রতিকূলম্ = প্রতিকূলকে, অস্য = এর। তস্য = তার, আপদম্ = আপদকে, জনয়তি = সৃষ্টি করে, স্বয়মেব = নিজেই, ধাতা = ঈশ্বর।

যিনি রণে যুদ্ধকারী এই শত্রুর কাছে (আপন প্রতাপ) যথার্থ প্রকাশ করবেন, তাঁর বন্ধু সত্বর তাঁর বিপত্তিকে বিনাশ করেন। পুনরায় যদি তিনি প্রতিকূলতা বা বিপরীত আচরণ করেন, স্বয়ং তিনি তাঁর (বন্ধুর) বিপদ সৃষ্টি করেন। (পরিবর্তে তিনি যদি বিপরীত আচরণ করেন তাহলে স্বয়ং ভগবান তাঁর বিপদ সৃষ্টি করেন বা ক্ষমা করেন না)

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ পর্বের কবি জয়দেব *গীতগোবিন্দ* মহাকাব্যে প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুসরণে সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তে অনুপ্রাস ও যমকের চাতুর্য প্রদর্শন করেছেন —

> মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান ।
> অমল-কমল-দল-লোচন ভবমোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান ।।

ভগবান হরির গুণকীর্তন — আপনি, হে হরি, মধু ও মুর নামক দৈত্যের ঘাতক, নরক নাশকারী (নরক থেকে উদ্ধারকারী), গরুড়াসন, দেবকুলে দৈবক্রীড়ার উৎস বা হোতা; নির্মল পদ্মদলের মতো চক্ষুবিশিষ্ট সংসারবন্ধন মোচনকারী, ত্রিভুবনের প্রধান আশ্রয়স্থল।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কবিরা ক্বচিৎ পূর্বসুরিদের অনুকরণে নিছক লেখাচ্ছলে এমন কবিতার মশকরা করেছেন —

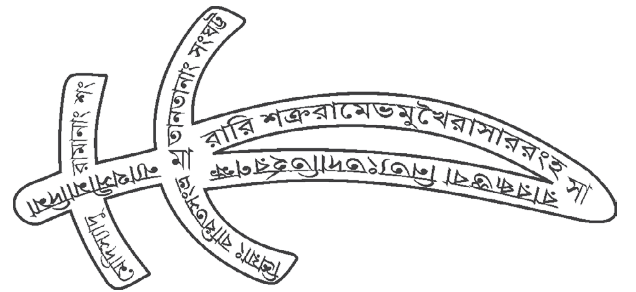
> *ঠাকুরাণী ঠকাইলা একি ঠকঠকে।*
> *ঠেঠায় করিয়া ঠেঠা ঠক কৈলে ঠকে ।। ভারতচন্দ্র*

যাই হোক, আলোচনাক্রমে আগেই উল্লেখ করা গেছে বর্ণচিত্র (একটি-দুটি স্বর ও ব্যঞ্জন প্রয়োগে) এবং স্থানচিত্র (উচ্চারণস্থানের ভেদ অনুযায়ী কিছু সজাতীয় বর্ণ বাদ দিয়ে শ্লোক রচনা) প্রসঙ্গে। এবার বর্ণ-শব্দ-পদ বা চরণকে বিভিন্ন বস্তু, পশু-পাখির আকার-সাদৃশ্যে চিত্রাকারে যেরকম বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে, যা 'আকারচিত্র' বা 'বন্ধচিত্র' স্বরূপ পরিচিত, সে-প্রসঙ্গে দু-একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। চিত্রবন্ধ কবিতায় এর অজস্র নমুনা পাওয়া যায়। যেমন — পদ্মবন্ধ (চতুর্দল, অষ্টদল, ষোড়শদল পর্যন্ত), বীণাবন্ধ, মুরজবন্ধ, খড়্গাবন্ধ, শঙ্খবন্ধ, চক্রবন্ধ, পুষ্পবন্ধ, পতাকাবন্ধ, ছত্রবন্ধ, সর্প বা নাগবন্ধ প্রভৃতি। প্রসঙ্গত, একাদশ শতাব্দীতে, মালবের রাজা ভোজ রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের ভেতর *শৃঙ্গারপ্রকাশ* ছাড়াও *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*-এ চিত্রকাব্য প্রসঙ্গে আলোচনায় এরকম বহু সংখ্যক 'বন্ধ'-র উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকী বিশেষ কোনো বস্তু বা প্রাণীর সাদৃশ্যে আকার বা বন্ধচিত্রেও বৈচিত্র্য সুপ্রচুর। নিবন্ধের এই ক্ষুদ্র পরিসরে সেসবের বিস্তারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন দেখে নেওয়া যাক খড়্গা, মুরজ এবং পদ্মের (অষ্টদল) ছাঁদে চিত্রবন্ধ কবিতাকে।

আ কা র চি ত্র : ১

খড়্গাবন্ধ

> মারারিশক্ররামেভমুখৈরাসাররংহসা ।
> সারারব্ধস্তবা নিত্যং তদার্তিহরণক্ষমা ।।
> মাতা নতানাং সংঘট্টঃ শ্রিয়াং বাধিতসম্ভ্রমা ।
> মান্যাথ সীমা রামাণাং শং মে দিশ্যাদুমাদিমা ।।



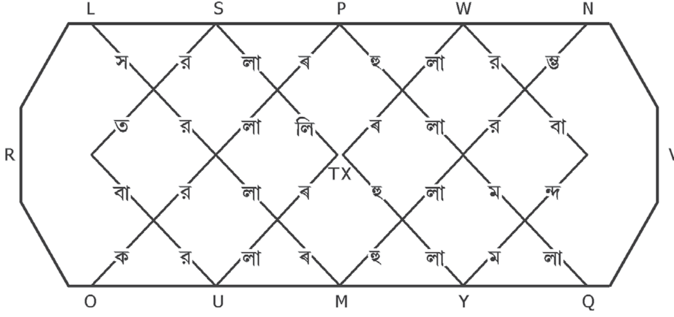
মার-অরি = মারারি = মহাদেব, শক্র = ইন্দ্র, রাম = রামচন্দ্র বা পরশুরাম, ইভমুখ = হাতিমুখ অর্থাৎ গণেশ, আসাররংহসা = জলসম্পাতের বেগে, সার = উৎকৃষ্ট, আরব্ধ = শুরু, স্তব = স্তুতি, নিত্যং = সর্বদা, তদার্তিহরণক্ষমাঃ = মহাদেব, ইন্দ্র প্রভৃতির পীড়া দূর করতে সমর্থা।

নতানাং মাতা = নম্য ব্যক্তিদের প্রতি মাতা স্নেহপরায়ণ, শ্রিয়াং = সম্পদের, সংঘট্ট = প্রাচুর্য, বাধিতসম্ভ্রমা = উদ্বেগরহিতা, মান্যা = মাননীয়া, রামাণাং = নারীদের, সীমা = পরাকাষ্ঠা বা শ্রেষ্ঠা, আদিমা = প্রথমা, পার্বতী মে শং দিশ্যাৎ অর্থাৎ পার্বতী আমার মঙ্গল বিধান করুন। তিনি আদিমা (প্রথমা বা মূল শক্তি), নারীদের শ্রেষ্ঠা, মাননীয়া; তিনি মহাদেব, ইন্দ্র, রামচন্দ্র, গণেশ প্রভৃতির উৎকৃষ্ট স্তুতির দ্বারা অর্চনীয়া হয়ে তাঁদের আর্তিহরণে সমর্থা। তিনি নম্রজনের অর্থাৎ ভক্তদের প্রতি স্নেহপ্রবণা, সর্ব সম্পদের আধার ও উদ্বেগরহিতা।

মুরজবন্ধ

সরলা ৰহুলারম্ভতরলালিৰলারবা ।
বারলাৰহুলামন্দকরলাৰহুলামলা ।।

সরলা- ৰহুল-আরম্ভ-তরল-অলিবল-আরবা
বারলা- ৰহুল-আমন্দ-করলা- ৰহুলা-অমলা



সরলা = মেঘমুক্ত। শরলা = শরতৃণসমৃদ্ধা। ৰহুলা = অনেক। আরম্ভ = সূচনা। তরল = চঞ্চল। অলিবল = ভ্রমরসৈন্য। আরব = কোলাহল। বারলা = হংসীরা। ৰহুলা = অনেক। অমন্দ = উৎসাহী। করলা = করগ্রাহী। অৰহুলা = শুক্লপক্ষ (তুল্য)। অমলা = নির্মল।

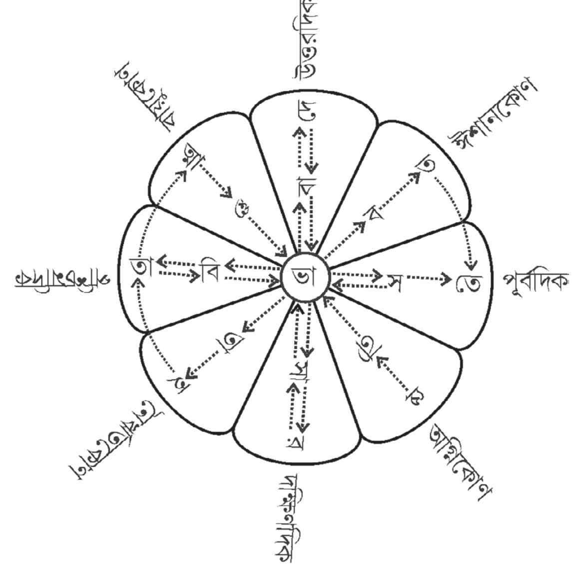
মেঘমুক্ত আকাশ ও শরবনে সমৃদ্ধ শরৎ ঋতুর প্রারম্ভেই ভ্রমরপুঞ্জ চঞ্চল। বিজিগীষু রাজার সেনাবাহিনী ভ্রমরপুঞ্জের মতো উচ্চকিত। দলে দলে রাজহংসীরা ভিড় করেছে, রাজপথে করসংগ্রাহক রাজকর্মচারীরাও সমবেত। শারদীয় শুক্লপক্ষের মতো নির্মল নিসর্গজগৎ।

পর্বভাগে শ্লোকটিকে চার ছত্রে বিন্যস্ত করার পর মুরজের গ্রন্থিবন্ধনে প্রথম ছত্রের দুই প্রান্ত (স এবং ম্ভ) এবং চতুর্থ ছত্রের মধ্যভাগ (ৰ এবং হু-এর নীচস্থ শূন্যস্থান) নিয়ে কৌণিকভাবে সংযোজক রেখায় বর্ণগুলি যুক্ত করলে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ একটি ত্রিভুজের (LMN) দুই বাহুতে যথারীতি প্রথম ছত্রটিকেই পাওয়া যায়। এরপর চতুর্থের দুই প্রান্ত (ক এবং লা) এবং প্রথমের মধ্যভাগ (ৰ এবং হু-এর শিরোপরি শূন্যস্থান) নিয়ে অনুরূপভাবে সংযোজক রেখায় বর্ণগুলির সংযুক্তি হলে সরল একটি ত্রিভুজ (OPQ) আগেরটির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথারীতি ওই ত্রিভুজের দুই বাহুতে চতুর্থ ছত্রের প্রাপ্তি ঘটে। এবার বাম এবং ডান পাশে দুটি রম্বস বা বরফি অঙ্কণে (RSTU এবং VWXY, মুরজের কেন্দ্রে T এবং X) এদের বাহুগুলিতে লগ্ন বর্ণসমূহের সংযোগে যথারীতি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছত্র দু-টি পাওয়া যায়।

আবার প্রথম দুই ছত্র যেমন, অনুরূপভাবে তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রও ক্রমানুযায়ী পরস্পর তির্যকভাবেও পড়া যায়, চিত্রের বিন্যাস এমনই। প্রথম দুই ছত্রের বর্ণগুলি যেভাবে উলটো দুটি ত্রিভুজের উপর প্রতিষ্ঠিত সরল দুটি ত্রিভুজের বাহুগুলিতে লগ্ন হয়ে আছে, পরের দুই ছত্রের বর্ণগুলিও সেরকম। উচ্চাবচভাবে ক্রমানুযায়ী পড়লে, মুরজের মধ্যভাগস্থ দুই প্রান্তের R ও V দুই বিন্দুকে কাল্পনিক সরলরেখায় যুক্ত করে ভাবলে, উপরার্ধ ও পরার্ধে যথারীতি দু-টি করে চার ছত্রই পাওয়া যায়। মুরজবন্ধের এহেন নকশার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে আরেক ধরনের বন্ধচিত্রের, যা 'গোমূত্রিকা' নামে পরিচিত। গোরুর চলনকালে মূত্রপাতজনিত বক্ররেখাতুল্য হওয়ায়, সেটি ওই নামেই প্রসিদ্ধ।

পদ্মবন্ধ (অষ্টদল)

ভাসতে প্রতিভাসার / রসাভাতা হতাবিভা ।
ভাবিতাত্মা শুভাবাদে / দেবাভা বত তে সভা ।।



(হে) প্রতিভাসার = প্রতিভাশ্রেষ্ঠ (মহারাজ)। তে = আপনার। সভা = পরিষদ। ভাসতে = শোভা পাচ্ছে। রসাভাতা = রস (প্রীতি / শৃঙ্গারাদি কাব্যরস) দ্বারা আভাতা — সম্যক শোভিতা। হতাবিভা = হতা — লুপ্তা, আবিভা — মলিনতা। আহতাবিভা = আহতা — অপ্রতিহতা, আবিভা — উজ্জ্বল দীপ্তি। ভাবিতাত্মা = ভাবিত, নির্ণীত আত্মা, ঈশ্বর (যে সভায়)। ভাবিত — বশীকৃত, আত্মা — স্বয়ং (যে রাজা)। শুভাবাদে = শুভা — মঙ্গলময়, বাদে — তত্ত্ববিচারে। দেবাভা = দেব — স্বর্গের দেবতাদের, আভা — উজ্জ্বলতা (যে সভার)।

হে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান মহারাজ, আপনার রাজপরিষদ পারস্পরিক প্রীতি ও সৌন্দর্যের সম্পর্কে, তথা শৃঙ্গারাদি রসময় কাব্যের দ্বারা শোভমান। এখানে সব মলিনতা লুপ্ত, গুণীজনের সমাবেশে এই সভা অতি উজ্জ্বল। ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত, তথা স্বয়ং বশীকৃত, মহারাজ তত্ত্ববিচারে বিশেষ পারদর্শী, স্বর্গের দেবসভার মতো এই রাজসভা অতি দীপ্তিময়ী।

পদ্মবন্ধ এই শ্লোকের প্রতি পর্বে আটটি দল (syllable), চার পর্বে সবসুদ্ধ বত্রিশটি। বর্ণগুলির ভেতর সর্বাধিক সংখ্যক 'ভা' বর্ণের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শব্দের আদি, মধ্য (সন্ধিজনিত) এবং প্রান্তে সংশ্লিষ্ট এই বর্ণের প্রতি ছত্রে প্রবেশ ও প্রস্থানে বিশিষ্ট অবস্থানের দরুন এই আকারচিত্রে পদ্মের কর্ণিকা স্বরূপ সেটি চিহ্নিত। 'ভা'-রূপ কর্ণিকার সব দিক ব্যেপে আটটি দল বা পাপড়ির এক-একটিতে দু-টি করে বর্ণ প্রাথমিকভাবে লেখার পর প্রবেশ-প্রস্থানের পালা। প্রথম প্রবেশ কর্ণিকাস্থ 'ভা' বর্ণে, এর পর পূর্বদলে অবস্থিত 'স-তে' বর্ণ দু-টিতে প্রস্থান, পাওয়া যাচ্ছে শ্লোকের প্রারম্ভিক শব্দ 'ভাসতে'। অতঃপর অগ্নিকোণস্থ দলে প্রবেশক্রমে সেখানে প্রাপ্ত 'প্র-তি' থেকে কেন্দ্রাভিগ হলে 'ভা' বর্ণে ইতি, পাওয়া যায় 'প্রতিভা'। আবার কেন্দ্রস্থ 'ভা' বর্ণ থেকে দক্ষিণদলে প্রবেশক্রমে সেখানকার 'সা-র' বর্ণ দু-টি যুক্ত হয়ে 'প্রতিভাসার' হচ্ছে। কিন্তু 'সা-র' বর্ণ দু-টি বিপরীতক্রমে 'র-সা' হওয়ার দরুন দক্ষিণদল থেকে প্রস্থানক্রমে কর্ণিকাস্থ 'ভা' বর্ণে ইতি, ফলস্বরূপ 'রসাভা' প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার ওই কেন্দ্র থেকে নৈর্ঋতদলে প্রবেশক্রমে সেখানকার 'তা-হ' বর্ণ দু-টি যুক্ত হয়ে 'রসাভাতাহ' পর্যন্ত প্রাপ্তির পর নৈর্ঋত থেকে প্রস্থান এবং পশ্চিমদলে প্রবেশক্রমে 'তা-বি' বর্ণ দুটির সংযুক্তি-সহ

যথারীতি কেন্দ্রাভিগ হলে 'ভা' বর্ণ সহযোগে সম্পূর্ণ হয় 'রসাভাতাহতাবিভা'। এইভাবে কর্ণিকা এবং অন্যান্য দলসমূহে পর্যায়ক্রমে প্রবেশ ও প্রস্থানে বর্ণগুলির সংযোগে পূর্বদলে প্রত্যাগমন করে কেন্দ্রাভিগ হলে সামগ্রিক পরিক্রমায় শ্লোকটির পদ্মবন্ধ রূপ পূর্ণাঙ্গ হয়।

বর্ণচিত্র, স্থানচিত্র, আকারচিত্র ব্যতীত আরেক প্রকার চিত্রবন্ধ 'গতিচিত্র'। নামেই প্রকাশ, 'গতি'র সঙ্গে চলমানতা, অস্থিতি, বা বেগবত্তার সম্পর্ক। সুতরাং 'গতিচিত্র' নিশ্চলতা বা স্থিরতার বিপরীত। এখানেও বৈভিন্ন্য কম নয়। অর্ধভ্রমণ, সর্বতোভদ্র, গজপদ, তুরগপদ, রথপদ (শতরঞ্জের বা দাবার ছকে চৌষট্টি ঘর পরিক্রমায় হাতি, ঘোড়া, নৌকার চলনরীতিসদৃশ যে-চিত্রবন্ধে পদের বর্ণসমূহ বিন্যস্ত), এমনকী কাকের পায়ের মতো যা, তাই 'কাকপদ' এবং গোরুর চলনপথে মূত্রপাতজনিত বক্ররেখাতুল্য তাই 'গোমূত্রিকা' নামেও আরেক চিত্রবন্ধ রয়েছে। 'সর্বতোভদ্র' এবং 'গোমূত্রিকা' যুদ্ধের বূহ্যতুল্য বিন্যাস স্বরূপ কথিত। সেনার বহির্মুখী সজ্জা প্রথমটিতে এবং তির্যক বিন্যাস দ্বিতীয়ে। প্রসঙ্গত, 'গোমূত্রিকা' সদৃশ তির্যক বিন্যাস 'আকারচিত্র : মুরজবন্ধ'র মধ্যেও বর্তমান। বলা বাহুল্য, বিশিষ্ট শৃঙ্খলায় প্রস্তুত নির্দিষ্ট পদের ভিত্তিতে তার চিত্রধর্মের স্বাতন্ত্র্যও নির্ধারিত হয়ে আছে এসবে, যার দরুণ বৈচিত্র্যও প্রচুর।

যাই হোক, আলোচনার অন্তিম পর্বে এসে এখন 'গতিচিত্র'র অন্যতম 'সর্বতোভদ্র' সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। পূর্বোল্লিখিত ভারবির শ্লোকটি (দেবাকানিনি কাবাদে...) স্মরণে রেখেই এখানে অন্য একটির উল্লেখ করা যাক —

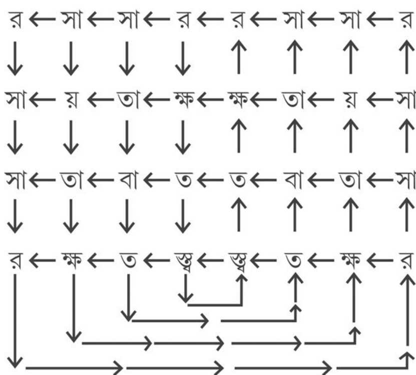
রসাসার রসাসার সায়তাক্ষ ক্ষতায়সা ৷
সাতাবাত তবাতাসা রক্ষতস্ত্বস্ত্বক্ষর ৷৷

(হে) রসাসার = রসা অর্থাৎ পৃথিবী, তার সার — শ্রেষ্ঠ (পৃথিবীপালক শ্রেষ্ঠ রাজ্য)। রক্ষতঃ = রক্ষাকারী আপনার কাছে। রসা = পৃথিবী। ক্ষতায়সা = দুর্জনশূন্যা / উপদ্রবহীনা। (অথবা) সারসায়তাক্ষ = পদ্মবৎ আয়ত লোচন যার, অর্থাৎ রাজীবলোচন। সাতাবাত = নাশিত-অজ্ঞান, অথবা সাত-আবাত = সাতে — সুখে, আবাত — অচঞ্চল। অতক্ষর = অতক্ষ — প্রচুর, রা — ধনসম্পদ, প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী। অতক্ষ-র = প্রচুর ধনসম্পদ-দাতা।

হে শ্রেষ্ঠ পৃথিবীপালক রাজা, আপনার দ্বারা এই পৃথিবী দুর্জনরাহিতা/ উপদ্রবহীনা। আপনি পদ্মপলাশলোচন, নাশিত-অজ্ঞান (অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত), সকলের সুখে অচঞ্চল, অজস্র ধনসম্পদের অধিকারী এবং বিপুল ধনসম্পদ-দাতা।

স্পষ্টই দৃশ্যমান, পদান্তর্গত প্রারম্ভিক শব্দগুলির অন্ত্যবর্ণ হয়েছে তাদের পরবর্তী শব্দের প্রারম্ভিক বর্ণ এবং পরবর্তী শব্দগুলি তাদের পূর্ববর্তী শব্দের বর্ণক্রমের বিপরীতে বিন্যস্ত। সুতরাং বিশিষ্ট শৃঙ্খলায় বর্ণসমূহ বিন্যস্ত এখানে, যার দরুন সরল পাঠ এবং বিপরীতক্রমে পাঠ একই প্রকার। এই ধরনের বিন্যাস 'বিলোম' জাতীয় কবিতাকে মনে করায়। এদিক থেকে 'বিলোম চিত্রবন্ধ' বলা যেতে পারে। এখন প্রত্যেক ছত্রের বর্ণগুলিকে নির্দিষ্ট ক্রমে সাজিয়ে চিত্ররূপে দেখা যাক।

গতিচিত্র : অর্ধভ্রমণ



প্রতি ছত্রের প্রথমার্ধের বিপরীতক্রমে পরার্ধের বর্ণগুলি বিন্যস্ত। এর দরুন প্রতি সারির পরার্ধের বর্ণ চতুষ্টয়ের প্রতিবিম্বসদৃশ হয়ে আছে ওই সারিরই প্রথমার্ধের বর্ণগুলি। উপরের অর্থাৎ প্রথম সারির প্রারম্ভিক চার বর্ণ অর্ধযতিভাগে চারটি ছত্রের আদ্যক্ষর (র,সা,সা,র), অধঃক্রমে এসে প্রতি ছত্রের অন্ত্যাক্ষর (র,সা,সা,র) ওই প্রথম সারির পরার্ধে যুক্ত হয়েছে ঊর্ধ্বক্রমে। অনুভূমিক কিংবা লম্বভাবে এবং বিপরীতক্রমে পড়লেও একই প্রকার পাঠ পাওয়া যায়। ৪+৪ = ৮টি করে বর্ণ ৪ সারিতে বিন্যস্ত করার দরুন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ৩২টি (৮x৪) কক্ষের সংস্থানও একপ্রকার হয়ে আছে। বর্ণগুলি নির্দিষ্টক্রমে পাঠকালে, অর্থাৎ দৃষ্টি এদের অনুসরণ করে অগ্রসর হলে তবেই এক-একটি ছত্রের পাঠ সম্পূর্ণ হয়। আপাতদৃষ্টে স্থিরচিত্র, কিন্তু তা নয়। সজ্জা এমনই যে দৃষ্টিও গতিশীল না থাকলে ছত্রগুলির পাঠ অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু এই পরিক্রমা আংশিক, তাই 'গতিচিত্র' হলেও তা 'অর্ধভ্রমণ'। দণ্ডী বলছেন — 'তদিদং সর্বতোভদ্রং ভ্রমণং যদি সর্বতঃ।' সুতরাং 'গতিচিত্র'র সঙ্গে ভ্রমণের সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই ভ্রমণ সর্বত্রগামী হলে তবেই তাকে 'সর্বতোভদ্র' বলা যায়। কিন্তু, কীভাবে 'ভ্রমণং যদি সর্বতঃ' হবে? অন্যত্র বলা হচ্ছে — 'অষ্টকোষ্ঠচতুষ্টয়ং লিখিত্বা তত্র শ্লোকং ক্রমেণ লিখিত্বা সর্বতো বাচনা সর্বতোভদ্রঃ'। (কাব্যাদর্শ) অর্থাৎ আট ঘরে বা কক্ষে চার পদ বা চরণ (৮x৪ = ৩২) লিখে তারই ক্রমানুযায়ী প্রত্যেক কক্ষে যে বিন্যাস, তা-ই সর্বতোভদ্র। তাহলে কক্ষ আরও প্রলম্বিত করা প্রয়োজন, তবেই সর্বত্রগামী হওয়া সম্ভব এবং গতিশীলতা আরও বাড়বে সেখানে। অতএব ৩২ সংখ্যক থেকে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬৪ কক্ষে যেতে হবে। এখানেও সেই শতরঞ্জ বা দাবার ছক, গজপদ-তুরগপদ-রথপদের মতো। কিন্তু চলন আলাদা। এবার তাহলে পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটিকে (রসাসার রসাসার সায়তাক্ষ...) 'অর্ধভ্রমণ' থেকে 'সর্বতোভদ্র'য় দেখা যেতে পারে। সেইসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত ভারবির শ্লোকটিকেও (দেবাকানিনি কাবাদে...)।

গতিচিত্র : সর্বতোভদ্র

র	সা	সা	র	র	সা	সা	র
সা	য়	তা	ক্ষ	ক্ষ	তা	য়	সা
সা	তা	বা	ত	ত	বা	তা	সা
র	ক্ষ	ত	স্ত্ব	স্ত্ব	ত	ক্ষ	র
র	ক্ষ	ত	স্ত্ব	স্ত্ব	ত	ক্ষ	র
সা	তা	বা	ত	ত	বা	তা	সা
সা	য়	তা	ক্ষ	ক্ষ	তা	য়	সা
র	সা	সা	র	র	সা	সা	র

চিত্র ১

দে	বা	কা	নি	নি	কা	বা	দে
বা	হি	কা	স্ব	স্ব	কা	হি	বা
কা	কা	রে	ভ	ভ	রে	কা	কা
নি	স্ব	ভ	ব্য	ব্য	ভ	স্ব	নি
নি	স্ব	ভ	ব্য	ব্য	ভ	স্ব	নি
কা	কা	রে	ভ	ভ	রে	কা	কা
বা	হি	কা	স্ব	স্ব	কা	হি	বা
দে	বা	কা	নি	নি	কা	বা	দে

চিত্র ২

সংক্ষেপসূচি

কি. : কিরাতার্জুনীয় (রচয়িতা ভারবি)
শি. : শিশুপালবধ (রচয়িতা মাঘ)
সুভা. : সুভাষিতরত্নকোষ (বিদ্যাধর সংকলিত, ১১শ খ্রি.)
শৃ. : শৃঙ্গারপ্রকাশ (রচয়িতা ভোজরাজ, ১০ম-১১শ খ্রি.)
ভট্টি. : ভট্টিকাব্য (রচয়িতা ভট্টি)
ভা.কা. : ভামহ কাব্যালংকার (রচয়িতা ভামহ)

রচনাটির পূর্ণাঙ্গ রূপদানে বিশেষ সহায়তায় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
— সম্পাদক

ইস্পানো-পোর্তুগেস দুনিয়ার দেখার কবিতা, কবিতা দেখা

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা কেমন দেখতে হবে, ভাবার দরকার পড়ে সেই সমাজে, যেখানে কবিতার সামাজিক গুরুত্ব নেই। কবিতার সামাজিক গুরুত্ব আছে কি? মানে, কবি গলা ফাটিয়ে রাজনৈতিক বিবৃতি দেবেন কবিতায়, তা কি হয় এইসময়? হয়। এখনও কিছু কবি ভাবেন কবিতায় মনোরঞ্জন। যার শরীরে ঢোকে রাজনৈতিকতা। কিন্তু যে-কবিতা আরোপণ নামক ক্রিয়াপদে আস্থাশীল নয়, সে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসহীন। অর্থাৎ, যে-কবিতা সেইসব প্রাচীন পথে হেঁটেছে, তাদের চেহারা নিয়ে অত কিছু ভাবার নেই; কিন্তু যার পথ আসলে চোরা, তাকেই চেহারা নিয়ে ভাবতে হয়।

এবং এটাই ইবেরোদুনিয়ার কবিতাভাবনার কেন্দ্রে কাজ করে চলেছে গত চল্লিশ বছর। আমি রাউল সুরিতা-র সঙ্গে কথা বলেছি ২০০৪ সালের কলকাতা বইমেলায়, রাউল আমাদের সময়ের এক প্রধান কবি এস্পানিওল ভাষায়, চিলে নামক দেশটির যাবতীয় স্বৈরাচার দেখেছেন, বুঝেছেন নিজের হাড়ে, রাউলের কাছে কবিতা তার প্রচলিত আকার হারিয়েছে পিনোচেতের জেলখানা থেকে ফেরার পর। পুলিশের লাঠি মলদ্বারে ঢোকার পর। প্রচলিত ছন্দে লেখা উঠে গিয়েছিল দীর্ঘদিন, এবার একেবারেই গদ্যের আকারে লেখা কবিতা।

আবার রাউলের চেয়ে দশক হিসেবে এক দশক আগের কবি রাফায়েল কাদেনাস-এর কাছে কবিতাকে কবিতার মতো দেখতে হওয়াটা জরুরি। কাদেনাস ছয়-এর দশকের কবি। গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়েই অস্থিরতা। কাদেনাসের দেশ বেনেসুয়েলাতেও। কিন্তু একা নেরুদা ও পাররা-র উপস্থিতি সেই সময়ের কবিতাকে অন্তর্মুখী করেছে গোটা এস্পানিওল ভাষাভূগোলে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে। আবিষ্কৃত হচ্ছেন লুইস সেরনুদা নামক লোরকার নেরুদার সমসাময়িক স্পেনীয় জীবনানন্দ দাশ। বদলে যাচ্ছে কবিতার বিষয়।

একদিকে রাউল সুরিতা যেমন বলছেন, কবিতার প্রথাগত বিষয় বদলেছে বলে তার চেহারাও পরিবর্তিত। অন্যদিকে রাফায়েল কাদেনাস অন্য বিষয় লিখে চলেছেন কবিতার মতো দেখতে একটা আঙ্গিকে।

রাউল সুরিতার মতো সত্তরের স্পেনের দুই প্রধান ও সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ কবি আংখেল গিন্দা ও আন্তোনিও কোলিনাস কবিতার চেহারা নিয়েও উলটো মত পোষণ করেন। আন্তোনিও কোলিনাসের বিষয় কবিতার চিরাচরিত। কিন্তু তাঁর কবিতার চেহারায় অনায়াসে মিশে যায় গদ্য। আংখেল তাঁর জীবনের মতোই কবিতায় বিপদজনক। কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশকালে ভাবেন চেহারা নিয়ে। গদ্যের মতো দেখতে কবিতা কিছুতেই প্রচলিত কবিতার মতো দেখতে কবিতার সঙ্গে এক বইতে থাকে না। অবশ্য এর জন্য ইস্পানো কাব্যপাঠাভ্যাসও দায়ী। যেখানে আমেরিকা মহাদেশের এস্পানিওল কবিতা গদ্য বা ছন্দ এইসব বিতর্কের ঊর্ধ্বে, সেখানে এস্পানিয়া এখনও অক্ষরবৃত্ত গোছের একটা ছন্দে লিখে চলে। ফলে সেখানে গদ্যের মতো দেখতে কবিতা হলে পাঠক হারানোর সম্ভাবনা থাকে। এক বন্ধু প্রকাশক আমাকে বলেছিলেন, 'এক র‍্যাঁবো ফরাসী কবিতাকে একধাক্কায় সাবালক করেছিলেন, কিন্তু এস্পানিয়ার বিশ শতক শুধু লোকসংগীত আর ম্যান্ডোলিনের পিড়িং-পিড়িং নিয়েই গেল'; ইশারা গার্সিয়া লোরকা-র দিকে। তার সঙ্গে অবশ্য যোগ করেছিলেন, ফ্রান্সে আর কবিতা নেই। কিন্তু এস্পানিয়ায় এখনও আছে, আর তার এক প্রধান কারণ হল, আমেরিকা মহাদেশে লেখা কবিতার সঙ্গে এস্পানিয়ার চিরাচরিত কবিতার সংঘাত।

এই সংঘাত থেকেই কবিতা কেমন দেখতে হবে, তাই নিয়ে একটা নানা ভাবনার চোরাস্রোত আছে। আর সেখানেই ঢুকে পড়েন 'পোয়েসিয়া কোংক্রেতা'-র কবিরা। এঁদের কবিতা দৃশ্য। এঁরা ভেবেছেন কবিতার বাহ্যিক চেহারার চিত্রময়তা নিয়ে। মেহিকোয় ওক্তাবিও পাস, চিলেতে নিকানোর পাররা অতি বিখ্যাত নাম। আর এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম জোয়ান ব্রোসা। এস্পানিয়ার কবি। লিখেছেন কাতালান ভাষায়। যে-ভাষা দীর্ঘ শতাব্দী জুড়ে অবনমনের শিকার। যে-ভাষা আজ এই ২০১৫-তে পৃথক কাতালুনিয়া দেশের দাবি তুলেছে। জোয়ান ব্রোসার কাজ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে এক অন্য চ্যালেঞ্জ। ফ্রাংকোর জমানায় কাতালান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আর সে-নিষেধের বিরুদ্ধে লেখার এক কায়দা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ছবি। একটি উদাহরণ রাখলাম।



নিকানোর পাররাও ব্রোসার প্রণোদনায় ছবি লিখেছেন! নাম দিয়েছেন, 'পোয়েসিয়া বিসুয়াল'। তাঁরা দু-জনে প্রায় সমসাময়িক এবং বন্ধু।



LA MUERTE
ES UN HABITO COLECTIVO

মৃত্যু এক সমবায়ী অভ্যেস; নিকানোর পাররা

PROCESO DIALECTICO

TESIS



ANTITESIS



SINTESIS



ডায়ালেক্টিক কবিতা; নিকানোর পাররা

এঁদের ‘পোয়েসিয়া কোংক্রেতা’-র দলে ফেলা যাবে এই কবিতাগুলির জন্য।

ইবেরো-ভূগোলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পোর্তুগেসে চিত্রটি সামান্য ভিন্ন। সেখানে ব্রাজিল নামক এক দেশের বিরাট উপস্থিতি। সেখানকার বিরাট লেখকভূগোল। তাঁদের কবিতার বৈচিত্র্য। আরলদো দে কাম্পোস ও দেস পিগনাতারি ও তাঁদের ‘কোংক্রেতিসমো’। এইসমস্ত লেখাতেই কবিতার দৃশ্যরূপ প্রধান হয়ে উঠেছে। পিগনাতারি তাঁর কবিতায় স্লোগানধর্মী কিছু লেখার থাকলে ব্যবহার করেছেন অক্ষরের দৃশ্যগুণ। যেমন নীচের কবিতাটি —



প্রথম লাইনে বলা হচ্ছে, কোকাকোলা পান করুন। তারপরে এখানে মূল খেলা অক্ষরগুলি নিয়ে। যা শেষ হচ্ছে ক্লোয়াকা বা মলদ্বারে গিয়ে। দলের বাকিদেরও কাজ একই রকমের। তবে, পর্তুগেস ভাষায় আরেক রকমের বিস্ময় পর্তুগালের কবি এরবেরেতো এলদের। তাঁর কবিতা প্রচলিত কবিতার মতোই দেখতে। কিন্তু তাঁর কবিতাসমগ্র তৈরি করার সময় এক প্রবল পরিবর্তন ঘটান, যার কোনো তুলনা সহজলভ্য নয়। চিরকালই প্রচারবিমুখ। জীবনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন হাতে-গোনা। কাব্যগ্রন্থ-সংখ্যা পনেরোর অধিক। কিন্তু কবিতাসমগ্র প্রকাশকালে তিনি ষাট শতাংশ কবিতা কেটে বাদ দেন। যদিও এ-কাজ আগে মারিয়ানে মুর করেছেন। এলদের আরেক ধাপ এগিয়ে কবিতাসমগ্রে মুছে দিলেন কবিতার বইগুলির নাম এবং কবিতার শিরোনাম। কবিতাসমগ্রটি একটি দীর্ঘ কবিতা হিসেবে পড়তে হয়। নাম ‘একটানা কবিতা’ (Ou o poema continuo)।

কবিতার আকার ও চেহারা নিয়ে বিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে নানা নিরীক্ষা হয়েছে এবং তা এখন অন্য চেহারায়। ১৯৭৮ সালে জন্ম এস্পানিয়ার সোফিয়া রেই লিখেছেন পর্যায়সারণির মতো দেখতে কবিতা। নির্মাণ করেছেন গ্রন্থ। সমসাময়িক চিলের এক্তোর এরনান্দেস লিখেছেন টানা গদ্যের মতো দেখতে কবিতার বই।

আসলে, কবিতার বিনোদনী ভূমিকা চলে গেছে ইবেরো ভাষাভূগোল থেকে। ফলত, কবিতার চেহারায় চটক দেওয়ার কোনো প্রবণতা এখন আর বিশেষ দেখা যায় না।

আলংকারিক উর্দু কবিতার দৃশ্যরূপ

কলিম হাজিক

আর পাঁচটা ভাষার মতো উর্দুর ক্ষেত্রেও কবিতার মূল তত্ত্বগত ধারণায় খুব একটা তফাত কিছু নেই। ভাষার মাধ্যমেই তো কাব্যিক প্রকাশ সম্ভব, উর্দুর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার; কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় তাই শব্দই সূচনাবিন্দু হয়ে ওঠে। শব্দের মাধ্যমেই আমাদের যাবতীয় কাব্যিক অভিব্যক্তি, তার অবলম্বন বিভিন্ন রীতি — সে গজল, রুবাই, কিতা, কাসিদা, মসনবি, মর্সিয়া, যা-ই হোক; তা ছাড়া আজাদ (মুক্তক) এবং নস্‌রি নজ়ম-ও (গদ্যকবিতা) রয়েছে। এমনকী সনেটের মতো আকর্ষণীয় রীতি — যাতে আখতার শিরানি (১৯০৫-৪৮) এবং নুন মিম রশিদ-ও (১৯১০-৭৫) লিখেছেন।

আরবি, ফারসির মতো উর্দুর ক্ষেত্রেও কবিতা সম্পর্কিত আলোচনার শুরু সেই বলাগত্ (সংযোগদক্ষতা /প্রকাশনৈপুণ্য) এবং আরুজ (ছন্দ) দিয়েই। ছন্দবদ্ধ কাব্যিক প্রকাশের ক্ষেত্রে উভয় প্রণালীরই চর্চা হয়ে আসছে সুদীর্ঘ কাল ধরে, তা সে গজল, মসনবি প্রভৃতি যা-ই হোক। প্রতি ক্ষেত্রেই নিজস্ব দৃশ্যরূপগত বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। কিন্তু মুক্তক এবং গদ্যধর্মী রচনার সূত্রপাতের পর সেই সুনির্দিষ্ট দৃশ্যরূপেও বড়ো রকমের রদবদল ঘটে গেছে। যদিও গজল দৃশ্যত দ্বিপদীবন্ধ, কিন্তু তা পঁচিশটিরও বেশি ছন্দরূপে লেখা হয়ে থাকে। প্রত্যেক শব্দের ধ্বনিই তাদের মাত্রাসূচক। কবিতার জগতে তা বিরল নয়, এরকম আরও দেখা যাবে। ছন্দমাত্রার তারতম্যর দরুন দৃশ্যরূপেও তফাত তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। এমন কিছু ছন্দও আছে যেখানে রুকন্ (পর্ব / foot) হয়তো দুটি। সেভাবেই আবার কোনো কোনো ছন্দের ক্ষেত্রে রুকন্ চার, কিন্তু সিলেব্‌ল্ হয়তো পাঁচ কি আরও বেশি। আরেক হল আলংকারিক দিক, যেখানে হয়তো ছন্দবদ্ধ কোনো পঙ্‌ক্তিকে বিস্তীর্ণ করা হয় না গদ্য পঙ্‌ক্তির ধাঁচে, কিন্তু অনেক সময় আবার শব্দের উপস্থাপনা এমনই হয় একটি বা একাধিক সিলেব্‌ল্-এর সমাবেশে, যার দরুন এক *মিসরা* (দ্বিপদীর এক পঙ্‌ক্তি) হয়ে ওঠে, আর তা থেকেও স্বতন্ত্র কোনো অবয়ব পাওয়া যায় কবিতার, যা সচরাচর নয়। যাই হোক, গালিবের গজল থেকে একটি দ্বিপদী দেওয়া গেল —

না থা কুছ তো খোদা থা, কুছ না হোতা তো খোদা হোতা।
ডুবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না ম্যাঁয় হোতা তো কিয়া হোতা।।

গজল তৈরি হয় তিনের বেশি দ্বিপদী নিয়ে — প্রথম দ্বিপদীকে বলে *মাত্‌লা*, যার দুটি পঙ্‌ক্তিতেই থাকে *রদিফ* (অন্ত্যমিল) এবং *কাফিয়া* (রদিফের আগে যে-শব্দ থাকে)। উপরের দ্বিপদীতে ‘খোদা’ আর ‘কিয়া’ হল *কাফিয়া* এবং ‘হোতা’ হল *রদিফ*। কিছু কিছু গজলে দুটি *মাত্‌লা*-ও পেতে পারেন এবং তখন তাদের বলা হয় *মাত্‌লা-এ-আওয়াল* (প্রথম মাত্‌লা) আর *মাতলা-এ-সানি* কিংবা *হুসন-এ মাত্‌লা* (পরবর্তী মাত্‌লা বা মাত্‌লা-র সৌন্দর্য)। পরবর্তী দ্বিপদীর পঙ্‌ক্তি দুটি থাকে *কাফিয়া* ও *রদিফ*-এ। শেষতম দ্বিপদীকে বলে *মক্‌তা*, এতে কবির নামের উল্লেখ থাকে যে-কোনো জায়গায়। এবার আগের ওই গজলের তিনটি দ্বিপদী এখানে দেওয়া গেল —

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا
ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا
نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا
ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے
وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খোদা থা, কুছ না হোতা তো খোদা হোতা
ডুবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না ম্যাঁয় হোতা তো কিয়া হোতা

হুয়া জব গম সে যুঁ বেহিস, তো গম কিয়া সরকে কটনে কা
না হোতা গর জুদা তন সে, তো জ়ানোঁ পর ধরা হোতা

হুয়ে মুদ্দত কে গালিব মর গয়া, পর ইয়াদ আতা হ্যায়
উহ্ হর এক বাত পর কহনা, কে যুঁ হোতা তো কিয়া হোতা

অনুবাদ —

কিছু না থাকলেও বিধাতা থাকতেন, না হলে কিছু তবু হতেন নিরাকার।
আমাকে ডুবিয়েছে আমারই হওয়া, হায়, না হলে আমি তবে কোথায় আমি আর!

বেহুঁশ ছিলে যদি মর্মবেদনায়, মাথাও কাটা গেলে কী আর আসে যায়!
শরীর থেকে শির ছেদ না হত যদি, জানুর উপরেই থাকত সে আবার!

সময় গেল ঢের, গালিব হলে গত, তবু তো মনে হয় এখনও অহরহ
কথার পিঠে তার সেই যে কথা সব, এই যা হত, হলে, তাতেও কী-বা আর!

কিন্তু এটাও আশ্চর্যের, মির্জা গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯) অনেক আগেই, উর্দু কবিতা যখন ফারসি সাহিত্য দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত, সেই সময়েই আমির খুসরু (১২৫৩-১৩২৫) গজল রচনা করেছিলেন, আর তাতে কেবল ফারসি শব্দই ছিল না, একদিকে অলংকারসমৃদ্ধ ও ব্যকরণসম্মত, অন্যদিকে *খড়ি বোলি*-সমৃদ্ধ পাঠবস্তুর সঙ্গে মিশিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব পরীক্ষমূলক *কহ-মুকরনি* আঙ্গিকের সৃজনকর্ম। তারই মধ্যে ছিল ছোটো-ছোটো গীতিকবিতা, তাদের নিজস্ব ছন্দবদ্ধ বিন্যাসে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল —

গজল থেকে দুটি দ্বিপদী —

زحال مسکیں مکن تغافل دورائے نیناں بنائے بتیاں
کہ تاب ہجراں ندارم اے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں
شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چو عمر کوتاہ
سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں

জে হাল-এ-মিসকিন তগাফুল, দুরা-এ-নয়না বনায়ে বতিয়াঁ।
কি তাব-এ-হিজরাঁ না দরুম অ্যায় জাঁ, না লহু কাহে লাগা কে ছাতিয়াঁ॥

শবাঁ হিজরাঁ দরাজ চুঁ, জুলুফ্, রোজ-এ-ওয়াস্লত্ চুঁ উমর কোতাহ্।
সখী পিয়া কো যো ম্যাঁয় না দেখুঁ, তো ক্যায়সে কাটুঁ অন্ধেরি রাতিয়াঁ॥

অনুবাদ —

কাঙালের গতি করো হে উদাসী, দ্যাখো চোখ মেলে, কথা কও।
এ জীবনভার অবহ বিরহে, কেন দূরে এত, বুকে নও?

অলকদীর্ঘ বিরহের নিশা, মিলনের বেলা যত ক্ষীণ —
কীভাবে তামসী কাটে অদেখায়, প্রিয়, তুমি যদি দূরে রও?

چھاپ تلک سب چھینی رے موسے نیناں ملائکے
پریم بھٹی کا مدھوا پلائکے، متوالی کر دینی رے موسے ....
گوری گوری بیاں، ہری ہری چوڑیاں، بیاں پکڑ دھر لینی رے موسے
بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، اپنی سی کر لینی رے موسے
خسرو نجام کے بل بل جئیے، موہے سہاگن کینی رے موسے ....

ছাপ তিলক সব ছীনি রে মোসে নয়না মিলাইকে।

প্রেম ভাটী কা মাধবা পিলাইকে,
মতওয়ালি কর লীনি রে মোসে নয়না মিলাইকে।

গোরি গোরি বইয়াঁ, হরি হরি চুড়িয়াঁ,
বইয়াঁ পকর ধর লীনি রে মোসে নয়না মিলাইকে।

বল বল যাউঁ ম্যাঁয় তোরে রংগরজওয়া,
আপনি সী কর লীনি রে মোসে নয়না মিলাইকে।

খুসরৌ নিজাম কে বল বল যাইয়ে।
মোহে সুহাগন কীনি রে মোসে নয়না মিলাইকে।

অনুবাদ —

কেড়ে নিলে ছাপ-তিলক আমার নয়নে তোমার নয়ন মিলিয়ে।
পিরিতিভাটির মধুমদ দিয়ে মাতালে, নয়ন নয়নে মিলিয়ে।

গৌরী হাতের শ্যামল কাঁকন — হয়ে ওঠে সেও কঠিন বাঁধন,
তুমি ধর যদি এ-হাত আমার নয়নে তোমার নয়ন মিলিয়ে।

তোমাকেই সঁপে দিয়েছি, আমার রংরেজ তুমি ক'রে আপনার
রাঙাও আমাকে, তুমিও নিজের নয়ন আমার নয়নে মিলিয়ে।

তোমারই উপায়ে বাঁচাও এখন খুসরোকে তুমি, লেগেছে লগন —
বিবাহের আজ, দয়িত, আমার নয়নে তোমার নয়ন মিলিয়ে।

আরেকটি প্রাচীন রূপ হল দোহা, যেমন আমরা কবীরের কবিতায় পাই। খুসরু বলছেন —

خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار
جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار

খুসরু দরিয়া প্রেম কি উলটি ওয়াঁ কি ধার।
যো উতরা সো ডুব গয়া, যো ডুবা যো পার॥

অনুবাদ —

প্রেমসাগরের উলটো রীতি, খুসরো, এমন —
পার হলে হয় ভরাডুবি, ডুবলে তো পার হল সেজন।

দোহার বিশেষত্ব এই যে, এর ছন্দও যেমন দ্বিতীয়রহিত, অন্ত্যমিলও একটিমাত্র। এখানে যেমন, 'ধার'-এর সঙ্গে 'পার' রয়েছে। কিন্তু গজলের দ্বিপদী আবার একাধিক ছন্দে, বিভিন্ন মাত্রা সমাবেশে এবং অন্ত্যমিল বা রদিফ নিয়েই গড়ে ওঠে।

এ ছাড়াও ছন্দবদ্ধ গঠনে আরও বিশেষ কিছু রূপ আছে, যেখানে দুটি দ্বিপদী নিয়ে একটি কিতা এবং রুবাই লেখা হচ্ছে কোনো বিশেষ বিষয়ে। কিতা আর রুবাইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তি অন্ত্যমিলে থাকে, কিন্তু রুবাই গড়ে ওঠে মোটের ওপর কুড়িটির মতো ছন্দমাত্রায়, এক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিল থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বাহাদুর শাহ্ জাফরের একটি ফারসি কিতা এখানে উল্লেখ করা হল —

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست
در پریشاں حالی و درماندگی
دوست مشمر آنکہ در نعمت زند
لاف یاری برادر خواندگی

দোস্ত আঁ বাশদ কে গীরুদ দস্ত-এ-দোস্ত
দের পরীশাঁ হালি-এ-দমনদায়ী
দোস্ত মে শুমের আঁ কে দের নেমাত জনদ
লাফ ইয়ারে ব্রাদের খানদায়ী

অনুবাদ —

বন্ধু যে, হাতে হাত রাখে সে-ই বন্ধুর —
দুর্গতি হলে দুঃসময়ে।
খানদানে মন যার, হোক না সে বন্ধু,
ভাই হোক, নামে শুধু সে রহে।

এবার রুবাই। পারস্য এবং আরবের সমস্ত বড়ো কবিই এই আঙ্গিকে লিখেছেন এবং তার দরুন বিপুল সংখ্যক রূপকল্পেরও সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের রচনার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে তো বটেই, এমনকী সেসব ছাড়িয়েও। কবিতার এই বিশিষ্ট রূপের আশ্রয়ে জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক চিন্তার বহুল প্রকাশ লক্ষ করে রুবাইকে তাই 'হকিমানা খয়ালত' (দার্শনিকের জ্ঞান, সারগর্ভ চিন্তা) স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। ফারসিতে খৈয়াম থেকে উর্দু রুবাইয়ে ফিরাক গোরখপুরী অবধি প্রত্যেকেই নিজস্ব মাইলফলক রচনা করেছেন।

এখানে রঘুপতি সহায় ফিরাক গোরখপুরীর (১৮৯৬-১৯৮২) একটি রুবাই তাঁর *গুল-এ-নগমা* রচনাসংগ্রহ থেকে দেওয়া গেল —

رباعی

آنکھوں میں وہ رس جو پتی پتی دھوجائے
زلفوں کے فسوں سے مارِ سنبل سوجائے
جس وقت تو سیر گلستاں کرتا ہو
ہر پھول کا رنگ اور گہرا ہو جائے

আঁখো মে উহ রস যো পত্তি পত্তি ধো যায়ে
জুলফোঁ কে ফাসুঁ মার-এ-সুনবুল সো যায়ে
জিস ওয়াক্ত সায়ের-এ-গুলিস্তাঁ করতা হো
হর ফুল কা রংগ অউর গহরা হো যায়ে

অনুবাদ —

পল্লব সবই ধুয়ে দিয়ে যাও দৃষ্টিরসের ধারায়।
চূর্ণ অলক বশ ক'রে সাপ মুথাঘাসে ঘুম পাড়ায়।
উদ্যানে তুমি এসেছ যখন ভ্রমণের সেই ক্ষণে —
গাঢ় হয়ে ওঠে ফুলগুলি আরও আপন রঙের ধারায়।

ছন্দবদ্ধরূপে অনেক কবিতাই লেখা হয়েছে নানারকম ধাঁচে। যেমন, মোসাল্লাস, যেখানে এক-একটি স্তবকে তিনটি করে পঙ্‌ক্তি — মোরাব্বায় চার, মোসাজ্জায় পাঁচ আর মোসাদ্দাস-এ ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবক। তবে সব ক-টির ধরন আলাদা রকম। যেমন, মোসাল্লাস-এ দুটি পঙ্‌ক্তির মিল একরকম, কিন্তু তৃতীয়তে এসে সেটি ভিন্ন ধরনের। মোরাব্বায় চারটি পঙ্‌ক্তির মিলই একরকম। মোসাজ্জায় তিনটি এবং দুটি পঙ্‌ক্তির মিল একরকম এবং এভাবেই। মোসাদ্দাস ধাঁচে আল্লামা ইকবাল (মহম্মদ ইকবাল, ১৮৭৭-১৯৩৮) ১৯০৫ সালে *হিমালয়* শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, যার প্রথম স্তবকটি এখানে পেশ করা হল —

ہمالہ

اے ہمالہ اے فصیلِ کشورِ ہندوستاں
چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں
تجھ پہ کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں
تو جواں ہے گردشِ شام و سحر کے درمیاں

ایک جلوہ تھا کلیمِ طور سینا کے لئے
تو تجلی ہے سراپا چشمِ بینا کے لئے

অ্যায় হিমালা অ্যায় ফসীল-এ-কিশওয়ার-এ হিন্দুস্তাঁ
চুমতা হ্যায় তেরী পেশানি কো ঝুক কর আসমাঁ
তুঝ ম্যায় কুছ পয়দা নহীঁ দেরীনা রোজি কে নিশাঁ
তু জওয়াঁ হ্যায় গর্দিশ-এ-শামোসহর কে দরমিয়াঁ

এক জলওয়া থা কলিম-এ-তুর-এ-সিনা কে লিয়ে
তু তজল্লি হ্যায় সরাপা চশ্‌ম্‌-এ-বিনা কে লিয়ে

অনুবাদ —

হিমালয়, তুমি হিন্দুস্তানের সীমান্ত প্রাচীর।
মাথা ঝোঁকালে আকাশ তোমার ললাট চুম্বন করে।
তুমি বৃদ্ধ নও — নেই তার চিহ্ন কিছু তোমার উপর।
এত দিন এত রাত কেটে গেল, তবুও নবীন।

সেই যে তেজোবলয় — সিনাই পর্বত — মোজেসের দিব্য দেখা,
অন্তর্লোকে, তোমারও হয়েছে সেই প্রখর প্রকাশ, আপাদমস্তক।

সেভাবেই, মসনবি, মর্সিয়া আর কাসিদা আকার-প্রকারে একইভাবে লেখা হয়েছে। মসনবি আখ্যানকাব্য, মর্সিয়া শোকগাথা, আর কাসিদাও সেই নজ়ম বা কবিতা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিত্ব বা রাজারাজড়ার প্রশস্তিতে রচিত, সুতরাং প্রশস্তিমূলক কাব্য। *মসনবি সেহরুল বয়ান* (মীর হাসান ১৭৩৬-১৭৮৬), *মোসাদ্দাস-এ-হালি* (আলতাফ হুসেন হালি ১৮৩৭-১৯১৪), *কলকত্তা এক রবাব* (হরমাতুল একরাম ১৯২৭-১৯৮৩) উল্লেখযোগ্য মসনবি। ইকবালের *হিমালয়*-এর মতো একই ধাঁচে, একই ছন্দে এই তিন মসনবি লিখিত। পাঠ্যাংশের আকার-প্রকার যা-ই হোক, পরিপূর্ণ কল্পনা আর বিবরণসমৃদ্ধ হওয়ার দরুন এই মসনবিগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই স্মরণীয় হয়ে আছে।

মীর তকি মীর (১৭২৩-১৮১০), মীল বাবর আলি আনিস (১৮০২-১৮৭৪) এবং মির্জা দবির (১৮০৩-১৮৭৬) হলেন মর্সিয়ার তিন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। 'মর্সিয়া' মূল আরবি শব্দ 'রিসা'-জাত, যার অর্থ হল মৃতের জন্য বিলাপ বা শোক করা। মর্সিয়া উর্দু কবিতার বিভিন্ন কিসমের একটি, সাধারণভাবে শোকগাথামূলক কবিতা হিসেবে পরলোকগত আত্মার জন্য বিষাদ প্রকাশক হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি পয়গম্বর মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হুসেনের ঐতিহাসিক কারবালা যুদ্ধে শহিদ হওয়ার স্মরণেই বিশেষত লেখা হয়ে থাকে। ছয় পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত মুসাদ্দাসের স্তবকরীতি মেনে। মীর বাবর আলি আনিসের একটি মর্সিয়ার সূচনাংশের কয়েক পঙ্‌ক্তি —

مرثیہ

نمک ِ خوانِ تکلم ہے فصاحت میری
ناطقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری
رنگ اڑتے ہیں وہ رنگیں ہے عبارت میری
شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری
عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں
پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں

নমক-এ-খওয়াঁ-এ-তকল্লুম হ্যায় ফসাহত্‌ মেরী
নাত্‌কে বুঁন্দ হ্যায় সুন সুন কে বলাগত্‌ মেরী
রং উড়তে হ্যায় উহ্‌ রঙ্গিন হ্যায় ইবারত মেরী
শোর জিসকা হ্যায় উহ্‌ দরিয়া হ্যায় তবিয়ত মেরী
উমর গুজরি হ্যায় ইসি দুশ্‌ত্‌ কি সায়াহি ম্যাঁয়
পঞ্ছি পুশ্‌ত্‌ হ্যায় শাব্বির কি মদ্দাহি ম্যাঁয়

অনুবাদ —

বচনপটু লিখন আমার নুন তো ভারি, পাঠক যা খায়
আমার কথা শুনলে কত বাক্যবাগীশ চুপ করে যায়
রং যে কত উড়তে থাকে, লিখতে গেলে রং যা ছড়ায়
স্বভাব সে তো খুব দরিয়া — অষ্টপ্রহর সে-ই গর্জায়
বয়েস গেল এই যা ঘুরে শব্দ টুঁড়ে কোন বনে যাই
পঞ্চমটি জোগান যদি হুসেন তবে রক্ষা যে পাই

আধুনিক কালে মীরাজি থেকে সাকি ফারুকি পর্যন্ত উর্দু কবিতা বিপুল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। প্রচলিত ছন্দরীতি ছাড়িয়ে এগুলি ক্রমে আরও নমনীয় ধাঁচে আজাদ নজ়ম (অন্ত্যমিলহীন কবিতা) এবং গদ্যকবিতার (নির্ধারিত ছন্দমাত্রা ছাড়া, যা আজাদ নজ়মেও ব্যবহৃত) দিকে অগ্রসর হয়েছে। এত কিছু

সত্ত্বেও ছন্দকে যেমন, নজ়ম-এর দৈর্ঘ্যকেও ঠিক তেমনই কবিরা পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। তবে প্রত্যেক নজ়মই (কবিতাই) তাদের নিজস্ব ধরন ছেড়ে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। এখানে, স্বনামধন্য কবিদের রচনা থেকে কিছু উদাহরণ দেব। গজল ছাড়াও ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের বেশ কয়েকটি সংকলন রয়েছে। তাঁর কবিতা, 'মুঝ সে পহলি সি মহব্বত মেরে মহবুব না মাঙ্গ' এখানে নেওয়া হল, এর নকশাটি লক্ষণীয়। দেখা যাক কীভাবে এটি কাগজের পৃষ্ঠায় ভেসে ওঠে। এই কবিতাও ছন্দবদ্ধ, কিন্তু সব ক-টি দ্বিপদীর মধ্যে রয়ে গিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অন্ত্যমিল। প্রথম দুটি দ্বিপদীর প্রথম *মিসরা*-র (পঙ্‌ক্তি) সঙ্গে দ্বিতীয় দ্বিপদীর প্রথম পঙ্‌ক্তির (অন্ত্যমিল) এবং তার বিপরীতটাও ঘটছে। তৃতীয় আর চতুর্থ দ্বিপদী দুটি অনেকটা গজলের *মা'ত্‌লা*-র মতো। পরের স্তবকের প্রথম দুটি দ্বিপদী আবার প্রথম স্তবকের মতো একই ছাঁদে রয়েছে, আর অবশিষ্ট তিনটি দ্বিপদী হল *মা'ত্‌লা*-র মতো (যেখানে দ্বিপদীর দুটি পঙ্‌ক্তিই অন্ত্যমিলে রয়েছে)। নজ়মটিকে এবার দেখা যাক —

مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ

مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ

میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات   ترا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے
تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات   تری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے

تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہوجائے
یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یوں ہوجائے
اور بھی دُکھ ہیں زمانہ میں محبت کے سوا
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا

ان گنت صدیوں کے کے تاریک بہیمانہ طلسم   ریشم و اطلس و کمخواب میں بُنوائے ہوئے
جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم   خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہائے ہوئے
جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے   پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے
لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے   اب بھی دلکش ہے ترا حسن مگر کیا کیجئے

اور بھی دُکھ ہیں زمانہ میں محبت کے سوا
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا
مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ،

মুঝসে পহলি সি মহব্বত মেরে মহবুব না মাঙ্গ

ম্যাঁয়নে সমঝা থা কি তু হ্যায় তো দরখ্‌শাঁ হ্যায় হায়াত
তেরা গম হ্যায় তো গম-এ-দহর কা ঝগড়া কিয়া হ্যায়
তেরি সুরত সে হ্যায় আলম ম্যায় বাহারোঁ কো নিশাত্
তেরি আঁখো কে সিওয়া দুনিয়া মেঁ রক্‌খা কিয়া হ্যায়

তু যো মিল যায়ে তো তকদির নেগুঁ হো যায়ে
ইঁউ না থা ম্যাঁয়নে ফক্‌ত চাহা থা ইঁউ হো যায়ে
অউর ভি দুখ হ্যাঁয় জমানে মেঁ মহব্বত কে সিওয়া
চাহতেঁ অউর ভি হ্যাঁয় ওয়াস্ল কি চাহত কি সিওয়া

আনজিনত সাদিওঁ কে তরীক বেহিমানা তিলিস্‌ম্
রেশম-ও-ইতলস্-ও-কিমখাব মেঁ বুনওয়ায়ে হুয়ে
যা বাজা বিখরে হুয়ে কুচা-ও-বাজার মেঁ জিস্‌ম্
খাকমে লুথরে হুয়ে খুন মেঁ নাহলায়ে হুয়ে

জিস্‌ম্ নিকলে হুয়ে ইমরাজ কে তন্নুরোঁ সে
পিপ বহতি হুয়ী গলতে হুয়ে নসুরোঁ সে
লৌট যাতি হ্যায় উধার কো ভি নজর কিয়া কিযে
অব্ ভি দিলকশ্ হ্যায় তেরা হুস্ন মগর কিয়া কিযে

অউর ভি দুখ হ্যায় জমানে মেঁ মহব্বত কে সিওয়া
রহতে অউর ভি হ্যাঁয় ওয়াস্ল কি রাহত কে সিওয়া
মুঝসে পহলি সি মহব্বত মেরে মেহবুব না মাঙ্গ

অনুবাদ —

চেও না প্রথম প্রেম এখন আমার কাছে, প্রিয়!

মনে হত, এ-জীবন সর্বক্ষণ দীপ্তি পাবে, থাক যদি পাশে;
দুঃখ পেলে তুমি, কত তুচ্ছ হত জগতের অন্য সব ক্লেশ,
তোমার শ্রীমুখ হেন বিশ্বে যেন অটল বসন্ত চিরহাসে,
তোমার নয়ন শুধু, বাকি ধুধু, দুনিয়ায় কী আর বিশেষ!

ভাগ্য হত অধোমুখ, একবার তুমি দেখা দিলে,
এ নয় যা চেয়েছি তা যথেষ্ট হয়েছে সব মিলে।
আরও দুঃখ জীবনের — প্রণয়বেদনা ছাড়া যত,
মিলনসুখের বেশি আকাঙ্ক্ষাও থাকে অবিরত।

অগণন বর্ষ পার অন্ধকার নিদারুণ মায়াজাল ক'রে —
রেশমে যা বোনা হল, মখমলও, জরিরও বুনন সেইখানে।
শরীর ছড়িয়ে কত, ইতস্তত গলি আর বাজারেও প'ড়ে —
ধুলোয় ঢেকেছে লাশ, রক্তমাস সবই সেই শোণিতের স্নানে।

ব্যাধির উনুন থেকে দেহ যত হয়েছে উদ্ধার,
পুরোনো ক্ষতের মুখে পুঁজ সেই বেরোয় আবার।
দৃষ্টি যদি পড়ে ঠিক ওইখানে, কী করি তখন!
তোমার মোহিনী রূপও মনে এলে, কী-বা করে মন!

আরও দুঃখ জীবনের — প্রণয়বেদনা ছাড়া যত,
মিলনসুখের বেশি আকাঙ্ক্ষাও থাকে অবিরত।
চেও না প্রথম প্রেম এখন আমার কাছে, প্রিয়!

এ ছাড়াও স্তম্ভাকার দৃশ্যরূপবিশিষ্ট নজ়ম আর এক ধরনের উদাহরণ, যা ছোটো-ছোটো দলমাত্রায় সৃষ্ট অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে, যেন অন্ধকার ঘরে কোনো ছিদ্র দিয়ে আলোকরশ্মির ধারা নেমে আসছে। লন্ডন-নিবাসী ইফতিকার একজন উর্দু কবি যাঁকে বারহয়াঁ খিলাড়ি (দ্বাদশ খেলোয়ার) বলা হয়। তাঁর একটি কবিতা এখানে পেশ করা হল —

بارہواں کھلاڑی

خوش گوار موسم میں
ان گنت تماشائی
اپنی اپنی ٹیموں کو
داد دینے آتے ہیں
اپنے اپنے پیاروں کا
حوصلہ بڑھاتے ہیں
میں الگ تھلگ سب سے
بارہویں کھلاڑی کو
ہوٹ کرتا رہتا ہوں
بارہواں کھلاڑی بھی
کیا عجب کھلاڑی ہے
کھیل ہوتا رہتا ہے
شور مچتا رہتا ہے
داد پڑتی رہتی ہے
اور وہ الگ سب سے
انتظار کرتا ہے
ایک ایسی ساعت کا
ایک ایسے لمحے کا
جسمیں سانحہ ہوجائے
پھر وہ کھیلنے نکلے
تالیوں کے جھرمٹ میں
ایک جملہ ٔ خوش کن
ایک نعرہ ٔ تحسین
اسکے نام پر ہوجائے
سب کھلاڑیوں کے ساتھ
وہ بھی معتبر ہوجائے
پر یہ کم ہی ہوتا ہے
پھر بھی لوگ کہتے ہیں
کھیل سے کھلاڑی کا
عمر بھر کا رشتہ ہے

عمر بھر کا یہ رشتہ
چھوٹ بھی تو سکتا ہے
آخری وصل کے ساتھ
ڈوب جانے والا دل
ٹوٹ بھی تو سکتا ہے
تم بھی افتخار عارف
بارہویں کھلاڑی ہو
انتظار کرتے ہو
ایک ایسے لمحے کا
ایک ایسی ساعت کا
جس میں حادثہ ہوجائے
جسمیں سانحہ ہو جائے
تم بھی افتخار عارف
تم بھی ڈوب جاؤگے
تم بھی ٹوٹ جاؤ گے

উর্দু কবিতার আলংকারিক উপস্থাপনে বর্ণবৈচিত্র্য (shades) কিছু কম নয়, তার সব ক-টি স্তরকে তুলে ধরা বেশ দুরূহ কাজ। এখানে কিছু-কিছু আলোচনা করা হলেও একটা বড়ো অংশের কথাই বাকি রয়ে গেল।

সৃজনশীল রচনার প্রকাশে লিপিশিল্পকে (ক্যালিগ্রাফি) তার যাবতীয় শৈল্পিক সমৃদ্ধিসমেত ব্যবহার করা হয়েছে চিরায়ত আরবি ও ফারসি সাহিত্যে। উদাহরণ স্বরূপ ফিরদৌসির শাহ্‌নামার পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

ফারসি এবং উর্দু ভাষায় লিপিশিল্প আরবি থেকে এসেছে, এমনটাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু লিখন আর চিত্রকর্ম আলাদাই ছিল। ক্ষেত্র বিশেষে চিত্রকলাকে ব্যবহার করা হয়েছে কবিতার শোভাবর্ধনে।

شاہنامۂ فردوسی

রাজস্থানের আসলাম হানিফ, জারিনা সানি প্রমুখ উর্দু কবির কিছু কবিতাকে সচেতনভাবে চিত্ররূপেই প্রকাশ করার ব্যাপারে দু-হাজার সালে এক আলোচনার সূত্রপাত হলে আসলাম হানিফ দাবি করেন, নয়-নয় করে পনেরোটি নব্যরূপে তাঁর কবিতাকে আলাদা-আলাদা আঙ্গিকে তিনি প্রকাশ করেছেন। এইসব রচনা গদ্য আর ছন্দবদ্ধ কবিতার মিশ্রিত রূপ। সেসবের দু-একটি এখানে যুক্ত করা হল।

نثری موشح اور پابند نظم میں

ایک شکل ساز نظم

لیمپ اور میں

والد ماجد ڈاکٹر محمد عبدالقیوم مرحوم کے نام

উর্দুতে আরও একটি ছবি আমরা দেখতে পাই সনেট-রূপে, যা সেই সময়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষার ওপর ইংরাজি কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবই শুধু নয়, লেখালেখির জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার এবং নিজের ভাষায় সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আত্মীকরণ করার ঝোঁককেও বোঝায়। ভারতীয় উপমহাদেশে সনেট লেখা হয়েছে বাংলা, অসমিয়া, ইংরাজি, ডোগরি, গুজরাটি, মারাঠি, হিন্দি, কাশ্মীরি, মালয়ালম, মণিপুরি, নেপালি, ওড়িয়া, সিন্ধি এবং উর্দু ভাষাসমূহে। সনেট লেখার সময় উর্দু কবিরা ইংরাজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কবিদের যতটা গ্রহণ করেছিলেন, উর্দু ভাষার প্রয়াত কবি আজমাতুল্লাহ খাঁ-কে (১৮৮৭-১৯২৩) ততটা গ্রহণ করেননি। যদিও এমনটা ধরা হয়ে থাকে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে উর্দু সাহিত্যে ইনিই এই রূপটি চালু করেন। আর যেসব বিখ্যাত কবিরা উর্দুতে সনেট লিখেছিলেন তাঁরা হলেন আখতার জুনাগড়হি, আখতার শিরানি (১৯০৫-১৯৪৫), নুন মিম রশিদ (১৯১০-১৯৭৬), মেহরলাল সনি জিয়া ফতেহ্‌বাদি (১৯১৩-১৯৮৬), সালাম মচলিশাহরি (১৯২১-১৯৭২) এবং ওয়াজির আগাহ্‌ (১৯২২-২০১০)।

জিয়া ফতেহ্‌বাদির কবিতাসংগ্রহ *মেরী তসবির* থেকে একটি চতুর্দশপদী উদাহরণ স্বরূপ এখানে দেওয়া হল। ইংরাজি সনেটের (শেক্সপিয়রীয়) আদলেই তা লিখেছিলেন —

ڈبکنی

پسِ پردہ کسی نے میرے ارمانوں کی محفل کو
کچھ اس انداز سے دیکھا، کچھ ایسے طور سے دیکھا
غبارِ آہ سے دیکر جلا آئینۂ دل کو
ہر اک صورت کو میں نے خوب دیکھا، غور سے دیکھا
نظر آئی نہ وہ صورت مجھے جس کی تمنّا تھی
بہت ڈھونڈا کیا گلشن میں، ویرانے میں بستی میں
منوّر شمعِ مہر و ماہ سے دن رات دنیا تھی
مگر چاروں طرف تھا گھپ اندھیرا میری ہستی میں
دلِ مجبور کو مجبورِ الفت کردیا کس نے
مرے احساس کی گہرائیوں میں ہے چبھن کس کی
مٹا کر جسم ، میری روح کو اپنا لیا کس نے
جوانی بن گئی آماجگہ صدمات پیہم کی
حجاباتِ نظر کا سلسلہ توڑ اور آبھی جا
مجھے اک بار اپنا جلوۂ رنگیں دکھا بھی جا

ডুবকানি

পাস-এ-পর্দা কিসী নে মেরে অরমানোঁ কী মহফিল কো
কুছ ইস অন্দাজ সে দেখা, কুছ অ্যায়সে তৌর সে দেখা
ঘুবর-এ-আহ্‌ সে দে কর জিলা আইনা-এ-দিল-কো
হর এক সূরত কো ম্যায়নে খুব দেখা, ঘোর সে দেখা
নজর আয়ী না উহ্‌ সূরত, মুঝে জিসকি তমান্না থী
বহুত ঢুন্ঢা কিয়া গুলশন মেঁ, বীরানে মেঁ, বস্তী মেঁ
মুনব্বর শম্মা-এ-মেহর-ও-মাঁ সে দিন রাত দুনিয়া থী
মগর চারোঁ তরফ থা ঘুপ অন্ধেরা মেরী হস্তি মেঁ
দিল-এ-মজবুর কো মজরুহ্‌-এ-উলফত কর দিয়া কিসনে
মেরে এহসাস কী গহরাইয়োঁ মেঁ হ্যায় চুভন গম কী
মিতা কর জিস্‌ম্‌, মেরী রূহ্‌ কো অপনা লিয়া কিসনে
জওয়ানী বন গয়ী আমাজগাহ্‌ সদমাত-এ-প্যায়হম কী
হিজাবাত-এ-নজর কা সিলসিলা তোড় অউর আ ভী যা
মুঝে ইক বার অপনা জলওয়া-এ-রঙ্গিন দিখা ভী যা

অনুবাদ —

নিমজ্জন

আমার বাসনার জলসাঘরের পর্দা সরিয়ে
কেউ উঁকি দিল এমনভাবে, এমন কৌশলে —
তাতেই আমার হৃদয়দর্পণ ধুলোয় ভরে গেল,
সব দিক থেকে সবরকমভাবে খুঁটিয়ে আমার মুখ দেখলাম।
যে-মুখ আমার প্রত্যাশায় ছিল, তাকে পেলাম না —
বাগানে, জনহীন খাঁ খাঁ প্রান্তরে, লোকালয়ের মাঝেও;
দিন তো সূর্যকরোজ্জ্বলই ছিল, রাত্রিও চন্দ্রকিরণে যেমন থাকে,
কিন্তু আমার অস্তিত্বের / জীবনের সর্বত্রই অন্ধকার।
কে আমার প্রেমাহত হৃদয়কে আরও অসহায় করে দিল!
আমার অনুভবের গভীরে কে আরও মুচড়ে দিয়ে গেল।
কে আমার আত্মাকে আমার শরীর ধ্বংস করে নিয়ে গেছে!
যৌবনই সবসময় উপর্যুপরি ধাক্কার লক্ষ্য হয়ে থাকে।
দৃষ্টিকে আড়াল করে যত পর্দা সার দিয়ে আছে, সেগুলো সরাও,
আমাকে একবার অন্তত নিজের বর্ণোজ্জ্বল রূপ দেখিয়ে যাও।

উর্দু সনেটের আরও একটি — কবি : আখতার শিরানি।

اک ایسا بت بناؤں کہ دیکھا کروں اسے
آسودہ ہے خیال کا پیکر بنا ہوا
خوابِ عدم میں مست ہے جوہر بنا ہوا
اک مرمریں نقاب سے پیدا کروں اسے
پھولوں میں جیسے جذبۂ نکہت نہفتہ ہو
یا جلوہ بے قرار ہو امواجِ رنگ میں
یوں اس کی روح خفتہ ہے آغوشِ سنگ میں
ظلمت میں جیسے نور کی صورت نہفتہ ہو
دن رات صبح و شام میں پوجا کروں اسے
میرا گدازِ روح جبیں سے نکل پڑے
اس کی نظر سے جذبِ محبت ابل پڑے
سازِ نفس کو توڑ کے گویا کروں اسے
فن خوابِ مرگ بن رہے بت ساز کے لیے
دنیا پکارتی رہے آواز کے لیے

ইক অ্যায়সা বুত বনাউঁ কে দেখা করূঁ উসে
আসুদা হ্যায় খয়াল কা পয়কর বনা হুয়া
খ্বাব-এ-আদম মেঁ মস্ত হ্যায় জৌহর বনা হুয়া
ইক মমরী হিজাব সে পয়দা করূঁ উসে
ফুলোঁ মেঁ জ্যায়সে জজবা-এ-নখত্‌ নিহুফ্‌তা হো
য়া জলবে বে-করার হোঁ অমওয়াজ-এ-রংগ মেঁ
য়ুঁ উসকী রূহ খুফতা হ্যায় আগোশ-এ-সংগ মেঁ
জুলমত্‌ মেঁ জ্যায়সে নূর কী সূরত নিহুফ্‌তা হো
দিন-রাত, সুবহ-ও-শাম ম্যাঁয় পূজা করূঁ উসে
মেরে গুদাজ-এ-রূহ্‌ জবীঁ সে মচল পড়ে
উসকী নজর সে জজ্‌ব্‌-এ-মহব্বত উবল পড়ে
সাজ-এ-নফ্‌স কো তোড় কে গোয়া করূঁ উসে
ফন্‌, খ্বাব-এ-মর্গ বন রহে বুত-সাজ কে লিয়ে
দুনিয়া পুকারতি রহে আওয়াজ কে লিয়ে

অনুবাদ —

এমন এক মূর্তি গড়লাম, যেটি সর্বক্ষণ চোখে চোখে থাকে —
আমার কল্পনার মূর্ত রূপ দেখে সন্তুষ্ট আমি
স্বপ্নের সেই মূর্তির গুণে মত্ত আমি
মর্মরের মতো সুন্দর পর্দাও করলাম।
ফুলের গন্ধে যেমন গুপ্ত থাকে অনুভব,
কিংবা তরঙ্গের বর্ণে যেমন অবিরাম উজ্জ্বল দীপ্তি,
তেমনই তার আত্মা পাথরের আলিঙ্গনে ঘুমিয়ে আছে,
অন্ধকারে যেমন আলোর রূপ গোপন থাকে।
দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা তারই অর্চনা করি,
আমার বিগলিত আত্মা আমার ললাটকেও বিকৃত করে,
তার দৃষ্টি থেকে প্রণয়ের আবেগ উথলে ওঠে,
হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে তাকে মুখর করি।
শিল্প — সে মৃত্যুর স্বপ্ন হয়ে থাকে মূর্তিকারের কাছে,
জগৎ ধ্বনির জন্য কলরব করে।

বর্তমানে উর্দু কবিতা ছন্দবন্ধনকে কিছুটা হলেও অতিক্রম করেছে এবং ভালো কিছু গদ্যকবিতার নমুনাও সৃষ্টি করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, উন্মোচন ঘটেছে অনেক অকথিত কাহিনির যা বেশির ভাগ সময়েই আটকে যেত ছন্দবদ্ধ রীতিনীতিতে। আমিক হানফি, জুবেইর রিজভি, ফাহ্‌মিদা রেয়াজ, আনোয়ার সাদিদ, সারা শেগুফতা, কাজি সালিম, শামিম আনোয়ার, আয়ান রশিদ খাঁ, সিদরা সহর ইমরান, তহসিন গিলানি, সালাহ্‌উদ্দিন পারভেজ এবং একঝাঁক নতুন প্রতিভা এই সারিতে রয়েছেন।

এখানে আমি সেরকম একটি কবিতার উদাহরণ দেব। করাচির বাসিন্দা সিদরা সহর রহমান এমনই এক তরুণী কবি। প্রাণশক্তিতে ভরপুর এই কবি তাঁর সময়কালের পটকথাকে পরম নিষ্ঠায় তুলে ধরেন। তাঁর *জংগল কী তারিখ* (জঙ্গলের ইতিহাস) শীর্ষক কবিতাটি এখানে পেশ করা হল সেটির বাহ্যিক রূপের জন্য, যা নিজেই উদাহরণ স্বরূপ —

جنگل کی تاریخ

جس زمانے میں سوئی کے بعد
کلہاڑی ایجاد ہوئی
ان درختوں کو کیڑے کھانے پہ مجبور کر دیا گیا
جو آدمی سے زیادہ بے شرم نہیں تھے
غار میں رہنے والے
سارے پتے اتار کر ساتھ لے گئے
اور ننگے درخت
اپنے بنیادی حقوق کے لئے
جنگل میں اکٹھے ہوئے

ایک کامیاب بھوک ہڑتال کو ناکام بنانے کے لئے
شہروں تک پھیلادی گئی
جنگل میں لگائی گئی آگ
اور آدمی کی تاریخ میں قتل کشی کا آغاز ہونے پر
کئی دن لکڑیاں جلائی گئیں
آدمیوں سمیت!!

سدرہ سحر عمران

জংগল কী তারিখ

জিস জমানে মেঁ সূয়ে কী বাদ
কুলহারি ঈজাদ হোয়ী
উন্ দরখ্‌তো কো কীড়ে খানে পর
মজবুর কর দিয়া গয়া
জো আদমি সে জেয়াদা বেশরম থে
ঘর মেঁ রহনেওয়ালে
সারে পত্তে উতর কর সাথ লে গয়ে
ঔর নঙ্গে দরখ্‌ত্
অপনে বুনিয়াদি হক কে লিয়ে
জংগল মে একাঠ্‌ঠে হুয়ে

এক কমইয়াব ভুক হরতাল কো নকাম
বনানেকে লিয়ে
শহরোঁ তক ফয়লাদি গয়ী
জংগল মেঁ লগায়ী গয়ী আগ
ঔর আদমি কী তারিখ নস্লকুশি কা
আগাজ হোনে পর
কয়ী দিন লকড়িয়াঁ জ্বলায়ী গয়ী
আদমিওঁ সমেত্

অনুবাদ —

জঙ্গলের ইতিহাস

যে-যুগে ছুঁচের পর কুঠার আবিষ্কার হয়,
কীট খেতে বাধ্য হয় গাছেরা যখন,
কে তবে নির্লজ্জ বেশি
গুহামানবের চেয়ে —
সমস্ত গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চলে যায় যারা?
আর সেই নগ্ন বৃক্ষ সব
জড়ো হয় জঙ্গলে
নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষায়।

অনশন ধর্মঘটে জেতা জয়
ব্যর্থ করে দিলে
ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে শহরে যখন,
জঙ্গলে আগুন লাগে
আর শুরু হয় মানবের ইতিহাসে
ব্যাপক নিধন
বৃক্ষ সব জ্বলে যায়
আদমের সাথে।

আবার হাইকু, ট্রায়োলেট, কহ-মুকরনি, মাহিয়া (পাঞ্জাবি) এসবের ধরনেও লেখা হয়েছে। সব কবিতাই তিন পঙ্‌ক্তির এবং ৫, ৭, ৫ দলমাত্রার আঙ্গিকে রচিত।

যাই হোক, এই নিবন্ধের অন্তিম পর্যায়ে এসে এখন হয়তো বলা যেতে পারে, আলংকারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে শব্দই যেহেতু ভাষার প্রধান অবলম্বন, সেক্ষেত্রে কোনো শব্দের নিজস্ব ভাবমূর্তিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেই শব্দই রূপকাশ্রিত হয়ে উঠলে, তার পূর্বতন ভূমিকার পরিবর্তনের দরুন সেই শব্দের সুপরিচিত ভাবমূর্তির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অনিবার্য। তার দরুন কখনো অভ্যস্ত বা জানাশোনা অর্থটাও সেই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। ভাষালংকার স্বরূপ শব্দের সেই একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাকে পণ্ডিতরা নানারকমভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

এক-একটি ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দরাজির সূত্রে যে-ভাবমূর্তি সেই ভাষাতেই সঞ্চিত হতে থাকে, সেসব কি গতকালের আদৌ? কালক্রমেই তা প্রাচীন হয়ে ওঠে সেই ভাষারই মতো। চলতি প্রয়োগে হয়তো তাদের সেই প্রাক্তন

ভাবমূর্তি হারিয়ে থাকতে পারে, বা চাপা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়গত বা পেশাগত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যে-বুলি, বা হয়তো অশিষ্ট, কী ইতর প্রয়োগে, দেখা যাবে সেখানে হয়তো রয়ে গেছে এবং সেই ধরনের ভাষায় সেসব তাৎপর্যবাহী, প্রাণীদেহের মেরুদণ্ডের মতোই। এমনকী সৃষ্টিশীল রচনায়, সে গদ্য বা কবিতা যা-ই হোক, নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। জোসেফ টি. শিপ্‌লে তাঁর *দ্য ডিকশনারি অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার*-এ নিজস্ব পন্থায় একে সুন্দরভাবে বলেছেন।

এও তো আমাদের অজানা নয় একেবারে, কোনো কোনো সময়ে শব্দ বিশেষের ভিতরকার ছবিটা চাপা পড়ে সেই একই শব্দে স্বতন্ত্র কোনো ছবির উদ্ভব হয় এবং তা হয়তো উপমার ধরনে, কিংবা রূপকের বৈশিষ্ট্যও হয়তো কিছু থেকে যায় তার মধ্যে। ভাষা তো আমাদের যোগাযোগেরই মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা বা উদ্দেশ্য নিয়েও যখন মাথা ঘামাতে হয়েছে, তখনই, সংকেতই হোক বা কোনো মানসচিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আলংকারিক ভাষার ভূমিকা কতখানি সেটাও বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেছেন। তার প্রতিপত্তির দিকে লক্ষ রেখে তাই আলংকারিক ভাষার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অভিধানকার আব্রামস (Meyer Howard Abrams) তাঁর *এ গ্লসারি অফ লিটারারি টার্মস* গ্রন্থে জানান — 'কোনো ভাষায় শব্দসমূহের প্রচলিত যে আদর্শ অর্থ সেই ভাষা ব্যবহারকারীরা গ্রহণ করে থাকেন, সেইটিকে, অথবা শব্দাবলির অর্থের যে আদর্শ ক্রম আছে তাকেও ছাড়িয়ে যা বিশিষ্ট অর্থ সম্পাদন করে, আলংকারিক ভাষা হল তা-ই। প্রাথমিভাবে কখনো তা কাব্যিক প্রসঙ্গে বিবৃত হলেও, ভাষার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেই তা ওতপ্রোত এবং সবরকম আলাপ-আলোচনাতেও অপরিহার্য।'

অন্যান্য ভাষার মতো উর্দুতেও কবিতার ক্ষেত্রে, সন্দেহাতীতভাবে শব্দের যে-অর্থ আমরা সচরাচর জানি তার পরিবর্তে অন্য অর্থেও তা প্রযুক্ত হয়। তাই ক্ষেত্র বিশেষে শব্দের প্রয়োগ স্বাপেক্ষে অর্থের স্বাতন্ত্র্যের দরুন আক্ষরিক অর্থকে 'হকিকি' এবং গূঢ়ার্থকে 'মজাজি' বলা হয়ে থাকে। যখন আমরা বলি — 'ইহাঁ পানি বহুত হ্যায়', তার গূঢ়ার্থ হল এখানে অঢেল সবুজ। ঠিক তেমনভাবেই 'বুত' মানে কোনো প্রতিমা নয় বরং প্রাণের মানুষ। যেমন, 'লাইয়ে উস বুত কো মুদ্দোয়া করকে / কুফর টুটা খুদা খুদা করকে' — এখানে বুত (প্রতিমা), কুফার (অস্বীকার করা), খুদা (ঈশ্বর) আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অথচ আজকাল বহু লোকজনই চিরায়ত কাব্যের আক্ষরিক অর্থ করে ঠকে যান। শব্দ আমরা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ছবিটা আটকে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু কাল্পনিক ও অনুমিত অর্থ গ্রহণ করলে তাতে প্রাণসঞ্চার ঘটে।

*কলিম হাজিক (জ. ১৯৬১) পশ্চিমবঙ্গের উর্দুভাষী কবিদের একজন। 'চাঁদ খিলোনে', 'আগহী গর নহীঁ' প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তরের কর্মী। 'বোধশব্দ'-র জন্য লিখিত তাঁর প্রবন্ধটি মূলে ইংরেজিতে ছিল, সেটির গদ্যাংশের অনুবাদ এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি সংযোজন করেছেন **দীপঙ্কর ভট্টাচার্য**, কবিতাগুলির অনুবাদ **রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**-কৃত।*

— সম্পাদক

কবি-পরিচিতি (নির্বাচিত)

আখতার শিরানি (১৯০৫-১৯৪৮) : আসল নাম মহম্মদ দাউদ খাঁ। জন্ম ব্রিটিশ শাসিত ভারতে রাজস্থানের তংক-এ, তেতাল্লিশ বছর বয়সে পাকিস্তানের লাহোরে জীবনাবসান। নজম ও গজল ঘরানার উর্দু রোমান্টিক কবি। সব মিলিয়ে নয়টি কবিতাসংগ্রহ রেখে গিয়েছেন। শেলি, কিটস, বায়রনের মতো তাঁর কবিতায় রোমান্স ও যৌবনের প্রভাবই বেশি।

আমির খুসরু বা আবুল হাসান ইয়ামিন উদ্‌-দিন খুসরু বা হজরত খুসরু (১২৫৩-১৩২৫) : জন্ম উত্তরপ্রদেশের পাতিয়ালি, মৃত্যু দিল্লিতে। খুসরু ছিলেন রাজকবি। তাঁকে 'ভারতের তোতাপাখি' বলা হত। কাওয়ালি-র জনক খুসরু এগারো রকম ছন্দরীতি ব্যবহার করে অন্তত পঁচিশটি পৃথক ভাগে লিখেছেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে গজলের জন্মদাতাও তাঁকে বলা হয়ে থাকে। দিল্লির মসনদে অন্তত সাতজন সুলতানের রাজসভায় তিনি রাজকবি ছিলেন। সুফি এই কবি ফারসি, হিন্দি এমনকী পাঞ্জাবিতেও লেখালেখি করেছেন।

গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯) : ভারতীয় উপমহাদেশে সুপরিচিত এই কবির আসল নাম মির্জা আসাদুল্লাহ্ বেগ খাঁ গালিব। জন্ম আগ্রায়, দিল্লিতে মৃত্যু। উর্দু ছাড়াও ফারসিতে লিখেছেন। তেরো বছর বয়সে দিল্লির ইলাহি বখ্‌শ্‌-এর কন্যা উমরাও বেগমের সঙ্গে বিবাহ। তাঁর তখল্লুস (লেখালেখির জগতের নাম বা ছদ্মনাম) ছিল 'আসাদ'। গজলে তিনি 'আসাদ' নামটি ব্যবহার করলেও, পরে তাঁর শুভানুধ্যায়ী কবি ফজলে হকের পরামর্শ মেনে ওই উপনাম বদলান এবং 'গালিব' নামটি ব্যবহার করতে থাকেন। বাহাদুর শাহ্ জাফর ১৮৫০ সালে তাঁকে দবির-উল-মুল্‌ক এবং পরবর্তী সময়ে নজ্‌ম-উদ্‌-দৌলা উপাধিতে ভূষিত করেন।

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ (১৯১১-১৯৮৪) : কবি ও বামপন্থী চিন্তাবিদ। মহম্মদ ইকবাল, কার্ল মার্কস ও মির্জা গালিব দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব। ব্রিটিশ ভারতে পাঞ্জাবের নারওয়াল জেলায় জন্ম এবং তিয়াত্তর বছর বয়সে পাকিস্তানের লাহোরে মৃত্যু। সাংবাদিকতা করেছেন। রুশ, পাঞ্জাবি, ইংরাজি, উর্দু, আরবি এবং ফারসি ভাষা জানতেন। ইংরাজি এবং আরবি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিল। লেনিন শান্তি পুরস্কার ছাড়াও উল্লেখযোগ্য আরও কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। চারবার সাহিত্যে নোবেলের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়।

মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) : আল্লামা ইকবাল নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। পাকিস্তানের শিয়ালকোটে জন্ম, লাহোরে মৃত্যু। কবি, দার্শনিক, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী। 'সারে জহাঁ সে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা'-র রচয়িতা ইকবালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *আস্‌রার-ই-খূদী* (১৯১৫), *রুমুয-ই-বেখুদী* (১৯১৮), *জাভিদনামা* (১৯৩২) প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ *শাশ্বতের গান* নামে। ইংরাজিতেও অনূদিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতাগ্রন্থ।

মীর বাবর আলি আনিস (১৮০২-১৮৭৪) : ছদ্মনাম আনিস। জন্ম লখনউয়ের ফয়জাবাদে। মর্সিয়া ও রুবাই লিখেছেন। কবিতায় আরবি, ফারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন। মর্সিয়া দীর্ঘই হত সেসময়, সেটাই দস্তুর ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও এখন নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে। 'নমক-এ-খওয়াঁ' (এখানে আলোচিত) তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত মর্সিয়া। উর্দু রুবাইয়ের ক্ষেত্রেও তিনি পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

মীরাজি (১৯১২-১৯৪৯) : পোশাকি নাম মহমম্দ সানাউল্লাহ্ দর। জন্ম পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালায় (অধুনা পাকিস্তানে), মুম্বাইতে জীবনাবসান। মীরা সেন নামের এক বাঙালি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় যুবক বয়সে এবং ক্রমে তা গভীর প্রেমে পরিণত হয়ে তাঁর জীবনে স্থায়ী ছাপ ফেলে। মীরা নামে লেখালেখি শুরু করেন। স্বাচ্ছল্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে বড়ো হলেও বেশিরভাগ জীবনটাই কাটিয়েছেন গৃহত্যাগী ভবঘুরে হয়ে এবং স্বরচিত কবিতা বিক্রি করে। উর্দু কবিতার আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।

মেহরলাল সোনি জিয়া ফতেহ্‌বাদি (১৯১৩-১৯৮৬) : জন্ম ভারতের পাঞ্জাবের কাপুরথালায়, মৃত্যু দিল্লিতে। উর্দু নজম ও গজল লেখক। পেশায় ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কর্মচারী। কিতা, রুবাই, গীত এবং সনেটও লিখেছেন। কলেজে পড়ার সময় মীরা নামের একটি বাঙালি মেয়ের অনুরক্ত হয়ে তাঁকে উদ্দেশ করেই বহু প্রেমের কবিতা লিখে ফেলেন। এই মেয়েই সেই মীরা সেন, একদা মীরাজি যাঁর প্রেমে পড়ে 'মীরাজি' ছদ্মনামে লেখা শুরু করেন। কিষণ চন্দর, মীরাজি এবং জিয়া ফতেহ্‌বাদি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রঘুপতি সহায় ফিরাখ গোরখপুরী (১৮৯৬-১৯৮২) : জন্ম গোরখপুরে, নয়া দিল্লিতে জীবনাবসান। কবি, লেখক ও সমালোচক। ফিরাক গোরখপুরী নামেই অধিক পরিচিত। শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যাল থেকে। পদ্মভূষণ, জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত। ইংরাজিতেও তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে : *দ সিলেক্টেড পোয়েট্রি অফ ফিরাখ গোরখপুরি*।

সিদরা সহর রেহমান (১৯৮৮) : জন্ম পাকিস্তানের সারগোধায়। বর্তমানে করাচির বাসিন্দা। নতুন প্রজন্মের প্রাণবন্ত কবি ও আখ্যানকার।

শব্দ-পরিচিতি

কহ-মুকরনি : কহা>কহ, অর্থাৎ বলা, আর মুকরনা মানে অস্বীকার করা। এই বলা এবং না-বলা কথা, অর্থাৎ হেঁয়ালি, ভারতে এটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী। মৌখিক ছাড়াও লিখিতরূপে এর উদাহরণ আছে। বিশেষত প্রাচীন কবিদের রচনায়। উপরের সোজা অর্থ করলে একরকম, কিন্তু ভিতরের অর্থ আরেক।

খড়ি বোলি : মৌখিক ভাষারূপে একদা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি ও রাজস্থানে প্রচলিত ছিল। আমির খুসরুও লিখেছেন এই ভাষায়। বর্তমান উর্দু, হিন্দির লিখিত রূপ এর ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে।

প্রবন্ধে উল্লেখিত উর্দু কবিতার বিভিন্ন আঙ্গিক প্রসঙ্গে

১। কাসিদা : স্তুতিমূলক বা ব্যঙ্গাত্মক দীর্ঘ কবিতা। সমিল দুই চরণে লিখিত হয়ে থাকে।

২। কিতা : গজলের আঙ্গিকে লিখিত হয়, বিষয় একটিই।

৩। গজল : প্রথম দ্বিপদী সমিল। পরের দ্বিপদীগুলির চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম এককসমূহ প্রথম এককের মিল অনুসরণে হয়ে থাকে। বিভিন্ন ছন্দে রচিত হয়। পর্বের একককে ‘রুক্‌ন্‌’ বলা হয়। শের বা দ্বিপদীগুলির ভেতর অন্ত্যমিলের ওই বন্ধনটুকু ছাড়া একটির সঙ্গে আরেকটির সেরকম কোনো যোগ নেই, অর্থাৎ শেরগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিষয় সাধারণত প্রেমমূলক।

৪। মর্সিয়া : কারবালার কাহিনি উপজীব্য বিষয়। স্তবকগুলি তিন চরণের এককে সাধারণত হয়ে থাকে। আয়তনগত দিক থেকে দীর্ঘ কবিতা।

৫। মসনবি : বিষয়ের বাধ্যবাধকতা নেই। দৈর্ঘ্য অনিয়মিত, মিলরীতি কাসিদার মতো।

৬। রুবাই : চার চরণের স্তবক (quatrain)। বিষয়গত কোনো নির্দিষ্টতা নেই। মিলরীতি ক ক খ ক সাধারণত হয়ে থাকে, তবে ক ক ক ক-ও দেখা গেছে ক্ষেত্র বিশেষে। প্রসঙ্গত, রুবাই এবং গজল উভয়ই ইউরোপে ‘সনেট’-এর জন্মলগ্নে প্রভাব ফেলেছিল। তার ইতিবৃত্ত স্বতন্ত্র।

লিটল ম্যাগাজিন : কবিতার বিচিত্র অবয়ব-আধার

সন্দীপ দত্ত

আমাদের কলেজস্ট্রিটে বাটা-র দোতলা-তিনতলা জুড়ে ছিল আমেরিকান লাইব্রেরি। কত ভালো-ভালো বই! সাতের দশকের গোড়ায় ওখানেই প্রথম কংক্রিট কবিতার বই দেখি। এ-ও কবিতা! *Rain*, বৃষ্টির ছবি। *Home*, বাড়ি। কবিতার অক্ষরে সাজানো। ওর ঠিক আগে শ্রুতি আন্দোলন শুরু। সেখানেও পরেশ মণ্ডল, পুষ্কর দাশগুপ্ত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়রা বাংলা অক্ষরকে নানা ঢঙে সাজান। ধ্বনি তৈরি হয়, একটা ছবিও।

কত বৈচিত্র্য কবিতার ছাঁদে, অবয়বে। সাতের গোড়ায় অনুভব ভট্টাচার্য চ্যাপলিন স্কোয়ার-এর আর্টমেলায় কবিতা পড়েন — আমার কবিতার নাম ‘পাঁচ মিনিট নীরবতা’। কবি দাঁড়িয়ে যান চুপ। শ্রোতারা নীরবতাই বা কতক্ষণ সহ্য করবেন! শুরু হয়ে গেল চিল্লামেল্লি। কবি তখন ‘দর্শকদের অনুরোধে এক মিনিট করা হইল’ বলে কেটে পড়েন।

ছয়ের দশকে শান্তি লাহিড়ী *বাংলা কবিতা* পত্রিকার পক্ষে প্রথম স্বকণ্ঠে কবিতার রেকর্ড উপস্থাপন করেন। শুধু গায়ক গাইবেন না, আবৃত্তিকাররাই কবিতা আবৃত্তি করবেন না, শুরু হল কবিতার রেকর্ড অভিযান, কবিদের স্বকণ্ঠে। একটি লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে এমন একটি উদ্যোগ কম কথা কী! বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা পড়ছেন নিজেদের কণ্ঠে, এ তো বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা! পরে এইচএমভি এটি কিনে নেয়।

কবিতাকে জনপ্রিয় করার হিড়িক পড়ে যায় ১৯৬৬ নাগাদ — দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, এমনকী ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কবিতার পত্রিকা প্রকাশ করে। এই সময়ে অনেকগুলি সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পনা আন্দোলন। প্রবন্ধর ‘প্র’, কবিতার ‘ক’, গল্পর ‘ল্প’, আর নাটকের ‘না’ নিয়ে ‘প্রকল্পনা’। ভট্টাচার্য চন্দন ছিলেন এর সম্পাদনায়, যার যাত্রা শুরু ১৯৬৯-এ। এঁরা শব্দ ও বাক্য বা বাক্যাংশের তাৎক্ষনিক অনুভূতিকে স্পষ্ট করতে শব্দের বা বাক্যের পাশে সেই শব্দটিকে visualize করার চেষ্টা করতেন। যেমন জানালা হল III, চোখ হল ⌒। লেটারপ্রেসের লেড, ব্র্যাকেট, গণিতের সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করতেন। নিজেরা ব্যান্ড বাজিয়ে বাউলের পোশাক পরে মাঝে-মধ্যে শহর পরিক্রমা করতেন। কবিতা থাকত কণ্ঠে। ভট্টাচার্য চন্দনের ‘যুগ যুগ জিও’ কবিতাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল কবিতাকে ধ্বনিময় করে তোলার জন্য। *স্বতোৎসার automatic writing* বা *প্রকল্পনা* পত্রিকার প্রথম দিকে চেহারা ছিল কুডুলের মতো।

১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনার বিশ্বের প্রথম অণুপত্রিকা (৪ x ২.৫ ইঞ্চি) প্রকাশিত হয়। এই সময় পত্রিকায় অণুগল্পের সঙ্গে বেরোতে থাকে অণুকবিতা।

মিনি পত্রিকাতেই শুধু কবিতা বেরোল না, কবিতার আধার হল *সিগারেট পত্রিকা*। *মাঝি* ও *প্রতিদ্বন্দ্বী* পত্রিকার সিগারেটের মতো মোড়কে থাকত কবিতা। শুধু সিগারেট নয়, সিগারেটের প্যাকেটে পত্রিকা প্রকাশিত হল ‘কিন্তু’ নামে। সিগারেটের মতো খোলে পাঁচটি কবিতার সিগারেট মোড়ক! দেশলাইও এল সঙ্গে। দেশলাই-এর অবয়বে কবিতার লাইন, ভেতরে দেশলাই কাঠি। *সাংস্কৃতিক খবর*, *কিঞ্জল* ও *অব্যয়* পত্রিকা একসময় কবিতাকে স্থান দিয়েছিল দেশলাই বাক্সের বহিরঙ্গে। *পত্রাণু* বার করে ক্যাসেট পত্রিকা, কবিদের স্বকণ্ঠে কবিতা উচ্চারিত হত সে ক্যাসেট চালালে। *সন্দীপন* পত্রিকা ও *প্রোরেনাটা* প্রকাশ করেছিল ক্যালেন্ডার কবিতা। *অতএব ভাবনা* একবার তালপাতায় কবিতা মুদ্রণ করেছিল। কলাপাতায় কবিতা ছাপার উদ্ভাবনও ছিল তাদের। *গ্রাফিত্তি*, *বর্ন টু বার্ন* বার করেছিল ভিডিও পত্রিকা। রুমাল পত্রিকা, পোস্টার পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে। রুমালের মতো ফিনফিনে আকাশি কাগজে শোভিত কবিতাগুচ্ছ। *কিঞ্জল* পত্রিকার ‘কলমের কবিতা’ কিংবা বাংলা টেলিফোন ডায়রেক্টরি, যে-ডায়রেক্টরি পুষ্ট কবিদের কবিতায়। ১৯৭৭-এ *কবিসেনা* প্রকাশ করেছিল ‘কবিতার ডায়েরি। *অতএব ভাবনা*-র পোস্টকার্ড পত্রিকা কিংবা *লিরিক*-এর ইনল্যান্ড কবিতা, কিংবা কাশীনাথ মণ্ডলের পনেরো বছর ধরে চলা *কবিতা পোস্টার* অভিনব প্রয়াস, সন্দেহ নেই।

এক প্রবীণ মানুষের কথা মনে পড়ছে — সতী চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭৭ সালের মে মাস থেকে নিয়মিত একটি মাসিক হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। পত্রিকার নাম ‘কালের যাত্রার ধ্বনি’। হুগলির বলরামবাটী সিঙ্গুর থেকে বেরোত পত্রিকাটি। ফুলস্ক্যাপ সাইজ, চার পৃষ্ঠার। পত্রিকাটি আগাগোড়া সতী চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দর হস্তাক্ষরে বিন্যস্ত। নিজের হাতে প্রায় তিনশো কপি লিখতেন, আর বিভিন্ন সাহিত্যসভায় বিলোতেন। পঁচিশ বছরের ওপর একনাগাড়ে পত্রিকাটি চালিয়ে গেছেন স্বহস্তচালিত কলমে। পত্রিকায় প্রকাশ পেত অসংখ্য কবিতা। ডাকে আসা বা কবিপ্রদত্ত কবিতাগুলি হাতে লিখে ভরিয়ে দিতেন কাগজ। কবিতা ছাড়াও থাকত নানা তথ্য, নানা খবর। বছর কয়েক হল, তিনি প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু ভোলা যায় না তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রমকে। কবিতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ সতী চট্টোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞ অসাধারণ, তাঁকে প্রণাম।

এবার বলব দুই মুদ্রণ ব্যবসায়ীর কথা। অমিয়রঞ্জন সিংহের ব্যাবসা ছিল সিল্কস্ক্রিনের। বেলগাছিয়ায় তাঁর সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টিং-এর নাম ছিল ‘সেরিগ্রাফি’। ১৯৮৭ সাল নাগাদ ‘সেরিগ্রাফি’ নামেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পবিষয়ক পত্রিকাটি আগাগোড়াই ছাপা হত সিল্কস্ক্রিন পদ্ধতিতে। *গিনেস বুক অব রেকর্ডস*-এর পক্ষে ‘সেরিগ্রাফি’-কে নাকি বিশ্বের প্রথম সিল্কস্ক্রিন পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়!

সমরেন্দ্র দোবে রাবার-স্ট্যাম্প ব্যবসায়ী। কাঁচকাপাড়ার সিদ্ধেশ্বরী লেনে ওঁর বাড়ি। নিজে কবিতা লেখেন। বের করে ফেললেন সম্পূর্ণ রাবার-স্ট্যাম্পে ছাপা দ্বিমাসিক কবিতার ফোল্ডার *আতত*। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৬ (১৯৯৬)। পরের বছর রেজিস্ট্রেশন পায়। দেখলে মনেই হবে না,



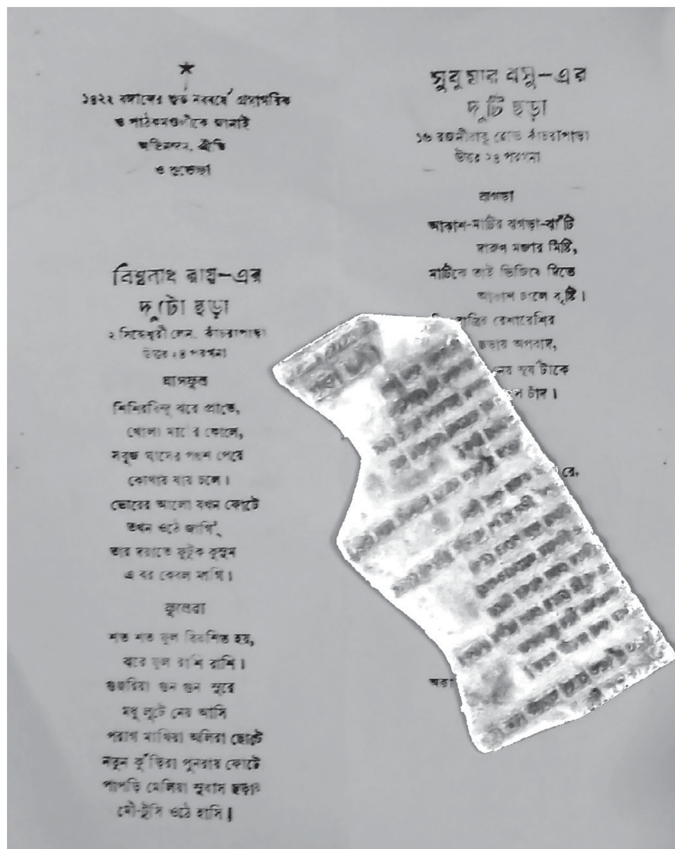
অগত্যা কি আর করা যাবে—জয় প্রকল্পনা বলে কোনো ক্রমে ১ ব্যক্তিগত বাসের পশ্চাদ্দেশে যাত্রীপূর্ণ বোমপার্টে ভ্রমণ—যদিও সংশ্লিষ্ট কারোরই তা পছন্দ নয়—সরাসরি হাওয়া হওয়া প্রায়-দুর্ঘটনা জনক উত্তেজনা—শাঁক শাঁক করে গাত্রতীর ঘেঁসে গাড়ীগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে—আর আমি কি মুহূর্তে নতুন করে জন্মাচ্ছি—আমি খোলা হাওয়া কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছি রাজপথে পালতোলা অসামান্য নৌকার মতো······দুধারে গণজময় দোকানপাট ······মনোরম বাতিস্তম্ভ ·····শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন+সুরম্য অট্টালিকারাজি ·····পার্শ্ববর্ত্তী আর আর যানবাহনেরা ভেসে চলেছে সওদাগরী বজরা বা হাটুরে গয়নার নৌকার মতো··· শিশবিক সরল হাওয়া ছুটোছুটি কর্চে অল্পবয়েসী বাছুরের মতো······মানসপটে উদয় হয়/কতদিন আগের গয়নার নৌকায়/শিশুকালের ছবি···দুচোখে দুর্বার দহের ঘূর্ণীময় ভয়··· ; গনজের সওদার গন্ধ···শহরে টকি দেখতে যাবার দুর্দম উত্তেজনা···

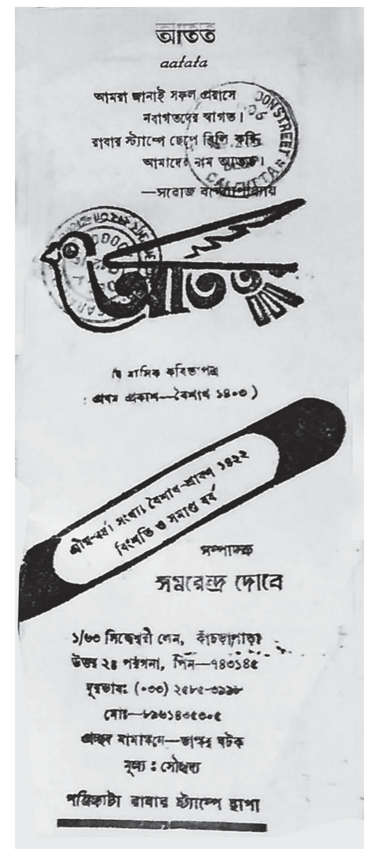
বিষণ্ণতার কোল ছুঁয়ে আমার আসা
বিদেহী ভ্যালায় চড়ে ভেসে যায়
অনন্ত সন্ধানে, সূর্যাস্তের অলৌকিক
আলোয় ঘরে ফেরা পাখীর
চোখে ফোটে ক্লান্ত জিজ্ঞাসা—
?+?+?+?+?+?+?=?
আর কতোকাল এভাবে
সীমিত সময়ের কোটে বাঘবন্দী
খেলবে ?

স্বতোৎসার : একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ ও প্রকাশিত দু-টি লেখার অংশ

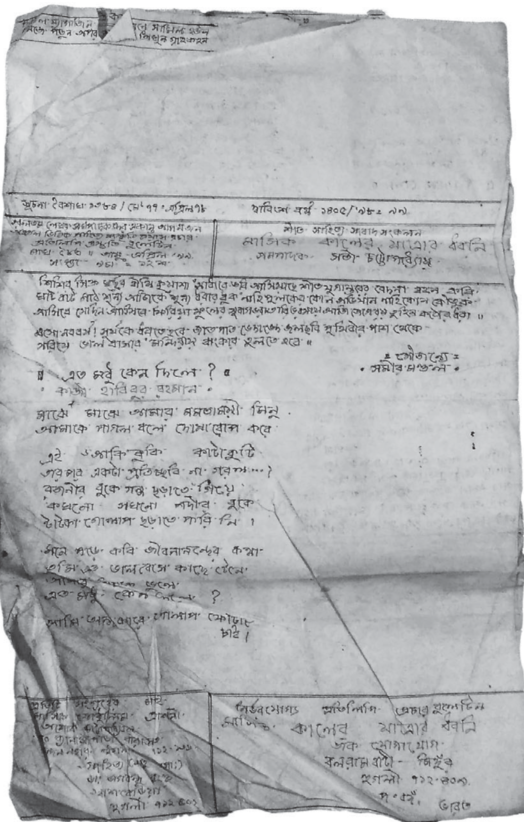


কলমে কবিতা

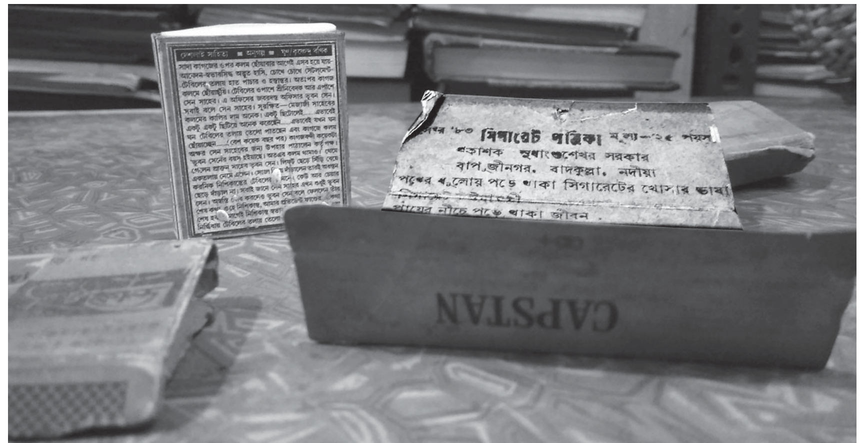




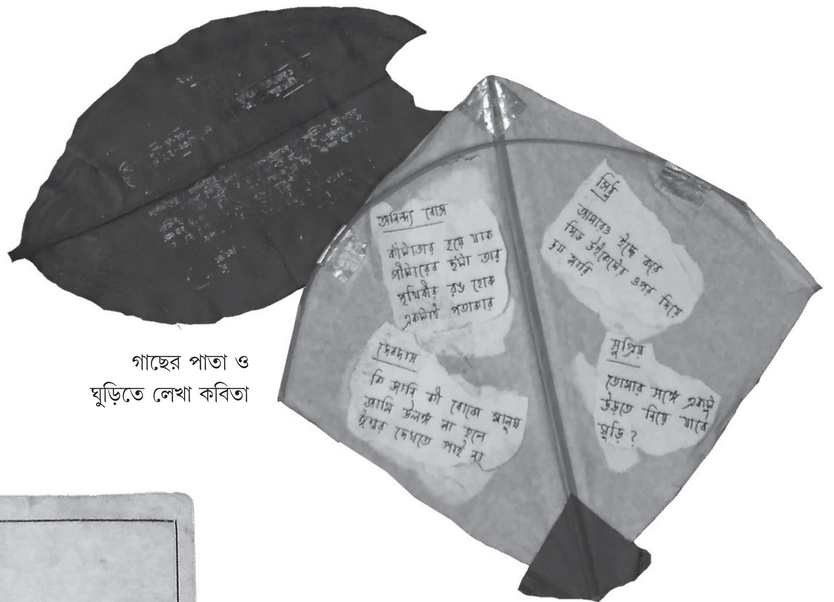
আতত : আগাগোড়া রাবার-স্ট্যাম্পে ছাপা পত্রিকা এবং একটি মাস্টার রাবার-স্ট্যাম্প



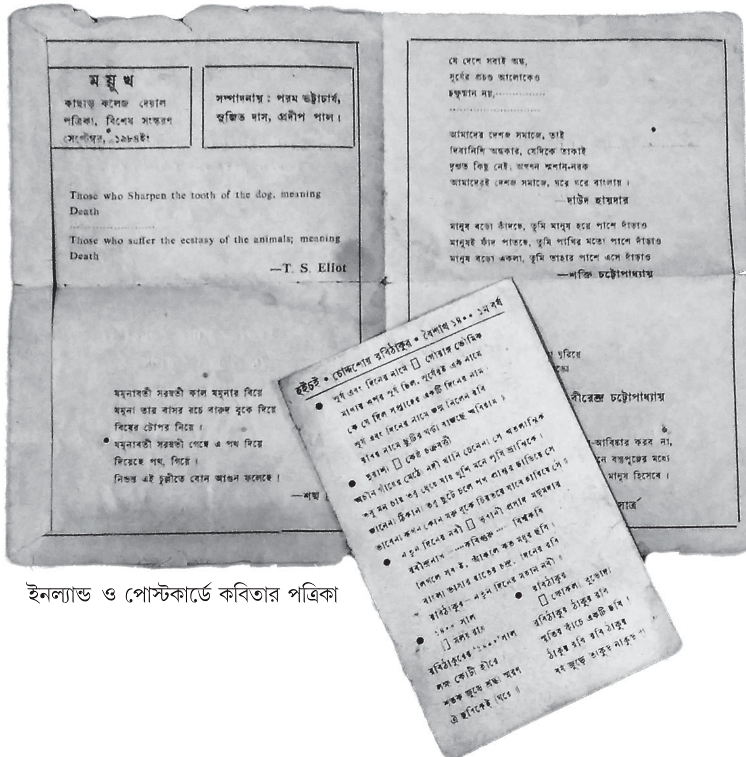
কালের যাত্রার ধ্বনি : হাতে লেখা পত্রিকা



কবিতার আধার সিগারেট ও দেশলাই



গাছের পাতা ও
ঘুড়িতে লেখা কবিতা



ময়ূখ
কাছাড় কলেজ দেয়াল পত্রিকা, বিশেষ সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ইং

সম্পাদনায় : পরম ভট্টাচার্য, সুজিত দাস, প্রদীপ পাল।

Those who Sharpen the tooth of the dog, meaning
Death
....
Those who suffer the ecstasy of the animals; meaning
Death

—T. S. Eliot

যে দেশে সবাই অন্ধ,
সূর্যের প্রচণ্ড আলোকেও
চক্ষুষ্মান নয়,.............
....

আমাদের দেশজ সমাজে, তাই
দিবানিশি অন্ধকার, যেদিকে তাকাই
দৃশ্যত কিছু নেই, অগণন শ্মশান-নরক
আমাদেরই দেশজ সমাজে, ঘরে ঘরে বাংলায়।

—দাউদ হায়দার

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।
নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে।

—শঙ্খ

...বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হইচই • চোদ্দশোয় রবিঠাকুর • বৈশাখ ১৪০০ • ১ম বর্ষ

ইনল্যান্ড ও পোস্টকার্ডে কবিতার পত্রিকা



সেরিগ্রাফি
শ্রীঅমিয় রঞ্জন সিংহ
সম্পাদিত
সিল্ক স্ক্রীণে ছাপা ত্রৈমাসিক পত্রিকা
শীত ১৯৮১/ তিন টাকা

সেরিগ্রাফি : আগাগোড়া
সিল্কস্ক্রিনে ছাপা পত্রিকা

রাবার-স্ট্যাম্পে ছাপা। ঠিক যেন মুদ্রিত পত্রিকা। নিজে প্রতিটি লেখা রাবার-লিপি করে ছাপেন। সত্তরোর্ধ বয়স্ক মানুষটি আজও নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছেন পত্রিকাটি। নিজের দু-টি কাব্যগ্রন্থ আছে, যা ছাপা ওই রাবার-স্ট্যাম্প পদ্ধতিতেই!

হাতের লেখায় মুদ্রিত একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল মাহেশ থেকে; নাম *মৌমিতি* (১৯৭১)। কবিদের হাতের লেখা সম্ভবত প্রথম মুদ্রিত করে *মাঝি* পত্রিকা, ১৯৮৫ সালে। *চান্দ্রমাস*-ও এমন একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছিল।

কেমন বাউল আমরা-র তরফে ছোটো ঘুড়িতে সাতটি কবিতা সেঁটে দেওয়া হয়েছিল। কবিতার আকাশে সে-ঘুড়ি উড়েছিল কি না, জানি না; তবে প্রচেষ্টাটি নিঃসন্দেহে অভিনব। *দেওয়াল* পত্রিকা ঠোঙার সঙ্গে কবিতাকে জুড়ে দিয়েছিল। পত্রিকাটি প্রকাশ পেয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল, 'হরিদাস পালকে'! *মহুল* পত্রিকার একটি সংকলনও ছিল ঠোঙার মধ্যে। কৌশিক গাঙ্গুলি তো ওঁর সব কবিতার বই বার করেন কবিতার ফোল্ডার-এর মতো করে। সে-ফোল্ডারও ৫০টি প্রকাশিত। *একপদী* পত্রিকা বের হত উত্তর দিনাজপুর থেকে। তাপসী আচার্যর সম্পাদনায় বেরিয়েছে *দুই পংক্তি*। বোতাম খুলে পত্রিকা পড়তে হয়। অনির্বাণ দাসের দু-পঙক্তির কবিতার সংকলন *ব্লেড*-এর অবয়ব ব্লেডেরই মতো। ইনা রায়ের চার পঙক্তির কবিতার সংকলন *ইনবক্স*-এর চেহারা ইনবক্সের মতোই। মেদিনীপুর শহর থেকে i-সোসাইটি-র সৌমিত্র রায়ের পরিকল্পনায় মোবাইল, চ্যাট, এসএমএস, i-কবিতা, e-কবিতা ইত্যাদি নিত্যনতুন উদ্ভাবনী কবিতা মাধ্যমের প্রচেষ্টা চলেছে। এখন তো মঞ্চেও মোবাইলে দেখে কবিতা পড়া হয়। ফেসবুকে চলে কবিতার মশকরা। *কবিতা পাক্ষিক* একবার 'টেলিভিশন কবিতা'-র প্রয়াস করেছিল, *কৌরব*-এ সিনেম্যাটিক কবিতা, পরিযায়ী কবিতা, সমবায়ী কবিতা — কতরকম কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। 'হপ্তাক কাচরা' নামে কাগজটি বের করেন অতি তরুণ কবির দল। লম্বা, বেঁটে, চৌকো — কতরকম সাইজে ও কার্ডগুচ্ছে তাঁরা চালাচ্ছেন কবিতাভাবনা।

নানা আধারে-অধরে বিচিত্র রূপে কবিতার আরাধনা। রংচঙে কাগজে কবিতার সঙ্গে ছবিও থাকছে শিল্পীর। এইভাবেই চলেছে কবিতা-যাত্রা — নব অধ্যয়নে নিবিড় হয়ে।

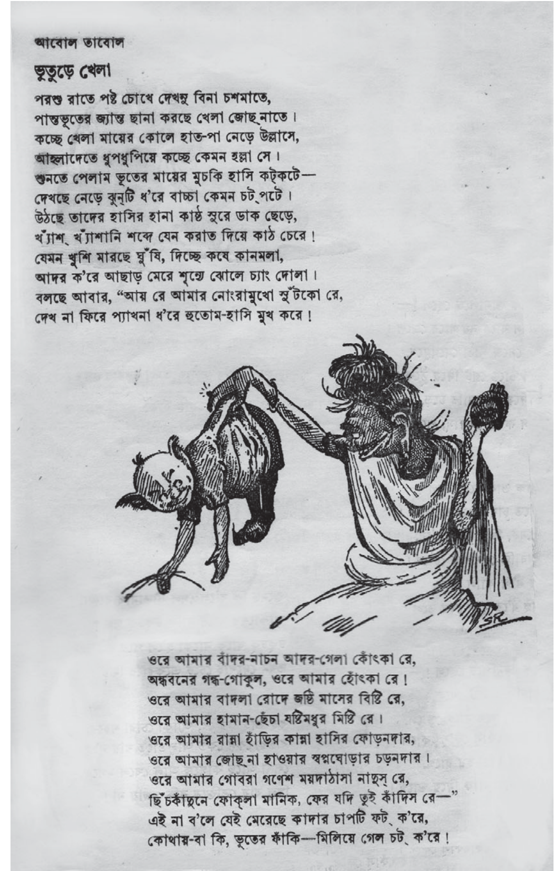
'ভূতুড়ে খেলা' ও কবিতার ভূত

স্রোতা দত্ত

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৩
৭ই মে, ১৯৭৬
দ্বিতীয় প্রকাশ
২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৬
প্রকাশক
দীন মহম্মদ
সাক্ষরতা প্রকাশন
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা ভবন
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে গোপন টাকের মতো, কবিতার গলার স্বর, কানের চুল, বুকের রোম, নখের আকার, তার ভালো-মন্দ, সবই তার 'স্ব-ভাব' হয়ে ওঠে। তখন তার আদলের থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে তার আত্মা। কিন্তু ভূতেরও কি আত্মা হয়? ছায়াময়তায় ভর করে 'ভূত' শব্দে শিরদাঁড়া দিয়ে ছমছমে ঠান্ডা স্রোত, পিঠে ভয়। *ভূতুড়ে খেলা* চাক্ষুষ করলে সেরকম কিছু হওয়ার কথা! 'ভূতুড়ে' বলে ছোটোবেলায় আরোপিত অপরিচয়ের অছিলায় দূর থেকে উঁকিঝুঁকি চলত বহুত।

এই 'দেখা' যখন শুরু, তখন *আবোল তাবোল*-এর *ভূতুড়ে খেলা* বেশ থপথপে। গাল-গোল, মোটা দাগের, হাসিখুশি মার্কা। সুকুমারী পান্তভূত ও তার জ্যান্ত ছানা তখন পেটকাটা, ভুঁড়িওয়ালা। অবশ্য ভুঁড়িটা ওই 'SR' ছাপ ছবির জন্য। নইলে পেট এক্কেবারে আড়াআড়ি কাটা। অনেকটা হাঁ। ইজিচেয়ারে আধ-এলানো। কিন্তু চেহারার প্রশ্ন আসছে কেন? ওরা তো নেই-চেহারা। কবিতার


আবোল তাবোল

ভূতুড়ে খেলা

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে,
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছ্‌নাতে।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত-পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হল্লা সে।
শুনতে পেলাম ভূতের মায়ের মুচকি হাসি কট্‌কটে—
দেখছে নেড়ে ঝুনুটি ধ'রে বাচ্চা কেমন চট্‌পটে।
উঠছে তাদের হাসির হানা কাষ্ঠ সুরে ডাক ছেড়ে,
খ্যাঁশ্‌ খ্যাঁশানি শব্দে যেন করাত দিয়ে কাঠ চেরে!
যেমন খুশি মারছে ঘুঁষি, দিচ্ছে কষে কানমলা,
আদর ক'রে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাং দোলা।
বলছে আবার, "আয় রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে,
দেখ না ফিরে প্যাখনা ধ'রে হুতোম-হাসি মুখ করে!

ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁৎকা রে,
অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁৎকা রে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টি রে,
ওরে আমার হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টি রে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছ্‌না হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোবরা গণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্‌ রে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস রে—"
এই না ব'লে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট্‌ ক'রে,
কোথায়-বা কি, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট্‌ ক'রে!

মতোই। প্রশ্ন না করলে, একটা কবিতা 'আলাভোলা বাঁকা আলো' নাকি 'সরু মোটা সাদা কালো' অথবা শাল গাছ না সুবর্ণরেখার মতো, তাতে খুব কী যায়-আসে! তার আসল কাণ্ডকারখানা তো মনে, মননে। কবিতার চেহারার কেরামতি, মনে খুব কি হেরফের ঘটায়?

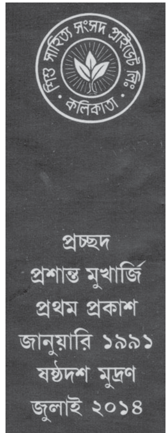
১৯৭৬ সালে সাক্ষরতা প্রকাশন-এর লেটারপ্রেসে ছাপা মোটা ঢ্যাবাঢ্যাবা কালো হরফের *ভূতুড়ে খেলা*-র নিজস্ব একটা ধরন আছে। মাথায় ফেট্টির গিঁট্টুর মতো শিরোনামে, 'ভ'-এর নীচে 'উ'-কারটা এতই ধ্যাবড়া যে গোলমাল আবশ্যিক। অবশ্য তার প্রতি মনোযোগও অপ্রয়োজনীয়। প্রথম আলাপে, ছাপার কারণেই হোক বা চোখের কারণে, 'আহ্লাদেতে'-তে আটকাত চোখ। কেমন যেন আধো-আধো সোহাগি। জ্যান্ত ছানার 'আহ্লাদেতে' ধুপধুপিয়ে হল্লাটা গালের উপর নধর আঁচিলের মতোই আহ্লাদি। 'হ' আর 'ল'-টা পাশাপাশি গ্ল্যাক্সো-বেবি। 'তে'-টা দেখতে দুলারি কা মা-এর কোমরের মেদের মতো গোল। 'আহ্লাদেতে' কথা-খানায় চোখ আটকালে সুকুমার-মতির মনে এ-ছবি অচেতনে কাজ করে যায় (অবশ্য, তা 'ছোটবেলার উপর বড়বেলার আরোপিত কল্পনা' হতে পারে)। ছবিতে জ্যান্ত ছানার বাঁ-গালের ফুটকিটা সে-ভাবনাকে আরাম দিত। ভয় কাটত একটু। ওঃ, তাহলে ওদেরও আঁচিল, তিল, জড়ুল থাকে! 'কট্‌কটে —' আর 'সুঁটকো রে' কথা দুটো, লাইন থেকে কেমন, হাতে দশ দিনের না-কাটা শক্ত নখের মতো খচাত-খচাত করে বেরিয়ে। ভূতের নখ কালো নোংরা ভর্তি।

বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করতে আসত কাচড়া, তেলের টিন কেটে বানানো মেকশিফট বেলচাটা হাতে ধরে। শেওলা-ধরা সরু নালা ঝাঁট দিয়ে সাফ করে জড়ো করত ভেজা, কালো নোংরার স্তূপ। বেলচায় ঝুলে ভেজা কাগজ, ঝাঁটার কাঠি, লেবুর কালো খোসা... জ্যান্ত ছানার নখ কি ওরকমই? মাঠের ধারে ধোবিঘাট লাগোয়া ঝুপড়ির গরিব বাচ্চাগুলো সারাদিন টায়ার বা তার রিম নিয়ে দৌড়ে বেড়াত। ধুলোয় গর্ত করে গোলাগুলি, ডাংগুলি এন্তার। ছানাটা কি ওদের

মতোই 'নোংরামুখো'? ভূত-মা আদর করতে গিয়ে যেমন খুশি 'ঘুঁষি' মারে। কানটা কষে মুলে দেয়। আবার আছাড়ও মারে। রামিয়াকে ওর মা কথায়-কথায় কষে দু-ঘা দিত! রামিয়ার চিল চিৎকারে গোটা মাঠ কম্পমান। ভূত মায়ের আদর তবে এমনই! কিন্তু 'মা'-নির্মাণের এই চেহারা অচেনা। তাই কবিতার শরীর-সহ আত্মার সঙ্গে দূরত্ব ক্রমবর্ধমান। অবশ্য সেসময়ে ছমছমানির হদিশ পেতে 'কাষ্ঠ সুরে' হাসি বুঝে নেওয়াটাও জরুরি! তাই নৈকট্যের সেতুবন্ধনে 'খ্যাঁশ্‌ খ্যাঁশানি'।

কাঠের টালে ডাঁই কাঠের মাঝে করাত চালিয়েই যাচ্ছে লাকড়া। বসে, একটুক ঝুঁকে, হাত এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে সাঁই-সাঁই। সঙ্গে শরীরটাও, অল্প-অল্প। দূর থেকে শব্দহীন। বরং খাটালে গাই-ভঁইসার জাবনা জোগাতে খড় কাটার নিরন্তর ঘ্যাঁশ-ঘ্যাঁশানি ওই 'খ্যাঁশ্‌ খ্যাঁশানি'-র কাছাকাছি। অবয়বহীনকে অবয়বদানের ছেলেমানুষি প্রচেষ্টায় মাঝখান থেকে আত্মিক ব্যবধান প্রকট। কাটা-পেটের তলার অংশে চোখ নামাতে অনিচ্ছে যেত। গোটা এই অংশটা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো দাঁত-ভ্যাংচানি মার্কা। মা নানা কথা বলে-বলে ছানাকে আদর করছে, সেই দীর্ঘ উদ্ধৃতি (অবশ্য সত্যি কথা বলতে কী, এটা যে উদ্ধৃতি, তা-ই জানা ছিল না বহুকাল)-তে নানা শব্দের মাথায় চন্দ্রবিন্দু এঁটে।

সকালবেলা লোহার গেটের ওপার থেকে ভঁ-অ-ক ভঁ-অ-ক হর্ন দিত সাহেব। উতরাই পেরিয়ে আবার রিকশোর সিটে সাহেবকাকু। স্কুলের পথে কুমোরপাড়ায় মাটির হাঁড়ি, দিওয়ালি কা পুতলা, খাপরা, জালার উপর দিয়ে চোখ চলতে-চলতে আটকে যেত সাহেবকাকুর আদুড় পায়ে। শক্ত, ফোলা পেশির গায়ে কোঁকড়ানো লোম। হঠাৎ মনের চোখে ভাসে, 'কোঁৎকা', 'হোঁৎকা', 'হামান-ছেঁচা', 'ছিঁচকাঁদুনে'...। চলন্ত রিকশোর একটানা কোঁ-ও-চ কোঁ-ও-চ (আবার চন্দ্রবিন্দু!), সাহেবকাকুর পায়ের কোঁকড়ানো লোম আর অতগুলো চন্দ্রবিন্দু। বিশেষত ওই ''...ফের যদি তুই কাঁদিস রে —" কবিতার ছবি, চাকার শব্দ, রিকশোওয়ালার পায়ের লোম — দৃশ্য-শব্দ-কল্প মিলিয়ে অনুভূতিটা অস্বস্তিকর। ভালো নয়। মনে হত, এ-কবিতা ভালো নয়।



বহুকাল বিছড়ে 'অল্প' বন্ধুর সঙ্গে অচানক মোলাকাত কিংবা ফোটো-অ্যালবামে আচম্বিতে মিলে যাওয়া আলগা কোনো আধা-চেনা সাদা-কালো ছবির মতো আবার পরিচয়। তখন সে 'খ্যাংরা-খোঁচা' নাকি 'চিমনি-চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাঁপাটে', তা অবান্তর, বরং **বহুত সাল** পরে এলাটিং বেলাটিং-এর পুরাতনী সুর মিলিয়ে নেওয়ার পালা।

বদলও এসেছে। *ভুতুড়ে খেলা* এখন অফসেট। মেদ ঝরিয়ে ছিমছাম গোটাগুটি, ফর্সা। হলদেটে, খসখসে বুড়ো চামড়া খসিয়ে এখন মসৃণ চকচকে বিজ্ঞাপনী ত্বক। পেট জুড়ে গিয়ে গোটাটা এখন টুপি পরা, প্রোফাইলে এক তাগড়া ফৌজি। ছবিও এখন বাই-কালার। জ্যান্ত ছানা এখনও সেই কালো থাকলেও, ভূত-মা-এর পরনের কাপড় এখন কমলা। সাক্ষাতের প্রথম উচ্ছ্বাসের মতো এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার সময় চোখে পড়ে না যে, বেশ চোখে পড়ার মতো রদবদল ঘটে গিয়েছে। তবে ফিরে দেখলে চোখে পড়ে, চুলের রেখায় রুপোলি রং, চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়া। হালের কাগজ এখন আরও সাদা আরও মোলায়েম। পুরোনো বই-এর পাতা, সাদা-কালো ছবির মতোই হলদেটে, খসখসে। হাতের লোমের ঘনত্ব বুঝতে গিয়ে দেখা যায়, 'আহ্লাদে' এখন স্মার্ট হয়ে 'আহ্লাদে'। মুখের পুরোনো তিল হাতড়ালে ফিকে-হয়ে-যাওয়া রঙের মতো 'ঘুঁষি'-টা কখন জানি 'ঘুসি' হয়ে কেমন কমজোর পড়ে গিয়েছে। চন্দ্রবিন্দুহীন হওয়ায় তা ম্লানতর। অবশ্য বন্ধুর ঘ্যামা বাজখাঁই গলার মতোই 'কটকটে —' এখনও একইরকম, কেবল হসন্ত-বিহীন। 'সুঁটকো'-টাও একইভাবে খচাত করে লাইন থেকে বেরিয়ে। পুরোনো ছাপায় ওই চন্দ্রবিন্দুর জন্যই 'স' আর 'ট'-এর মাঝে আলগা একটা ধুলো-ভরা ফাঁক ছিল। এখন নখের নোংরাটা আরও ঠাসাঠাসি আর কড়া।

আয়নায় বলিরেখা খুঁটিয়ে দেখার নিবিষ্টতাতেই চোখে পড়ে *ভুতুড়ে খেলা*-র কোনায়-কোনায় আপাত বদল। 'হোঁৎকা' এবং 'কোঁৎকা' এতদিন ছিল বেশ নাদুসনুদুস। 'হোঁতকা' ও 'কোঁতকা' হয়ে একেবারে 'ওবিজ'। তবে 'দূর-ছাই!' মনোভাব সত্ত্বেও দেরাজে ঝুলে থাকা বাবার তসরের টাই দোলানোর নিবিড়তাসম 'শূন্যে ঝোলে চ্যাং দোলা'-তে অদ্ভুত এক আলম্ব দোলনের চাক্ষিক আইয়াশি ছিল। এখনকার 'চ্যাংদোলা' কেমন ঝটপট, কুইক সার্ভিস!

এ-কথা তো জানাই যে, ঘুসি, কানমলা, চ্যাংদোলা-সহ বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে 'মা' নির্মাণের চরম বিপ্রতীপ পান্ত-মা। এতদিন তার ক্রিয়াকলাপের ছায়া ছিল দীর্ঘতর। বরং উদ্ধৃতি ছিল বিশাল টানা বারান্দার দূর রেলিং-এ থমকে থাকা গিরগিটির মতো ভয়ঙ্কর, অচেনা। বেশি অনার্য, কারণ ব্যবহৃত বিশেষণের মধ্যে ওই 'মানিক' ছাড়া আর কোনোটাই চেনা 'খুকুমণি', 'চাঁদের কণা', 'সোনামণি' মার্কা নয়। কিন্তু **এখন**, কবিতার অবয়ব, মায় দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন আর অবয়বহীন পান্ত-মা-এর মারপিট অথবা ভূত-সুলভ খুনসুটি আর অলীক অচেনা নয়। বরং বাস্তবতার হাত ধরে বেশ জটিলও। কারণ, দ্বিপাক্ষিক হাসি-মজাকের অন্তরালে হালের মানসিকতা বার বার প্রশ্ন তোলে, সন্তানের প্রতি অভিভাবকের ব্যবহার নিয়ে সুকুমার রায় অন্য কোনো গূঢ় ইঙ্গিত দেন না তো?

তবে এসব ছাপিয়ে দীর্ঘ উদ্ধৃতিই এখন অনেক বেশি নজরকাড়া, হৃদয়ের কাছাকাছি। এই অংশে কবিতার শরীরে মেদ জমেছে না সে তকতকে তন্বী, তা নিতান্ত অবান্তর। যেমন, 'বিছড়ে' বন্ধুর চোখের তলার কালি, দাঁতের হলদে ছোপের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ 'তুই গানটা কি এখনও সেইরকমই ভালো গাস?' অথবা চমৎকৃত বন্ধুর অকপট বিস্ময়ী মন্তব্য 'তুই মা হয়েছিস!' — ফলে পুরোনো সম্পর্কের বহতা ফল্গুর পরিণাম, নয়া দোস্তি। সেখানেই উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিকতা তীব্রতর।

পান্তভূতের অশরীর, তার মাতৃত্বের অনার্য শব্দাবলি নতুন দ্যোতনা তৈরি করে। 'হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টি' স্বাদ আগে যতটা অচেনা ছিল, এখনও প্রায় ততটাই অপরিচিত। কিন্তু মাতৃত্ব 'স্ব-ভাব' সম্বলিত পাঠকের কাছে বাঙালি জনমানসিকতার অন্তরের 'অন্ধের যষ্টি'-র উপমা হঠাৎই যষ্টিমধুর স্বাদ বদলে দেয়। 'রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার' আগে পাঁচফোড়নের বাছাবাছিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও, এখন তা ছোট্ট পায়ের মোজা বা গোটের ঝুমঝুমির মতো মনের কাছাকাছি। যে-'স্বপ্নঘোড়া' আগে পক্ষীরাজ ঘোড়া (আচ্ছা, বাংলার পারুল বোন বা সুখু-দুখুরা কি কখনো পক্ষীরাজ চড়েছে?)-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফৌত হত, এখন সেই 'স্বপ্ন-ঘোড়া'-ই ছোটো, নরম হাতের রেখা ধরে দুলকি চালে এগিয়ে চলে। ধীরে-ধীরে অশরীরী পান্ত-মা, মা-পাঠকের আত্মায় প্রবেশ করে।

এ-কবিতা লেখার সময় সুকুমার রায়ের অপত্য স্নেহের থেকেও বেশি সৃজন ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে কি না, বা এ-কবিতা রচনার সময় তাঁর পাণ্ডুলিপিতে তিনি কতটা কাটাকুটি, কোথায়-কোথায় ডুড্‌ল করেছেন, অথবা কত পাতা জুড়ে তিনি এটা লিখেছিলেন, সত্যি কথা বলতে কী, পাঠক হিসেবে সে-প্রসঙ্গ অবান্তর মনে হয়। এই কবিতার চোখের পাতা, কণ্ঠার হাড়, কনুই-এর কড়া কাটা-ছেঁড়া করতে গিয়েই দেখা গেল, বাংলা ভাষাকে আরও যুগোপযোগী, কেতাদুরস্ত করতে গিয়ে কবি / লেখকের ভাবনাকে দূরে রেখে ছাপার অক্ষরে কখনো যোগ হয়েছে হাইফেন, বাদ পড়েছে হসন্ত। খণ্ড-ত (ৎ) স্রেফ মুছে গিয়েছে। ছাপার ভূত নয়, আধুনিক বাংলা বানানবিধির কেরামতিতে একদা যা ছিল দুটো শব্দে, এখন তা জুড়ে গিয়ে বেমালুম একটা হয়ে গিয়েছে। এমনকী 'কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি —' বেআদব হয়ে 'কোথায় বা কী, ভূতের ফাঁকি —' হয়ে গিয়েছে। সুকুমার রায় 'কী / কি' ঠিক কি / কী-ভাবে লিখেছিলেন, বা তিনি এসব দেখলে কতটা আঁতকে উঠতেন, কিংবা তাঁর পিলে চমকাত কি না, তা গবেষকের বিষয়। সাধারণ পাঠক হিসেবে চেনা বানানের রদবদলে অভ্যাস-জনিত অস্বস্তি কাটিয়ে-ওঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছাড়া আর বিশেষ পরিশ্রমের দরকার পড়ে বলে মনেও হয় না।

ভূতুড়ে খেলা



পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে,
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছনাতে।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হল্লা সে।
শুনতে পেলাম ভূতের মায়ের মুচকি হাসি কটকটে—
দেখছে নেড়ে ঝুন্‌টি ধরে বাচ্চা কেমন চটপটে।
উঠছে তাদের হাসির হানা কাষ্ঠ সুরে ডাক ছেড়ে,
খ্যাশখ্যাশানি শব্দে যেমন করাত দিয়ে কাঠ চেরে।
যেমন খুশি মারছে ঘুসি, দিচ্ছে কষে কানমলা,
আদর করে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাংদোলা।
বলছে আবার, "আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে,
দেখ না ফিরে প্যাখনা ধরে হুতোম-হাসি মুখ করে!
ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁতকা রে,
অন্ধবনের গন্ধগোকুল, ওরে আমার হোঁতকা রে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্টি মাসের বিষ্টি রে,
ওরে আমার হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টি রে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপ্ন-ঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোবরা গণেশ ময়দাঠাসা নাদুস রে,
ছিচকাদুনে ফোকলা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস রে—"
এই না বলে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট করে,
কোথায় বা কী, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট করে!

কারণ, কবিতা কোথায় আধা-আধি পেট-চেরা, কোথায়ই বা খাড়াই থেকে গড়িয়ে পড়া ঝরনা, তা একেবারেই পাঠকের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির এক্তিয়ার। আর এখানেই পদ, কবিতা, ছড়া, পদ্যের অবয়বনির্মাণ প্রকাশনা-ভেদে ভিন্নতর হলেও, পাঠকের কাছে সেটা তার সমস্ত আত্মাসহ অন্তরে প্রবেশ করে।

ভূত যেমন। অশরীরী উপস্থাপনার থেকেও তার উপস্থিতির দ্যোতনা ভিন্ন। কবিতাও কি সেরকম নয়? তবে ভূতের মতো সে অবয়বহীন নয়। হতে পারে না। সে কুদরতি নয়, রীতিমতো ম্যান-মেড। ভূতও কিন্তু প্রায় সেরকমই। যদিও তা সংজ্ঞানুযায়ী সূক্ষ্মশরীরী, তবু ব্রহ্মদত্যি, ডাকিনী, পিশাচ, পেতনির দৃশ্যকল্প এক নয়। জন-কল্পনায় তাদের এক-একজনের চেহারা এক-এক রকমের। এই *ভূতুড়ে খেলা*-কেই সুকুমার রায় টিপে-টুপে, ছেঁটে-ছুঁটে, গড়ে-পিটে কায়াদান করেছেন। সেইসঙ্গে লেখার পাশাপাশি পান্তভূত আর জ্যান্ত ছানার ছবি তৈরি করে তার 'কায়া'-কেও বেশি স্পষ্টতা দানের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সেই ছবিই তো শেষ কথা নয়! সব মিলিয়ে সবটা তৈরি করেছে একরকম 'মায়া'।

আত্মা যেমন পুরোনো বসন ছেড়ে নতুন বসন পরে, ছাপার কালের ফারাকে *ভূতুড়ে খেলা*-ও অনেক পরিবর্তিত। আগে লেটারপ্রেস, পরে অফসেটে ছাপার কল্যাণে এবং বানানবাগীশদের হাতযশে একই কবিতার কায়ায় পরিবর্তন হয়েছে। তবে আত্মা যেমন নতুন বসন পরে অচেনা হয়ে দাঁড়ায়, কবিতার ক্ষেত্রেও কি ব্যাপারটা সেরকম নয়? উত্তরটা হতে পারে হ্যাঁ এবং না। নতুন পাতায় ধোপ-দুরস্ত, ফিটফাট চেহারার *ভূতুড়ে খেলা* প্রথমে কেমন চেনা-অচেনার দোলাচলে দুলিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে মনে গেঁথে থাকা *ভূতুড়ে খেলা*-র কায়া এবং মায়ার বাঁধন নতুন করে চিনতে শেখায় ভূতকে, তার মাকে। সুকুমার-মতি পাঠক হিসেবে যে-কবিতা না-পসন্দ, মা-পাঠক হিসেবে সেই কবিতাই জবরদস্ত পছন্দসই। পান্ত-মা-এর উদ্ধৃতি কোন সময় জানি অন্তরাত্মায় সেঁধিয়ে, তার মাতৃত্বকে দাপটের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে! মা-ভূত আর অচ্ছুত নয়, বরং অজান্তে, গোপনে, আবেগ প্রকাশের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আপাতভাবে তা আত্মার বসন পরিবর্তনের অজুহাত বলে চালিয়ে দেওয়া যেতেই পারে। উলটো দিক থেকে দেখলে মনে হয়, কবিতার যে-আত্মাকে পাঠক এতদিনে চিনেছে, সেই পরিচয়ই খাঁটি। আবার এক কবিতা আজ যেভাবে পরিচিত, দু-দশক পরেও যে সে সেই রূপেই দেখা দেবে, তার দায় পাঠক-লেখক কেউই নেবেন না। সুকুমার রায় কী ভেবে *ভূতুড়ে খেলা* রচনা করেছিলেন, বা কোথায় 'হসন্ত' ছাঁটাই হল, সে-প্রশ্ন নিতান্ত অদরকারি। ততটাই অদরকারি কবিতার শেষের অংশ পরের পাতায় চলে গিয়ে কতটা বিঘ্ন ঘটাতে পারে, সেই কষ্টকল্পনা। বরং কবিতার আত্মা কখন যে কোন বহুরূপীর রং ধরে ধরা দেয়, পাঠকের কাছে তার ব্যক্তিগত ইতিহাস বেশি গ্রহণীয়।

আসলে কবিতাও ভূতের মতোই। মানুষকে ভূতে পায়। কবিতাও পায়! ভূতগ্রস্ত হওয়ার মতো মানুষ কবিতাগ্রস্তও হয়। মুশকিলটা হল, ওঝা দিয়ে ভূত নামানো যায়। *ভূতুড়ে খেলা*-তে 'কাদার চাপটি ফট করে' মেরে পান্তভূত আর তার জ্যান্ত ছানা চট করে মিলিয়েও যেতে পারে। কিন্তু কবিতা-ভূত, বেজায় নাছোড়বান্দা। তার চেহারায় সে 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার' না 'হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যান', সে-বিতর্কে না গিয়ে গুপ্তকবির *মায়া* থেকে ধার করে কবিতা-ভূতকে কি এভাবে সংজ্ঞায়িত করা নেহাত ছেলেমানুষি হবে?

...ভূতে ভূতে যোগাযোগ ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড অভিভূত সব॥
ভূতের আকার নাই বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের মনোহর দেহ॥
...ভূতের বাসায় থাক দেখ নাকো চেয়ে।
দিবানিশি তোমারে হে ভূতে আছে পেয়ে॥

বইমাতৃক কাব্য

বইমাতৃক কাব্য

বই-এর পাতা তাদের জমি নয়। তবু তারা পরোক্ষে বই থেকেই উঠে আসা। কবিতার বই যেন অনেকটা তাদের বিমাতার মতো। গ্রন্থ-অতিক্রান্ত সেসব কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য আসলে দৃশ্যরূপই! এখানে রইল আমজনতার মাঝে দেখতে পাওয়া তেমনই কিছু কবিতার কথা।

বিয়ের পদ্যের অক্ষরবিন্যাস ও সজ্জা

গৌতমকুমার দে

বিয়ের পদ্য একইসঙ্গে পড়ার এবং দেখার। লেখা হয়, তাই পড়ার — সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এমন কী আছে বিয়ের পদ্যশরীরে, যে-জন্য তা দর্শনীয়? বিয়ের পদ্যকায়া নির্মাণে তার অক্ষরবিন্যাস ও সজ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদ্যের উপস্থাপনা ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এসবের একটা প্রভাব পড়ে বই কী। নিঃসন্দেহে দর্শক-পাঠকের কাছে একটা অন্য আবেদন নিয়ে হাজির হয়। তবে এই আবেদন যতটা ভিস্যুয়াল, ততটা কাব্যশৈলীময়তার জন্য নয়। কারণ পদ্য রচয়িতার নিজস্ব শৈলীনির্মাণ ও প্রয়োগ-দক্ষতা-সহ ভাষা ব্যবহারে নিজস্বতার ওপর নির্ভর করে থাকে এগুলো।

মনে করা হয়, পদ্যের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল কোনো পরিবার থেকেই শুরু হয় বিয়ের পদ্য লেখার ব্যাপারটা। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগরের সর্বাধিকারী পরিবারের বিয়ের পদ্যের বয়স প্রায় দু-শো দশ বছর। এরকম দু-একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে, মোটামুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই লেখার চল চোখে পড়তে লাগল।



॥ শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ ॥

কল্যাণীয়া শ্রীমতি অন্নপূর্ণা'র সহিত কল্যাণীয় শ্রীমান শুভেন্দু বাবাজীবনের শুভ-পরিণয় উপলক্ষে

ঃ শুভাশীর্ব্বাদ ঃ

অন্নপূর্ণা ঃ—

বিবাহ বাসর— ঝরিয়া, (মানভুম)

শুভেন্দু ঃ—

ইতি— আশীর্ব্বাদিকা তোমার
"মা"

বড়দি'র বিয়েতে আমাদের গোটা দুই কথা

ইতি — তোমার স্নেহের
"ছোট ভাই ও ভগ্নীগণ"

চিত্রসৌজন্য : *বিয়ের পদ্য*, বারিদবরণ ঘোষ

গোড়ার দিকে অক্ষরবিন্যাস ও অক্ষরসজ্জার ব্যাপারটা ছিল গৌণ। তখন 'প্রীতি-উপহার' (বিয়ের পদ্য আদিতে যে-নামে পরিচিত) রচনাকে ঘিরে থাকত আমোদ-আহ্লাদ-প্রীতি-ভালোবাসা-আশীর্বাদ...। তাতে লেগে থাকত, ফুটে উঠত, মেয়ে কাছ-ছাড়া হওয়ার দুঃখ। পাঠক তথা বিয়ের আসরে আগত অতিথি-অভ্যাগতদের মনোরঞ্জনের মধ্য দিয়ে উঠে আসত রচয়িতার তৃপ্তির ঢেকুর। ধারে-ভারে তা ছিল এক অন্ত্যজ কাব্যসাহিত্য। তথাকথিত এই নিম্নবর্গ তখন নিজের অস্তিত্বের ভিতকে পাকাপোক্ত করতেই ব্যস্ত। অক্ষরবিন্যাস ও সজ্জার ভাবনা সেখানে গতানুগতিক।

বিয়ের পদ্যে রুচি ও শিল্পসম্মত স্নিগ্ধ-মধুর নির্মল রসের আবির্ভাব সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। পরবর্তীতে বিয়ের পদ্য যাকে বলে জাতে উঠল, খানিকটা কুলীন হল, যখন বিয়ের পদ্য লিখলেন বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, বিষ্ণু দে, কবিশেখর কালিদাস রায়, আনন্দ বাগচী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

আজ পর্যন্ত যত বিয়ের পদ্যের নমুনা সংগ্রহে এসেছে বা দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতায় মনে হয়, বিয়ের পদ্যে অক্ষর বসানোর ব্যাপারটা আলাদা করে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে একশো বছরেরও আগে থেকে। বিয়ের পদ্য, যাকে রচনার ধরনের জন্য 'ছড়া' বলা যায় অনেক সময়, সেখানে শব্দ বিশেষ মোটা অক্ষরে (bold letter) ছাপার মধ্য দিয়ে শুরু এই অভিযান। একটা নমুনার দিকে একটু ফিরে দেখা যাক। ঠাকুরবাড়ির ছেলে কৌশিকনন্দন ঠাকুর। বিয়ের পদ্য রচনায় সদা আগ্রহী ও সিদ্ধহস্ত। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গগনেন্দ্রনাথের পৌত্রী বকুলার বিয়ে (১৩ই মাঘ ১৩৪৫) কয়লাহাটা ঠাকুর পরিবারের মেয়ে দ্রবময়ী দেবীর প্রপৌত্র প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দুই পরিবারের আত্মীয়তা লতায়-পাতায়। এ-কথা

মনে রেখে দুই পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম বিয়ের কবিতায় রাখলেন কৌশিকনন্দন। মোটা হরফে। কবিতাটির অংশ বিশেষ —

প্রণবের অভিসার —
বকুল তলায় —
(আবির্ভাব)
সরযূর সেই পুন্যকূলে,
নতুন নবদ্বীপ!
নিতাই গৌর হরির প্রেমে
জ্বালিল স্বর্ণদ্বীপ!!
মন্দির দ্বারে প্রসাদ বিলাল,
আপনি **অন্নদা**;
কমলা যেথায় চিরতরে রয়,
হইয়ে **ধনদা**।

বাংলা ১৩৫১ সনের একটি বিয়ের কবিতা —

মাই ডিয়ার, dearest ফ্রেন্ড
এখন তবে ৮০
আসছে বছর নবাগতর ভাতে
মারতেই হবে খাসি।

বিয়ের পদ্যে কোডিং-ডিকোডিং-এর সূচনা এভাবেই। বর-বধূর নাম, তাদের পিতৃ-মাতৃকুলের পরিচয়, বিয়েবাড়ির নাম একটু বড়ো আকারে ছাপা হত। উদ্দেশ্য, বিবাহবাসরের নায়ক-নায়িকা এবং কারিগরদের বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা। একশো বছরেরও বেশি পুরোনো আরও বিচিত্র কিছু উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে সত্যচরণ মিত্রের *বিয়ের মন্তর* বই-এ। বইটিকে বলা যেতে পারে বিয়ের পদ্যের সংকলন। বইটির ১৩২০ সনে লেখা উৎসর্গপত্র ও গৌরচন্দ্রিকা অংশ দু-টি তুলে দিলাম। এ-থেকে কেবল সেকালের বিয়ের পদ্যের হরফসজ্জাই নয়, বিয়ের পদ্যের কালচারেরও একটা আঁচ মিলতে পারে।

স্নেহের উপহার।

পাঁচু!
সবাই মিলে লিখিয়ে ছড়া,
তুমিত কিছু চাইলে না
এত লাজুক হলে ত বাপ,
সংসার করা চলে না
বাপের ধন ছেলেতে পায়,
সবারিত আছে জানা
তাই “বিয়ের মন্তর” ছাপিয়ে নিয়ে,
দিলাম তোমায় বইখানা
সময় পেলে প'ড়ো তুমি,
নিয়ে তোমার বন্ধু জনা
যদিও ভাববে সবাই জানি মনে,
দেখে শুনে কাণ্ডখানা।

বাদুড়বাগান।
২০ বৈশাখ ১৩২০।
বাবা।

গৌর চন্দ্রিকা।

আজকাল
পদ্যহীন বিয়ে—ভাবলে গা কেঁপে উঠে
আরে ছি ছি লাজে মরে যাই,
বর ক'নে থাক বা না থাক,—পুরুত আসুক আর নাই আসুক
(অন্ততঃ) একটা পদ্য চাইই চাই।
লাল নীল কাগজেতে যা'তা' লেখা
লোকের হাতে দিলেই তাই
তার বদলে একটা “থ্যাঙ্কস্” (thanks)
পেলে একেবারে বর্ত্তে যাই॥
তাই বলি কবিতে গো
আর কিছু নাহি চাই
(আমার) কলমে এসে ভর কর মা
হু হু করে লিখে যাই
(ভাল হ'ক মন্দ হ'ক তাতে কিছু ক্ষতি নাই)
মোদ্দা কিনা, পদ্য একটা চাই ই চাই।



প্রথম দিকে বিয়ের পদ্য লিখতেন শিক্ষিত ব্যক্তিরা। তার মধ্যে থাকত এক ধরনের গাম্ভীর্য। কালে-কালে তা লঘু হতে শুরু করল। সেই সঙ্গে কবির তুলনায় অকবির ভিড় বাড়তে থাকল। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পদ্যের ভাব-ভাষা-ছাপা-বিবরণেও এল পরিবর্তন। হালকা গোলাপি, হলুদ, সবুজ, লাল, নীল বা নীলচে-সবুজ রঙের পাতলা কাগজে থাকত মালা হাতে পরি, প্রজাপতি, ডাব ও ঘটসুদ্ধু কলাগাছ, শাঁখবাদনরত মহিলা, ফুল-লতা-পাতার বাহারি নকশা, বর-বধূর হাতের ওপর হাত, ব্রহ্মা, গোলাপ ফুল বা ফুলের মালা, ঢাকি-সহ কচি-কাঁচা বয়স্ক মানুষজনের ভিড়ের এক ঝলক। সঙ্গে পদ্য।

গত শতকের নয়ের দশকে দেখা গেল, ক্যানভাসের বদল। পাতলা কাগজের বদলে মোটা শক্ত কাগজ। এতে কোথাও-কোথাও পূর্বোক্ত ছবিগুলো এমবস করে দেওয়া। নতুন শতাব্দীর গোড়ায় পাওয়া গেল সুগন্ধি কাগজে ছাপা বিয়ের পদ্য। অত্যন্ত দামি ও বাহারি হ্যান্ড-মেড পেপার ব্যবহার করতেও দেখেছি। পকেট পারমিট করলে সিল্ক স্ক্রিনে ছাপাতেন কেউ-কেউ।

বিবেকানন্দের *সঙ্গীত কল্পতরু*-তে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘দুই হৃদয়ের বাণী’ গানটি। এটি কবি লেখেন রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাবতীর বিয়ে উপলক্ষে। কবির লেখা অন্যতম একটি বিয়ের গান (অপরটি ‘মহাগুরু দু'টি ছাত্র এসেছে তোমার’)। এই গানকে নতুনভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা গেল ১৯৯৩ সালে। কাঁথির মহাদেব-সবিতার বিয়েতে। এভাবে —

দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি
বলো দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার
তুমি প্রেম পারাবার
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটি মিলিতে চায়॥

প্রসঙ্গত, মূল রচনায় ‘একত্রে’-র বদলে আছে ‘একত্র’; তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ দু-টি এক লাইনে; এবং ‘তার’ শব্দের পরে কমা ছিল।

পাতলা কাঠের বা ফাইবারের পাইপে গোটানো যায় (অনেকটা ওয়াল হ্যাংগিং-এর কায়দায়), এভাবে ভেলভেট বা তসরের কাপড়ের ওপরেও ছাপা হতে দেখি বিয়ের পদ্য। তসরের ওপর ছাপা পদ্যর ক্যালিগ্রাফি দেখার মতো। যদিও মূল লেখাটা নেহাতই সাদামাটা। সময়টা ছিল জানুয়ারি ১৯৯৫।

'জীবন পূর্ণ হোক', 'পূর্ণ হোক জীবন', 'ধন্য হউক নব জীবন', 'হৃদয় গভীরে থাক', 'শান্তি ভালোবাসা বিনা রাখঢাক' — প্রতিটি বাক্যাংশের শব্দগুলো ছিল একটা বৃত্তের পরিধি বরাবর। আর সেই শব্দময় বৃত্ত বা রিং-গুলো একে অপরের ওপর সমাপতিত হয়েছে দু-লাইনে। এমনভাবে, যা দেখলে অলিম্পিকের শাশ্বত প্রতীকের কথা মনে পড়বে। যেন বলতে চায়, এ-জীবন এক খেলা! সংসার খেলাঘর, গেমস ভিলেজ! ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরের উদাহরণ শেষোক্তটি। কাঁচড়াপাড়ার নন্দিতা-তপনের বিয়ে উপলক্ষে সৃষ্ট।

প্রিয় মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে অঞ্জনা করের। এটা ১৯৯৮ সালের কথা। এদের বিয়ের পদ্যে শিরোনামের জায়গায় যা ছিল, তা জেনে নেওয়া যাক একবার। হৃদয়ের আকৃতি কল্পনা করুন। এবার ভেবে দেখুন, সেই হৃদয়াকৃতি রেখা বরাবর লেখা একটাই নাম। বার বার — 'অঞ্জনা'। দুই প্রকোষ্ঠে দু-টি অক্ষর — 'প্রি' এবং 'য়'। এটি বরের বাড়ির তরফে রচিত। আপাত লঘুতা সত্ত্বেও আপন করে নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশের জোরটি কোনোমতেই নজর এড়ায় না। এহেন শিরোনামের নিচে লেখা —

নব জীবনে মিলনের বাণী
দু'জনায় করি ঘোষণা
প্রিয়ের পাশে অঞ্জনা ওগো
শান্তি-সহায় ভাবনা।

ফুটবল অন্তপ্রাণ কিশোর চট্টরাজ। মোহনবাগান বলতে অজ্ঞান। তাঁর বিয়ের পদ্য ছাপান গোলাকার শক্ত কাগজে। তাতে সবুজ-মেরুন রঙের ফুটবলের ছবি। তার মাঝে লেখা শিরোনামহীন এই ক-টি লাইন, এইভাবে —

আজি এ জীবনে নতুন প্রভাতে
মহুয়া,
তোমাতে নিজেকে সঁপিলাম



এসব লেখার কোনো-কোনোটা পাকা হাতের বললেও কম বলা হয়। রীতিমতো পেশাদার কবির লেখা। যেমন নীচের দু-টি —

১. বি
বি
হা জীবনে-মিলনে
তা সৃজনে-চুম্বনে, এক রবে চি-র-কা-ল!
ন চলনে-বলনে
ন

২. আজি এ বসন্তে
জীবন প্রান্তে
চির অক্ষয় হোক, আশীর্বাদ করি,
তোমাদের সং-সার [প্রদীপের ছবি]

ছেলের বিয়েতে বাবা-মা-র আশীর্বাণী। রচনাকাল ডিসেম্বর ২০০১।

প্রথমটির (বিহান-বিতান) অক্ষরসজ্জা-বিন্যাস মনে পড়ায় স্প্যানিশ ভাষার কবিতায় স্ট্রাকচারালিজ্‌ম-এর অন্যতম হোতা কবি নিকানোর পাররা-কে। যাঁর কবিতা কেবল পড়ার নয়, আলাদা করে শুধু দেখারও। অক্ষরের ছবি। অক্ষরভিত্তিক স্থাপত্যের মুদ্রিত সংস্করণ।

কবিতার ব্যাকগ্রাউন্ডে খাজুরাহের মিথুন দৃশ্য ছাপা হয়েছে। কবিতাটি ছিল এরকম —

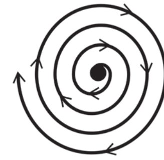
চারি চক্ষের মিলন —
উ ব চু
ৎ স ম
স ন ব
বে তে নে
র র র
চারি চক্ষের মিলন —
ভালোবাসার, প্রেমের, উৎসবের
চারি চক্ষের মিলন —
জীবন বসন্তের

চমৎকার গঠনসৌকর্যের এই বিয়ের কবিতাটি লেখেন বর তমাল। নয়নাকে জীবনসঙ্গী করার আনুষ্ঠানিক আয়োজনে।

বাংলা-ইংরেজি, এমনকী সংস্কৃত মিশিয়ে বিয়ের পদ্য লেখার চল বহুকালের। প্রথম বিয়ের পদ্য সংগ্রাহক অবিনাশচন্দ্র ঘোষের *উপহার*, পঞ্চানন বাকচির *বিবাহের কবিতা*, পরবর্তী কালে বারিদবরণ ঘোষের *বিয়ের পদ্য* ও চিত্রা দেবের *বিবাহবাসরের কাব্যকথা* বইতেও এ-ধরনের অনেক নমুনা রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহেও আছে কয়েক-শো। এ-জাতীয় বিয়ের পদ্যে চমকটাই মুখ্য। উপস্থাপনায় একটা বহু-চর্চিত ধারা অবলম্বনে নতুনত্ব আনার প্রয়াস মাত্র। আঙ্গিক কিংবা ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে এর আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই বলেই মনে হয়।

ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্রিকেট মাঠকে রেখে, মাঠের সবুজ গালচের অংশে ছোট্ট কবিতা। পুরোটা ছবি প্রিন্ট করার ম্যাট ফিনিশ্‌ড পেপারে মুদ্রিত। তাতে লেখা, 'জীবনে-মরণে / আমার জীবনে / আজ হতে তুমি — / ধ্রুবতারা'। রচনা হিসেবে খুব যে উচ্চাঙ্গের, তা নয়। তবে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বর সুমিত্রর ক্রিকেট প্রেমের কথা জানা গেল। এটা ২০০৬-এর জানুয়ারির ঘটনা।

এবার যে বিয়ের পদ্যের কথা বলব, তা আলাদা কাগজে ছেপে বিতরণ করা হয়নি। ছাপা হয় বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের প্রচ্ছদ রূপে। ক্রিম-রঙা কভারে মেরুন রঙে ছাপা হয় কবিতাটি। এভাবে স্পাইরালের মতো —



একেবারে কেন্দ্রস্থিত বিন্দু থেকে শুরু হয়ে তির চিহ্ন নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে এগিয়ে চলে কবিতার অক্ষরমালা : 'সত্যি নাকি ঠাকুরপো, তোমার নাকি বিয়ে! ভাবুক তুমি, আপন মনে ভাবছ কী? ঘড়ির পানে চেয়ে। আসবে কখন মধুযামিনী ভাবছো মনে মনে! তর সয় না!!! কতক্ষণে বসবে গিয়ে উদিতার সনে।' রচয়িতার নাম অনুক্ত থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, দেওরকে নিয়ে লেখাটি বউদির। অনন্তের দিকে অক্ষরবৃত্তের এই শুভযাত্রা কীসের সন্ধানে? জীবনের? চমৎকার তো বটেই, এবং চলতি হাওয়ার সঙ্গেও একেবারেই মেলে না তন্ময়ের বিয়েতে (১৪ই ফাল্গুন ১৪১২) রচিত এই অনবদ্য বিবাহসাহিত্য। এরকমটা খুব-একটা দেখা যায় না।

এই যে অক্ষরবিন্যাস ও সজ্জার অনন্যতা, কিংবা নিছক পড়ার বাইরে অতিরিক্ত প্রাপ্তি — এমন অভিজ্ঞতা সেকালেও হত। বারিদবরণ ঘোষ তাঁর সম্পাদিত *বিয়ের পদ্য* বই-এর ভূমিকায় লিখছেন (পৃ. ১৮) —

> একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা... চারুচন্দ্র দত্তের বিয়েতে তাঁর প্রবাসী বন্ধুরা রেশমি কাপড়ে দুর্লভ মুদ্রণ সৌকর্যে বিতরণ করেছিলেন।... 'জাগরণ' নামে এই কবিতার প্রথম স্তবক :

সোনার প্রতিমা সুপ্তি মগন
রয়েছে আপনা পাশরি,
অনন্তকালের স্বপ্ন জড়িমা
খেলিছে নয়নে তারি।
সোনার কাঠির হলে পরশন,
যুগ নিদ্রা পরিহরি
সেই শুভক্ষণে, লভিবে চেতন —
জাগিবে রাজকুমারী
সোনার প্রতিমা সুপ্তি মগন
রয়েছে আপনা পাশরি!

কবিতার পঞ্চম পঙ্‌ক্তির 'সোনার কাঠির' শব্দ দুটি হঠাৎ বড় বড় অক্ষরে সোনার জলে ছাপা হয়েছে। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বন্ধুরা এমন আদিরসাত্মক মন্তব্য করেই থাকেন।

এই আদিরস কতটা কড়া হতে পারে, তার খান তিনেক নমুনা পেশ করা যাক, আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেই। একইসঙ্গে লক্ষণীয় তাদের অক্ষরবিন্যাস ও পরিবেশন পদ্ধতি। তিনটির জন্মস্থান আলাদা। পরিবেশও ভিন্ন। প্রথমটা নাগরিক নমুনা : নানান ব্র্যান্ডের জন্ম-নিরোধকের প্যাকেট উপর-নীচ-পাশাপাশি চার লাইনে বর্গাকৃতিতে বসানো। পুরোটা স্বচ্ছ সেলোফেন পেপারে মোড়া। বক্সের ওপর সাঁটা সেল্‌ফ অ্যাডেসিভ কাগজে লেখা 'ছক্কা' নাম্নী এই ছ-লাইন :

হে আদম-ঈভ
Start take & Give
ঢালো সুধারস [পাশে রসের হাঁড়ি থেকে রস ঢালার স্থিরচিত্র]
নিভৃত কোটর-এ
ভরা থাক স্মৃতি সুধায়
স্মৃতির প্রথম নোনা-আখর।

এটি ১৯৯৯ সালের। স্বামী-স্ত্রী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তাদের বিয়েতে এই সবিশেষ উপহার-আলেখ্য উভয়ের কলেজজীবনের (দু-জনে একই কলেজে পড়তেন) বন্ধুদের তরফে। দু-জনের অনুরোধে নাম অনুক্ত রইল।

দ্বিতীয় নমুনাটি এক আধা-মফস্‌সল শহর নৈহাটির। ১৯৯৩ সাল, অমিত-রঞ্জিতার বিয়ে। হাতের তালুতে ধরা পড়ে, এমন সাইজের কার্ডে বড়ো করে লেখা — 'For Adults only'। নীচে বাঁকা হরফে (italics) — 'অক্ষমদের স্থান নেই।' মাঝে খাজুরাহোর নানা মৈথুন-চিত্রের কোলাজ। রয়েছে অজাচারের ছবি। এসবের মাঝে লাল কালিতে ইতস্তত ছড়ানো-ছেটানো অবস্থায় মোট তিন বার লেখা এই দুই পঙ্‌ক্তি —

দোঁহার পাথেয় দোঁহার সঙ্গ
যৌবন-জল-তরঙ্গ

তৃতীয়টি দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং-এর। ২০০৪ সালের। একশো মিলিলিটার পাউচ প্যাকের (দিশি মদ) গায়ে সাঁটা স্টিকারে লেখা — 'বাঁড়া, খাড়া বাঁড়া ছাড়া এখানে নিষেধ ন্যাতানো ধোন নাড়া'। এই পাউচ প্যাক বিলি করা হয় বউভাতের অনুষ্ঠানে, কেবল অ্যাডাল্ট ছেলেদের জন্য। আমাকে এটার সন্ধান দেন *তদেক* পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীব মণ্ডল।

বিয়ের পদ্যের গ্রাফিক হওয়ার প্রয়াসগুলি মূলত বাহ্যিক। অন্যদের থেকে আলাদা অথবা একটু অন্যরকম হওয়ার চেষ্টা, কিংবা নতুন কিছু করার বাসনা থেকে এসব করা হয়ে থাকে মূলত অতিথি-অভ্যাগতদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। সবরে-অবরে তাতে শালীনতা বেআবরু হয়। মৌক্তিক সুষমার অঙ্গহানি হয়। কিন্তু নজর এড়ায় না। নজর কাড়ার এই প্রয়াস-পদ্ধতির সবটাই নির্দোষ, এমনটা কখনোই নয়। বিয়ের পদ্য গুণমান বিচারে প্রায়শই উচ্চাঙ্গের নয়। তবু তার অন্তরে ফল্গুধারার মতো নিয়ত বহমান অন্তরের, প্রাণের টান, হৃদয়াবেগ। এই চর্চা প্রমাণ করে, বিয়ের পদ্যের চল এখনও সচল।

বিয়ের পদ্যে আদিরস মেশানোর এই যে ধারা, তা ছাড়াও যে এর অক্ষরবিন্যাস কাব্যসুষমামণ্ডিত এবং চিত্ররূপময় হতে পারে, তার কিছু নিদর্শন এই নিবন্ধে আগেই রেখেছি। এ একেবারে একালের, তা-ও নয়। এর নমুনা রয়েছে ঠাকুর পরিবারেই। রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে উপলক্ষে লিখেছিলেন —

'ছদ্মবেশধারী উৎসর্গ
এককথায়
উপসর্গ,
শর্বরী গিয়াছে চলি'।
দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি।
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লায় তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে বলি' এই 'আশিষি তোমারে
অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক।
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার।। মদ্রাজার করে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক'।

লক্ষণীয়, এই কবিতায় যে 'স্বর্ণ-মৃণালিনী' শব্দবন্ধটি রয়েছে, তার জোরে 'ভবতারিণী' পরিচিত হলেন 'মৃণালিনী' রূপে। এবং, সমগ্র কবিতা মঙ্গলঘটের কথা মনে পড়ায়।

বিয়ের পদ্য লেখা হত গদ্যে। নাটকের সংলাপের ঢঙে। শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ-এর বিজ্ঞপ্তি, সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনের কায়দায়, নোটিশের আঙ্গিকে... প্রভৃতি নানান কায়দা-কসরত করে। চিঠির আদলে, পত্রিকার ধাঁচেও হত। বিয়ের পদ্যের জগতে এসব সম্প্রদায় সংখ্যা বিচারে সংখ্যালঘু। কিন্তু খানিকটা অনন্যতার জন্যই তা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত অনেকদিন পর্যন্ত। কিছু থেকে যেত ব্যক্তিগত সংগ্রহে। অক্ষরবিন্যাস এবং সজ্জার এই যে ধারাগুলি, এ-জন্য দরকার হত একটু বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষার। তাছাড়া, যিনি লিখছেন এবং যাঁর বিয়েতে এর অবতারণা — উভয়ের রুচির মিলও একটা ফ্যাক্টর।

এ-জাতীয় কিছু নমুনা —

১. *মোবাইল সংলাপ*
খোকা : হ্যা-আ-ল-লো, মানতা বুড়ি,
খুকু : বলো শ্বাশুড়ি...
(মোবাইলের দু'প্রান্তেই হাসির হ-র-রা)
খোকা : কি করছ?
খুকু : সাজছি।
খোকা : নিজের না আমার জন্য?
খুকু : ধ্যুস, তোমার জন্য সাজবো কেন! সাজছি আমার ব...
খোকা : জানি কী বলবে।
খুকু : কী বলোতো?
খোকা : তোমার লঙ্কাসোনার জন্য...
খুকু : বাঁড়ার ডিম, আমার বয়ফ্রেন্ডের জন্য।

২.
এই ভিক্ষা চাই।
স্বপন-শোভার সৌরভ যেন
চতুর্দিকে পাই।
হে ভগবান, তোমার কাছে

আশীর্বাদক
বাবা-মা

৯ বৈশাখ
১৪১১

৩. এই রাত
তোMAর আMAর
নিজেকে দেবার
তোমাকে পাবার
 মেলবার
আদরে-সোহাগে-ললিত রাগে
[গরু ও বাঘের ছবি]
এক ঘাটে জল এ জীবন খাবে।

৪. তোরা নব দম্পতি
তোদের তরে পদ্য লিখি
আমরা দুই ভগ্নীপতি

ফেভিকল হোক এ জোড়ের বন্ধন
সুখে শান্তিতে অটুট এ আলিঙ্গন

পুরাতন দিদি দু'টি, ভুলো নাকো তারে
তারা যে তোদের সহায়, ভালোবাসার জ্বরে।

শেষের এই পদ্যটির প্রতিটি লাইন ছাপা হয় এক-একটি রঙে। সেই রঙের ক্রম — বেনীআসহকলা অনুসারী। যুগ্ম রচয়িতার (অনিমেষ-রজত) সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এরকম বর্ণের ব্যবহারের কারণ। এই রংগুলো পাশাপাশি রেখে দ্রুত ঘোরালে চোখ সাদা বর্ণ দেখে। অর্থাৎ, নারী-পুরুষে কোনো বর্ণভেদ চলে না। তাছাড়া, সাদা রং শান্তি ও পরিচ্ছন্নতার প্রতীক। এই সমগ্র বার্তা পৌঁছে দেবার ভাবনা থেকেই জন্ম পদ্যটির। সংক্ষেপে বললে, অগোছালো হলেও সদর্থক।

বিয়ের পদ্যের সজ্জা তথা উপস্থাপনার সঙ্গে তার কাব্য তথা ভাষাশৈলীর এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। শব্দ প্রয়োগের রীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিত্রান্বয়ের রীতি। দু-এর অনুষঙ্গে যা পাওয়া যায়, তা যতটা শিল্পোচিত, তার থেকে অনেক বেশি জনমোহিনী। সংখ্যা এবং মানের কথা ভাবলে, এটাই মুখ্য। আপাতদৃষ্টিতে এসব রচনার পেছনে ব্যক্তিগত ভালো লাগাটাই শেষ কথা। কখনো-সখনো তার সঙ্গে যুক্ত হয় দেখানেপনা ও আধুনিক হওয়ার চেষ্টা। অন্যের চোখে নিজেকে, নিজের পরিবারকে বিশিষ্ট করে তোলার প্রয়াস। কেউ-কেউ নিজেকে সংস্কৃতিমনস্ক — এটা প্রমাণ করার জন্যও এ-জাতীয় রচনায় ও তার বাস্তবায়নে আগ্রহী।

অবশ্য এর একটা অন্য দিকও আছে। বস্তুত বিয়েটা এখন আর নিছক একটা সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। দুর্গোৎসবকে, পশ্চিমবঙ্গের চৌত্রিশ বছরের শাসকদল পাড়ায়-পাড়ায় নিজস্ব প্রভাব বিস্তার এবং তাকে আরও শক্তপোক্ত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পথ দেখায় প্রথম। সেদিন থেকে সামাজিক অনুষ্ঠানকে রাজনীতিকরণের এই অবাঞ্ছিত ছোঁয়াচ লেগেছে বাঙালির একান্ত ঘরোয়া আচার-অনুষ্ঠানেও। বিয়েতে ক-জন চারচাকা নিয়ে এসেছে, সেটা অনেককে গর্ব করে বুক ফুলিয়ে বলতে দেখা যায়। একইভাবে আমার বিয়ের কার্ডের নকশা বা পদ্য কে লিখে দিয়েছেন, সেটা আমরা প্রায়শই বলে থাকি এটা বোঝাতে যে, কোন স্তরের লোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে বা কাদের সঙ্গে আমার নিত্য ওঠা-বসা। একটা সম্যক ধারণা পৌঁছে দেবার প্রয়াস, আমার চারপাশের লোকজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের কাছে। এর মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে রয়েছে দম্ভ, আত্মম্ভরিতা, ক্ষমতার প্রকাশ।

তাছাড়া, এসবের মধ্য দিয়ে বিয়েতে একপক্ষ অপর পক্ষের কাছ থেকে খানিকটা সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। কারণ বরযাত্রী, কনেযাত্রী অথবা বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে এমন অনেকে থাকেন, যাঁকে ভবিষ্যতে এরকম কোনো অনুষ্ঠানে ফের পাওয়া যাবে (বিশেষত তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আইডেনটিটি থাকলে), সে নিশ্চয়তা থাকে না। সেক্ষেত্রে তাঁদের কাছে আমি কী, কেমন, কতটা সাংস্কৃতিক বোধসম্পন্ন — সেই রুচির ঘরানা সম্পর্কে জানান দেওয়ার হাতিয়ার বিয়ের পদ্য। সেটাকে ক্ষুরধার করতেই নজর দেওয়া তার অক্ষরবিন্যাস ও সজ্জার দিকে। বিয়ের তত্ত্ব-সজ্জা যে-কারণে অর্ডার দিয়ে করানো হয়, সেই মানসিকতা সক্রিয় থাকে এক্ষেত্রেও।

নতুন শব্দ, উপমার প্রয়োগ, মাধ্যম কিংবা উপকরণ এখন আর যথেষ্ট নয়। ভাষাকে জোরালো করার ভাবনা-প্রবণতা, প্রচলিত বাক্যবিন্যাসের রীতিকে ভেঙে নতুনত্ব দানের প্রচেষ্টাও বটে। গ্রাম বা মফস্সলের যে-ছেলে বা মেয়েটি বাড়ির প্রথম প্রজন্ম, শহরের হস্টেল বা মেসবাড়িতে থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে, সে যে আর 'গেঁয়ো' নেই, আধুনিক হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে তার নজির বিয়ের পদ্য।

এছাড়া, বিয়ের পদ্যের নেপথ্যে রয়েছে প্রশংসিত হওয়ার অভীপ্সা। নিজের কবিতামনস্কতা, 'ভাষাটা ভালো বুঝি' গোছের ধারণা বা আপন ভাষা-ভাবনার অস্তিত্বকে জানান দেওয়ার এ এক মস্ত সুযোগ। যখন খুব মামুলি লেখার শিরোনাম অভ্রসিক্ত হয়ে পৌঁছোয় আমাদের হাতে, তখন মনে হয়, ধরে আছি হাতে-গরম চাপা-অহঙ্কার! বিয়ের পদ্য তখন আত্মপ্রবঞ্চনার মুখোশ, রহস্যের দূত। এ-ও এক ভাবান্বয়ী লোকাভরণ হয়ে ওঠে, যা জনজীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে। তাই, 'দু'একটি নক্ষত্র তবু আসে চৈতন্যের কাছাকাছি / মানুষের উজ্জ্বলতা, আলো নিয়ে' (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। তখন বিয়ের পদ্য হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনাময়। তার অক্ষরবিন্যাস ও সজ্জা অর্থবহ হয়ে ওঠে। তখন পাঠক-দর্শক বুকের স্পন্দনে অনুভব করে পরিশুদ্ধ অরূপরতন। যেমন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতার আদলে রচিত এই বিয়ের পদ্যটি —

বদলে
যাই
বদলে
যাই
বদলে
যেতে
যেতে
আমি থমকে দাঁড়াই,
মালতী,
তোমার সামনে হাত পেতে।

বিয়ের পদ্যের প্রাণভোমরা এই আমোদ-আহ্লাদ-আনন্দ-প্রাণখোলা পাহাড়ি ঝরনার উচ্ছলতা। কিন্তু সেটাকেই যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখি, তখন দুঃখ হয়। মনে হয়, রচয়িতারা মনে রাখলে ভালো হয়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'ভাঙারও নিজস্ব এক ছন্দ আছে, রীতি-প্রথা আছে'।

কবরের কবিতা : শরীর নয়, মন

পিনাকপাণি ঘোষ



সমাধির গায়ের লিপি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার নীচে শুয়ে থাকা মানুষটির জন্ম-মৃত্যুর দিনক্ষণ। কিছুটা স্তুতি। অনেক ক্ষেত্রেই সেই স্তুতি প্রকাশের মাধ্যম কবিতা। কখনো সেটা বিখ্যাত কবির বিখ্যাত লাইন, কখনো আপনজনেদেরই লেখা। কিন্তু তা শুধুই কবিতা নয়, আসলে প্রিয় মানুষের প্রতি প্রিয় মানুষদের মনের আবেগ। আর সেই আবেগে ভরা কবিতায় শরীর যেন বড়োই গৌণ। মনটাই বড়ো।

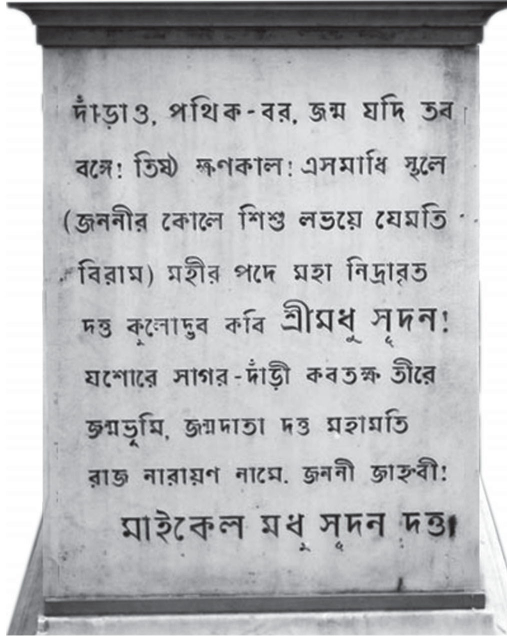
কবরের কবিতা বলতে যে বিশাল ক্ষেত্র বোঝায়, তা এই অনুসন্ধানে নেই। নিতান্তই ক্ষুদ্র পরিসরে খোঁজ-খবর। অনেক বড়ো একটা বিষয়কে ক্ষুদ্র পরিসরে দেখার যে-খামতি, সেটুকু মেনে নিয়েই কবরের গায়ে খোদিত কবিতার রূপ-সন্ধান।

কবি নরেন্দ্র দেব একসময় দেশে-দেশে কবিদের সমাধিতে গিয়েছিলেন। সেখানে বসেই লিখেছিলেন তাঁর অনুভব। কবির কথা, কবিতার কথা। *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে-ও ছিল মনের খোঁজ। কবির মন, কবিতার মন, লেখকের মন। এখানে মন নয়, শরীরের খোঁজ।

শহর কলকাতার কয়েকটা সমাধিক্ষেত্র ঘোরার মাঝেই মনে হচ্ছিল, নিজের কবরের জন্যই যেন কবিতা লিখে গিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব...'। এই কবিতার মুদ্রিত রূপ দেখেছি। কিন্তু কবরের ফলকে কোন রূপে রয়েছে সে? বই-এর অনুরূপ, না কি কবরের কবিতা কবরের মতো।

না, পথিক-বর পথ চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে পড়বে, এমন জায়গায় তো আর কবি-বরের চিরশয্যা নয়। জন্ম যদি তব বঙ্গে অথবা অন্যত্র, আগে হেঁটে যেতে হবে কবির সমাধির কাছে। তার পরে দাঁড়াতে হবে। মল্লিকবাজারের খ্রিস্টান কবরস্থানে ঢুকে কিছুটা সোজা গিয়ে ডান হাতে 'মধু-পথ' ধরে একেবারে দেওয়ালের পাশে গিয়ে বাঁ-হাতে সেই জায়গা — যেখানে কবির নির্দেশ, 'তিষ্ঠ ক্ষণকাল'। '...এ সমাধি স্থলে (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রারত দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধু সূদন!' — এ-পর্যন্ত পড়েই থামতে হবে। শরীর মিলছে না। কবিতাটি বই-এ যেমন, কবরে তেমন নয়। 'শ্রীমধু সূদন!' বড়ো এবং বোল্ড। কবির সমাধিকে যাঁরা সাজিয়েছেন-গুছিয়েছেন, তাঁরা কবির নামের অংশটি, যেটা আসলে কবিতারই অংশ, তাকে বড়ো করে দিয়েছেন। হয়তো কবির সমাধি যাঁরা দেখতে আসবেন, তাঁরা যাতে চিনতে পারেন সহজেই, তার জন্য। কিংবা শ্রদ্ধেয়র প্রতি বাড়তি গুরুত্ব আরোপের প্রয়াস। আর, 'মধুসূদন' কেন ছোট্ট একটা স্পেস শরীর নিয়ে 'মধু সূদন' হয়েছেন, সেটাও মনে প্রশ্ন তৈরি করে। কবিতার ভিতরে, বাইরে নীচেও তেমনভাবেই লেখা। এক্ষেত্রে কবরে যাঁরা খোদাই-এর কাজ করেন তাঁদের জবাব, 'যেমন লিখতে বলা হয়, তেমনই লেখা হয়। এই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নামের অংশটি ওইভাবে লিখতে বলা হয়েছিল। কিংবা যে-কাগজটি দেখে শিল্পী খোদাই করেছিলেন, তাতে এইরকমটাই লেখা ছিল।'

কলকাতায় কবরের ফলকে লেখার কাজের জন্য যাঁর পরিচিতি সর্বাধিক, তিনি আশরফ হুসেন। বাবা গুলাম রসুল এই কাজই করতেন। উত্তরসূরি হিসেবে কাজ করছেন আশরফ। ‘কলকাতার অনেক কবরেই বাবার হাতের ছোঁয়া রয়েছে’, বললেন আশরফ। এখন তিনি সেই কাজ করে চলেছেন। কলকাতার গোরাচাঁদ রোডে গুলাম রসুল অ্যান্ড সন্স-এর অফিস। আশরফ বললেন, ‘কী লিখতে হবে, সেটা পার্টি বলে দেয়। কিন্তু সেটা কেমন করে সাজাতে হবে, সেটা আমাদের ব্যাপার। যে যেমনটা চাইবে, তেমনটা করে দিই। তবে কোনো কবিতা বা কোটেশন থাকলে বানান হুবহু খোদাই করা হয়। সেখানে ভুল থাকলে, ভুল হতে পারে।’ কিন্তু লেখাটার কী অ্যালাইনমেন্ট হবে কিংবা কেমন ফন্টে লেখা হবে, সেটা কে ঠিক করে? আশরফের বক্তব্য, ‘বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেউ আলাদা করে কিছু বলে না। আমরা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে দিই। কবরটা কেমন দেখতে, ফলকের মাপ কেমন, এসবের ওপর নির্ভর করে ডিজাইন।’





তবে, আশরফ হুসেনেরও কথা সেই একই। কবরের কবিতায় মনটাই আসল। শরীর এখানে গৌণ। বরং বলা ভালো, কবরের মতো করেই গড়ে ওঠে নতুন শরীর। যেমন, মূল কবিতাটি মধুসূদন বাঁ-দিকে মার্জিন ঘেঁষেই লিখেছেন। কবরের ফলকে খোদাই-কর্তা সেটাই মেনে চলতে চেয়েছেন, তবে ডান দিকটা বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে ভেবেই হয়তো প্রতি লাইনে শব্দের মধ্যেকার দূরত্ব বাড়িয়ে কবিতাটির রূপ প্রায় ‘জাস্টিফায়েড অ্যালাইনমেন্ট’ করে দিয়েছেন। তাতে কবিতার শরীর ভাঙলেও, কবরের শরীরটি দেখতে যে মন্দ হয়নি, তা ঠিক।

খ্রিস্টান কবরসজ্জার ক্ষেত্রে সম্ভবত বাইবেলের প্রতীক হিসেবে অনেক জায়গাতেই পাথরের একটি খোলা বই থাকে। মধুসূদনের কবরেও তা আছে। সেখানে খোদিত ‘মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।... মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শারদে।।’ — তার উপরে খোদিত আছে কবির পৌত্রদের শ্রদ্ধা প্রকাশ। ইংরেজি ভাষায়। দু-পাতার মাঝে বই-এর স্পাইনের যে-ফাঁক থাকে, গোটা টেক্সটটাই সেই বরাবর সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট। কবরের সৌন্দর্য যদি বিচার করতে হয়, তবে বহু ক্ষেত্রেই খোদাইশিল্পীদের দক্ষতার কদর করতেই হবে। যেমন, বেশ চমকপ্রদ লাগল, অনেক কবরেই এই যে একটি করে পাথরের বই রয়েছে, আর তার উপর যে-লেখা, সেটিও বইটির খোলা-পাতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ঢেউ খেলানো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পাথুরে বই-এ ডানদিকের পাতার লেখা রাইট অ্যালাইনমেন্ট আর বাঁ-দিকের পাতায় লেফট কিংবা সেন্টার।

মধুসূদন দত্তের কবিতা সম্পর্কে আরও একটা ফলকের উল্লেখ করতে হবে। সেটা যদিও কবির সমাধি নয়, তবু উল্লেখ করা দরকার। মল্লিকবাজার সমাধির বাইরে, গেটে ঢোকার আগেই বাঁ-দিকে রাস্তার পাশে ১৯৬৯ সালে তৈরি হয় ‘কবির-স্মৃতি স্তম্ভ’। এটা সত্যি-সত্যিই ‘পথিক-বর’-দের দাঁড় করানোর জন্য। সেই স্তম্ভের নীচে লেখা আছে, ‘কবির সমাধি অভ্যন্তরে অবস্থিত’।

এই স্তম্ভেও সেই বিখ্যাত কবিতাটি খোদিত। ‘দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব...’ — এখানে আবার খোদাইকর এক অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন। কবিতার মূল শরীরকে ব্যবচ্ছেদ করে তার উল্লম্ব কেন্দ্রীয় অক্ষটিকে খুঁজে বের করেছেন যেন। এবার দু-পাশে টানা হয়েছে প্রতিটি লাইনকে। স্তম্ভের যে-অংশটিতে কবিতাটি রয়েছে, সেটির চেহারা একটি মাথা-কাটা পিরামিডের মতো। খোদাইশিল্পী কবিতাটিকেও সেই মাথা-কাটা পিরামিডের আদল দিয়েছেন।

একইভাবে কবরের শরীরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে রবীন্দ্রনাথের গানের লাইনকেও চেপে-চুপে জায়গা করে নিতে হয়। মল্লিকবাজার কবরস্থানেই প্রীতিকণা মণ্ডল ও তপনকুমার মণ্ডল (মা ও ছেলে)-এর কবরে *গীতসংহিতা*-র বাণীর নীচেই রবীন্দ্রনাথের ‘সখী, ভাবনা কাহারে বলে’ গানের দু-টি বিচ্ছিন্ন লাইন খোদিত। দেখেই বোঝা যায়, অল্প জায়গায় যথাসম্ভব বড়ো হরফে চারটি লাইন খোদিত হয়েছে। ফলে লেফট অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গিয়েছে জাস্টিফায়েড। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া লাইন-শেষের ড্যাশ-কে জায়গা দেওয়াই যায়নি।

কলকাতার খ্রিস্টান কবরে বাংলার ব্যবহার খুবই কম। আর ইংরেজির ক্ষেত্রে ফন্টের অনেক বৈচিত্র্য। পরিচিত কবিতার পঙ্‌ক্তি না হলেও, কবিতার ছড়াছড়ি। সেসবের অনেক স্তবকই হয়তো আপনজনেদের লেখা। কোথাও অল ক্যাপিটাল, কোথাও প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণটি বড়ো-হাতের। কিন্তু যেভাবেই লেখা হোক, একটা বিষয় ঠিক যে, তা চোখকে কষ্ট দেয় না। বরং সাদা-কালো হরফের নকশা



কবরস্থানের আবহের সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। কোথাও-কোথাও তা রীতিমতো বাঙ্ময়। চোখে পড়ল জনৈক 'স্যামসন' পরিবারের কবরস্থানটি। কবরটির সামনে কালো পাথরের ওপর যত্নে লেখা চারটি লাইন —

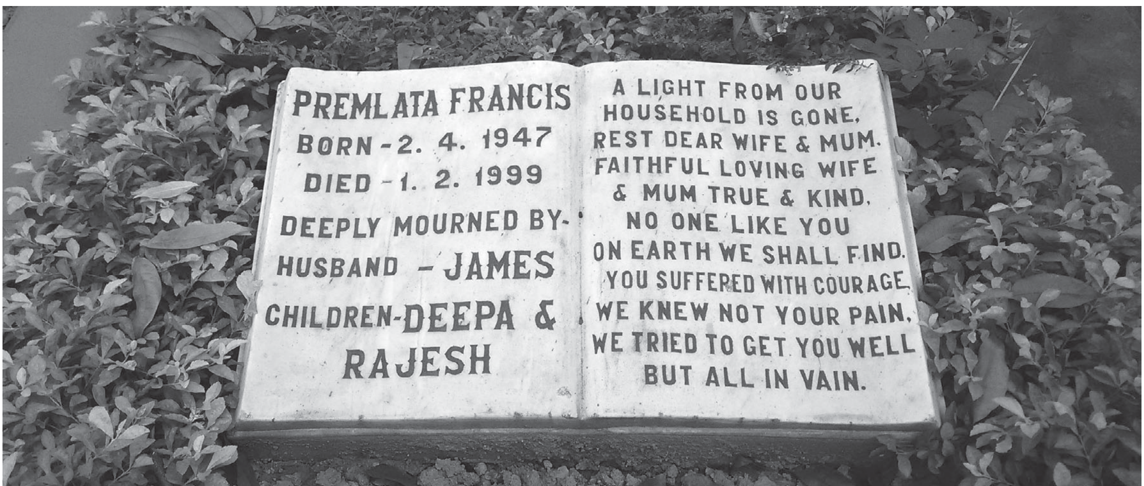
OUR FAMILY CHAIN IS BROKEN
NOTHING SEEMS THE SAME
BUT AS GOD CALLS US ONE BY ONE
THE LINK WILL JOIN AGAIN

এই সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট স্তবকটির নীচেই একটি শৃঙ্খল খোদাই করেছেন শিল্পী। অনেকগুলি রিং একটির সঙ্গে একটি জুড়ে আছে, আর তার থেকে খানিক দূরে একটি রিং রয়েছে একলা। যেন শৃঙ্খলে জুড়ে যাওয়ার অপেক্ষায়...। কবিতাটির মর্মার্থই প্রকাশিত। ওই শৃঙ্খলই বলে দেয়, মৃত্যু হল নির্ধারিত ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সকলকেই একদিন পঞ্চভূতে বিলীন হতে হবে। শিল্পীর স্বাধীনতা অনেক সময় কবরে খোদিত মূল কবিতার শরীর ভেঙেছে বলে কেউ অভিযোগ তুলতে পারেন, কিন্তু কবরের শরীর সম্পর্কে খোদাইশিল্পীর সচেতনতার প্রমাণই হয়তো তাতে মিলবে।

এই মল্লিকবাজার কবরস্থানে সবথেকে যত্নে থাকা কবরস্থানটি জন ইলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন-এর। ঠিক যেখান থেকে ডান হাতে চলে গেছে 'মধু-পথ', তার উলটো দিকেই বাঁ-হাতে গেছে 'বেথুন-বীথি'। এই কবরেও খোদিত কবিতা। বেশ মানানসই বটে। শুধু কবিতাই নয়, কবরে-কবরে বাইবেলের অংশবিশেষ কিংবা যোহনের বাণী খোদিত বা লেখা, যা-কিছুই আছে, তার সবই কবরের কথা মাথায় রেখে। কবরস্থানের শান্ত পরিবেশের সঙ্গে তার ইলাস্ট্রেশনও শান্ত, সরল।

কবরের গঠন বৈচিত্র্য অনেক বেশি পার্কস্ট্রিটের পুরোনো কবরস্থানে। সেখানে মূলত ব্রিটিশ শাসকদের, যোদ্ধাদের কবর। অধিকাংশ কবরের স্থাপত্যেই যতটা না শৈল্পিক ভাবনা, তার থেকে বেশি আভিজাত্যের প্রকাশ। দেখার মতোও বটে। কিন্তু সেখানে কবিতার বিশেষ স্থান নেই। বেশিরভাগ কবরের গায়েই অনেক-অনেক লেখা। বেশিটাই কবরে শায়িত মানুষটির জীবন বর্ণনা। তিনি কার সঙ্গে কবে কোন যুদ্ধ করেছিলেন, কীভাবে কত বয়সে প্রাণ দিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ। এই কবরগুলিতে খোদাই-এর ব্যবহার বিশেষ হয়নি। কোনো ধাতুর তৈরি হরফকে কবরের গায়ে আটকে দেওয়া হত। যা অনেক ক্ষেত্রেই কালের নিয়মে ক্ষয়ে গিয়েছে, খুলে গিয়েছে।

এরই মধ্যে একেবারে আলাদা ডিরোজিও-র কবর। ১৮৩১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটি নতুন করে তৈরি করে। ডিরোজিও-র মূর্তিও স্থাপন করা হয়। সেই সঙ্গে ফলকে তাঁর জীবন-কথা, স্তুতি এবং দু-টি আলাদা ফলকে আত্মার শান্তিকামনা করা কবিতা খোদাই করা আছে। দু-টি কবিতাই সেই এক রূপে। অল ক্যাপ, জাস্টিফাই। শিল্পীর ভাবনায় এমন রূপই হয়তো কবরের কবিতার জন্য জাস্টিফায়েড।



ফোটোগ্রাফ : অরুণাভ পাত্র

পদ্য-পোশাক

শুভজিৎ দাশ



কেউ কবিতা পড়েন। কেউ কবিতা পরেন। প্রথম ক্ষেত্রে কবিতা ছাপা থাকে বই-এ, পত্রিকায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পোশাকে। যেমন, টি-শার্ট, কুর্তা, শাড়ি ইত্যাদি। কবিতা পড়ার সময় তার একটা দৃশ্যরূপ ধরা দেয়। কিন্তু কবিতা যখন 'পরা' হয়? পোশাকে কবিতা কেমন দেখতে লাগে?

চলুন, পদ্য-পোশাকের বক্ষপথে একটু প্রদক্ষিণ করে আসি। কেমন লাগে যখন বুকের ওপর লেখা থাকে, 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' বা শাড়ির আঁচলে 'হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'? কবিতার দৃশ্যরূপ তখন বদলায় কি? কবিতা পড়ার সেই পরা-বাস্তবতা আদপে কেমন?

সপসপে ভিজে, লিকলিকে এক কলেজ-পড়ুয়ার বুকে আমি শক্তিশেল দেখেছি। বৃষ্টিস্নাত সেই যুবকের টি-শার্টে উল্লেখ ছিল — 'বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো'। আমার তো আবহাওয়ার সৌজন্যে সেদিন ওই 'পদ্য' বেশ প্রাসঙ্গিকই লেগেছিল। গুনগুনিয়ে যাদবপুর থেকে বাঘাযতীন এসেছিলাম — 'গিলা মন শায়দ বিস্তার কে পাস পড়া হ্যায়' ভেবেই। *ইজাজত*-এর মতো দেখতে লেগেছিল সেদিন সেই পদ্য-পোশাক। মাইরি বলছি, 'গুলজার'-এর দিব্যি!

'মাইরি' বলতে মনে পড়ল। ইউনিভার্সিটিতে ভার্সেটাইল স্বাগতার বুকের ওপর (পড়ুন টি-শার্টের ওপর) লেখা ছিল, 'ওগো, আমাকে নেবে না?' তাই দেখে প্রশান্ত বলে উঠেছিল — 'বাতাবির ফল প'ড়ে থাকা মাঠ'। উফ! সে কী 'পিন্তানিনা সান্তামারি' কেস! সেদিন আমি, পোশাকে কবিতার 'প্র-বীরত্ব' দেখেছিলাম। সার্থকতা দেখেছিলাম।

আমার বন্ধু অমিতাভকে, বন্ধু শক্তি (পদবি মনে নেই) জ্বলন্ত দেশলাই ছোঁড়ার আগে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, অমিতাভ, তোকে একটু পোড়াই?' তা অমিতাভ বলল, 'তোর শখ হয়েছে যখন, তখন পোড়া না!' শক্তি জ্বলন্ত দেশলাই ছুড়ল। অমিতাভ ছটফট করে নিভিয়েও দিল। টি-শার্টে একটা ফুটো হয়েছিল মাত্র। অমিতাভর প্রিয় টি-শার্টের মধ্যে ওইটা ছিল অন্যতম। তাই মায়াক্রান্ত হয়ে, বাড়ি গিয়ে অমিতাভ ওই ফুটোর পাশে ডিজাইন করে লিখেছিল — 'স্কোপ'। টি-শার্টে। বুকের বাম দিকে। কবিতা না হলেও একটা সুকুমারীয় 'কবিতাস্কোপ' হয়েছিল। সেদিন ওই পদ্য-পোশাকে আমি 'কার্ডিয়াক আউটপুট' দেখেছিলাম। আসলে —

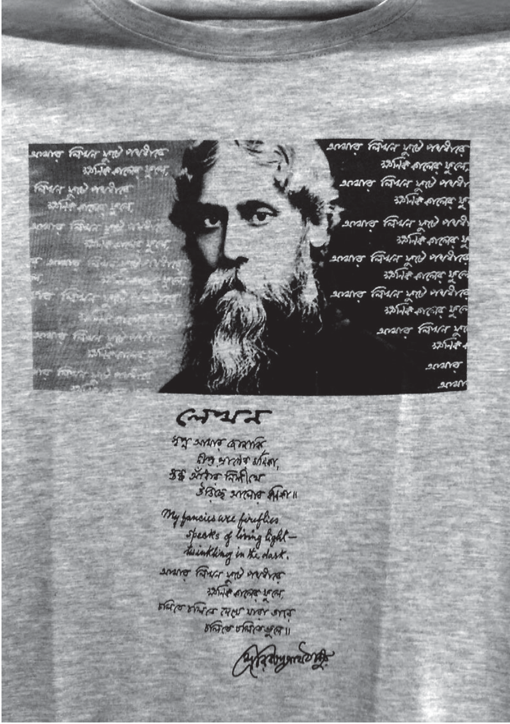
> যে যা দেখার সে তাই দেখে
> যে যা রাখার রাখছে মনে
> তুমিও ঠিক আমিও ঠিক
> তফাত শুধু দৃষ্টিকোণে।

দৃষ্টিকোণ, মানে, কোন কোণ থেকে আপনি দেখছেন। সূক্ষ্ম না স্থূল? লেখক সৈকত কুণ্ডুর এই লেখাটি কোনো বই-এ ছাপা হয়নি। লেখাটি গানও হয়ে ওঠেনি কোনোভাবে। তবুও গীতিকার সৈকতবাবু। তার এই লেখাটি টি-শার্টের বক্ষ-মাঝে রাখার মৌখিক অনুমতি দিলেন বটে। কিন্তু শাড়িতে কবিগুরুর লম্বা কবিতার দৃশ্যরূপ চাক্ষুষ করে তিনি বেশ চটেই ছিলেন। কারণ কুঁচিতে হারিয়ে গিয়েছিল কবিতার কিছু লাইন। তাই তিনি রেগে, এই পোশাকি পদ্যের নামকরণ করেন 'সাহিত্যের ডিজে'। যদিও তিনি মনে করেন, পোশাকের জন্য আলাদাভাবে 'পদ্য' লেখা যায়।

তবুও, Complex way of seeing must be practiced। ব্রেশ্‌ট বলেছিলেন। ভবাসুলভ ভঙ্গিতে ঘটকালি করলে বলা যায় — দেখো, দেখো, দেখা প্র্যাকটিস করো। ভাবছি...।

হলুদ রঙের টি-শার্ট-এ কালো কালিতে লেখা 'মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়'। বিনয় মজুমদারের একটা কবিতার মাত্র একটা লাইন কারো বুকে হঠাৎ উড়ে আসাকে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের খুব-একটা নয়ন সুখকর লাগেনি। কিন্তু কোনো-কোনো কবিতার কোনো-কোনো লাইন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। চাবুকের মতো কাজ করে। যেগুলো স্বতন্ত্র উদ্ধৃতি হয়ে ওঠে। যেমন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৃষ্টি ও মায়ের কণ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটে যায়' যদি টি-শার্টে লেখা থাকে তাহলে সেটা 'চাবুকের মতো' দেখতে লাগে।

কিন্তু কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের কাছে পোশাকে কবিতার একটি মাত্র পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি কদর্য! তাঁর মতে, গোটা কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের শুদ্ধি একটি মাত্র লাইন বহন করতে পারে না, তা সে যতই চমকপ্রদ লাইন হোক না কেন। কোনো মস্তান যদি 'আমি স্বেচ্ছাচারী' লেখা টি-শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, সেটা তাঁর বাঁদরামির নামান্তর বলেই মনে হয়।



কিন্তু আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে ভারতবর্ষে পদ্য-পোশাকের আগমনীর পথিকৃত সঞ্চালক-অভিনেত্রী চৈতালি দাশগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। পদ্য-পোশাকের সামাজিক ভাবমূর্তি তুলে ধরলেন তিনি। তাঁর পদ্য-পোশাকের সাজঘরের নাম 'শ্রাবস্তী'। শ্রাবস্তী-র কারুকার্যে রয়েছে টি-শার্ট, কুর্তা এবং শাড়িদেহে পদ্যবিভাব। কোনো কবিতার টুকরো লাইন, আবার কোনো কবিতার দীর্ঘ দেহ শাড়ি জুড়ে পায়চারি করছে। আবহে কখনো প্রাসঙ্গিক রং-কারিকুরি, কখনো-বা নন্দলাল বসু বা রামকিঙ্কর বেইজের 'দৃষ্টি-সৃষ্টি'। আগামী প্রজন্মকে সাহিত্যের সন্নিকটে নিয়ে আসতে পদ্য-পোশাক অনুঘটকের কাজ করে বলে মনে করেন চৈতালি ওরফে কেয়াদি। কেয়াদির কাছে তাই পদ্য-পোশাক 'শিক্ষকের মতো দেখতে'।

কবি অজিত দত্তর কন্যা ফ্যাশন ডিজাইনার শর্বরী দত্ত অবশ্য মনে করেন যে, ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হিসেবে পোশাকে পদ্যের ব্যবহার ডিজাইনারের সৃজনশীলতার অভাবকেই প্রকট করে। তবুও কথা রাখতে গিয়ে, তিনিও একবার পদ্য-পোশাক গড়েছিলেন। বাম নেতা, তৎকালীন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী একবার জ্যোতি বসুর জন্য একটা চাদর ডিজাইন করে দেওয়ার আর্জি রাখেন শর্বরী দত্তের কাছে। আবেদন ছিল, চাদর-জুড়ে যেন থাকে বঙ্গভূমির ব্যাকগ্রাউন্ড। তখন চাদরের বুকে গ্রামের মন্তাজে ফিরে-ফিরে আসে কবিতার কলতান — 'নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম, জননী বঙ্গভূমি'।

নিজের খেয়ালে পোশাকে এক্স ইকুয়ালস টু প্রেম ধরে নিয়ে প্রেমের পদ্যের আঁকিবুকি বিস্তর করেছেন ফ্যাশনবর্ধক ব্যক্তি শিলাজিৎ। তার কাছে কোনো কবিতার লাইন তো বটেই, একেকটা শব্দ, এমনকী একেকটা অক্ষরও স্বমহিমায় নিজস্বী। পদ্য-পোশাকে তাই তিনি ইমেজ দেখেন। তবে, ইদানীং ইমেজ-কনশাস 'শিলু'-রও, যেকোনো বুকের ওপর ফুটে-ওঠা কবিতা পড়তে নাকি লজ্জা লাগে! x-ray of hope আর কি!

অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা ওরফে ঋ-র শান্ত-শান্ত, স্বাভাবিক পরিবেশ খুব-একটা পছন্দ নয়। তাই পোশাকে পদ্য লিনিয়ার থাকুক, তিনি চান না। লাইনটা ভেঙে-চুরে ডিসটর্ট করলে, তবেই তার কাছে

সেটা প্রাসঙ্গিক হয়। যেমন —

প্রভু নষ্ট হয়ে যাই

এটাই ঋ-অ্যাকশন!

কবি শ্রীজাত মনে করেন, চলমান মানুষের শরীরের পোশাক থেকে গোটা কবিতা পড়ে নেওয়া সম্ভব না। তাই একটা লাইনই যথেষ্ট। তবে, লাইনটা 'এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই' বা 'আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডন আছে'-র মতো হলে, তা পপুলার দেখায়। তাঁর মত। তবে, তিনি কবিতা পড়তে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, পরতে একদমই নন।

তবে, পোশাক মানেই তো নানা ভাঁজের সমাহার। তাই ভাঁজের আড়ালে কবিতার শব্দ লুকিয়ে গেলে পাঠকের বে-লাইন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই চৈতালি দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রাবস্তী'-র কারুকার্যে জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা*-কে দৃশ্যমানতায় রাখেন। তবুও আঁচলজোড়া *রূপসী বাংলা* দেখে কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের খানিক অস্বস্তিই হয়েছিল, কারণ উক্ত মহিলার হাব-ভাব নাকি ওই শাড়ির বৈভবের বিপ্রতীপ ছিল।

ইচ্ছে হলে, ইচ্ছেমতো টি-শার্ট, কুর্তা, শাড়ির দেহে কবিতার চরণকে চালিয়ে দেওয়াই যায়। অনেকে দেনও। কিন্তু পদ্য-পোশাক যখন ব্যাবসায়িক স্বার্থে সৃষ্টি হচ্ছে, তখন কিছু আইনি দ্বন্দ্ব পোহাতে হয় ওই শিল্পরসিক ব্যবসায়ীকেও। তখন ইচ্ছা থাকলেও কপিরাইটের লেফট এবং রাইট কুচকাওয়াজে অধরা থেকে যায় 'ফ্যাতাড়ু সিরিজ'। সাদাবাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে অনুমতি নিয়ে তবে জিজ্ঞেস করা যায় 'অবনী বাড়ি আছো?'

যাঁরা এই পদ্য-পোশাকের চলনকে আরও 'প্রো' করে তুলছেন, এদেশে 'কবিরা' তাদের অন্যতম। বাংলাদেশ থেকেও আমরা নিয়মিত পাচ্ছি 'নিত্য উপহার'। 'নিত্য উপহার' নামক এই ব্র্যান্ড বাংলাদেশে পদ্য-পোশাকে একপ্রকার জোয়ার নিয়ে এসেছে। এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকেই মাতৃভাষাকে শুধুই পোশাকি না রেখে, পোশাকে রাখার প্রয়াসে মেতেছেন। জয় বাংলা। হোক ছোঁয়াচে।

সেদিন নন্দন চত্বরে নচিকেতাকে একটা কালো টি-শার্ট পরে সবান্ধব হেঁটে আসতে দেখলাম। বন্ধুসম নচিকেতা গঙ্গোপাধ্যায়। দৃষ্টিহীন। ধ্যান-জ্ঞান নাটক। কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, ওঁর কালো টি-শার্টের বুকে কালো কালিতে লেখা — 'আলো ক্রমে আসিতেছে'। ও নিজেই লিখেছে। জানি, এটা কোনো কবিতার লাইন নয়। তবে, ভীষণ কবিতার মতো দেখতে লাগছিল। আসলে কখনো-কখনো পোশাকে কবিতাকে শুধু কবিতার মতোই দেখতে লাগে। আর কিছু না।



যাক, অনেক রাত হয়েছে। পৃথিবীর রং নিভু-নিভু। পাণ্ডুলিপির আয়োজন শুরু। মা ডাকল। মনে পড়ে গেল একটা গান — 'Mama I'm coming home'। Ozy Osbourne। শরীর জুড়ে উলকি। আঁকিবুকি। ওঁর পোশাকতুল্য প্রায়। এখন এই উলকিবাজি ওরফে ট্যাটুর প্রচলন বেশ রমরম। নকশার পাশে জায়গা করে নিয়েছে টেক্সট-ও। পদ্যও চোখে পড়ে কদাচিৎ। দেখতে কেমন লাগে জীবিত মাংসের ওপর খোদাই পদ্য? বুকের বাঁ-দিকে হাত-মেশিনটা ভনভনিয়ে লিখে দিচ্ছে... 'নির্দিষ্ট ব্যথার দিন দেখা হয়েছিল...'।



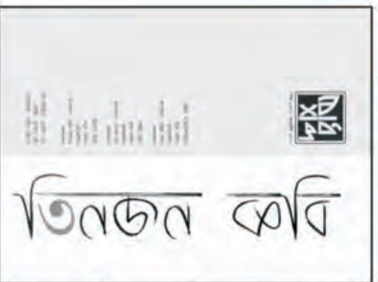




কবির প্রথম বই, জানুয়ারি ২০১১



পাঁচজন কবি, জানুয়ারি ২০১৪



তিনজন কবি, জানুয়ারি ২০১৭



এবার গল্প, জানুয়ারি ২০১৯



সৌজন্য সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১০



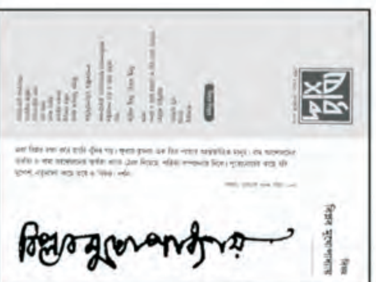
মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩



কবিতা যেমন দেখায়, জানুয়ারি ২০১৬



কবিতার বিপণন, জানুয়ারি ২০১৮



বিপ্লব মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০০৯



বিভাব কবিতা, জানুয়ারি ২০১২



ভেটকি, জানুয়ারি ২০১৫

কবিতা যেমন দেখায়



www.facebook.com/groups/bodhshabdo/
https://twitter.com/#!/Bodhshabdo

ঊনবিংশ সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ : পৌষ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬
বিনিময় মূল্য : ১২৫ টাকা